ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা
সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন
রাযিয়াল্লাহু আনহুম
মাওলানা মাসউদুর রহমান অনূদিত

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)

(৫৪জন সাহাবীর জীবনী)

২

মাওলানা মাসউদুর রহমান
অনূদিত

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন (২)

মূল : ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান রহ.
১ম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৮, ৪র্থ মুদ্রণ : জুলাই ২০২৩ প্রচ্ছদ : মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ : জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স, ৬৫ প্যারিদাস লেন, ঢাকা-১১০০।
বাঁধাই : আয়েশা বুক বাইন্ডিং, সূত্রাপুর, ঢাকা। ০১৭১২-৯৫৪৮৩১

একমাত্র পরিবেশক : **রাহনুমা প্রকাশনী,**
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
কওমী মার্কেট, ৪নং নিচতলা, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ৯০০/- (নয়শ টাকা মাত্র)

SAHABAYE KERAMER EMANDIPTO JIBON (2nd Issue)
Writer: Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha, Translated by- Mawnala Maswoodur Rahman,
Published by: Rahnuma Prokashoni, Price: Tk. 900.00, US $ 15.00 only.

ISBN 978-984-93221-7-7
Web: www.rahnumabd.com, E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

অর্পণ–

পাবনা জামেয়া আশরাফিয়ার
বড় হুযুর
হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ নেয়ামতুল্লাহ দা. বা.-এর
মুবারক হাতে।

যিনি তিলে তিলে নিজের জীবনের
সব শক্তি নিংড়ে দিয়ে
গড়ে তুলেছেন জামেয়া আশরাফিয়া।

অনুবাদকের কিছু কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ,
অসংখ্য আগণিত শুকরিয়া মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদন করছি, যিনি আপন করুণার আঁচলে ঢেকে এই নগণ্যকে *সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন* দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সম্পূর্ণ করার তাওফীক দিয়েছেন।

মূল আরবী কিতাব *সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা* দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পূর্ণ নতুন ৪৩টি জীবনী নিয়ে ডক্টর রাফাত পাশা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা অনুদিত গ্রন্থে উভয় খণ্ডের কলেবর একরকম রাখার ইচ্ছায় উভয় খণ্ডে ৫৪টি করে জীবনী ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

রাহনুমা প্রকাশনী—যা রুচিশীল ইসলামী প্রকাশনার জগতে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, আমার অন্য বইগুলোর মতো এটাও খুবই চমৎকারভাবে উন্নত কাগজ, ঝকঝকে ছাপা, মজবুত বাঁধাই এবং দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদে সাজিয়ে পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছে দেখে আমি খুবই তৃপ্ত। আশা করি পাঠকরাও আনন্দ পাবেন এবং তৃপ্ত হবেন; ইনশাআল্লাহ।

একজন মুমিনের জন্য মহান সাহাবীদের বিষয়ে মৌলিক কিছু ধারণা রাখা অতি জরুরি। সেই জরুরি বিষয়গুলো প্রথম

খণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ সেটা ভালোভাবে পড়ে নেবেন।

বইটিকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার জন্য অনুবাদক এবং রাহনুমা পরিবার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করেনি। এরপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়, বরং মানুষ হিসাবে সেটাই স্বাভাবিক। কারও চোখে কোনো ভুল বা অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানালে কৃজ্ঞতার সঙ্গে পরবর্তীতে সংশোধন করে দেওয়া হবে; ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা জানাই, সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ জীবন থেকে আমরা যেন শিক্ষা নিতে পারি, আদর্শ জীবন গড়তে পারি, জাহান্নাম থেকে মুক্তির পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ওয়াস সালাম–

মাসউদুর রহমান

কমলাপুর, কুষ্টিয়া

২৯ যিলহজ ১৪৩৯ হি.

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.

ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা
রহমাতুল্লাহি আলাইহি

জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।

জন্মস্থান সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের 'আরীহা' শহর। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা।

মাধ্যমিক শিক্ষা 'হলব' শহরের খসরুবিয়া বিদ্যালয় থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রী মিশর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উসূলুদ্দীন' (ধর্ম) অনুষদ থেকে। সব শেষে কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে অনার্স, মাস্টার্স ও পি.এইচ.ডি.।

কর্মজীবনের শুরু শিক্ষক হিসাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরবী ভাষার প্রধান পরিদর্শক (Inspector)। তারপর দামেস্কের 'দারুল কুতুব' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাশাপাশি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের প্রভাষক।

সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এখানে ইসলামী সাহিত্য কারিকুলাম এবং 'অলঙ্কার ও সমালোচনা' বিভাগের চেয়ারম্যান, 'মজলিসে ইল্‌মী'র (শিক্ষা পরিষদ) আজীবন সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ প্রধানের দায়িত্ব পালন।

মরহুম ড. আবদুর রহমান ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্বোধক নন, বহু চিন্তাশীল, গবেষক তাঁর পূর্বেও এ কাজ করেছেন... তবে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন পূর্বসূরিদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও স্বার্থক রূপায়ন ঘটাতে। সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারা।

তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর সভাপতিত্বে *রাবেতা আল-আদাবুল ইসলামী*'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সহ-সভাপতি। এছাড়াও বহু সংস্থা ও কমিটির তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য।

মৃত্যু ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই শুক্রবারে তুর্কিস্তানের ইস্তাম্বুল শহরে। তাঁকে দাফন করা হয় সেখানেরই 'ফাতেহা' গোরস্থানে। যেখানে সমাহিত রয়েছেন অনেক সাহাবী ও তাবেঈ। জীবদ্দশায় যাঁদের তিনি সর্বাধিক ভালোবাসতেন এবং যাঁদের পাশে একটু স্থান পাওয়ার ব্যাকুল প্রার্থনা করতেন মহান প্রভুর দরবারে। আল্লাহ সেই প্রার্থনা কবুল করে পৃথিবীতেই তাঁর মৃতদেহকে স্থান দিয়েছেন মহান সাহাবী ও তাবেঈদের কবরের পাশে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা—চিরস্থায়ী জান্নাতেও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী বানিয়ে দিন। আমীন।

সূচিপত্র

সাবেত ইবনে কায়েস আল-আনসারী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

সাবেত ইবনে কায়েস আল-আনসারী ছাড়া আর কারোরই মৃত্যুর পরের অসিয়ত কার্যকর করা হয়নি।

সাবেত ইবনে কায়েস আল-আনসারী ছিলেন 'খাযরাজ' গোত্রের একজন বিখ্যাত নেতা। ছিলেন ইয়াসরিবের একজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা ও উপস্থিতবুদ্ধির অধিকারী। ভরাট গলার, দরাজ আওয়াজের আকর্ষণীয় বক্তা। কথা শুরু করলে সকলের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠে তাঁর কথা, আর বক্তব্য দিতে উঠলে সকলের হৃদয়, মন ও মনোযোগ সবটুকু আকৃষ্ট হয়ে থাকে তার প্রাঞ্জল বক্তব্যে।

ইয়াসরিবের জমিনে ইসলাম গ্রহণকারী অগ্রগামীদের তিনি অন্যতম। ইসলামের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কুরআনের তিলাওয়াত শুনে। ইয়াসরিবের উদ্দেশে প্রেরিত ইসলামপ্রচারক মক্কার তরুণ মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধুর কণ্ঠের সুললিত তিলাওয়াত তাকে মুগ্ধ করে। তারপর তিনি তন্ময় হয়ে বারবার শুনতে থাকেন কুরআনের অপূর্ব উপদেশমাখা আয়াতগুলো। কুরআনের অশ্রুতপূর্ব বক্তব্য ও ভাষাশৈলী, জাদুমাখা শব্দালংকার তার হৃদয়ে তোলে সুরের ঝংকার। কুরআনের আকর্ষণীয় ও চমৎকার বর্ণনাভঙ্গি, আদেশ-নিষেধ ও

দিকনির্দেশনা তার হৃদয়ে সৃষ্টি করে এক কালবৈশাখী ঝড়—যা তছনছ করে দেয় দীর্ঘদিনের লালিত চেতনা ও বিশ্বাস।

আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে দেন ঈমান গ্রহণের জন্য। ইসলামের পতাকাতলে, সত্য দীনের আলোর কাফেলায় শামিল করে তিনি তার মর্যাদাকে করে তোলেন সমুন্নত।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এলে সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজ কওমের একদল অশ্বারোহী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তাকে জানান উষ্ণ অভ্যর্থনা। রাসূল ও তাঁর সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীকের শুভাগমন উপলক্ষে তিনি চমৎকার এক স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। যথারীতি শুরুতে মহান আল্লাহর হামদ ও সানা এবং প্রিয় নবীর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠের পর তিনি আবেগময় বক্তব্যের সমাপ্তিতে এসে বলেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি দিয়ে আপনার হেফাজত করব ঠিক যেভাবে আমরা নিজেদের স্ত্রী, সন্তান ও নিজ নিজ জীবনের হেফাজত করে থাকি। ইয়া রাসূলাল্লাহ, এর বিনিময়ে আমরা কী পাব?

এর জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

‘এই মহান ত্যাগের বিনিময় হিসাবে তোমরা পাবে ‘জান্নাত’।’

প্রিয় নবীর জবান মুবারক থেকে ‘জান্নাত’-এর বিশাল প্রতিশ্রুতি শোনামাত্রই উপস্থিত সকলের হৃদয়-মন আনন্দে নেচে ওঠে। তাদের চোখে-মুখে সেই প্রচণ্ড খুশির ঝলক বয়ে যায়। এত বড় বিশাল প্রতিদানের ঘোষণা শুনে তারা একসঙ্গে বলে ওঠেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এই প্রতিদানে রাজি আছি।

হে আল্লাহর রাসূল, আমরা এই প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট আছি।’

সেদিন থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিযুক্ত করলেন নিজের 'মুখপাত্র'। দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিতেন নিজের কবি হাস্‌সান ইবনে সাবেতকে। যিনি দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের কাব্য প্রতিভায় গর্বকারীদেরকে কবিতার মাধ্যমে তুলোধোনা করে শ্রেষ্ঠনবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেন।

***

সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন সুদৃঢ় ও সুগভীর ঈমানী চেতনায় বলিষ্ঠ বিরল ব্যক্তিত্ব। আল্লাহর ভয় অর্থাৎ খাঁটি তাকওয়া ও পরহেজগারির গুণ ছিল তাঁর হৃদয়ভরা। মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক যাবতীয় বিষয় থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখতেন বহুদূরে।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভীষণ চিন্তিত ও বিষণ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে আবু মুহাম্মাদ, (সাবেত ইবনে কায়েস) কী হয়েছে তোমার? এত চিন্তিত কেন?'

চিন্তিত আওয়াজে তিনি জবাব দিয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি এবং হয়তো নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

'কীভাবে সেটা?'

তিনি বললেন,

'আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজের প্রশংসায় খুশি হতে এবং নিজের প্রশংসা পছন্দ করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন, অথচ আমি

দেখতে পাচ্ছি যে, কেউ আমার প্রশংসা করলে আমি খুশি হই। মজা পাই। আল্লাহ তাআলা 'তাকাব্বুর' (অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা) করতে বারণ করেছেন। অথচ আমি তো মনে মনে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবি। নিজেকে পছন্দ করি...'

এভাবে সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের ভয় ও আশঙ্কার কথা বলতে থাকেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আশ্বস্ত করতে থাকেন। তাকে অভয় দিতে গিয়ে এক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'হে সাবেত, তুমি কি খুশি হবে না, যদি তোমার জীবন হয় প্রশংসনীয়...
মৃত্যু হয় শাহাদাতের...
মৃত্যুর পর ঠিকানা হয় জান্নাতে?'

এই বিরাট সুসংবাদে সাবেত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারা খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। এর জবাবে তিনি বলেন,

'কেন খুশি হব না ইয়া রাসূলাল্লাহ!
অবশ্যই আমি খুশি ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'তোমার জন্যই ঐ সুসংবাদ।'

***

যখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাজিল হলো,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের চেয়ে তোমাদের আওয়াজকে উঁচু কোরো না এবং তার সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বোলো না,

যেমন একে অন্যের সঙ্গে বলে থাকো। হতে পারে এতে তোমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, অথচ তোমরা জানতেও পারবে না।'-সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ২

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের প্রতি প্রচণ্ড ভক্তি-ভালোবাসা সত্ত্বেও তাঁর মজলিসে হাজির হওয়া ছেড়ে দিলেন। সারাক্ষণ নিজ বাড়িতেই নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে শুরু করলেন। শুধু ফরজ নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে হাজির হতেন। এ ছাড়া অবশিষ্ট সকল সময় বাড়িতেই একাকী বিষণ্ন মনে পড়ে থাকতেন।

বেশ কয়েকদিন তার অনুপস্থিতির পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মজলিসে ঘোষণা করলেন,

'কে আছে, যে আমাকে সাবেত ইবনে কায়েসের খবর এনে দিতে পারবে?'

এক আনসারী উঠে বললেন,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনাকে তার খবর এনে দিতে পারব।'

লোকটি যথারীতি সাবেত ইবনে কায়েসের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। দেখলেন, তিনি বিষণ্ন মনে মাথা নিচু করে বসে আছেন। আনসারী লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে আবু মুহাম্মাদ, আপনি কেমন আছেন?'

তিনি সংক্ষেপে ভূমিকা ছাড়াই জবাবে বললেন,
'খুব খারাপ।'

লোকটি এবার একটু ব্যাখ্যা চেয়ে বললেন,
'কেন? কী হয়েছে?'

তিনি বললেন,
'দেখো, আমার গলার আওয়াজ সকলের চেয়ে উঁচু। এতে করে নিশ্চয় অনেক সময় রাসূলের আওয়াজের ওপরে আমার আওয়াজ উঁচু

হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কুরআনে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তার কারণে আমি ভীষণভাবে শঙ্কিত, হয়তো আমার সকল আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে আর আমি জাহান্নামী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।'

লোকটি রাসূলের কাছে ফিরে এসে নিজের দেখা ও শোনা সকল বিষয় জানালেন। সকল বিষয় অবগত হয়ে তিনি লোকটিকে বললেন,

'তুমি তার কাছে আবার যাও। গিয়ে বলো, তুমি জাহান্নামী লোকদের অন্তর্ভুক্ত নও; বরং তুমি জান্নাতী লোকদের একজন।'

এটাই ছিল সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুসংবাদ, সারা জীবন তিনি কামনা করেছেন, যেন এর সুফল লাভ করতে পারেন দুনিয়া ও আখেরাতে।

***

সাবিত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হক-বাতিলের সকল লড়াইয়ে শরীক হয়েছেন। শাহাদাতের স্বপ্নপূরণের আকাঙ্ক্ষায় সকল যুদ্ধেই তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে শত্রুসৈন্যের সারি ভেদ করে দুঃসাহসী হয়ে লড়াই করেছেন। কিন্তু প্রতিবারেই তিনি স্বপ্নপূরণের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেও ব্যর্থ হয়েই ফিরে এসেছেন। কাঙ্ক্ষিত শাহাদাতকে স্পর্শ করতে পারেননি।

অবশেষে তাঁর সেই শাহাদাতের স্বপ্ন পূরণ হলো প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনামলে ভণ্ড নবী মুসাইলামা ও মুসলিম বাহিনীর মাঝে সংঘটিত 'রিদ্দা'র যুদ্ধে।

এই যুদ্ধে তিনি ছিলেন আনসার সৈনিকদের আমীর ও সিপাসালার আর আবু হুযাইফার আযাদকৃত ক্রীতদাস সালিম ছিলেন মুহাজির সৈনিকদের আমীর ও সিপাসালার। আর মুহাজির, আনসার ও বেদুঈনসহ সকল দলের সর্বাধিনায়ক বা প্রধান সেনাপতি ছিলেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

যুদ্ধের শুরু থেকেই রণাঙ্গনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল মুসাইলামা ও তার শক্তিশালী বাহিনীর দাপট। বিজয়ের পাল্লাও ঝুঁকে ছিল তাদেরই দিকে। মুসলিম বাহিনীর চরম শোচনীয় অবস্থার সুযোগে মুসাইলামার বাহিনী সেনাপতি খালিদের তাঁবুতে আক্রমণ করে বসল। তারা মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র (যুদ্ধের হেড অফিস) এই তাঁবুর সকল রশি ছিঁড়ে সবকিছু একেবারে তছনছ করে ফেলল। সেনাপতির স্ত্রী 'উম্মে তামীম'কে হত্যার উদ্যোগ নিয়েও শেষ পর্যন্ত 'নারীহত্যা কাপুরুষতা'র প্রচলিত রীতির কথা চিন্তা করে বিরত হলো।

সেই দিন সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম বাহিনীর দুর্দশা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে ভীষণ ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি সর্বাধিক বিচলিত হলেন যখন দেখলেন, শহুরে যোদ্ধারা মরুবাসীদের ভীরু আর মরুচারী বেদুঈন যোদ্ধারা শহুরে যোদ্ধাদের অনভিজ্ঞ বলে দোষারোপ করছে।

মুসলিম বাহিনীর বিশৃঙ্খলা ও পারস্পরিক দোষারোপের কারণে সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাফনের কাপড় পরে মৃত ব্যক্তির মতো শরীরে কর্পূর মেখে দরাজ গলায় সকলকে সম্বোধন করে বললেন,

'প্রিয় মুসলিম সৈনিক ভাইয়েরা!

আজকের রণাঙ্গনে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখে আমি ভীষণ ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কোনো রণাঙ্গনেই মুসলিম সৈনিকদের এমন লজ্জাজনক বিপর্যয় আমি দেখিনি।

মুসলিম সৈনিকদের বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনী আজ পর্যন্ত এমন দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। অথচ তোমাদের অনৈক্য, পারস্পরিক দোষারোপ ও ভীরুতা আজ শত্রুদের এতখানি দুঃসাহসী ও উল্লসিত করে তুলেছে।

শত্রুবাহিনীর এতবড় দুঃসাহস আর নিজেদের বিপর্যয় কি তোমরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিচ্ছ? আমি কিছুতেই এই বিপর্যয় মেনে নিতে পারব না।'

এরপর তিনি ওপরে আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে বললেন,

'হে আল্লাহ, আমি এই মুসাইলামা ও তার মুরতাদ বাহিনীর রিদ্দতের ফিতনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করছি, একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে আজকের এই প্রতিরোধযুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর দুর্বলতা থেকেও নিজেকে সম্পর্কহীন ঘোষণা করছি।'

এই ঘোষণার পর তিনি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম কবুলকারী কয়েকজন মুসলিম সৈনিক—বারা ইবনে মালেক আল-আনসারী, আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবের ভাই যায়েদ ইবনুল খাত্তাব এবং আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুবাহিনীর ওপর আহত সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং এমন ভয়াবহ লড়াই করতে থাকলেন, যা দেখে মুসলিম সৈনিকদের হৃদয়ে হারানো সাহস ও আত্মবিশ্বাসের আগুন জ্বলে উঠল আর শত্রু মুরতাদ বাহিনীর অন্তরে সৃষ্টি হলো ভীতি, ত্রাস আর কম্পন।

অব্যাহত তুমুল আক্রমণের মাধ্যমে তিনি শত্রুবাহিনীর সকল দিকের সার্বিক প্রতিরোধব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দিলেন। অসংখ্য তির, তরবারি ও বর্শার মরণঘাতী আঘাত বুক পেতে নিয়েও শত্রুবাহিনীর বুকে কাঁপন সৃষ্টি করে এক সময় তিনি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে গেলেন। অন্তিম মুহূর্তে সেই শাহাদাতের স্বপ্ন পূরণের আনন্দে তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল, যার সুসংবাদ তাকে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রাণপাখি দেহ ত্যাগ করার পূর্বেই তার হৃদয় শীতল ও প্রশান্ত হয়ে উঠল মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের সূচনা দেখে, যা ছিল একান্ত তার উদ্যোগ আর কুরবানীর ফসল।

***

সাবেত ইবনে কায়েস আল-আনসারীর দেহে ছিল চমৎকার ও লোভনীয় একটি বর্ম। সেদিক দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক মুসলিম সৈনিক সেটা দেখে লোভ সংবরণ করতে না পেরে খুলে নিয়ে সরে পড়ল।

সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেদিন শহীদ হলেন সেই দিনের পরবর্তী রাতেই একজন সাধারণ মুসলিম স্বপ্নে দেখলেন, সাবেত ইবনে কায়েস তাকে বলছেন,

'তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি সাবেত ইবনে কায়েস।'

লোকটি উত্তরে বললেন,

'জি, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। কী খবর, বলুন!'

তিনি বললেন,

'আমি তোমার কাছে খুব জরুরি একটি অসিয়ত করব। কিন্তু খবরদার! তুমি এটাকে স্বপ্নে দেখা কোনো সাধারণ ব্যাপার মনে করে ভুলে যেয়ো না।...

বিষয়টি এই, গতকাল শহীদ হওয়ার পর আমার মৃতদেহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক মুসলিম সৈনিক আমার দামি বর্মটি শরীর থেকে খুলে নিয়ে যায়। বর্মটি নিয়ে সেনাছাউনির একেবারে শেষপ্রান্তে অবস্থিত নিজের তাঁবুতে নিয়ে একটি ডেগের মধ্যে রেখে সেটাকে জিনপোষ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। লোকটির বিবরণ এই রকম...

শোনো, সকালে তুমি আমাদের প্রধান সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের কাছে গিয়ে বলবে, তিনি যেন কাউকে পাঠিয়ে আমার বর্মটি উদ্ধার করেন। সেটা এখনো বর্ণিত ডেগের মধ্যেই আছে।

তোমাকে আরও একটি জরুরি অসিয়ত করছি, খবরদার! এটাকে সাধারণ স্বপ্ন মনে করে অবহেলায় ভুলে যেয়ো না।...

তুমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের কাছে আমার এই অনুরোধ ও অসিয়ত পৌঁছে দেবে যে, মদীনায় গিয়ে খলীফা আবু বকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি যেন তাকে জানিয়ে দেন, সাবেত ইবনে কায়েসের ঘাড়ে এই পরিমাণ ঋণের বোঝা রয়েছে, আর অমুক অমুক নামে আমার দু'জন ক্রীতদাস রয়েছে। খলীফা যেন আমার ক্রীতদাস দু'জনকে মুক্ত করে দেন এবং আমার বর্মটি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে দেন।'

ঘুম ভাঙার পর সকালে লোকটি স্বপ্নের নির্দেশনামতো গিয়ে হাজির হলেন সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের কাছে। সবিস্তারে তাঁর কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানালেন।

স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ শোনার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্মটি উদ্ধার করার জন্য লোক পাঠালেন। লোকটি গিয়ে যথারীতি বর্ণিত স্থান থেকে বর্মটি উদ্ধার করে ফিরে এলেন।

সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রণাঙ্গন থেকে মদীনায় ফেরার পর খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাঁর কাছে যথারীতি সাবেত ইবনে কায়েসের অসিয়তসংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় আলোচনা করলেন। সকল বিষয় অবগত হওয়ার পর খলীফা সরকারি ফরমান জারি করে সাবেত ইবনে কায়েসের অসিয়ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

এটাই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা যেখানে কারো মৃত্যুর পরে করা অসিয়ত কার্যকর করা হয়েছিল। সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আগে বা পরে কখনোই আর কারোর মৃত্যুর পরের অসিয়তকে আমলযোগ্যই বিবেচনা করা হয়নি।

আল্লাহ তাআলা সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি আপন সন্তুষ্টি দান করুন। তাকেও তুষ্ট করে দিন আপন প্রভুর প্রতি আর জান্নাতের উঁচু স্তরে তার স্থান নির্ধারণ করে দিন। আমীন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৯০৪।
২. *আল-ইসতীআব* (*আল-ইসাবার* টীকা), ১ম খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।
৩. *তাহযীবুত তাহযীব*, ২য় খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা।
৪. *ফাতহুল বারী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা।
৫. *তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী*, ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠা।
৬. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
৭. *আল-বায়ান ওয়াত্তাবয়ীন*, ১ম খণ্ড, ২০১ ও ৩৫৯ পৃষ্ঠা।
৮. *সীরাতু ইবনি হিশাম*, ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা।
৯. *আস সিদ্দীক লি হুসাইন হাইকাল*, ১৬০ পৃষ্ঠা।
১০. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*।
১১. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা; অথবা *আত্তারজামা*, ৫৬৯।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

প্রকৃতপক্ষে শাহাদাতপ্রাপ্ত—শহীদ, অথচ জমিনের ওপর চলমান—এমন ব্যক্তিকে দেখে যদি কেউ খুশি হতে চায়, সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখে।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী কুরাইশী এক বাণিজ্য-কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছিলেন শাম দেশের উদ্দেশে। কাফেলা যখন সিরিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র বুসরা (ইরাকের বাণিজ্য-বন্দর 'বসরা' নয়) এসে পৌঁছল তখন কুরাইশের পোড়-খাওয়া ঝানু ঝানু ব্যবসায়ীরা সেখানে ব্যস্ত বাজারে ঢুকে কেনাবেচা শুরু করে দিলেন।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ যদিও ছিলেন অল্পবয়সী তরুণ এবং ব্যবসায় তার ছিল না কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা, তথাপি তার তীক্ষ্ণ মেধা ও দূরদর্শিতার কারণে এমনভাবে কেনাবেচা করলেন—যা তাকে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, বরং ব্যবসায় তিনি ঝানু ব্যবসায়ীদের চেয়েও বেশি মুনাফা করতে সক্ষম হন।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এই সরগরম ও ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্রে সকাল-বিকাল আসা-যাওয়ার কালে একবার তার সামনে ঘটল এমন এক আশ্চর্য

ঘটনা যা শুধু কেবল তার জীবনের সম্পূর্ণ গতিধারা পাল্টে দেওয়ারই উপলক্ষ হলো না; বরং ঘটনাটি সাব্যস্ত হলো গোটা ইতিহাসেরই গতিধারা পাল্টে দেওয়ার শুভ ইঙ্গিতবাহক।

চলুন, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত-তাইমীর জবানিতে শোনা যাক সেই চমৎকার ও অবিস্মরণীয় কাহিনি।

***

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ বলেন,

'আমরা 'বুসরা' বাণিজ্যকেন্দ্রেই ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন খ্রিষ্টান পাদরি চিৎকার করে ব্যবসায়ীদের বলছেন, 'এই বিশাল জনতার মাঝে কি মক্কার হারামে বসবাসকারী কেউ আছেন?'

আমি ছিলাম তার একেবারেই নিকটে, ফলে দ্রুত তার নিকট এগিয়ে গিয়ে বললাম,

'জি, আমি আছি হারামের অধিবাসী।'

তিনি আমার জবাব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন,

'তোমাদের মাঝে কি 'আহমাদ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে?'

আমি বললাম,

'এই 'আহমাদ'টা আবার কে?'

তিনি বললেন,

'তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। এটাই সেই পবিত্র মাস—যাতে তাঁর আত্মপ্রকাশের কথা। আর তিনিই হবেন আখেরী পয়গম্বর। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তিনি তোমাদেরই জন্মভূমি হারামের পবিত্র মক্কা নগরীতেই জন্মগ্রহণ করবেন। এরপর তিনি হিজরত করবেন কালো পাথরবিশিষ্ট এবং খেজুরবাগান শোভিত এমন ভূমিতে—যার উপরিভাগ লবণাক্ত কিন্তু নিম্নভাগের সুমিষ্ট ও সুপেয় পানি ওই বাগানগুলোকে সজীব করে রাখে।

হে তরুণ, সাবধান তাঁর কাছে পৌঁছতে তুমি যেন অন্যদের চেয়ে পিছে পড়ে যেয়ো না।'

তালহা বলেন,

'খ্রিষ্টান পাদরির আবেগজাগানো কথাগুলো আমার হৃদয়ের গভীরে খুব রেখাপাত করল। ফলে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমি ছুটে চলে গেলাম আমার উটপালের কাছে। উটের পিঠে হাওদা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। সঙ্গী কাফেলার কাউকে কিছু না বলেই দ্রুতগতিতে অবিরাম চলতে লাগলাম মক্কার উদ্দেশে।

মক্কায় পৌঁছার পর আমার পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম,

'আমরা মক্কা ছেড়ে যাওয়ার পর এখানে নতুন কিছু কি ঘটেছে?'

তারা বলল,

'হ্যাঁ, একটি নতুন বিষয় এখানে ঘটেছে। আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ দাবি করছেন যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী। এরই মধ্যে আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাঁর অনুসারী হয়েছেন।'

তালহা বলেন,

'আমি আগে থেকেই চিনতাম আবু বকরকে। কারণ, তিনি ছিলেন এমন একজন সহজ সরল মানুষ যিনি সবার সঙ্গে সহজভাবে মিশতেন। সবাই তাকে ভালোবাসত। খুবই কোমল স্বভাবের, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের একজন ব্যবসায়ী মানুষ হওয়ার কারণে আগে থেকেই আমি তাকে আপন মানুষ ভাবতাম। তার সঙ্গে চলাফেরা ও ওঠাবসা করতে পছন্দ করতাম। তার কাছে গেলে কুরাইশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাদের বংশলতিকা বা নসবনামা জানা যেত। কারণ, তিনি ছিলেন এসবের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। অতএব দেরি না করে আমি সোজা তার কাছেই হাজির হয়ে গেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

'এটা কি সত্যি যে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিজেকে নবী হিসাবে দাবি করেছেন আর আপনি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন?'

তিনি বললেন,

‘হ্যাঁ, একদম সত্যি কথা।’

এরপর তিনি আমাকে রাসূল সম্পর্কে অনেক কিছু শোনালেন এবং ইসলাম কবুলের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তখন আমিও তাকে খ্রিষ্টান পাদরির বিষয়ে সব কথা খুলে বললাম। সব কথা শোনার পর তিনি বিস্মিত ও হতবাক হয়ে বললেন,

‘তাহলে আর দেরি নয়, তুমি এখনই আমার সঙ্গে চলো। তুমি নিজেই এই কাহিনি নবী মুহাম্মাদকে বলবে এবং তাঁর কিছু বক্তব্য তুমি নিজ কানে শুনবে। সেটা হয়তো আল্লাহর দীন ইসলাম কবুলের ক্ষেত্রে তোমার জন্য সহায়ক হয়ে যাবে।’

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ বলেন,

‘আমি আর দেরি না করে আবু বকরের সঙ্গে নবী মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি আমার কাছে ইসলামের আদর্শ-সৌন্দর্য তুলে ধরলেন। কুরআনের কিছু আয়াতও শোনালেন। তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ লাভের সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন।

আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিলেন। ইসলাম কবুল করার সিদ্ধান্ত ও সংকল্প আমি গ্রহণ করলাম। সেই মুহূর্তে আমি তার কাছে সিরিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র ‘বুসরা’র সেই খ্রিষ্টান পাদরির পূর্ণ কাহিনিটি খুলে বললাম। তিনি এত খুশি হলেন যে, তাঁর নিষ্পাপ চেহারায় সেই খুশির ঝলক বয়ে গেল। এরপর আমি তাঁর সম্মুখে এক অদ্বিতীয় আল্লাহকে এবং মুহাম্মাদকে তাঁর মনোনীত রাসূল হিসাবে মেনে নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে পড়ে নিলাম,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা লা-শারিক, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁরই মনোনীত সত্য রাসূল।’

হযরত আবু বকরের মধ্যস্থতায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে আমি ছিলাম চতুর্থ।'

***

কুরাইশী তরুণের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ তার আত্মীয়-পরিজন ও পরিবারের লোকজনের মাথায় বজ্রপাতের আঘাত হয়ে পতিত হলো। তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদে সর্বাধিক ব্যথিত ও বিচলিত হলেন তার মা। তার মনে স্বপ্ন ছিল, একদিন এই ছেলে আপন কওমের নেতৃত্ব দেবে। কারণ, নেতৃত্বের উপযোগী মানবিক ও চারিত্রিক গুণাবলি এবং একজন নেতার মতো যোগ্যতা তার মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

***

তার কওমের লোকজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাকে নতুন ধর্ম-বিশ্বাস থেকে ফেরানোর জন্য। প্রথমে কোমল ভাষায়, সদাচরণের মাধ্যমে তাকে আবার মূর্তিপূজায় ফেরত আসার অনুরোধ করল। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। তিনি রয়ে গেলেন একেবারে পাহাড়ের মতো অটল ও অনড়। এভাবে যখন কিছুতেই তাকে ফেরানো গেল না, তখন তারা বেছে নিল নির্যাতন, শক্তিপ্রয়োগ ও শাস্তির পথ। নির্যাতন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে তাকে দমন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর নির্মম নির্যাতনের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখা মাসউদ ইবনে খারাশা বর্ণনা করেন,

'হজ ও উমরার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাফা ও মারওয়ার সাঈ করার সময় আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম, বেশ কিছু মানুষের জটলা একজন তরুণ যুবককে কেন্দ্র করে হই-হুল্লোড় করে এগিয়ে আসছে। যুবকটির দুই হাত গলার সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। জটলা পাকানো লোকগুলো পেছন থেকে তার মাথায় জোরে জোরে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। আবার পেছন থেকে তার পিঠে গুঁতা মেরে মেরে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে

যাচ্ছে। পেছনে ছিল এক বুড়ি, সে চিৎকার করে যুকবটির প্রতি নানা রকমের অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছিল।...'

যুবকটির বিষয় জানার উদ্দেশ্যে আমি প্রশ্ন করলাম,
'কী হয়েছে এই যুবকের?'

উত্তরে তারা জানাল,
'এ হলো তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ। বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে হাশেম গোত্রের মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।'

আমি বললাম,
'এই মহিলাটি কে?'

তারা বলল,
'যুবকটির মা। সাবা বিনতুল হাযরামী।'

***

এরপর সামনে এল 'কুরাইশের সিংহ' বলে বিখ্যাত নওফাল ইবনে খুওয়াইলিদ। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে একটি রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। আবু বকর সিদ্দীককেও আরেকটি রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর মক্কার নির্বোধ ও দুষ্ট লোকদের হাতে সঁপে দিয়ে বলল, 'দেখব, এই যুগলবন্দীকে তোমরা কতটা শাস্তি দিতে পারো।'

এই ঘটনা থেকেই আবু বকর এবং তালহাকে বলা হয় 'কারীনাইন' (যুগলবন্দী)।

***

সময়ের চাকা ঘুরতে থাকল। একের পর এক জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ঘটেই চলল। সময়ের গতিধারা আর জীবনের বিভিন্নমুখী ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ পরিণত হয়ে উঠলেন পোড়-খাওয়া বিরল ব্যক্তিত্বে। আল্লাহ ও রাসূলের জন্য দুঃসহ সব

অগ্নিপরীক্ষা তিনি একটি একটি করে উতরে গেলেন। ইসলাম আর মুসলিম জাতির জন্য তার প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি বাড়তেই থাকল। ঈমান ও ইসলামী বিশ্বাসের জন্য তার অঙ্গীকার দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হলো। একপর্যায়ে মুসলিম জাতি তাকে 'জিন্দা শহীদ' (আশ্‌শাহীদুল হাই) উপাধিতে ভূষিত করল। খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র জবানে তালহার নামের সঙ্গে নানা রকম কল্যাণকর বিশেষণ যোগ করে কখনো ডাকলেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ তালহা', 'মহান তালহা' আবার কখনো ডাকলেন 'দানবীর তালহা' নামে। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর এই সকল উপাধির প্রত্যেকটির পেছনেই রয়েছে খুবই চমৎকার ও বিস্ময়কর কাহিনি—যার কোনোটিই অন্যটির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

***

'জিন্দা শহীদ' উপাধি দেওয়ার কাহিনি,

ওহুদ যুদ্ধের দিন। প্রথম পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে মুশরিক বাহিনীর ময়দান ছেড়ে পলায়নাবস্থা দেখে যুদ্ধ শেষ মনে করে মুসলিম মুজাহিদগণ যার যার অবস্থান থেকে সরে পড়েন। তাদের এমন অসতর্ক ও এলোমেলো অবস্থায় মুশরিকদল পেছন থেকে ফিরে এসে অতর্কিত মুসলিম বাহিনীকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। এমন এক নাজুক অবস্থায় পড়ে দিশেহারা মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ ছেড়ে ছুটে পালাতে থাকে। খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন অরক্ষিত ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। আনসারীদের ভেতর থেকে এগারোজন এবং মুহাজিরদের মাত্র একজন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ছাড়া আর কেউ তখন তাঁর পাশে ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মাত্র বারোজন সঙ্গীকে নিয়ে পাহাড়ের ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। সেই মুহূর্তে মুশরিকদের দুর্ধর্ষ একটি ক্ষুদ্র দল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে ছুটে আসে। আক্রমণের উদ্দেশ্যে এই দলটিকে ছুটে আসতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَنْ يَرُدُّ عَنَّا هؤُلَاءِ، وَهُوَ رَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ ؟

'আমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসা ওই দলটিকে কে প্রতিরোধ করতে পারবে? প্রতিদান হিসাবে জান্নাতে তাকে আমার সঙ্গী বানানো হবে।'

এত বড় সুসংবাদ লাভ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ওদের প্রতিরোধ করব।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'না, তুমি এখানেই থাকো।'

তখন এক আনসারী বললেন,
'আমি যাব ওদের প্রতিরোধ করতে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'হ্যাঁ, তুমি যাও।'

আনসারী লোকটি একাই আক্রমণকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে তুমুল সাহস নিয়ে লড়াই করে তাদের হিমশিম খাইয়ে দিলেন। কিন্তু একা একটি দলকে কতক্ষণ ঠেকানো যায়? অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে জান্নাতে পৌঁছে গেলেন। এরই মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদের নিয়ে পাহাড়ের কিছুটা উঁচুতে উঠে পড়লেন। শত্রুরা আবার তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে কাছে এসে গেলে তিনি আবার পূর্বের মতো বললেন,

'ওদের ঠেকানোর মতো কেউ কি নেই?'

তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবারও বললেন,
'আমি আছি ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আগের মতোই থামিয়ে দিয়ে বললেন,

'না, তুমি এখানে আমার সঙ্গেই থাকো, অন্য কেউ যাক।'

তখন আরেকজন আনসারী অনুমতি চেয়ে বললেন,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাব।'

তিনি বললেন,
'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

এই আনসারী সাহাবীও সর্বশক্তি দিয়ে তাদের আক্রমণ এমনভাবে প্রতিহত করলেন যে, কিছু সময়ের জন্য তাদের আক্রমণ থেমে গেল। এই অবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদের নিয়ে পাহাড়ের আরও কিছুটা ওপরে উঠে পড়লেন। এই দ্বিতীয় আনসারীও লড়াই করতে করতে একসময় শহীদ হয়ে গেলেন। আক্রমণকারী বাহিনী আবারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে আক্রমণ প্রতিরোধের আহ্বান জানালেন।

তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবারও নিজেকে পেশ করে বললেন,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নিজেকে পেশ করছি।'

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও তাকে নিবৃত্ত করে অন্য একজন আনসারীকে অনুমতি দিলেন। এভাবেই একে একে সকল আনসারী শহীদ হয়ে গেলেন। রাসূলের পাশে বেঁচে থাকলেন শুধু তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এবার যখন আক্রমণকারী ক্ষুদ্র মুশরিক বাহিনী এগিয়ে এল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালহাকে অনুমতি দিয়ে বললেন,
'তালহা, এবার তোমার পালা, যাও ওদের প্রতিরোধ করো।'

এই ক্ষুদ্র বাহিনী যখন রাসূলকে আক্রমণ করতে আসে, তার পূর্বেই প্রিয় নবীর অবস্থা হয়ে পড়েছিল ভীষণ নাজুক। শত্রুদের আক্রমণে তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়ে গিয়েছিল। ঠোঁট মুবারক হয়েছিল ক্ষত-

বিক্ষত। চেহারা মুবারকে অস্ত্রের ফালি ঢুকে পড়ার ফলে সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল। প্রচণ্ড আঘাত, প্রচুর রক্তক্ষরণ তাঁকে দুর্বল ও নিস্তেজ করে ফেলেছিল। এমন নিদারুণ পরিস্থিতিতে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-আনসারী আক্রমণকারী বাহিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি এমন সাহসী ও চৌকস আক্রমণ করলেন যে, দলটি হিমশিম খেয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার কথা ভুলে গেল। সেই সুযোগে তিনি বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁধে তুলে পাহাড়ের খানিকটা ওপরে পৌঁছে দিলেন। ক্ষুদ্র দলটি আবার কাছাকাছি এসে পড়লে তিনি আবারও প্রচণ্ড বেগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বেশ কিছুটা পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। এই সুযোগে ফিরে এসে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁধে নিয়ে পাহাড়ের আরও উঁচুতে সুরক্ষিত ও নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিলেন। শত্রুরা নিকটে এসে গেলে এবার তিনি রাসূলকে নিরাপদে রাখতে পারার বদৌলতে নতুন মনোবলে শাণিত হয়ে প্রচণ্ড বেগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং আক্রমণকারী এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিহত এবং তাদের আক্রমণের সক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রাণের চেয়ে প্রিয় রাসূলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হলেন।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

‘সেই মুহূর্তে আমি এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে শত্রুদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলাম। লড়াই করে তাদের ময়দান থেকে বিতাড়িত করার পর আমরা দু’জনে মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবায় ছুটে গেলাম। তাঁর খেদমতে হাজির হলে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়ে বললেন,

أُتْرُكَانِيْ وَانْصَرِفَا إِلٰى صَاحِبِكُمَا، يُرِيْدُ طَلْحَةَ

‘আমার কাছে নয়, তোমরা তাড়াতাড়ি তালহার কাছে যাও।’

আমরা তালহার কাছে গিয়ে দেখি, প্রায় আশিটির মতো ছোট-বড় আঘাত তার সারা শরীরজুড়ে স্পষ্ট হয়ে আছে। বুকে ও পিঠে কোনো জায়গাই অক্ষত নেই। তির, তরবারি আর বর্শার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আর রক্তস্নাত একটি মৃতপ্রায় দেহ বেহুঁশ পড়ে আছে। এক হাতের কবজি সম্পূর্ণ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি গর্তে পড়ে আছে।'

ওহুদ যুদ্ধের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সময়ই বলতেন,

مَنْ سَرَّه أَنْ يَنْظُرَ إِلى رَجُلٍ يَمْشِيْ عَلى الْأَرْضِ قَدْ قَضى نَحْبَه فَلْيَنْظُرْ إِلى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

'প্রকৃতপক্ষে শাহাদাতপ্রাপ্ত—শহীদ, অথচ এখনো জমিনের বুকে চলমান—এমন ব্যক্তিকে দেখে কেউ যদি খুশি হতে চায়, সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখে।'

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওহুদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ এলেই বলতেন,

ذٰلِكَ يَوْمٌ كُلُّه لِطَلْحَةَ

'ওহুদ যুদ্ধের সেই দিন! আহা! সেদিনের পুরো কৃতিত্বটাই ছিল তালহার দখলে।'

এটাই ছিল তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে 'জিন্দা শহীদ' আখ্যায়িত করার ইতিহাস। তাঁকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ তালহা' (তালহাতুল খায়র) ও 'দানবীর তালহা' (তালহাতুল জূদ) আখ্যায়িত করার পেছনে রয়েছে একশো একটি কাহিনি। সেই কাহিনিগুলোর মধ্য থেকে একটি বিশেষ কাহিনি,

'তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন প্রচুর সম্পদ ও ধনভান্ডারের মালিক। তার ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে

বিস্তৃত। একবার বাণিজ্যিক মুনাফা হিসাবে ইয়েমেনের হাযরামাউত থেকে তার কাছে নগদ সাত লক্ষ দিরহামের বিরাট অঙ্ক এসে পৌঁছল। এত বিশাল সম্পদ রেখে তিনি রাত কাটাবেন এই চিন্তায় অস্থির হয়ে ঘুমহীন ও আতঙ্কিত হয়ে রইলেন।

তাঁর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের ছাপ দেখে তার স্ত্রী আবু বকর সিদ্দীকের মেয়ে উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী ব্যাপার আবু মুহাম্মাদ, আপনাকে এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে কেন? আমার দ্বারা কি কোনো কষ্ট পেয়েছেন?'

তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর কথার জবাবে বললেন,

'না, না প্রিয়তমা! তোমার কারণে আমি কোনো কষ্ট পাইনি। তুমি তো বরং একজন মুমিনের সর্বোত্তম আদর্শ স্ত্রী। আমার দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের কারণ অন্যখানে। সারা রাত আমি ঘুমাতে পারিনি এই আতঙ্কে যে, এত বিশাল সম্পদ ঘরে রেখে যে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে, সে আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবে?'

তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন,

'আপনি কেন চিন্তিত হচ্ছেন? আপনি তো আর অভাবী ও গরিব আত্মীয়দের এবং আপনার দরিদ্র দীনি বন্ধুদের কখনোই ভুলে থাকেন না। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে একটুখানি অপেক্ষা করুন। ভোর হয়ে গেলেই এই সম্পদের সবটুকু তাদের মাঝে বিলিয়ে দিন।'

তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা স্ত্রীর পরামর্শে খুব খুশি হয়ে বললেন,

'আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তোমার পরামর্শে চিন্তামুক্ত হলাম। সত্যিই তুমি অতুলনীয় ব্যক্তির অতুলনীয় মেয়ে। আমার জীবন ধন্য তোমার মতো জীবনসঙ্গিনী পেয়ে।'

ভোর হতে না-হতেই সাত লক্ষ দিরহাম সম্পূর্ণ দান করে দিলেন মুহাজির, আনসার ও সাধারণ গরিব অসহায় পরিবারগুলোর মাঝে।

***

তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দানশীলতার ব্যাপারে আরও বর্ণনা করা হয়,

'একবার জনৈক ব্যক্তি তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্য এসে আলাপের সূত্রে জানালেন,

'আপনার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার এমন সংযোগ রয়েছে, যার ভিত্তিতে আমি আপনার 'মীরাস'-এরও হকদার।'

লোকটির এই দাবি শুনে তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'জীবনে এই প্রথম শুনলাম যে, আপনার সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। যা হোক, যখন দাবি করছেন, আপনার জন্য আমার কাছে দু'টি প্রস্তাব রয়েছে :

এই মুহূর্তে আমার মালিকানায় একখণ্ড জমি রয়েছে—যা উসমান ইবনে আফ্‌ফান তিন লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে কিনে দিয়েছেন।

আপনি চাইলে জমিটি নিতে পারেন আবার ইচ্ছা হলে জমির মূল্য অর্থাৎ তিন লক্ষ মুদ্রাও গ্রহণ করতে পারেন।'

লোকটি বললেন,
'জমি নয়, আমাকে নগদ মূল্যটাই দিন।'

তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লোকটির চাহিদামতো নিঃসংকোচে তিন লক্ষ মুদ্রা তার হাতে তুলে দিলেন।

***

অভিনন্দন তালহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি। যাকে দেওয়া প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সর্বশ্রেষ্ঠ তালহা' ও

'দানবীর তালহা' উপাধি সার্থক হয়েছে। মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তার কবরকে নূরে ও রহমতে পরিপূর্ণ করে দিন। আমীন।

তথ্যসূত্র :

১. *আততাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা
২. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৫ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-বাদউ ওয়াততারীখ*, ৫ম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা
৪. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ২৩০ পৃষ্ঠা।
৫. *গায়াতুন নিহায়া*, ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা।
৬. *আররিয়াযুন নাযরাহ*, ২য় খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা।
৭. *সিফাতুস সফওয়াহ*, ১ম খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।
৮. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।
৯. *যাইনুল মুযাইয়্যাল*, ১১ পৃষ্ঠা।
১০. *তাহযীবু ইবনি আসাকির*, ৭ম খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা।
১১. *আল-মুহাব্বার*, ৩৫৫ পৃষ্ঠা।
১২. *রাগবাতুল আমাল*, ৩য় খণ্ড, ১৬ ও ৮৯ পৃষ্ঠা।
১৩. *আল-ইসাবাহ*, ২য় খণ্ড, ২২৯; অথবা *আত্তারজামা*, ৪২৬৬।
১৪. *আল-ইসতীআব*, ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা।

আবু হুরাইরা আদ-দাউসী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ষোলশোর বেশি হাদীস মুখস্থ করেন। -ঐতিহাসিকদের মত

প্রিয় পাঠক, নিশ্চয় আপনি এই তারকা সাহাবীকে চেনেন? মুসলিম উম্মাহর মাঝে এমন একটি মানুষও কি পাওয়া যাবে যে আবু হুরাইরার নাম শোনেনি?

ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগে মানুষ তাকে ডাকত 'আব্দুশ শামস' (সূর্যের দাস) নামে। আল্লাহ তাআলা যখন তাকে ঈমান ও ইসলাম কবুলের সৌভাগ্যে ধন্য করলেন এবং তিনি প্রিয় নবীর পরশতুল্য সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলেন, সেই প্রথম সাক্ষাতেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন,

'তোমার নাম কী?'

উত্তরে তিনি বললেন,

'আব্দুশ শামস' (সূর্যের দাস)।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই নাম প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

‘অসম্ভব! তোমার নাম ‘সূর্যের দাস’ (আব্দুশ শামস) হতেই পারে না। বরং তোমার নাম ‘আব্দুর রহমান’ (দয়াময় আল্লাহর দাস)।’

আবু হুরাইরা মহা খুশি হয়ে বললেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই আমার নাম ‘আব্দুর রহমান’। আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত। আপনার দেওয়া নামটি ছাড়া এখন থেকে আমার আর কোনো নাম নেই।’

পক্ষান্তরে ‘আবু হুরাইরা’ তার ডাকনাম হওয়ার কারণ এই যে, শৈশবে তার ছিল পুতুলের মতো একটি নরম তুলতুলে বিড়ালছানা, যা নিয়ে তিনি খেলা করতেন। এ কারণে তার শিশু বন্ধুরা তাকে ডাকত ‘আবু হুরাইরা’ (ছোট্ট বিড়ালছানাওয়ালা) নামে।

পরে ওই নামটিই সকলের মুখে মুখে এত বেশি চালু হয়ে যায় যে, প্রকৃত নামটি আর কারোর মনেই থাকে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার গভীর ভালোবাসা ও সম্পর্ক গড়ে উঠলে নবীজি অনেক সময় তাকে আদর করে ডাকতেন ‘আবু হিররিন’ বলে। এর ফলে তিনি ‘আবু হুরাইরা’র চেয়ে ‘আবু হিররিন’ নামটাই বেশি পছন্দ করতে থাকেন। এর প্রথম এবং প্রধান কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন, আমার প্রিয়তম রাসূল যে আমাকে ওই নামে ডেকেছেন।

‘আবু হিররিন’কে বেশি পছন্দ করার আরও একটি কারণ এই যে, ‘হুরাইরা’ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, যার পুংলিঙ্গ ‘হিররুন’।

***

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের দীক্ষা লাভ করেছিলেন নিজ গোত্রের তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে। এর পর থেকে ৬ষ্ঠ হিজরী পর্যন্ত তিনি নিজ অঞ্চলে গোত্রীয় লোকজনের সঙ্গেই বসবাস করতে থাকেন। অবশেষে দাউস গোত্রের বড় একটি প্রতিনিধিদলকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় প্রিয় নবীর খেদমতে হাজির হন।

মদীনায় যাওয়ার পর দাউস গোত্রের এই তরুণ সাহাবী আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের জীবনধারা সাজালেন একেবারেই ভিন্নভাবে। জগৎ-সংসার থেকে সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে রাখলেন নিজেকে। প্রিয় নবীর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে নিজেকে সারাক্ষণ তৈরি রাখার সংকল্পে সঁপে দিলেন। তার আলাদা কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। রাসূলের মসজিদ 'মসজিদে নববী'ই ছিল তার দিন ও রাতের একমাত্র আশ্রয়স্থল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তার একমাত্র শিক্ষক। সারাক্ষণ তাঁর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকতেন। রাসূলই ছিলেন তার একমাত্র ইমাম। সকল নামায তিনি রাসূলের পেছনেই আদায় করতেন। তার পক্ষে এভাবে রাসূলের খেদমতে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি বিয়ে করে সংসার ও সন্তানের ঝামেলায় জড়াননি। তার একমাত্র পিছুটান ছিল কট্টর মুশরিক এক বৃদ্ধা মা। মায়ের প্রতি সদাচার এর অংশ হিসাবেই তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতে থাকতেন। কিন্তু মা কখনোই ছেলের ওই আহ্বানে কর্ণপাত করতেন না। মায়ের অবজ্ঞা আর প্রত্যাখ্যানে ভীষণ কষ্ট পেলেও তার কিছুই করার থাকত না।

একদিন তিনি যথারীতি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্য মাকে আহ্বান জানালেন। এতে রাগান্বিত হয়ে তার মা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন কটুকথা বলে ফেললেন, যা শুনে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভীষণ ব্যথিত হলেন। অন্তরের সেই ব্যথা গড়িয়ে পড়তে লাগল দুই চোখের অশ্রু ধারায়।

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাঁদতে কাঁদতেই ছুটে গেলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে অবাক হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী হয়েছে আবু হুরাইরা? কাঁদছ কিসের জন্য?'

তিনি বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মাকে প্রায়ই আমি ইসলাম গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকি আর তিনি সব সময়ই তা প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। কিন্তু আজ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর পর তিনি আপনার সম্পর্কে এমন কিছু কথা আমাকে শুনিয়েছেন যা সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই।

ইয়া রাসূলাল্লাহ, দয়া করে আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আবু হুরাইরার মায়ের অন্তরটাকে ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে দেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে দুআ করলেন।

আবু হুরাইরা বলেন,

'আমি দৌড়ে বাড়ি পৌঁছলাম। দেখলাম, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। পানি ঢালার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম মা গোসল করছেন। আমি ভেতরে ঢুকতে চাইলে আমার মা কোমল সুরে বললেন,

'আবু হুরাইরা, একটু দাঁড়াও, আগেই ভেতরে এসো না।'

তিনি পোশাক পাল্টে নিয়ে আমাকে ভেতরে যেতে বললেন। আমি ভেতরে ঢোকার পর তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে ঘোষণা করলেন,

أَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর মনোনীত রাসূল।'

আমি আবার দৌড়ে ফিরে এলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। তখন আমার দু'চোখ বেয়ে ঝড়ে পড়ছিল আনন্দের অশ্রু, অথচ এর একটু পূর্বেই আমার দু'চোখে ছিল বেদনার বানডাকা অশ্রু। খুশিতে আমি বলে উঠলাম,

'খুশির সংবাদ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেছেন এবং আবু হুরাইরার মাকে হেদায়েত দান করেছেন।'

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রাণপ্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনপ্রাণ উজাড় করে ভালোবাসতেন। প্রিয় নবীর প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা ছিল এত প্রবল যে, তনু-মন, দিল ও দেমাগ শুধু নয় এই ভালোবাসা তার রক্ত ও মাংসে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। প্রিয় নবীর চেহারা মুবারকের দিকে তিনি বারবার তাকিয়ে দেখতেন কিন্তু ওই চেহারার দিকে তাকানোর সাধ তার মিটত না। সারাক্ষণ দেখেও পরিতৃপ্ত হতে পারতেন না। তিনি বলতেন,

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَمْلَحَ وَلَا أَصْبَحَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَكَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِيْ فِيْ وَجْهِه ....

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারা আমার জীবনে আমি আর দেখিনি। যেন সূর্যের আলোকরশ্মি তাঁর চেহারায় ঝলমল করে হাসত।’

প্রিয় নবীর দীনের অনুসরণ এবং তাঁর সোহবত ও সান্নিধ্যের সৌভাগ্যের জন্য তিনি মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে বলতেন,

‘সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি আবু হুরাইরাকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেছেন।

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি আবু হুরাইরাকে কুরআন শেখার জন্য কবুল করেছেন।

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি দয়া ও করুণা করে আবু হুরাইরাকে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।’

***

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হৃদয়ে যেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ছিল ব্যাকুল ভালোবাসা একই

রকম ভাবে ইলম ও জ্ঞানের জন্যও তার অন্তরে ছিল সীমাহীন ভালোবাসা। জ্ঞান অর্জনকেই তিনি বানিয়েছিলেন জীবনের প্রধান ও চূড়ান্ত লক্ষ্য।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন,

'একদিন আমি আবু হুরাইরা এবং আমার এক সঙ্গী মিলে মসজিদে বসে দুআ ও যিকির করছিলাম। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমাদের মাঝে বসে পড়লেন। তাকে দেখে আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা যা করছিলে, তা চালিয়ে যাও। বসে থাকলে কেন?'

তখন আমি এবং আমার সঙ্গী আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুআ করতে থাকলাম। আমাদের দু'জনের দুআতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন আমীন বলতে থাকলেন।'

আমাদের দু'জনের দুআ শেষ হলে আবু হুরাইরা দুআ করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, আমার দুই সঙ্গী যা যা চেয়েছেন আমিও তা-ই চাই। উপরন্তু আমাকে দান করো এমন ইলম—যা হৃদয় থেকে কখনো মুছে যাবে না। যা আমি কখনোই ভুলে যাব না।'

আবু হুরাইরার এই বিশেষ দুআ শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমীন।

আমরা লজ্জিত হয়ে বললাম,
'আমরাও আল্লাহর কাছে এমন ইলম চাই যা কখনো ভুলব না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'তোমরা পিছে পড়ে গেছ। দাউস গোত্রীয় তরুণ তোমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।'

***

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজে যেমন প্রচণ্ড ইলমের অনুরাগী ছিলেন একইভাবে অন্যের ব্যাপারেও তার মানসিকতা ছিল এমন যে, ইলমের মতো অমূল্য সম্পদ থেকে কেউই বঞ্চিত না থাকুক।

একদিন তিনি মদীনার বাজারে গিয়ে দেখলেন, সকলেই বিভিন্ন মাল কেনাবেচা নিয়ে ব্যস্ত। দুনিয়াদারি নিয়ে তাদের এইরূপ সীমাহীন মগ্নতা দেখে তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন,

'হে মদীনার লোকেরা, তোমরা এত নির্বোধ আর বোকা হলে কীভাবে?'

তারা বলে উঠলেন,
'হে আবু হুরাইরা, আপনি আমাদের নির্বুদ্ধিতার কী দেখলেন?'

তিনি বললেন,
'এখানে এই বাজারে বসে কেনাবেচায় মগ্ন হয়ে থাকছ, অথচ মসজিদে নববীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া সম্পদ বণ্টন করা হচ্ছে। তোমাদের নির্বুদ্ধিতা এই যে, নিজেদের প্রাপ্য অংশ বুঝে নিতে সেখানে না গিয়ে এই বাজারে পড়ে আছ!'

এই কথা শুনে তারা দৌড়ে মসজিদের দিকে চলে গেলেন। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন,

'কী ব্যাপার আবু হুরাইরা? আপনার কথামতো আমরা মসজিদে গেলাম কিন্তু সেখানে তো কোনো সম্পদ বণ্টন হতে দেখলাম না।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
'মসজিদে কি লোকজন ছিল না?'

তারা জবাব দিলেন,
'অনেক মানুষ ছিল। একদল নামায পড়ছিলেন, একদল কুরআন পড়ছিলেন, আরও একদলকে দেখলাম হালাল-হারাম নিয়ে আলোচনা করছিলেন।'

তিনি বললেন,
'বোকার দল, এইগুলোই তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস। এইগুলোই তো রাসূলের রেখে যাওয়া সম্পদ।'

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পরিপূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখেন ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা খেত-খামার থেকে। রাসূলের প্রতিটি মজলিসে উপস্থিত থাকার জন্য খেয়ে, না-খেয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন। এ কারণেই তাকে ক্ষুধা ও পিপাসার এমন কষ্ট ও যাতনা সইতে হয়, যা তার সঙ্গীদের আর কাউকেই সইতে হয়নি।

তিনি নিজের জীবনের সেই যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায়ের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

'তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণা আমার সহ্যসীমার বাইরে চলে যেত। ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবীকে সামনে পেলে (ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানোর নির্দেশ-সংবলিত) কুরআনের আয়াত জিজ্ঞাসা করতাম, যেন আমাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যান এবং কিছু খেতে দেন।

একবার এমন হলো, ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পেটে পাথর বেঁধে নিলাম। এরপর সাহাবীদের চলাচলের পথে গিয়ে বসে পড়লাম। আবু বকর সিদ্দীককে আসতে দেখে ক্ষুধার্ততে খাদ্যদানের নির্দেশবিশিষ্ট আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আয়াতের ব্যাখ্যা জানা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল একটাই—তিনি যেন আমাকে ডেকে নিয়ে কিছু খেতে দেন। কিন্তু তিনি আমাকে ডাকলেন না।

এরপর ওই পথ ধরে এলেন উমর ইবনুল খাত্তাব। একই উদ্দেশ্যে নিয়ে আমি তাকেও কুরআনের একটি আয়াত—যাতে ক্ষুধার্তকে আহার করানোর নির্দেশ রয়েছে—সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনিও ব্যাখ্যা দিয়ে চলে গেলেন। আমাকে ডাকলেন না। এরপর এলেন একই পথ ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে কোনো কিছু বলা ছাড়াই তিনি আমার মুখের দিকে তাকানোমাত্রই বুঝে ফেললেন আমার ক্ষুধা ও যন্ত্রণার কথা। তিনি বললেন,

'আবু হুরাইরা, আমার সঙ্গে চলো।'

আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর পেছনে চলতে থাকলাম। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তিনি দুধভর্তি একটি বাটি দেখে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'এই দুধ কোত্থেকে এল?'

তিনি বললেন,
'অমুক সাহাবী আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।'

এ কথা শুনে তিনি আমাকে বললেন,

'আবু হুরাইরা, যাও আহলে সুফ্‌ফার (সম্পদ, সন্তান ও পরিবারহীন অসহায় দরিদ্র মুসলিম—যারা সার্বক্ষণিক মসজিদে নববীতে অবস্থান করে শিক্ষা অর্জন করতেন) সকলকে ডেকে নিয়ে এসো।'

আমি ভেবেছিলাম ওই বাটির দুধ কিছুটা খেতে পারলে ক্ষুধার যন্ত্রণাও কিছুটা কমত আবার শরীরেও খানিকটা শক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু সামান্য ওই এক বাটি দুধে এতগুলো লোকের কী হবে? এ কারণে সুফ্‌ফার লোকদের ডাকতে যাওয়া আমার একদম ভালো লাগছিল না। কিন্তু বাধ্য হয়েই গেলাম এবং তাদের ডেকে নিয়ে এলাম। তারা সবাই এসে রাসূলের নিকট বসে পড়ল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

'আবু হুরাইরা, সবাইকে দুধ দাও।'

নির্দেশমতো এক এক করে আমি সকলের কাছে দুধের বাটি নিয়ে যেতে থাকলাম। সকলেই পেটভরে পূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে পান করলেন। এরপর পাত্রটি নিয়ে আমি প্রিয় নবীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি মাথা মুবারক উঁচু করে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'শুধু আমি আর তুমিই কি বাকি?'
'জি, আমরাই শুধু বাকি।'
'তাহলে নাও, এবার তুমি খাও।'

আমি বেশ কিছুটা খেয়ে নিলাম।

তিনি বললেন,
'আরও খাও,

আরও খানিকটা খেলাম।

তিনি আবার বললেন,
খাও,

আমি খেলাম। এভাবে তিনি বলতে থাকলেন আর আমি খেতে থাকলাম। একপর্যায়ে আমি নিরুপায় হয়ে বলে উঠলাম,

'যে মহান আল্লাহ আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি, আমার পেটে আর কোনো জায়গা খালি নেই। আমি আর এক ঢোক দুধও খেতে পারব না।'

এরপর তিনি পাত্রটি আমার হাত থেকে নিয়ে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন।'

***

ক্ষুধা ও যন্ত্রণার এই যুগের একসময় অবসান ঘটে। সময়ের গতিধারা পাল্টে একসময় সুখের বাতাস প্রবাহিত হয় মুসলিমদের জীবনে। তাদের হাতে সম্পদের প্রাচুর্য এসে ধরা দেয়। অসংখ্য বিজয়-অভিযানের ফলে গনিমতের সম্পদ উপচে পড়ে মুসলিম জনপদে। সেই সূত্রে একসময়ে তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করা আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও অন্যদের মতো সম্পদশালী হন। তারও ঘরবাড়ি হয়। স্ত্রী ও সন্তান হয়।

তবে এসবের কোনো কিছুই তার জীবনের গতিধারায় ব্যাপক কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। ফেলে আসা সেই কষ্টের দিনগুলোকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। অনেক সময় সেই সব দিনকে স্মরণ করে তিনি বলতেন,

'শিশুকালে আমি ছিলাম পিতৃহীন এতিম। যখন আমি হিজরত করি, তখন ছিলাম অসহায় মিসকীন। বড় হয়ে আমি 'বুসরা বিনতে গাযওয়ান'

নামী মহিলার কাছে পেটচুক্তিতে কামলা খেটেছি। সফরের সময় ক্লান্ত হয়ে তারা যখন কোনো মনযিলে অবতরণ করত তখন তাদের সকলের হুকুমমতো আমাকেই সবকিছু করতে হতো। বিশ্রাম শেষে যখন তারা আবার রওনা করত, আমাকে তাদের উটের রশি ধরে টেনে নিয়ে যেতে হতো। আল্লাহর ইচ্ছায় একসময় আমার মনিব সেই মহিলার সঙ্গেই আমার বিবাহের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

এ কারণেই আমি প্রশংসা করি এবং কৃতজ্ঞতা জানাই সেই মহান আল্লাহর, যিনি দীন ইসলামকে বানিয়েছেন আমার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি আর আমাকে সেই দীনের কারণেই একদিন মদীনা মুনাওয়ারার গভর্নর ও ইমাম বানিয়েছেন।

***

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতকালে একাধিকবার মদীনার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এই বিশাল দায়িত্ব ও কর্তব্য তার স্বভাবের ঔদার্য ও চরিত্রের মাধুর্যে কোনো রদবদল আনতে পারেনি।

একদিন তিনি গভর্নর থাকাকালে মদীনার পথ ধরে জ্বালানি কাঠের বোঝা কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সালাবা ইবনে মালেককে একই পথে দেখে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে সতর্ক করে বললেন,

'হে মালেকের পুত্র, আমিরের জন্য পথ করে দাও। একটু সরে দাঁড়াও।'

সালাবা ইবনে মালেক বললেন,

'এতবড় প্রশস্ত রাস্তা পুরাটাই খালি। এরপরও আমাকে সরে দাঁড়াতে হবে?'

'হ্যাঁ, আমিরের জন্য এবং আমিরের বিশাল বোঝার জন্য সরে দাঁড়াও। বলা যায় না, জ্বালানি কাঠের খোঁচা খেয়ে কষ্ট পেয়ে যেতে পারো।'

***

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝে প্রচুর ইলমের পাশাপাশি সমাবেশ ঘটেছিল ব্যাপক তাকওয়া ও পরহেজগারির। মহান আল্লাহর ভয় ও প্রেমের কারণে তিনি দিনে রোযা রেখে এবং রাতের এক-তৃতীয়াংশ ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাতেন। এরপর স্ত্রীকে জাগিয়ে দিলে তিনি উঠে ইবাদত শুরু করতেন। দ্বিতীয় ভাগ শেষে তিনি নিজের মেয়েকে জাগিয়ে দিতেন। আর তিনি রাতের শেষভাগে ইবাদত করতেন।

এভাবে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে সারা রাত ইবাদত চালু থাকত। রাতের কোনো অংশেই তার গৃহ ইবাদতমুক্ত থাকত না।

***

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে সুদানের একজন যানজী ক্রীতদাসী ছিল। ক্রীতদাসীর দুর্ব্যবহারে একবার তিনি খুব কষ্ট পেলেন এবং তার স্ত্রী এতে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাসীকে প্রহার করার জন্য চাবুক উঁচু করলেন। কিন্তু হঠাৎ তার ভাবান্তর ঘটল। তিনি চাবুক না মেরে থেমে গেলেন। তিনি বললেন,

'কেয়ামতের ময়দানে যদি 'কেসাস' (আঘাতের বদলে সমপরিমাণ আঘাতের শাস্তিবিধান)-এর আশঙ্কা না থাকত, তাহলে তুমি যেমন আমাদের কষ্ট দিয়েছ আমিও তোমাকে মেরে কষ্টের বদলা নিতাম। আমি আর তোমাকে রাখব না। তোমাকে বেচে দেব এমন একজনের কাছে যিনি তোমার বদলে আমাকে দেবেন এমন মূল্য (সওয়াব) যা আমার ভীষণ প্রয়োজন। যাও, আল্লাহর জন্য তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। এখন থেকে তুমি স্বাধীন মুক্ত।'

***

তার মেয়ে তাকে এসে বলত,

‘আব্বুজান, আমার সমবয়সী বান্ধবীরা আমাকে এই বলে রাগায় যে, তোমার বাবার তুমি একটাই মেয়ে, তবুও তোমাকে কেন স্বর্ণের অলংকার কিনে দেয় না?’

তিনি বলতেন,

‘বেটি, ওদের বলে দিয়ো, এর কারণ এই যে, আমার পিতা আমার ব্যাপারে জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ভয় পান।’

***

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের একমাত্র মেয়েকে স্বর্ণালংকার না পরানোর কারণ এটা নয় যে, তিনি কৃপণ ছিলেন অথবা তিনি লোভী ছিলেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আল্লাহর রাস্তায় উদার হাতে দানকারী প্রসিদ্ধ দানবীর।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম মদীনার গভর্নর থাকাকালীন একবার পরীক্ষা করার জন্য আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে একশো স্বর্ণমুদ্রা পাঠালেন। পরের দিন লোক মারফত খবর পাঠালেন যে, আমার পাঠানো লোকটি ভুল করে দিনারগুলো আপনাকে দিয়ে গিয়েছে। আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্য একজন। এ কথা শুনে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন, আমি রাত হওয়ার আগেই সব স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দিয়েছি। একটি মুদ্রাও আমার কাছে রেখে দিইনি। আমার নামে বাইতুল মালে মাসিক বরাদ্দ ভাতা এলে সেখান থেকে মাসে মাসে কেটে রাখুন।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে তার যে উচ্চ ধারণা ছিল, প্রকৃতপক্ষে তিনি তার চেয়েও বেশি উচ্চমর্যাদার অধিকারী।

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সারা জীবন ধরে মায়ের প্রতি সর্বোত্তম সদাচরণ করেছেন। যখনই তিনি বাড়ির বাইরে যেতেন, মায়ের ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয় ও ভক্তির সঙ্গে বলতেন,

'আমার মমতাময়ী মা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।'

তিনি তখন জবাবে বলতেন,

'আমার আদরের বেটা, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরপর বলতেন,

'আল্লাহ তাআলা আপনাকে রহম করুন। কারণ, শৈশবে আপনি আমাকে লালন-পালন করেছেন।'

এর জবাবে মা বলতেন,

'আল্লাহ তোমাকেও রহম করুন। কারণ, বড় হয়ে তুমি সব সময় আমাকে খুশি রেখেছ, কখনো আমাকে কষ্ট দাওনি।'

এরপর যখন বাড়ি ফিরতেন আবারও মায়ের সঙ্গে একই আচরণ এবং একই রকম কথোপকথন করতেন।

***

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল মানুষকে পিতা-মাতার ব্যাপারে সজাগ করে তোলার। মানুষকে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের প্রতি এবং তাদের সঙ্গে সব সময় সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে তিনি ছিলেন খুবই আগ্রহী।

একদিন তিনি দু'জন লোককে একসঙ্গে হেঁটে যেতে দেখলেন, যাদের মধ্যে একজন ছিল বেশি বয়স্ক। তুলানামূলক কমবয়সী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'ওই লোকটি তোমার কী হয়?'

লোকটি জবাব দিলেন, 'আমার পিতা।'

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন,

এক. খবরদার কখনো তাকে নাম ধরে ডাকবে না।

দুই. কখনো তার আগে আগে হাঁটবে না।

তিন. তার আসন গ্রহণের পূর্বে নিজে বসবে না।

***

মৃত্যুশয্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিপ্রিয় এই সাহাবী আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কাঁদতে দেখে উপস্থিত লোকজন বললেন,

'আবু হুরাইরা, আপনি কিসের জন্য কাঁদছেন?'

তিনি জবাবে বললেন,

'দেখো, এই দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার শোকে আমি কাঁদছি না। কাঁদছি শুধু এই চিন্তায় যে, আখেরাতের সফর কত দীর্ঘ অথচ আমার পাথেয় কত অল্প! আমার জীবনের গাড়ি আজ এমন এক পথে এসে দাঁড়িয়েছে, যে পথ আমাকে নিয়ে যাবে হয় জান্নাতে অথবা জাহান্নামে। জানি না ওই দু'টি চূড়ান্ত গন্তব্যের কোনটিতে হবে আমার ঠাঁই।'

মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখতে এসে বললেন,

'আবু হুরাইরা, আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুন।'

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার সাক্ষাৎ পেতে চাই। দয়া করে অতিসত্বর আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করো।'

মারওয়ান বিদায় নিয়ে দরজা পার হতে না-হতেই আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চিরবিদায় ঘটে গেল।

আল্লাহ তাআলা আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিজের অসীম রহমত ও করুণার ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। এই বিরল ব্যক্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির অসীম কল্যাণে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ষোলোশোরও অধিক হাদীস হিফজ ও বর্ণনা করেছেন (প্রকৃতপক্ষে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫,৩৭৪টি)।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইসলাম ও মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৪র্থ খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ১১৯০।
২. *আল-ইসতীআব*, ৪র্থ খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড, ৩১৫-৩১৭ পৃষ্ঠা ।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১২শ খণ্ড, ২৬২-২৬৭ পৃষ্ঠা।
৫. *তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী*, ২য় খণ্ড, ৩৩৩-৩৩৯ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ২য় খণ্ড, ৬০০-৬০১ পৃষ্ঠা।
৭. *তাজরীদু আসমাইস সাহাবা*, ২য় খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-মাআরিফ লিবনি কুতাইবা*, ১২০-১২১ পৃষ্ঠা।
৯. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড, ৩৬২-৩৬৪ পৃষ্ঠা।
১০. *আবু হুরাইরা মিন সিলসিলাতি আলামিল আরাব* লি মুহাম্মাদ ইজাজ আল-খতীব।
১১. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৩৭৬-৩৮৫ পৃষ্ঠা।
১২. *তাবাকাতুস শাআরানী*, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা।
১৩. *মাআরিফাতুল কুবারাইল কিবার*, ৪০-৪১ পৃষ্ঠা।
১৪. *শাযাতারুয যাহাব*, ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা।
১৫. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ২৮৫-২৮৯ পৃষ্ঠা।
১৬. *তাকরীবুত তাহযীব*, ২য় খণ্ড, ৪৮৪ পৃষ্ঠা।
১৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১০৩-১১৫ পৃষ্ঠা।
১৮. *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১ম খণ্ড, ২৮-৩১ পৃষ্ঠা।

সালামা ইবনে কায়েস আল-আশজাঈ

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

‘আহওয়াজ বিজয়ী’

দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই রাতে ঘুমানো হলো না। মদীনার বিভিন্ন পাড়া-মহল্লার অলি-গলি ঘুরতে থাকলেন। প্রজারা যেন নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে ঘুমাতে পারে সে উদ্দেশ্যেই এটা খলীফার প্রায় প্রতিরাতের কর্মসূচি।

তিনি কখনো জনবসতির মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলা পথে, কখনো-বা দোকানপাট ও হাট-বাজারের পথ ধরে ঘুরতে ঘুরতে মনে মনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিজ্ঞ ও বীর সাহাবীদের কোনো একজনকে খুঁজছিলেন। প্রতিরাতের মতো আজও তিনি মদীনার পথে পথে ঘুরছিলেন। আর ভাবছিলেন, ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ‘আহওয়াজ’ অভিযানের উদ্দেশ্যে গমনকারী সেনাদলের সেনাপতির দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করা যায়? বিনিদ্র রজনীর শেষপ্রহরে এসে লৌহমানব খলীফা উমর হিমশিম খাওয়ানো প্রশ্নটির সামাধান খুঁজে পেয়ে খুবই খুশি হলেন। আনন্দের সঙ্গে নিজের মনেই বলে উঠলেন,

‘পেয়েছি... পেয়ে গেছি...

হ্যাঁ, তিনি ঠিক তেমনই হবেন, যেমন আমরা খোঁজ করছিলাম।’

সকালবেলা তিনি ডেকে পাঠালেন সালামা ইবনে কায়েস আল-আশজাঈ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে। তিনি হাজির হলে খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বললেন,

'হে সালামা, পশ্চিম ইরানের 'আহওয়াজ' অভিযানের উদ্দেশ্যে অপেক্ষমাণ সেনাদলের জন্য আমি তোমাকে সেনাপতি নিযুক্ত করছি।'

রওনা হওয়ার প্রাক্কালে খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েস আল-আশজাঈ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উদ্দেশে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করেন,

'সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত দেবে। যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরীতে লিপ্ত অর্থাৎ যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তবে আল্লাহর দুশমন কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে অবশ্যই তাদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরে ইসলাম কবুল করার আহ্বান জানাবে।

১. যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে,

(ক) ইসলাম কবুল করে তারা যদি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেয়, তাহলে তারাও তোমাদের মতোই ইসলামী রাষ্ট্রের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার হকদার হবে।

(খ) আর (ইসলাম কবুল করার পর তারা) যদি নিজ নিজ বাড়িতেই অবস্থান করতে চায় এবং মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিতে না চায়, তাহলে তাদের থেকে কোনো অর্থ উসূল করা হবে না। তবে সম্পদশালী হলে তাদের থেকে অবশ্যই যাকাত উসূল করা হবে। আর যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কারণে তারা 'ফাই' অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া শত্রুদের থেকে পাওয়া ধন-সম্পদে কোনো অংশ পাবে না।

২. যদি ইসলাম কবুলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে,

তারা যদি ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে, তাহলে 'জিযিয়া' বা নিরাপত্তা কর দেওয়ার শর্তে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের চুক্তিবদ্ধ নাগরিক

হিসাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করার সুযোগ দেবে। এই শর্ত মানলে তাদের নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। তাদেরকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র বহন করবে। তাদের এমন কোনো কাজের জন্য বাধ্য করা হবে না, যা করা অসম্ভব বা কষ্টকর।

৩. ইসলাম গ্রহণে কিংবা জিযিয়া প্রদানে তারা রাজি না হলে,

তারা যদি ইসলাম গ্রহণে কিংবা জিযিয়া প্রদানের উভয় প্রস্তাবকেই প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করবেন।

৪. তারা যদি কোনো অবাস্তব দাবি জানায়,

(ক) তারা যদি কোনো দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তোমাদের কাছে এই দাবি পেশ করে যে, 'আমরা আপন অবস্থান ত্যাগ করে নিজেদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের কাছে সমর্পণ করব'। খবরদার! এই উদ্ভট দাবি কিছুতেই মেনে নিয়ো না। কারণ, তারা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ, 'ইসলাম গ্রহণ করা' ও 'জিযিয়া প্রদান করা' উভয়টিই প্রত্যাখ্যান করেছে! এখন দুর্গের মধ্যে লুকিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নতুন কোন্ নির্দেশের কাছে সমর্পিত হতে চায়?

(খ) তারা যদি দাবি করে যে, আমরা নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করব যদি আমাদেরকে 'আল্লাহ ও রাসূলের আশ্রিত' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। খবরদার! তাদের 'আল্লাহ ও রাসূলের আশ্রিত' ঘোষণা দিয়ো না। কারণ, ইসলামী রাষ্ট্র 'আল্লাহ ও রাসূলের আশ্রিত' বলে ঘোষণা করে শুধু সেই সকল অমুসলিম নাগরিককে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে কর প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে। এ কারণেই চুক্তিবদ্ধ নাগরিকদের ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ মার্যাদা দিয়ে মুসলিম নাগরিকদের মতোই জান-মাল, ইজ্জত-আবরু হেফাজতের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। সেই প্রস্তাব পূর্বে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাদের ওই দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে তোমরা চাইলে তাদেরকে তোমাদের নিজেদের 'আশ্রিত' বলে ঘোষণা দিতে পারবে।

৫. যুদ্ধে তোমরা বিজয়ী হলে,

তোমরা যুদ্ধে বিজয়ী হলে অবশ্যই মনে রেখো, পরাজিত বাহিনীর সঙ্গে কোনো বাড়াবাড়ি করবে না। কোনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। মৃত লাশের নাক, কান কেটে বিকৃতি ঘটাবে না। খবরদার! কোনো নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে নিজেদের হাত কলুষিত করবে না।'

সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েস আল-আশজাঈ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমীরুল মুমিনীনের দিকে চেয়ে তাকে আশ্বস্ত করে বললেন,

'আমীরুল মুমিনীনের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে ইনশাআল্লাহ।'

এরপর খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গভীর আবেগের সঙ্গে সালামার দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন। তার সফলতার জন্য দুআ করে উষ্ণ আলিঙ্গন করে তাকে বিদায় জানালেন।

খলীফা তার ওপর ও তার সেনাদলের ওপর অর্পিত দায়িত্বের গুরুত্ব ভালোভাবেই অনুধাবন করতেন। কেননা, ইরানের এই 'আহওয়াজ' শহরটি ছিল একটি পাহাড়ি ও দুর্গম এলাকা। বহু দুর্ভেদ্য দুর্গ-পরিবেষ্টিত। বসরা ও পারস্য সীমান্তের মাঝখানে অবস্থিত দুর্গম, দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ি আহওয়াজ শহরের অধিবাসীরাও ছিল কুর্দীদের চেয়ে দুর্ধর্ষ ও দুর্বিনীত এক জাতি।

সুদূরপ্রসারী সমরকৌশল ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিচারে এই অঞ্চলটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মুসলিম জাতির সামনে এই শহর দখল করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিল না। কেননা, এখান থেকেই পারস্য সেনারা মুসলিম অধ্যুষিত বসরা নগরী আক্রমণের সুযোগ পাচ্ছিল। যা প্রতিরোধ করা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া পারস্য সেনারা বসরা নগরীকে সেনাছাউনি হিসাবে ব্যবহারেরও পরিকল্পনা করছিল। যার পরিণতিতে গোটা ইরাকের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে পড়েছিল।

সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েস আল-আশজাঈ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে সেনাদলকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। তবে আহওয়াজের সীমানায় পা রাখতে না রাখতেই তাদের মুখোমুখি হতে হলো সেখানের বৈরী ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ আর আবহাওয়ার।

বিশাল সেনাদলকে কখনো দুর্লঙ্ঘ উঁচু উঁচু পাহাড়, কখনো আবার দুর্গম গিরিপথের বদ্ধ জলাশয়ের নোংরা কাদা অতিক্রম করতে হলো। পাহাড় ও জঙ্গলের বিষধর সাপ ও বিচ্ছুর সঙ্গে লড়াই করে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেই তাদের এগুতে হলো।

ভূ-প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার চরম কষ্টের মুহূর্তে অভিজ্ঞ ও চৌকস সেনাপতি তার সেনাদলের পাশে এসে দাঁড়ান। ইসলামের বিশ্ববিজয়ী চেতনা ও জিহাদী জযবায় তাদের উজ্জীবিত করে তোলেন। মা-মুরগি যেমন ঝড়-ঝাপটা ও শক্রর ভয়ে আতঙ্কিত ছানাদের ডানা মেলে আশ্রয় দেয়, একইভাবে দক্ষ ও চৌকস এই সেনাপতি সেনাদলের কষ্ট ও ভীতি দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি জান্নাতের স্বপ্নীল ভুবনের অপূর্ব নায-নেয়ামতের চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরেন। আল্লাহর পথে বরণ করা সকল কষ্টের জান্নাতী বিনিময়ের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। তার জাদুময়ী বক্তব্য শুনতে শুনতে সেনাসদস্যরা জান্নাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ফেলে আসা কষ্টের স্মৃতিগুলো হয়ে উঠে জীবনের শ্রেষ্ঠতম মধুর স্মৃতি। দুর্গম ও দুস্তর পথগুলোকে এখন মনে হয় সমতল ভূমির মতোই সুন্দর-মসৃণ।

সেনাপতি পথের প্রতিটি বিরতিতেই সেনাদলের সাহস ও মনোবল উজ্জীবিত রাখার জন্য তাদের সামনে প্রাঞ্জল আলোচনা তুলে ধরেন। কুরআনের বাণী ও জিহাদের নির্দেশনা শুনিয়ে তাদের উদ্দীপ্ত করে তোলেন। এই সকল কারণেই সেনাসদস্যরা পথের সকল ক্লান্তি ও দুঃখ-কষ্টের স্মৃতি ভুলে নতুন করে ইসলামী চেতনায় আর নবোদ্যমে জিহাদী জযবায় ঝলসে উঠেন।

সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েস আল-আশজাঈ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্দেশ পরিপূর্ণরূপে পালন করলেন। আহওয়াজবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সর্বপ্রথম তিনি তাদের দীন ইসলাম কবুল করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করার বিনীত আহ্বান পেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা মুসলিম সোনাপতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল।

বাধ্য হয়ে সেনাপতি তাদের সামনে দ্বিতীয় বিকল্প তুলে ধরে বললেন,

'ইসলামী রাষ্ট্রকে জিযিয়া দিয়ে চুক্তিবদ্ধ নাগরিক হিসাবে জীবন-যাপন করো।'

আহওয়াজবাসী মুসলিম সেনাপতির এই প্রস্তাবটিও দর্পের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল।

মুসলিম জাতির সামনে আর কোনো বিকল্প পথ খোলা না থাকায় অবশেষে তারা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম প্রতিদানের আশায় জিহাদ ও যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

***

তাওহীদ ও শিরকের পতাকাবাহী ভিন্ন আদর্শের বিপরীতমুখী দু'টি দলের মাঝে শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। তির, তরবারি আর বর্শা-বল্লমের আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে কেঁপে উঠল 'আহওয়াজ' যুদ্ধের প্রান্তর। কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই চলতে থাকল। উভয় পক্ষ সাহস ও বীরত্বের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ইতিহাসের পাতায় যার নজির মেলা ভার।

তবে সিদ্ধান্তের জন্য অনেক বেশি অপেক্ষার প্রয়োজন পড়ল না। অল্প সময়ের মধ্যেই মুমিন মুজাহিদ বাহিনীর—যারা আল্লাহর জমিনে তাঁর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে—সুস্পষ্ট বিজয় সূচিত হলো আর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরাশক্তির গর্বে গর্বিত সামরিক বাহিনী আল্লাহর দুশমন মুশরিকদের কপালে জুটল লজ্জাজনক পরাজয়ের গ্লানি।

যুদ্ধ থেমে গেল। সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শত্রুসৈন্যদের থেকে প্রাপ্ত গনিমতের সম্পদ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টনের দিকে মনোযোগ দিলেন।

জমাকৃত গনিমতের সম্পদের মাঝে তিনি দেখতে পেলেন একটি অতি চমৎকার বালা। সেটাকে তার আমীরুল মুমিনীনের জন্য পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছা হলো। তাই তিনি বিষয়টি সৈনিকদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে বললেন,

'এই বালাটি তোমাদের মাঝে ভাগ করলে কারোরই তেমন কোনো কাজে লাগবে না। এটাকে আমীরুল মুমিনীনের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেওয়া কি তোমাদের নিকট ভালো মনে হয়?'

সকল সৈনিক একবাক্যে সম্মতি জানিয়ে বললেন,
হ্যাঁ, সেটাই বেশি ভালো হয়।

সকলের সম্মতি পেয়ে তিনি বালাটিকে একটি বাক্সে ভরলেন। তারই স্বগোত্রীয় একজনকে বললেন,

'তোমার গোলামকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় চলে যাও। খলীফাকে আমাদের বিজয়ের সংবাদ শোনাবে এবং তাকে এই বালা উপহার দেবে।'

সেনাপতির পাঠানো এই আশজাঈ দূত এবং খলীফা উমরের মাঝে কী ঘটেছিল সেটা জানার জন্য আমাদের তারই জবানিতে শুনতে হচ্ছে কাহিনির পরের অংশ :

আশজাঈ দূত বলেন,
'আমি আমার গোলামকে নিয়ে বসরায় চলে গেলাম। সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েসের দেওয়া অর্থ দিয়ে আমাদের দু'জনের জন্য ভালো দেখে দু'টি উট কিনলাম। খাদ্য, পানি ছাড়াও পথের জন্য জরুরি এমন আরও কিছু সামান কিনে আমরা অবিলম্বে মদীনার উদ্দেশে রওনা করলাম। অবিরাম সফর করে আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম। প্রথমেই আমীরুল মুমিনীন উমরকে খুঁজে বের করলাম। আমি দেখলাম, তিনি রাখালের মতো লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একদল মুসলিমকে দুপুরের

খানা খাওয়ানোর অনুষ্ঠান তদারক করছেন। তিনি মেহমানদের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে পাত্রের অবস্থা দেখে গোলাম ইয়ারফাকে বারবার নির্দেশনা দিয়ে বলছেন,

'ইয়ারফা, এখানে গোশত দাও।'
'ইয়ারফা, এইখানে আরও রুটি দাও।'
'ইয়ারফা, এইখানে ঝোল নেই।'

আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, বসে পড়ো। আমি কাছাকাছি এক জায়গায় বসে পড়লাম। খাবার দেওয়া হলে আমিও খেয়ে নিলাম।

সকলের খাওয়া শেষ হলে তিনি ইয়ারফাকে বললেন, বাসন-কোসন গুছিয়ে দস্তরখান উঠিয়ে ফেলো।

গোলামকে নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন। আমিও তার পিছে পিছে যেতে থাকলাম। তিনি বাড়িতে ঢুকলে আমি ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দিলেন। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, তিনি বসেছেন পশমের তৈরি একটি চটের ওপর। হেলান দিয়েছের খেজুর গাছের আঁশভরা দু'টি চামড়ার বালিশে। একটি বালিশ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি সেটাতেই বসে পড়লাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, তার পেছনে রয়েছে একটি পর্দা ঝোলানো। সেদিক ঘুরে তিনি বললেন,

'কুলসূমের মা, আমাদের দুপুরের খাবার পাঠাও।'

আমি মনে মনে ভাবলাম, আমীরুল মুমিনীনের বিশেষ খাবার না-জানি কত উন্নতমানের হবে! কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, একটি শুকনো রুটি, সামান্য তেল আর লবণের একটি শক্ত দলা, যা গুঁড়া করা হয়নি।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, শুরু করো। আমি তার কথা রাখার জন্য সামান্য একটু খেলাম। কিন্তু তাকে দেখলাম ভারি তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছেন। সারা জীবনে আমি এমন সাধারণ খাবার এতটা তৃপ্তির সঙ্গে খেতে আর কাউকেই দেখিনি।

রুটি খাওয়া শেষ করে তিনি আবার ভেতরে জানালেন, খাওয়া শেষ হলো, এবার পানি বা শরবত কিছু পাঠাও।

ভেতর থেকে যবের ছাতুর শরবত পাঠানো হলো। আমাকে প্রথমে খেতে বলায় আমি মাত্র এক ঢোক খেয়েই বুঝে গেলাম, এটার চেয়ে আমার বাড়িতেই বেশি স্বাদের ও বেশি উন্নতমানের ছাতুর শরবত বানানো হয়। তিনি আমার কাছ থেকে ছাতুর ওই পাত্রটি নিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে পান করলেন। এরপর প্রাণখুলে শুকরিয়া আদায় করে বললেন,

'সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি পেটভরে পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করালেন।'

এইবার আমি তাকে বললাম,

'আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনার কাছে সালামা ইবনে কায়েসের বার্তা নিয়ে এসেছি।'

তিনি বললেন,

'মারহাবা সালামা ইবনে কায়েসকে এবং তার বার্তাবাহককে।'

'বলো, মুসলিম বাহিনীর খবর কী? তারা কেমন আছে?'

আমি বললাম,

'আমীরুল মুমিনীন যেমন কামনা করে থাকেন, মুসলিম বাহিনী তেমনই আছে। আল্লাহর মেহেরবানিতে তারা নিরাপদে আছে এবং শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে বিশাল বিজয় লাভ করেছে।'

এভাবেই বিজয়-সংবাদসহ সেনাদলের সকল খবর তার কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করলাম।

সকল সংবাদ শোনার পর তিনি খুবই বিনয় ও ভক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহর প্রশংসায় বললেন,

'সকল প্রশংসাই মহান আল্লাহর জন্য, তিনিই দাতা, তিনিই মেহেরবান। শত্রুদের পরাজিত করে মুসলিম বাহিনীকে বিজয়ী করাটাও একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহ।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
'তুমি কি বসরায় গিয়েছিলে?'

আমি বললাম,
'জি, আমীরুল মুমিনীন, আমি বসরা হয়েই এখানে এসেছি।'

– 'বসরায় মুসলিমদের অবস্থা কেমন দেখেছ?'

– 'আলহামদুলিল্লাহ, সেখানের মুসলিম জনসাধারণ বেশ ভালো আছেন।'

– 'দ্রব্যমূল্য কেমন সেখানে?'

– 'একদমই সস্তা সবকিছু। তা ছাড়া বাজারে সব জিনিসের আমদানিও প্রচুর।'

– 'গোশতের আমদানি ও দরদাম কেমন দেখলে? গোশত ছাড়া তো আরবদের মেরুদণ্ডই ঠিক থাকে না।'

- 'বাজারে প্রচুর গোশতের আমদানি দেখেছি এবং বিক্রিও হচ্ছে খুব সস্তা দামে।'

আলোচনার এই পর্যায়ে এসে তিনি আমার হাতের সেই 'বালা'র বাক্সটির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন,

'তোমার হাতে ওটা কী?'

আমি একটু বিশদ বিবরণ দিয়ে বললাম,
'শত্রুবাহিনীর ওপর আমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়ে গেলে আমরা গনিমতের সম্পদ একত্র করে ফেললাম। আমাদের সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েস সেখানে একটি অতিমূল্যবান 'বালা' দেখতে পেয়ে সৈনিকদের বলেন, এই বালাটি যদি তোমাদের সকলের মাঝে বণ্টন করা হয় তাহলে কারও ভাগেই তেমন কিছু থাকবে না। এর চেয়ে এই বালাটি আমীরুল মুমিনীনের জন্য হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? সেনাপতির প্রস্তাব মেনে নিয়ে সকল সৈনিক একবাক্যে বলেছেন, 'খুবই ভালো হয়।' এই বিবরণ দিয়ে বালাটি আমি তার হাতে তুলে দিই।'

খলীফা বাক্স খুলে বালাটির অপূর্ব কারুকাজের ওপর চোখ পড়ামাত্রই ভীষণ রাগে নিজের জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। গর্জন করে উঠে বাক্সসমেত বালাটি সজোরে জমিনের ওপর ছুঁড়ে মারলেন। চুনি পাথরগুলো ডানে-বামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রইল।

ঘরের ভেতরের মহিলারা দৌড়ে পর্দার কাছে ছুটে এসেছেন। তারা ভেবেছেন আমি খলীফাকে হত্যার ষড়যন্ত্র নিয়ে এখানে ঢুকেছি।

তিনি ভীষণ রেগে আমাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া সকল পাথর-গুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন আর গোলাম ইয়ারফাকে বললেন,

'একে খুব জোরে জোরে পেটাও।'

খলীফার নির্দেশে আমি চুনি গোছাতে থাকলাম আর গোলাম ইয়ারফা তারই হুকুমে আমাকে পেটাতে থাকল।

একটু পরেই তিনি আমাকে বললেন,
'জলদি এখান থেকে বিদায় হও। প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত কোনো কাজ তোমরা করোনি। তুমিও নও, যে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে সেও নয়।'

আমি মিনতি জানিয়ে বললাম,
'আমরা এখনই আহওয়াজের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাব। আমাদের দু'টো উট দিতে বলুন। ইয়ারফা আমাদের উটগুলো কেড়ে নিয়েছে।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইয়ারফাকে বললেন,
'ওদের সাদাকার দু'টো উট দিয়ে দাও।'

এরপর আমাদের বললেন,
'তোমাদের কাজ শেষ হলে এই উটদুটো অভাবী ও গরিব কাউকে দান করে দেবে।'

আমি বললাম,
'সেটাই করব আমীরুল মুমিনীন।'

এরপর তিনি চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিয়ে আমাকে বললেন,

'সেনাসদস্যরা যার যার মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যদি এই বালা তাদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া না হয়, তাহলে আমি তোমার আর তোমার সেনাপতির জীবন বিপন্ন করে ছাড়ব।'

আমি আর একমুহূর্তও দেরি না করে বিদ্যুদ্গতিতে সেনাপতি সালামা ইবনে কায়েসের কাছে পৌঁছে হতাশা প্রকাশ করে বললাম,

'আমাকে যে কাজে পাঠিয়ে ছিলেন, সেটা মোটেও 'স্বস্তিদায়ক' ছিল না। এই বালা এক্ষুনি সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিন, আমাদের দু'জনের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসার পূর্বেই কাজটি সেরে ফেলুন।'

সবিস্তারে তাকে ঘটনা শোনানোর পর তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সকলের মাঝে ভাগ করে দিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. *মুজামুল বুলদান*, ১ম খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা (আহওয়াযের আলোচনা)।
২. *আল-ইসতীআব*, ২য় খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা।
৩. *কাদাতু ফাতহি ফারিস*, লেখক মাহমূদ শীত খাত্তাব।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৩৩৯২।
৬. *হায়াতুস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা।
৭. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা।

মুআয ইবনে জাবাল
(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

আমার উম্মতের মাঝে হালাল-হারামবিষয়ক জ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুআয ইবনে জাবাল।

-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

জাযীরাতুল আরব যখন হক ও হেদায়েতের অর্থাৎ দীন ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সে সময় মদীনার মুআয ইবনে জাবাল ছিলেন তরতাজা ও টগবগে এক যুবক। তীক্ষ্ণ মেধা, উপস্থিতবুদ্ধি, মিষ্টি ভাষা ও ঠাণ্ডা মাথাসহ উচ্চ মনোবল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে অনন্য করে রেখেছিল সমবয়সী বন্ধুদের মাঝে।

দৈহিক সৌন্দর্যের বিচারেও তিনি ছিলেন অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। লাবণ্যভরা মিষ্টি ও আকর্ষণীয় চেহারা, কাজলকালো দু'টি চোখ, মাথাভরা কোঁকড়ানো চুল আর মুক্তাদানার মতো ঝকঝকে তার দাঁতের পাটি দর্শকের দৃষ্টি ও হৃদয়কে মুগ্ধ করে রাখত।

তরুণ মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে। আকাবার রাতে নিজের তরুণ হাত বাড়িয়ে তিনি

স্পর্শ করেছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাত। সেই হাতে হাত রেখে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম কবুলের বজ্রকঠিন শপথ।

মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ এবং তাঁর হাতে বাইআত লাভের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমনকারী ভাগ্যবান বাহাত্তর সদস্যের একজন। যারা ঐতিহাসিক সেই সফরের মাধ্যমে সোনার আখরে নিজেদের নাম লিখিয়েছিলেন ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়ে।

***

তরুণ মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের হাতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক নির্মূলের দৃঢ়সংকল্প বুকে নিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় ফেরার পরপরই সমবয়সীদের সমন্বয়ে গড়ে তুললেন মূর্তি অপসারণের উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র দল। এই দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হলো 'মদীনার সকল মুশরিক পরিবার থেকে মূর্তি অপসারণ।' তরুণদলের সেই আন্দোলনের ফসল—মদীনার বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আমর ইবনুল জামূহ-এর ইসলাম গ্রহণ।

***

আমর ইবনুল জামূহ ছিলেন সালামা গোত্রের বিখ্যাত সরদার, তাদের সেরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি নিজের জন্য উন্নত ও দামি কাঠের একটি দেবীমূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন, যেমনটি করে থাকে অন্যান্য শরিফ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা।

সালামা গোত্রের এই সরদার নিজের খাস দেবীমূর্তির প্রতি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। রেশমি পোশাকে তাকে সাজাতেন আর প্রতিদিন সকালে তাকে আতর-চন্দন মেখে সুবাসিত করতেন।

মুআয ইবনে জাবালের গড়া কিশোর দলটি এক রাতের অন্ধকারে পৌঁছে গেল তার যত্নের এই দেবীর কাছে, তাকে সেখান থেকে তুলে

নিয়ে চলে গেল সালামা গোত্রের বাড়ি-ঘরের পেছন দিকের শেষ প্রান্তে, যেখানে পায়খানা, পেশাব ও ময়লা-আবর্জনা জমা হতো। ওই ময়লা-আবর্জনার নোংরা স্তূপের মধ্যে অতিযত্নের দেবীমূর্তিটিকে ছুঁড়ে ফেলে তারা পালিয়ে গেল।

সকালবেলা দেবীকে যথাস্থানে না পেয়ে বুড়ার মাথা খারাপ হয়ে গেল। পাগলের মতো একবার এই ঘর একবার ওই ঘরে খুঁজতে থাকলেন। কোথাও না পেয়ে বাইরে খুঁজে খুঁজে হয়রান-পেরেশান হয়ে পড়লেন। অবশেষে যখন অতিযত্নের সেই মূর্তিটিকে বাড়ির পেছনের ময়লা-আবর্জনার স্তূপের মধ্যে খুঁজে পেলেন, হুংকার ছেড়ে বললেন,

'আমার দেবীর সঙ্গে এতবড় বেয়াদবি কে করল? সেই কপাল পোড়া শয়তানটাকে হাতে পেলেই বুঝিয়ে দেব এর পরিণতি কত ভয়ঙ্কর!'

এরপর নোংরার ভেতর থেকে দেবীকে তুলে আনলেন। তাকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করলেন। আতর-চন্দন মেখে আবার তাকে যথাস্থানে রেখে মিনতি করে বললেন,

'ওহে আমার পরম পূজনীয় দেবী মানাত, তুমি আমার দোষ নিয়ো না। আল্লাহর কসম! তোমার সঙ্গে এত বড় বেয়াদবি যে করেছে, তাকে খুঁজে বের করে আমি অবশ্যই উপযুক্ত শাস্তি দেব।'

আবার যখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত গভীর হলো, যখন বৃদ্ধ আমর ইবনুল জামূহ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, আবারও মূর্তি অপসারণ আন্দোলনের সদস্যরা তৎপর হয়ে উঠল। তারা চুপিসারে পা টিপে টিপে দেবীর ঘরে পৌঁছে গেল এবং দেবীকে তুলে নিয়ে ঠিক আগের জায়গায় নোংরার মধ্যে ফেলে লুকিয়ে গেল।

আজও বৃদ্ধ ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে একই স্থানে নোংরা-আবর্জনার মধ্যে তার দেবীকে খুঁজে পেলেন। বিষণ্নমনে আজও তাকে ভক্তির সঙ্গে তুলে এনে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে আতর-সুগন্ধি মেখে যথাস্থানে রাখলেন এবং এই অপকর্মের হোতাদের বিরুদ্ধে নানা রকমের হুমকি-ধমকি উচ্চারণ করলেন।

অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীরা যখন আবারও একই কাণ্ড করল, তিনি আবারও তাকে একইভাবে নোংরা-আবর্জনা থেকে উদ্ধার করে ধুয়েমুছে যথাস্থানে রাখলেন। এবার তিনি আরও একটা কাজ করলেন, নিজের তরবারিটা দেবীর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে মিনতি করে বললেন,

'হে আমার মানাত দেবী, জানি না তোমার সঙ্গে এমন বেয়াদবি কারা করছে! কারা তোমার এমন জঘন্য অমর্যাদা ঘটাচ্ছে! হে আমার দেবী, তোমার কাছে আমার নিজের তরবারিটা রেখে যাচ্ছি। যদি তোমার কোনো ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে দয়া করে তুমি নিজের এই অবমাননা ঠেকাও। নিজের মান-সম্মান নিজেই রক্ষা করো।'

পরের রাতে বৃদ্ধ ঘুমিয়ে পড়লে যথরীতি দেবীর ঘরে হাজির হয়ে গেল মূর্তি অপসারণ দলের সদস্যরা। তার গলায় ঝুলানো তরবারিটা খুলে একটা মরা কুকুরছানার গলায় বেঁধে আবর্জনার মধ্যে ছুঁড়ে মারল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বৃদ্ধ দেখলেন, আজও দেবী উধাও। খুঁজতে খুঁজতে আজও চলে গেলেন সেই নোংরা-আবর্জনার ভাগাড়ে। দেখলেন একটি মরা কুকুরছানার সঙ্গে দেবী পায়খানা-পেশাবের মধ্যে উপুড় হয়ে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। করুণার দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন,

تَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اِلٰهاً لَمْ تَكُنْ - اَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِيْ قَرْنٍ

'আল্লাহর কসম! তুমি যদি সত্যিকারের মাবুদ হতে, তাহলে তোমাকে মরা কুকুরের সঙ্গে নোংরার মাঝে এভাবে পড়ে থাকতে হতো না। নিজেকেই তুমি রক্ষা করতে পারো না, আমার জন্য তুমি কী করতে পারবে?'

সবকিছু দেখে, বুঝেশুনে, ভেবেচিন্তে আমর ইবনুল জামূহ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি নিখাদ বিশ্বাস স্থাপন করলেন। নির্ভেজাল ঈমানদীপ্ত কাফেলায় সাহাবীর আসনে অলংকৃত হলেন।

***

এদিকে এই ঘটনা যখন ঘটছিল, তার বেশ পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বদেশভূমি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তরুণ মুআয ইবনে জাবাল তাঁর সাক্ষাতে মদীনায় গিয়ে হাজির হলেন এবং সারাক্ষণ প্রিয় নবীকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকলেন। নিজেকে উজাড় করে দিয়ে গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সান্নিধ্যে থেকে কুরআন ও ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান শিক্ষায় এত অগ্রসর হলেন যে, এক সময় সকল সাহাবীর মাঝে তিনিই হয়ে উঠলেন কুরআনের জ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, হলেন ইসলামী শরীয়তের মাসআলা-মাসাইল, হালাল-হারাম বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও সেরা আলেম।

ইয়াযীদ ইবনে কুতাইবা বর্ণনা করেন,

'আমি সিরিয়ার রাজধানী 'হিমস'-এর জামে মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখলাম, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো কালো চুলের এক যুবককে কেন্দ্র করে বিশাল এক মজলিস বসেছে। তিনি যখন মুখ খুলছেন যেন তার মুখ থেকে মুক্তা ঝরছে, যেন দীনের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এমন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ যুবককে দেখতে পেয়ে আমি কৌতূহলী হয়ে আশপাশের লোকজনের কাছে জানতে চাইলাম,

'কে এই মহান যুবক?'

তারা বললেন,

'ইনি হচ্ছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল।'

***

ইয়েমেনের বিখ্যাত তাবেঈ আবু মুসলিম আল-খাওলানী[১] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

---

১. আবু মুসলিম আল-খাওলানীর চমৎকার ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনি জানতে পড়ুন রাহনুমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত একই লেখক ও অনুবাদকের বই *তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন*।

'আমি দামেস্কের জামে মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলাম, বিরাট একটি ইলমী হালাকা (মজলিস) চলছে। যেখানে বসে আছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ সাহাবীগণ। অথচ তাদের মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন উজ্জ্বল ঝলমলে দাঁত আর কাজলকালো চোখের একজন যুবক। কোনো বিষয়ে সমস্যা হলেই প্রবীণরা ছুটে যাচ্ছেন সেই তরুণ যুবকের কাছে। এসব দেখে আমার পাশে বসা লোকটিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

'কে এই যুবক?'

তিনি জবাব দিলেন,
'ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল।'

***

মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওই বিশাল জ্ঞান ও মর্যাদায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কেননা শিশুকাল থেকেই তার লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, মনন ও চরিত্রগঠন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদরাসায়, তাঁরই মুবারক হাতে। তাঁর কাছে ইলম হাসিল মানেই তিনি ইলমের মূল উৎস থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। একইভাবে অধ্যাত্মিকতা ও আমলের দীক্ষাও তিনি হাসিল করেছিলেন আসল উৎস থেকেই।

ফলাফল হয়েছিল এই, তিনি হয়েছিলেন এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সর্বশ্রেষ্ঠ শাগরেদ।

মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অমূল্য বাণীটিই যথেষ্ট,

أَعْلَمُ أُمَّتِيْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

'হালাল-হারাম বিষয়ে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম মুআয ইবনে জাবাল।'

উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে তার অনন্য মর্যাদা প্রমাণের জন্য এই বিষয়টিই যথেষ্ট যে, তিনি ছিলেন সেই মহান ছয় ব্যক্তির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, যাদেরকে রাসূলের জীবদ্দশায় কুরআন সংকলনের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম যখন মুআয ইবনে জাবালের উপস্থিতিতে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতেন, তার অগাধ জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবশত এবং তার বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাববশত তার দিকে বারবার তাকাতেন।

***

রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং তাঁর পরবর্তী দুই খলীফা আবু বকর সিদ্দীক এবং উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এই বিরল ইলমীশক্তিকে ইসলাম ও মুসলিম জাতির ব্যাপক কল্যাণে কাজে লাগিয়েছেন।

এই যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাই ধরা যাক। তিনি যখন দেখলেন, মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশের লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে এবং তিনি অনুভব করলেন, ইসলামে দীক্ষিত এই সকল নওমুসলিমকে ইসলাম, কুরআন ও ইসলামী বিধিবিধান শেখানোর জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন, তখন তিনি আত্তাব ইবনে উসাইদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মক্কায় তাঁর প্রতিনিধি বা গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিলেন এবং তার সঙ্গে থেকে সেখানের লোকদের কুরআন এবং ইসলাম শেখানোর জন্য নির্দেশ দিলেন মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে।

***

ইয়েমেনের বাদশাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দূত পাঠালেন। তার মাধ্যমে জানালেন, তিনি এবং ইয়েমেনবাসী ইসলাম কবুল করেছেন। রাসূলের কাছে বাদশাহ আবেদন জানিয়েছেন যে,

ইয়েমেনের এই সকল নওমুসলিমকে দীন শেখানোর উদ্দেশ্যে দয়া করে কিছু দক্ষ লোক পাঠান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাঝ থেকে কয়েকজন দাঈকে নির্বাচন করে তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে।

ইয়েমেনের উদ্দেশে হেদায়েত ও নূরের অভিযাত্রী এই কাফেলাকে বিদায় জানাতে বেরিয়ে এলেন নূরের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; নিজ বাহনের পিঠে মুআযের পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন নবীজি। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি হাঁটতেই থাকলেন। মনে হচ্ছে, যেন তিনি মুআযকে দীর্ঘ সময় সঙ্গ দিতে চাচ্ছেন।

এরপর তিনি মুআযকে অন্তিম উপদেশ দিয়ে বললেন,

يَا مُعَاذُ إِنَّكَ لَا تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا - وَلَعَلَّكَ اَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ وَقَبْرِيْ

‘হে মুআয, হয়তো আজকের পর আমার সঙ্গে তোমার আর কখনো সাক্ষাৎ হবে না। যখন তুমি ইয়েমেন থেকে ফিরে আসবে মদীনায়, তোমাকে তখন সম্ভবত আমার মসজিদ আর আমার কবরের পাশ দিয়ে যেতে হবে।’

এই কথা শুনে মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদ-বেদনায় অস্থির হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তার সেই কান্না দেখে অন্য সকলেও খুবই কাঁদলেন।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি সত্য কথা বলেছিলেন। ওই দিনের পর মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর তাঁকে দেখতে পাননি। ইয়েমেন থেকে তার ফিরে আসার পূর্বেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীকে চিরবিদায় জানিয়ে চলে গেলেন।

সন্দেহ নেই যে, মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরপর যখন মদীনায় ফিরে এসেছিলেন তখন খুবই কেঁদেছিলেন। হয়তো কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে ছিলেন। কারণ, মদীনা তখন শূন্য ছিল প্রিয়তম নবীর ভালোবাসা থেকে। বিরান ছিল তাঁর উপস্থিতি থেকে।

***

উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতকালে একবার তিনি মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কিলাব গোত্রের উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় নাগরিক ভাতা পৌঁছানো এবং তাদের ধনীদের নিকট থেকে উসূলকৃত যাকাতের মাল তাদের মাঝে বিতরণের উদ্দেশ্যে। সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে তিনি খলীফার দেওয়া দায়িত্ব পালন করলেন। ঘোড়ার পিঠে গদির নিচে বিছানোর যে পাতলা চাদরটি বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটাই গলায় প্যাঁচ দিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরে এলেন। অভিযোগের সুরে স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী ব্যাপার, আপনি খালি হাতে কেন? রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে ফেরার সময় অন্য সকলেই তো স্ত্রীদের জন্য কোনো উপহার উপঢৌকন নিয়ে আসেন। আপনার প্রাপ্য অংশ কোথায়?'

তিনি একটু কৌশলী জবাব দিয়ে বললেন,

'দেখো, আমার সঙ্গে একজন পর্যবেক্ষণকারী ছিলেন।' (পর্যবেক্ষণকারী শব্দ দ্বারা 'আল্লাহ'কেও বোঝানো যায় 'মানুষ'কেও। সাহাবী বলেছেন আল্লাহর কথা। স্ত্রী বুঝেছেন 'পর্যবেক্ষণকারী' কোনো মানুষ ছিলেন স্বামীর সঙ্গে।)

এটা বুঝে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,

'আশ্চর্য! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আপনি বিশ্বস্ত ছিলেন, প্রথম খলীফা আবু বকরের কাছেও বিশ্বস্ত ছিলেন আর এখন উমর ফারূকের যুগে এসে তিনি আপনার সঙ্গে পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছেন?'

অভিযোগ আকারে কথাটি তিনি খলীফার স্ত্রীদের কাছে পৌঁছে দিলেন।

তাঁদের মাধ্যমে কথাটি খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কানেও পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুআয ইবনে জাবালকে ডেকে বললেন,

'আমি কি তোমার সঙ্গে কোনো পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছি?'

মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৃদু হেসে বললেন,

'আমীরুল মুমিনীন, বাস্তবে ব্যাপারটি মোটেও তেমন নয়। কিন্তু স্ত্রীকে ঠাণ্ডা করার জন্য কথাটি বলা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।'

খলীফা তার এই জবাব শুনে জোরে হেসে উঠলেন আর তার হাতে একটি ছোট্ট হাদিয়া দিয়ে বললেন,

'যাও, এটা দিয়ে তার মান ভাঙানোর চেষ্টা করো।'

***

উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনামলে সিরিয়ায় নিযুক্ত গভর্নর মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর কাছে চিঠি লিখলেন,

'আমীরুল মুমিনীন,

সিরিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। প্রতিটা শহরই মুসলিমদের দ্বারা ভরপুর হয়ে উঠেছে। তাদের জন্য কুরআন ও দীন শিক্ষাদানকারী বিজ্ঞ শিক্ষকের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অতএব আমীরুল মুমিনীন, দয়া করে তাদের দীন ও কুরআন শেখানোর জন্য উপযুক্ত কয়েকজন মানুষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।'

সিরিয়ার ভাইদের এই দীনি প্রয়োজন মেটানোর জন্য খলীফা উমর ইবনে ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ

করলেন এবং রাসূলের যুগে যে পাঁচজন সাহাবী কুরআন সংকলন করেছিলেন, তাদের ডাকলেন।

সেই পাঁচজন মহান সাহাবী হলেন,

এক. মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
দুই. উবাদা ইবনে সামিত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
তিন. আবু আইয়ূব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
চার. উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
পাঁচ. আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

খলীফা তাদের জানালেন,

'আপনাদের সিরিয়াবাসী ভাইদের কুরআন ও দীনের শিক্ষা দেওয়া খুব জরুরি। সে জন্য আপনারা নিজেদের ভেতর থেকে তিনজনকে নির্বাচন করে আমাকে সাহায্য করুন। ইচ্ছা হলে এর জন্য আপনারা লটারি করতে পারেন। নতুবা আমি নিজেই আপনাদের মধ্য থেকে তিনজনের নাম প্রস্তাব করব।'

এ কথা শুনে তারা বললেন,

'লটারি করার কী দরকার?

আমাদের পাঁচজনের ভেতর আবু আইয়ূব অতিবৃদ্ধ আর উবাই ইবনে কাআব অসুস্থ। অবশিষ্ট থাকলাম আমরা তিনজন। সুতরাং আমরা বাকি তিনজনই এই কাজের জন্য নির্ধারিত।'

খলীফা উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের তিনজনকে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়ে বললেন,

'আপনারা আপনাদের তালীম ও তারবিয়াতের কাজ শুরু করবেন হিমস থেকে। সেখানের জনগণের শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক মনে হলে একজনকে রেখে বাকি দু'জনের একজন যাবেন দামেস্কে আর অন্যজন ফিলিস্তিনে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত সেই তিন সাহাবী খলীফা উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্দেশমতো কুরআন ও দীন শেখানোর উদ্দেশ্যে হিমস নগরীতে পৌঁছে গেলেন। উবাদাহ ইবনে সামিত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সেখানে রেখে আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চলে গেলেন দামেস্কে। আর মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গেলেন ফিলিস্তিনে।

***

ফিলিস্তিনে গিয়ে কুরআন ও দীন শেখানোর মহান দায়িত্ব পালনকালে মহামারি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি কিবলার দিকে মুখ করে এই কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলেন,

'স্বাগতম তোমায় হে মৃত্যু স্বাগতম,
সারা জীবন দূরে থেকে আজ হলো আগমন।
তোমার জন্যই ব্যাকুল আমি হে প্রিয়তম।'

এরপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকলেন,

'হে আল্লাহ, তুমি তো জানো এই পৃথিবীর প্রতি এবং এই পৃথিবীর দীর্ঘ জীবনের প্রতি আমার কোনো মোহ ছিল না। কখনো আমি এখানে ফুল ও ফলের মানোরম উদ্যান গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিনি। পানির শীতল প্রবাহে বিলাসী জীবনযাপনের কল্পনাও করিনি।

এ জীবনে আমার একটাই লক্ষ্য ছিল—তোমার সন্তুষ্টি লাভ করা। আর সে জন্যই আমি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহ উপেক্ষা করে রোযা রেখে তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করেছি। আলেমদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দীন শিক্ষা ও প্রচারের মজলিসে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি।

হে আল্লাহ, ঈমানদীপ্ত মুমিন বান্দাকে যে পদ্ধতিতে তুমি মৃত্যু দিয়ে থাকো, আমাকেও সেভাবেই মৃত্যু দান করো।'

অবেগঘন এই কথাগুলো বলার পরই তার পবিত্র রুহ দেহ ত্যাগ করল। মৃত্যুর মুহূর্তে তিনি ছিলেন পরিবার ও স্বজন থেকে দূরে। ছিলেন আল্লাহর পথে আহ্বানকারী। ছিলেন আল্লাহর পথে হিজরতকারী।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৮০৩৭।
২. *আল-ইসতীআব*, ৩য় খণ্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা ।
৪. *সিয়ারুল আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা।
৫. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, ৫৮৩ পৃষ্ঠা।
৬. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা।
৭. *সিফাতুস সফওয়াহ*, ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।
৮. *তাহযীবু আসমা ওয়াল লুগাত*, ২য় খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা।
৯. *তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী*, ২য় খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।
১০. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ২য় খণ্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা।
১১. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা।
১২. *দুওয়ালুল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা।
১৩. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১০ম খণ্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা।
১৪. *ওফায়াতুল আইয়ান*,
১৫. *জামহারাতুল আউলিয়া*, ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা।
১৬. *তাবাকাতু ফুকাহাইল ইয়ামান*, ৪৪ পৃষ্ঠা।
১৭. *আল-বাদউ ওয়াত তারীখ*, ৫ম খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা।
১৮. *আয-যুহদ*, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ১৮০ পৃষ্ঠা।
১৯. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।
২০. *আল-মাআরিফ*, ইবনে কুতাইবা, ১ম খণ্ড, ১১১ পৃষ্ঠা।
২১. *আসহাবু বদর 'মানযূমা* লিশ শাইখ হুসাইন আল-গুলামী, ২০৪ পৃষ্ঠা।
২২. *হায়াতুস সাহাবা*, আল-ফাহারিস ফির রাবে।

ইয়াসির পরিবার

ইয়াসির, সুমাইয়া ও আম্মার

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)

একটুখানি ধৈর্য ধরো হে ইয়াসির পরিবার, তোমাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এক শিশিরভেজা, শুভ্র-সুন্দর আলোকিত ভোরে...

ইয়েমেন থেকে এক কাফেলা এসে পৌঁছল মক্কার উঁচু ভূমিতে।

এই কাফেলার সদস্য ইয়াসির ইবনে আমের আল-কিনানী। তিনি উঁচু থেকে পবিত্র কাবার দিকে দৃষ্টি মেলে তাকানোমাত্রই এর অপরূপ শোভায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেই মুগ্ধদৃষ্টি সহজে ফেরাতে পারলেন না।

কারণ, এই অপরূপ দৃষ্টিনন্দন কাবার শোভা তিনি আজই প্রথমবার দেখলেন।

***

ইয়াসিরের মক্কায় আগমনের উদ্দেশ্য বাণিজ্য ছিল না, যদিও এই সফরে কাফেলার অন্যান্য সদস্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেটাই।

ইয়াসির ইবনে আমের আল-কিনানী নিজে এবং তার আরও দুই ভাই হারেস ও মালেক এখানে এসেছেন শুধু তাদের কয়েক বছরের নিখোঁজ ভাইকে খোঁজার উদ্দেশ্যে।

***

যুবক তিন ভাই তাদের নিরুদ্দেশ ভাইটিকে খুঁজতে মক্কার প্রতিটি স্থান চষে বেড়াচ্ছেন...

প্রতিটি মানুষকেই জিজ্ঞাসা করলেন, একে একে ও দলে দলে।

লাভ হলো না কিছুই। তার সন্ধান পাওয়ার আশা হারিয়ে নিরাশ হয়ে পড়লেন। তখন সেই তিন ভাইয়ের গতিপথ হয়ে গেল ভিন্ন ভিন্ন।

হারেস ও মালেক ফিরে গেলেন মাতৃভূমি ইয়েমেনে, যেখানে রয়েছে তাদের দুরন্ত শৈশবের স্মৃতিময় খেলার মাঠ, সাথি ও বন্ধুরা।

তাদের অপর ভাই ইয়াসির যাকে মক্কা নগরী ভীষণভাবে আকর্ষণ করছিল, এমনকি সেখানেই নিজের আবাস গড়ে তোলার জন্য তার মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছিল। ইয়েমেনের স্মৃতি আর মক্কার আকর্ষণ তাকে দ্বিধায় ফেলে দিলো।

***

অবশেষে তিনি মক্কার আকর্ষণকে প্রাধান্য দিয়ে সেখানেই নিজের স্থায়ী আবাস গড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ইয়াসির ইবনে আমের আল-কিনানী বুঝতেই পারলেন না, তার ভাগ্যললাটে কত বিশাল সৌভাগ্য ও মর্যাদা লেখা হয়ে গেল।

তিনি জানতে পারলেন না যে, ইতিহাসের সুপ্রশস্ত দুয়ার দিয়ে এক সোনালি ইতিহাসের মধ্যে তার প্রবেশ ঘটে গেল।

জানতে পারলেন না, অদূর ভবিষ্যতে তার ঔরসে জন্ম নেবে এমন এক সন্তান—সুন্দর পৃথিবী গড়ার গৌরবময় কারিগরদের মাঝে যার নাম থাকবে উজ্জ্বল ও ঝলমলে হয়ে।

তবে মক্কাতে আবাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইয়াসিরের সমস্যা ছিল একটাই, এখানে তাকে আশ্রয় দেওয়ার মতো কোনো জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ছিল না...

আপদে-বিপদে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর এবং শত্রুদের থেকে তাকে বাঁচানোর মতো কোনো পরিবার-পরিজন ছিল না।

সুতরাং মক্কার যেই সমাজে দুর্বল-অসহায় মানুষের বসবাসের কোনো সুযোগ ছিল না, সেখানে সুখে-শান্তিতে, নিরাপদে থাকতে কোনো একজন সরদারের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া ইয়াসিরের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

অতএব বাধ্য হয়েই তিনি মৈত্রীচুক্তি করলেন 'আবু হুযাইফা ইবনুল মুগীরা আল-মাখযূমী'র সঙ্গে।

***

আবু হুযাইফা নতুন মিত্রের অমায়িক ব্যবহার, মার্জিত চালচলন ও উত্তম গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে নিজের ক্রীতদাসী সুমাইয়া বিনতে খিবাতকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এই নতুন দম্পতি প্রথম পুত্রসন্তান 'আম্মার'কে পেয়ে তারা যেন খুশিতে ফেটে পড়লেন।

তাদের দু'জনের সেই খুশি বহুগুণ বেড়ে গেল যখন আবু হুযাইফা ইবনুল মুগীরা আল-মাখযূমী তাদের এই সন্তানকে মুক্ত করে দিলো এবং তাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করল।

***

স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ইয়াসিরের ছোট্ট পরিবার মাখযূম গোত্রের আশ্রয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। সময়ের গতি-প্রবাহ এগিয়ে যেতে থাকল। একে একে বহু বছর পেরিয়ে গেল। ইয়াসির ও সুমাইয়ার বয়স বেড়ে একসময় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় প্রবেশ করল। একই সঙ্গে তাদের পুত্রসন্তান আম্মার হয়ে উঠল এক টগবগে তরুণ।

***

এরপর একসময় অন্ধকার এই জগৎ মহান সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত নবুওয়াতের সূর্যালোকে আলোকিত হয়ে উঠল।

মরুমক্কার বিস্তীর্ণ পাথুরে জমিন থেকে উৎসরিত হলো এমন সমুজ্জ্বল কিরণমালা যা জগৎকে পূর্ণ করে দিলো ইনসাফ ও অনুগ্রহে। উম্মী নবী প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিলেন,

তিনিই সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত আখেরী নবী। মানুষকে তিনি স্রষ্টার মনোনীত নীতিমালা মেনে চলার আহ্বান জানাতে থাকলেন যার মাধ্যমে তারা লাভ করবে দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ ও সম্মান। তিনি তাদের জান্নাতের সুসংবাদ শোনালেন, জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করলেন।

***

আম্মার ইবনে ইয়াসির লোকমুখে শুনতে পেলেন নতুন দাওয়াতের কথা। যা তার বুদ্ধি, হৃদয় ও কর্ণকে উদ্গ্রীব করে তুলল। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, এই নতুন দাওয়াতের বিষয়ে লোকমুখে তিনি যেটুকু জানতে পেরেছেন তা একেবারেই সামান্য। এতে কিছুই বোঝা যায় না।

তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে বললেন,

'ছি ছি আম্মার! কেন এই কৌতূহল নিয়ে চুপচাপ বসে থাকছ? খুব কাছেই তো রয়েছে কৌতূহল মেটানোর ব্যবস্থা। চলো না একবার ঘুরে আসি পয়গম্বরের নিকট থেকে। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট থেকে।

কারণ, নতুন দাওয়াতের সকল কথাই তো তুমি জানতে পারবে তাঁর কাছে এবং তাঁর সঙ্গীদের কাছে।'

***

আর একমুহূর্তও বিলম্ব না করে আম্মার ইবনে ইয়াসির তৎক্ষণাৎ ছুটে চললেন 'দারুল আরকাম'-এর উদ্দেশে। সেখানেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলেন। তাঁর জবান মুবারক থেকে শুনলেন এমন কিছু কথা যা তার হৃদয়মাঝে সৃষ্টি করল তুমুল আলোড়ন। শুনতে পেলেন তাঁর এমন কিছু দিকনির্দেশনা যা তার অন্তরকে ভরে দিলো হিকমত ও নূর দিয়ে, প্রজ্ঞা ও আলো দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اَلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُه وَرَسُوْلُه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই; আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি তাঁর বান্দা এবং রাসূল।'

***

আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের নিকট থেকে ফিরে এসে তার মা সুমাইয়ার নিকট গেলেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং এমনভাবে ইসলাম কবুল করলেন যেন পূর্ব থেকেই সবকিছু ঠিকঠাক করা ছিল।

এরপর তিনি গেলেন পিতা ইয়াসিরের নিকট এবং মায়ের মতো তাকেও ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিলেন। পিতাও মায়ের চেয়ে কম নন। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনিও ইসলাম কবুল করে নিলেন। এই মুবারক পরিবারের ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইসলামের আলোর মিছিলে শামিল হলো এমন তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যার আলোকমালা আজ পর্যন্ত

মুমিনদের হৃদয়কে আলো দিয়ে যাচ্ছে এবং পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত দিতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ।

***

এই তিনজনের ইসলাম গ্রহণের খবর তাদের মিত্র মাখযূম গোত্রের লোকদের কানে পৌঁছে গেল বাতাসের গতিতে। তারা রাগে-ক্রোধে একেবারে যেন ফেটে পড়ল।

তারা দৃঢ় শপথ নিল, হয়তো ওদের ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনবে আর না হয় তাদের নিঃশেষ করে ফেলবে।

সুতরাং তারা তরুণ পুত্রসহ পিতামাতাকে নিয়ে গেল গনগনে রোদের তাপে উত্তপ্ত মরুর বুকে। লোহার বর্ম পরিয়ে তাদের বালুর ওপর ফেলে রাখা হলো। ওপরে প্রচণ্ড সূর্যের তাপ আর নিচের দগদগে আগুনের মতো বালুর তাপ। যে তাপে তেতে ওঠা জ্বলন্ত চুলার মতো উত্তপ্ত লোহার বর্মের মাঝে তাদের শরীর ঝলসে যেতে থাকল। পানি পানি বলে চিৎকার করলেও একফোঁটা পানিও দেওয়া হলো না তাদের। উল্টা সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় তাদের জীবনকে দুঃসহ আযাবে পরিণত করা হলো।

তাদের কণ্ঠনালি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, শরীরের শিরাগুলো শুষ্ক হয়ে চামড়া ফেটে রক্তধারা বইতে থাকল।

পরের দিন শাস্তির দ্বিতীয় কিস্তি উপভোগ করানোর জন্য কিছু সময়ের বিরতি দেওয়া হলো আগের দিনের শাস্তিতে। এভাবেই চলতে থাকল।

একদিন তাদের ওপর নির্যাতন চলছিল, সে সময় তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ভীষণ ব্যথিত হলেন এ জন্য যে, তাদের সাহায্য করার এবং নির্যাতন থেকে বাঁচানোর কোনো শক্তি তাঁর নেই। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন,

'একটুখানি ধৈর্য ধরো হে ইয়াসির পরিবার, কারণ জান্নাত তোমাদের জন্য নিশ্চিতরূপে অবধারিত।'

প্রিয় নবীর মুখনিঃসৃত এই বিশাল আশ্বাসবাণী শুনে নির্যাতনে ওষ্ঠাগত প্রাণগুলো পেল স্বস্তি। বিস্ফারিত চোখগুলো লাভ করল শীতল প্রশান্তি। ব্যথা-ভারাক্রান্ত ও বেদনাক্লান্ত দুঃখী চেহারাগুলোতে ভেসে উঠল এক চিলতে প্রসন্ন মুচকি হাসি।

***

বয়োবৃদ্ধ পিতামাতার ওপর নির্যাতন বেশিদিন দীর্ঘ হলো না।

মক্কার দুর্বিনীত সরদার আবু জাহাল একদিন সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আর সে সময় তার ওপর চলছিল দুঃসহ নির্যাতন। আবু জাহাল তাকে বিশ্রী ও অশ্লীল ভাষায় গালি দিলো। তাকে ভীষণ কষ্টদায়ক কিছু কথাও শুনিয়ে দিলো। কিন্তু নির্যাতিতা সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার কোনো কথাতেই কর্ণপাত করলেন না।

মক্কার সরদার আবু জাহালের আত্মমর্যাদায় ভীষণ আঘাত লাগল তার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে। খুব উত্তেজিত হয়ে সে হাতের বর্শাটি ছুঁড়ে মারল সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার তলপেট লক্ষ্য করে। বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা পেটের নিচ দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হলেন ইসলামের জন্য প্রথম জীবন উৎসর্গকারিণী। লাভ করলেন ইসলামের 'সর্বপ্রথম শহীদ' এর মর্যাদা।

স্ত্রী সুমাইয়ার শহীদ হয়ে যাওয়ার পরপরই স্বামী ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও অসহ্য নির্যাতনের মধ্যেই আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অবিচল ঈমানের কালেমা পড়তে পড়তেই শহীদ হয়ে গেলেন।

***

পিতা-মাতা শহীদ হয়ে যাওয়ার পর আম্মার রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর নির্যাতনের মাত্রা ও কঠোরতা তীব্র থেকে তীব্রতর করে দেওয়া হলো। তার উপর নির্যাতন, কষ্ট ও যন্ত্রণার সকল সীমা অতিক্রম করল।

এই রকম দুর্দিনে একদিন তিনি ভীষণ লজ্জিত, ব্যথিত ও বিবর্ণ চেহারা নিয়ে হাজির হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে। তিনি বারবার চেষ্টা করেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে চোখ রাখতে পারছিলেন না। তার নিচু দৃষ্টি কিছুতেই উঁচু হচ্ছিল না। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কোমলতা কণ্ঠে ঢেলে অভয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

– 'কী হলো আম্মার? এত ভেঙে পড়েছ কিসের জন্য?'
– 'ভীষণ ভয়াবহ পাপ করে ফেলেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ।'
– 'আম্মার, কী পাপ করেছ সেটা খুলে বলো।'

আম্মার রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'গতকাল তারা এত ভয়াবহ নির্যাতন করেছে, যা পাহাড়ের ওপর করা হলে পাহাড়ও ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। প্রতিদিনের মতো তারা শুধু দুপুরের ঝলসানো রোদে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো বালিতে ফেলে রেখে আমার শরীরে আগুন লাগায়নি; বরং গতকাল তাদের নির্যাতন ছিল পূর্বের সকল নির্যাতনের চেয়ে লক্ষ-কোটি গুণ ভয়াবহ। তীব্র শারীরিক যন্ত্রণার পাশাপাশি ওরা আমাকে ঈমানহারা করে ছেড়েছে। ওদের পীড়াপীড়িতে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমি ওদের দেবদেবীর প্রশংসা করে ফেলেছি আর আপনার নামে মন্দ কথাও বলে দিয়েছি...'

এটুকু বলেই তিনি এমনভাবে কাঁদতে থাকলেন যে, হেঁচকি উঠতে থাকল।

সবকিছু শোনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও নরম ভাষায় জানতে চাইলেন,

‘বাধ্য হয়ে তুমি মুখে যা বলেছ, তোমার অন্তরও কি তাই বলেছিল?’

তিনি বললেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মুখের কথাগুলো একমুহূর্তের জন্যও হৃদয়ে স্থান নিতে পারেনি। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অবিচল বিশ্বাস আমার হৃদয়ে প্রথম দিন থেকে যেমন ছিল এখনো ঠিক তেমনই আছে।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

‘তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই। তারা যদি আবারও তোমাকে বাধ্য করে, তাহলে আবারও তুমি ওই কথা বলে দিয়ো।’

এরপর মহান আল্লাহ আম্মার রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাজিল করে তাকে আসামান্য মর্যাদায় ভূষিত করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর প্রতি অস্বীকৃতিতে লিপ্ত হয়—অবশ্য সে নয় যাকে বাধ্য করা হয়েছে—কিন্তু তার অন্তর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে স্থির; বরং সেই ব্যক্তি যে হৃদয় খুলে দিয়েছে কুফুরের প্রতি (অর্থাৎ বুঝে শুনে অস্বীকৃতিতে লিপ্ত হয়েছে) এরূপ লোকের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব নাজিল হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।’–সূরা নাহাল : (১৬) ১০৬

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদের মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন, তখন দীন রক্ষার উদ্দেশ্যে আম্মার ইবনে ইয়াসির হলেন মদীনায় হিজরতকারীদের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তি।

তিনি যখন 'কুবা'তে পৌঁছলেন, যেখানে হিজরতকারীগণ যাত্রাবিরতি করেছিলেন, নামায আদায়ের সুবিধার্থে তিনি সকলকে একটি মসজিদ তৈরির আহ্বান জানালেন। তারা সকলেই আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মসজিদ তৈরি করে ফেললেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ।

আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৌরব ও অনন্য মর্যাদার জন্য এটুকুই তো যথেষ্ট হওয়ার কথা।

***

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তাঁকে পেয়ে আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। নিজের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে পেলে কেউ যেমন খুশি হয়, আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রিয় নবীকে পেয়ে সেই রকম খুশি হলেন। ছায়ার মতো সারাক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করতে থাকলেন। দিনে ও রাতে প্রায় কখনোই তাঁর থেকে দূরে থাকতেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার প্রতি একই রকম ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতেন। আম্মার ইবনে ইয়াসির এলেই তিনি খুশি হয়ে বলতেন,

'বাহ বাহ, আমার সেরা বন্ধুর আগমন!'

***

বদর যুদ্ধের ময়দানে আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকাতলে শামিল হয়ে বীরবিক্রমে লড়াই করেন অন্য সকলের মতোই। অন্যদের থেকে

তার ভিন্নতা ছিল এই, ইসলামের সর্বপ্রথম এই যুদ্ধে একমাত্র তিনিই ছিলেন এমন মুজাহিদ যার পিতামাতা দু'জনই শহীদ।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চিরতরে আপন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন আর সেই সুযোগে বেশির ভাগ আরব ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল, সেই চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে ইয়ামামার লড়াইয়ে তার ছিল বিশেষ ও বিখ্যাত ভূমিকা।

সেটা ছিল এ রকম যে, সেদিন যখন প্রতিপক্ষের ভয়াবহ আক্রমণে সাহাবায়ে কেরাম দলে দলে শহীদ হতে থাকলেন। কুরআনের হাফেযরাও প্রচুর সংখ্যায় শহীদ হয়ে গেলেন। মুসলিম বাহিনীর পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল।

সেই মুহূর্তে একটি উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়ালেন আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ইতিমধ্যে তার একটি কান কেটে চামড়ার সঙ্গে ঝুলছিল। সেই ভাবেই তিনি মুসলিম মুজাহিদদের চিৎকার করে ডেকে বললেন,

'হে মুসলিম মুজাহিদ ভাইয়েরা, আপনারা কি জান্নাত থেকে পালাতে চান? হে মুজাহিদ ভাইয়েরা, জান্নাত আমাদের ডাকছে, আসুন আমার সঙ্গে।'

এভাবে সকলকে সমবেত করে তিনি আগে আগে চলতে থাকলেন, তখন তার কর্তিত কান গালের সঙ্গে লেগে দোল খাচ্ছিল। একসঙ্গে সকলে মরণপণ করে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভণ্ড নবী মুসাইলামা নিহত হলো। আর এরই মাধ্যমে লোকেরা দলে দলে আবার ইসলামে ফিরে আসতে থাকল, যেভাবে তারা দলে দলে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

***

দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনামলে খলীফা আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহ আনহুকে 'কূফা' অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করলেন আর তার সঙ্গে শিক্ষক ও সহযোগী হিসাবে পাঠালেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে। খলীফা কূফার জনগণের উদ্দেশে এক লিখিত সরকারি ফরমানে ঘোষণা করলেন,

'হামদ ও সালাতের পর...

আমি আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে তোমাদের আমীর (গভর্নর) আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে শিক্ষক ও উজির (সহযোগী) হিসাবে পাঠালাম।

তারা দু'জনই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবীদের মাঝে বিশিষ্ট ও নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং তোমরা তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে এবং তাদের আনুগত্য করে চলবে।'

কিছুদিন পর খলীফার মনে হলো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা দরকার। সুতরাং তিনি আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কূফার গভর্নরের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিলেন। দায়িত্বভার মুক্ত হয়ে যখন তিনি খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন,

'গভর্নর বানানোর পর আবার অপসারণ করে দিলাম, এতে কি কষ্ট পেয়েছ আম্মার?'

তিনি জবাবে বললেন,

وَاللهِ لَقَدْ سَاءَتْنِيْ الْإِمَارَةُ أَكْثَرَ مِمَّا سَاءَنِيْ الْإِقْصَاءُ عَنْهَا

'আল্লাহর কসম, গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ আমার জন্য যতটা কষ্টদায়ক ছিল, অপসারণ সে তুলনায় কিছুই নয়।'

***

আল্লাহ তাআলা আম্মার ইবনে ইয়াসিরের প্রতি সন্তুষ্ট হোন...

তিনি ছিলেন মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানের প্রতিচ্ছবি।

আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টিতে ভূষিত করুন তার পিতা ইয়াসির ও মা সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকেও...

কারণ, তারা গড়েছিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ ঈমানী পরিবার...

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা ।

২. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৬৪৭ অথবা *আত্তারজামা*, ৯২০৮, সুমাইয়া; ৪র্থ খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৫৮৫, আম্মার; ২য় খণ্ড, ৫১২ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৫৭০৪ পৃষ্ঠা।

৩. *আল-ইসতীআব*, ২য় খণ্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, সুমাইয়া; ৪র্থ খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা।

৪. *সিফাতুস সফওয়াহ*, ১ম খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

৫. *আসসীরাতুন নববিয়্যাহ* লিবনি হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী।

সুহাইল ইবনে আমর

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

তোমাদের কারও সঙ্গে যদি সুহাইলের দেখা হয়ে যায়, তাহলে খবরদার তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কোরো না। কারণ, আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি যে তার মধ্যে বুদ্ধি-বিচক্ষণতা ও ভদ্রতা লুকানো আছে। আর তার মতো এমন বিজ্ঞ মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে সারা জীবন অজ্ঞ থাকতে পারবে না।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সুহাইল ইবনে আমর; কুরাইশের গণ্যমান্য এক সরদার, আরবের জনপ্রিয় বাগ্মী ও তুখোর বক্তা। আরবসমাজের সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মজলিসের তিনি প্রভাবশালী সদস্য।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার শুরু করেছিলেন, সে সময় সুহাইল ইবনে আমর ছিলেন বিগত যৌবনের এক পোড়-খাওয়া ব্যক্তিত্ব। তার দীর্ঘ বয়সের অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও চৌকস ব্যক্তিত্বের জন্য খুবই স্বাভাবিক ও শোভনীয় হতো যদি তিনি রাসূলের সেই ডাকে সাড়া দিয়ে শুরুতেই ইসলাম কবুল করে নিতেন।

কিন্তু সেই সময় সুহাইল ইসলাম থেকে শুধু মুখ ফিরিয়ে রাখেননি; বরং সর্বশক্তি দিয়ে অন্য সকলকে আল্লাহর দীন ইসলাম থেকে দূরে সরানোর কাজে লেগে পড়েন। যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের ওপর তিনি অকথ্য নির্যাতন শুরু করেন, যেন তারা ইসলাম ত্যাগ করে আবার মূর্তিপূজার শিরকের দিকে ফিরে আসে।

সুহাইল ইবনে আমরের ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী অপতৎপরতা চলতে থাকল। কিন্তু হঠাৎ তার কানে এল এমন একটি সংবাদ, যা তার মাথায় ভয়াবহ বজ্রপাতের মতো আঘাত করল। তিনি জানতে পারলেন, তার নিজের ছেলে আব্দুল্লাহ ও মেয়ে উম্মে কুলসূম মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয় তারা তাদের ধর্মীয় সুবিধার স্বার্থে এবং কুরাইশ ও তার নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হাবাশায় পালিয়ে গেছে।

***

এরপর হাবাশায় হিজরতকারী মুসলিমদের মাঝে একটি গুজব রটে গেল যে, কুরাইশ বংশের প্রভাবশালী দলপতিরা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। আর সে কারণে ইসলাম গ্রহণকারীদের আর কোনো নির্যাতনের ভয় নেই। এখন তারা পরিবার-পরিজনের মাঝেই নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বাস করতে পারছে। এই মিথ্যা সংবাদ শোনার পর হাবাশায় হিজরতকারীদের মধ্য থেকে ছোট্ট একদল মুসলিম মক্কায় ফিরে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তাদেরই একজন ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে সুহাইল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

***

আব্দুল্লাহ ইবনে সুহাইল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কদম মক্কার মাটি স্পর্শ করামাত্রই তার পিতা তাকে বন্দী করে ফেললেন এবং বাড়ি নিয়ে গিয়ে একটি অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে দিলেন। এরপর তাকে নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে করে জীবন দুর্বিষহ করে

তুললেন। একপর্যায়ে তার তরুণ পুত্র মুহাম্মাদের দীন ত্যাগ করে বাপ-দাদার ধর্মে ফেরার ঘোষণা দিলেন।

পুত্রের এই ঘোষণায় সুহাইল ইবনে আমরের খুশি আর দেখে কে? তার চোখে-মুখে আর মনে-প্রাণে আনন্দ ও খুশির জোয়ার বইতে থাকে। তার মনে হতে থাকে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে এটা তার এক সুস্পষ্ট বিজয়।

***

মক্কার মুশরিকরা 'বদর প্রান্তরে' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করল। সুহাইল ইবনে আমর মস্তবড় এক স্বপ্ন বুকে নিয়ে ছেলে আব্দুল্লাহর সঙ্গে কুরাইশ বাহিনীতে যোগ দিলেন। কদিন আগেই মুহাম্মাদের অন্ধ অনুসারী হয়ে যে তার মাথা হেঁট করে দিয়েছিল, আজ সেই ছেলেটিই মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কুরাইশীদের সামনে আবার তার মাথা উঁচু করে দেবে। এই রকম রঙিন স্বপ্ন আর বর্ণিল কল্পনার ডানায় ভর করে সুহাইল ইবনে আমর বদর প্রান্তরে পৌঁছে গেলেন।

***

কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি সুহাইল ইবনে আমরের জন্য যে কী চমক লুকিয়ে রেখেছিল তা সে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। বদর প্রান্তরে একদিকে মুশরিক বাহিনী অন্যদিকে মুসলিম বাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোমাত্রই মুশরিক বাহিনীর সারি থেকে এক দৌড়ে বের হয়ে গেলেন মুমিন তরুণ আব্দুল্লাহ ইবনে সুহাইল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকাতলে শামিল হয়ে তরবারি খাপমুক্ত করলেন আপন পিতা ও তার সঙ্গী মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করার জন্য।

***

বিশ্বনবী ও তাঁর বাহিনীর প্রতি মহান আল্লাহর দেওয়া ব্যাপক সাহায্য ও বিশাল বিজয়ের মধ্য দিয়ে যখন বদর যুদ্ধ সমাপ্ত হলো, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রধান প্রধান সাহাবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরাইশ বন্দীদের নিরীক্ষণ করছিলেন। তারা হঠাৎ দেখতে পেলেন সুহাইল ইবনে আমরকে। বুঝলেন যে, কুরাইশী এই তুখোর বক্তাও মুসলিম বাহিনীর হাতে আটকা পড়েছে।

এরপর যখন নিজেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সুহাইল ইবনে আমর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মুক্তিপণ পেশ করলেন, তখন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার তার দিকে তাকিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ইচ্ছা করছে এই লোকটির সামনের দাঁতগুলো ভেঙে দিই, যেন আর কখনো সে মক্কার মজলিসগুলোতে ইসলাম ও নবীর বিরুদ্ধে মঞ্চকাঁপানো জাদুকরি বক্তব্য দিতে না পারে।'

দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমল সুরে বললেন,

'থাক থাক উমর, দাঁত ভেঙে তার বক্তব্য থামিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। ইনশাআল্লাহ একদিন তার বক্তব্য তোমাকে খুশি করবে।'

***

সময়ের চাকা অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে একসময় এসে গেল 'হুদাইবিয়া সন্ধির' সময়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মক্কার মুশরিকদের মাঝে অনুষ্ঠিতব্য এই সন্ধির চুক্তিনামা চূড়ান্ত করার জন্য কুরাইশের লোকেরা তাদের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাল সুহাইল ইবনে আমরকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে সুহাইলের সঙ্গে বসলেন। ওই বৈঠকে রাসূলের সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন সুহাইলের ছেলে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও। চুক্তিপত্রটি লেখার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ডাকলেন আলী ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে। তাকে বললেন লেখো,

'এই চুক্তিপত্র শুরু করছি 'রহমান' 'রাহীম' আল্লাহর নামে...'

সুহাইল ইবনে আমর সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানিয়ে বললেন,

'রহমান', 'রাহীম' আবার কে? আমরা তাকে চিনি না। সুতরাং ওইভাবে লেখা যাবে না। লিখতে বলুন 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন,

'ঠিক আছে ওর কথামতোই লেখো 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'।'

এরপর বললেন, লেখো...

'এই চুক্তির প্রথম পক্ষ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ'

সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বললেন,

'আপনাকে যদি আমরা 'আল্লাহর রাসূল' মেনেই নিতাম, তাহলে আপনার সঙ্গে আমাদের এত লড়াই-ঝগড়া কিসের? অতএব ওটা কেটে আপনার এবং আপনার পিতার নাম লিখতে বলুন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'আল্লাহর কসম, আমি যে আল্লাহর রাসূল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা মানো কিংবা না মানো তাতে কিছুই এসে যায় না। ঠিক আছে তার ইচ্ছামতোই লেখো... মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ।'

এভাবে সুহাইল ইবনে আমরের সকল কথা ঠিক রেখে সন্ধির চুক্তিপত্র লেখা সম্পন্ন হলো। এতে তার অন্তরে এই বিশ্বাস ও গর্ব হতে থাকল, তিনি আজ মুহাম্মাদকে চরম নাকানি-চুবানি খাইয়ে কুরাইশের পক্ষে এক অভাবনীয় বিজয় নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই মিথ্যা গর্বে গর্বিত হয়ে বুক ফুলিয়ে তিনি মক্কায় ফিরে এলেন।

***

আরও কিছু সময় পেরিয়ে গেল। একদিন দেখা গেল গর্বিত কুরাইশের সকল মিথ্যা দম্ভ, অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে চরম বিনয়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করছেন। বিনা প্রতিরোধে কুরাইশ নেতারা লজ্জাজনক এই পরাজয় বরণ করে নিচ্ছে।

বিজয়ী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্বজয়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশময় এই ঘোষণা মক্কার অলিগলিতে শোনা যাচ্ছে,

'হে মক্কাবাসী লোকসকল, আজ বিজয়ের এই আনন্দঘন মুহূর্তে যারা নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ থাকবে। যারা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে তারাও নিরাপদ থাকবে। যারা আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে তারাও নিরাপদ থাকবে।'

সুহাইল ইবনে আমরের কানে এই ঘোষণা পৌঁছামাত্রই তার মনে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ঘর বন্ধ করে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন। ভীষণ অস্থির ও অসহায় বোধ করতে থাকলেন।

তারপর কি হলো? তার জীবনের চরম সেই অসহায় মুহূর্তের বাকি কথাগুলো জানতে চলুন দেখা যাক কী বলেন সুহাইল ইবনে আমর। তিনি বলেন,

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, ভয় ও আতঙ্কে আমি বাড়িতে ঢুকে ঘরদুয়ার সব বন্ধ করে নিজেকে এক কোণে লুকিয়ে রাখলাম। আমার ছেলে আব্দুল্লাহকে খুঁজতে লোক পাঠালাম। যদিও এটা ভেবে আমার ভীষণ লজ্জা হচ্ছিল যে, ইসলাম গ্রহণের কারণে এক সময় তার ওপর আমি কত অত্যাচার করেছি। যাই হোক, সংবাদ পেয়ে সে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, আমি তাকে বললাম,

'বেটা, মুহাম্মাদের কাছে আমার প্রাণভিক্ষা চাও। নইলে যেকোনো মুহূর্তে যে কেউ এসে আমাকে খুন করে ফেলবে।'

আমার অসহায়ত্ব দেখে ছেলে সঙ্গে সঙ্গেই মুহাম্মাদের কাছে চলে গেল এবং তাঁর কাছে বলল,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গিত। আমার পিতা কি নিরাপত্তা পেতে পারে? তাকে কি প্রাণভিক্ষা দেওয়া যায়?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'ঠিক আছে যাও, তার প্রাণভিক্ষা দেওয়া হলো। আল্লাহর নিরাপত্তাব্যবস্থায় তাকে সোপর্দ করলাম। সে নিরাপদ থাকবে। তাকে বেরিয়ে আসতে বলো।'

আমার ছেলেকে এই কথা বলার পর তিনি সকল সাহাবীর প্রতি হুকুম জারি করলেন,

'তোমাদের কারও সঙ্গে সুহাইল ইবনে আমরের দেখা হলে খবরদার তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কোরো না। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা বলে, সে একজন বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাবান ও মর্যাদাবান মানুষ। তার মতো এমন একজন বিজ্ঞ মানুষ শেষ পর্যন্ত ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারবে না। যেটুকু ছিল তার নিয়তিতে তা তো হলোই।'

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সত্যে পরিণত হলো। সুহাইল ইবনে আমর এরপর আর ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারলেন না। তিনি এমনভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন যে, সেটা তার চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-ভাবনা, কথা ও কাজে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেতে শুরু করল। তিনি একেবারে খাঁটি ও পাক্কা মুমিন ও মুসলিম হিসাবে জীবন গড়ে তুললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি এত বেশি পরিমাণে ভালোবাসতে থাকলেন যে, সেটা পৌঁছে গেল তার হৃদয়ের গভীরে। অন্তরের অন্তস্থলে।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজের সময় আমি সুহাইল ইবনে আমরকে নবীজির সামনে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। দেখলাম সে একটি একটি করে উট এগিয়ে দিচ্ছে আর নবীজি নিজের পবিত্র হাতে সেগুলো জবাই করছেন।

এই কুরাইশী কাজ শেষ করে চুল কামানোর জন্য একজন নাপিত ডাকালেন। যিনি রাসূলের মাথা মুবারক মুণ্ডন করে দিলেন। সে সময় সুহাইলকে দেখলাম, প্রিয় নবীর কতগুলো চুল নিয়ে আবেগ, ভক্তি ও ভালোবাসায় চোখে মুখে ডলছে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির সেই দিনের কথা। আমি আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, আজ রাসূলের প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসার এই মানুষটিই কীভাবে ওইদিন 'মুহাম্মাদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামের সঙ্গে 'রাসূলুল্লাহ' পরিচিতিকে অস্বীকার করেছিল? এরপর প্রাণভরে আল্লাহর প্রশংসা করলাম, তিনি সেই মানুষটিকেও হেদায়েত দান করেছেন।'

***

সুহাইল ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন কল্যাণের পেছনে সঁপে দিলেন।

ফলে মক্কা বিজয়ের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউই এত বেশি নামাযী, রোযাদার ও সদকাকারী ছিলেন না। আর কারোরই ছিল না তার মতো এত বেশি হৃদয়ের কোমলতা। তার মতো আর কেউ আল্লাহর ভয়ে এত বেশি কান্নাকাটিও করতেন না।

এরপর তিনি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে যাওয়া শুরু করলেন কুরআন শিখতে। এতে যিরার ইবনুল খাত্তাব তাকে বললেন,

‘হে আবু যায়েদ, কুরআন শিখতে তুমি ‘খাযরাজ বংশীয়’ লোকটির কাছে যাও, এর চেয়ে তোমার নিজের কুরাইশ বংশীয় কারও কাছে যেতে পারো না?’

এর জবাবে তিনি বললেন,

‘তোমার এই কথাটি ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগের অন্যতম মারাত্মক একটি কুপ্রভাবের ফসল। নিজ বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই মিথ্যা অহমিকাই তো আমাদের সর্বনাশ করে ছেড়েছে। যে কারণে আজ আমরা কুরাইশীরা সকল কল্যাণের কাজে পিছে পড়ে গেছি। অন্যরা চলে গেছে আমাদের কত আগে! জাহেলী যুগের বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা অহংকারকে ইসলাম এসে চুরমার করে দিয়েছে। এমন অনেক কওমের লোকদেরকে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে, জাহেলী যুগে যাদের কোনো মান-মর্যাদাই ছিল না।

হায়! আমরা যদি আগেই তাদের সঙ্গী হতাম, তাহলে তাদের মতো আমরাও আজ অনেক অগ্রগামী থাকতাম।’

***

সুহাইল ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার মতো যারা ইসলাম গ্রহণে পিছিয়ে পড়া, তাদের চেয়ে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করতেন। এই দুই শ্রেণির মানুষের ব্যবধানটাও তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করতেন।

একবার উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাক্ষাৎপ্রার্থী হিসাবে তার দুয়ারে হাজির হলেন, কুরাইশী তিন সরদার সুহাইল ইবনে আমর নিজে, হারিস ইবনে হিশাম এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। একই উদ্দেশ্যে একই সময়ে সেখানে হাজির হলেন ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী আম্মার ইবনে ইয়াসির, সুহাইব আর-রুমী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এবং আরও কয়েকজন দাস-বংশীয় সাহাবী।

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রথম সুযোগ দিলেন আম্মার এবং সুহাইব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে। এতে কুরাইশের সরদারদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল। তারা রাগে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে থাকেন। এমনকি একজন বলেই ফেলেন,

'জীবনে আর কোনোদিন আমাদের প্রতি এত অবহেলা দেখানো হয়নি। আমাদের অপেক্ষায় ফেলে রেখে উমর আগে ওদের ডেকে নিল?'

এ কথা শুনে সুহাইল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'রাগ যদি ঝাড়তে ইচ্ছে করে, তাহলে অন্য কারোর ওপর নয় নিজেদের ওপরেই ঝাড়ো। ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত তাদেরও দেওয়া হয়েছিল আমাদেরও। তারা দ্রুত সাড়া দিয়েছে আর আমরা বিলম্ব করেছি। ভেবে দেখো, কী অবস্থা হবে আমাদের, যদি কেয়ামতের ময়দানে জান্নাতে শুধু তাদের ডাকা হয় আমাদের বাদ দিয়ে?

আল্লাহর কসম! পরকালীন উচ্চমর্যাদার ক্ষেত্রে তারা তোমাদের চেয়ে কত বেশি অগ্রগামী সেটা যদি ভাবতে, তাহলে উমরের এই দুয়ারে তাদের পেছনে পড়াকে কোনো গুরুত্বই দিতে না।'

এরপর তিনি আরও বললেন,

'ওরা তোমাদের পেছনে ফেলে অনেক অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ফেলে আসা অতীতের ক্ষতিপূরণ তোমাদের পক্ষে আর কোনোভাবেই সম্ভব নয়—জিহাদ ও শাহাদাত ছাড়া।'

এ কথা বলেই তিনি সেখান থেকে উঠে পড়লেন, নিজের পোশাক ঝেড়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

***

সে সময় সিরীয় সীমান্তে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর লড়াই চলমান ছিল। সুহাইল ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্ত্রী, সন্তান ও নাতিদের সকলকে নিয়ে শাম দেশে রওনা হলেন, সকলকে সঙ্গে

নিয়ে আল্লাহর জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় জীবন উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে।

তিনি সঙ্গীদের বললেন,

'আল্লাহর কসম! আমি অতীতে মুশরিকদের যেভাবে সহযোগিতা করেছি, এখন থেকে মুসলিমদেরও একইভাবে জানপ্রাণ দিয়ে সহযোগিতা করে যাব। এতদিন মুশরিকদের সঙ্গে থেকে যেভাবে আর্থিক সাহায্য করেছি, এখন থেকে একইভাবে ইসলামের জন্য অর্থসাহায্য করতে থাকব।

আল্লাহর কসম! আমি এই সীমান্ত পাহারায় নিজেকে নিয়োজিত রাখব। হয়তো এখানে শহীদ হয়ে যাব আর না হয় মক্কা থেকে দূরে এই প্রবাসেই আমার মৃত্যু এসে যাবে।'

***

সুহাইল ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার কথা রেখেছিলেন, নিজের শপথ বাক্যগুলো অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেছিলেন। মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 'ইয়ারমূকের' যুদ্ধে শরীক হয়ে ন্যায়নিষ্ঠ ও খাঁটি মুমিন মুজাহিদের ভূমিকা পালন করে লড়াই করেন।

এরপর এক ময়দান থেকে অন্য ময়দানে একের পর এক জিহাদ অব্যাহত রাখেন।

শেষ পর্যন্ত শাম দেশে একসময় ভয়াবহ 'আমওয়াস' মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। সেই মহামারিতে আক্রান্ত হয়েই ইন্তেকাল করেন সুহাইল ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার পরিবারের সকল সঙ্গী।

আল্লাহ তাআলা সুহাইল ইবনে আমরের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাকে নবী ও শহীদগণের উত্তম বন্ধু হিসাবে তালিকাভুক্ত করে নিন। 'কতই-না উত্তম সঙ্গী তারা।'

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

যিনি মুসলিম জাতির কল্যাণে মহান নবীর এক হাজার পাঁচশো চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

'ইয়াসরিব' থেকে মক্কার উদ্দেশে কাফেলাটি ছুটে চলেছে। দুর্নিবার এক আকর্ষণ ও অদম্য উৎসাহ কাফেলাটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে...

আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এই কাফেলার সাক্ষাতের বিষয়টি পূর্ব থেকেই ছিল নির্ধারিত। কাফেলার প্রতিটি সদস্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পরম কাঙ্ক্ষিত সেই সাক্ষাৎ-সৌভাগ্য লাভের জন্য অধীর আগ্রহে ছটফট করছিলেন। নবীজির হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ আর তাঁকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন ও সাহায্যের অঙ্গীকারের কথা ভেবে তারা সকলেই হচ্ছিলেন পুলকিত, রোমাঞ্চিত।

সেই কাফেলাতে শামিল ছিলেন কওমের একজন প্রবীণ সরদার, যিনি বাহনের পেছনে বসিয়ে নিয়ে এসেছেন নিজের একমাত্র ছোট্ট পুত্রকে আর ইয়াসরিবে রেখে এসেছেন নয়জন কন্যাসন্তানকে।

প্রবীণ লোকটির প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল এটাই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে 'বাইয়াতের' এই ঐতিহাসিক ঘটনায় তার ছোট্ট ছেলেটি যেন স্বশরীরে উপস্থিত থাকতে পারে।

এবং এই মহান ও অবিস্মরণীয় মুহূর্তে অনুপস্থিতির বেদনা যেন তাকে কখনো আহত করতে না পারে।

ওই প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আল-আনসারী...

আর তার ওই ছোট্ট শিশুপুত্রটি হলেন জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী...

***

ছোট্ট শিশু জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর কোমল হৃদয়ে ঈমানের আলো উদিত হলো। ফলে সে আলো তার দেহমন ও জীবনের সকল অঙ্গনকে আলোকিত করে তুলল।

ইসলাম তার সদ্য সজীব হৃদয়ে সেভাবেই কোমল স্পর্শ বুলিয়ে গেল, যেভাবে শিশির বিন্দু ফুলকলিকে স্পর্শ করে তাকে বিকশিত করে তোলে আর সদ্য ফোটা পাপড়িতে সজীবতা ও সুবাস মেখে দেয়। তার সদ্য সজীব সেই শৈশবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে গেল।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসে গেলেন, তখন সেই ঈমানদীপ্ত কিশোর বালকটি দয়ার নবীর শিষ্য-শাগরেদ বনে গেলেন। যার ফলে মুহাম্মাদী মাদরাসা থেকে উত্তীর্ণদের মাঝে কুরআন হিফয, ইসলামের হালাল-হারাম ও নীতিশাস্ত্রে এবং রাসূলের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি হলেন অন্যতম সেরা শিক্ষার্থী।

প্রিয় পাঠক, তার অনন্যতা অনুমান করার জন্য এই তথ্যই যথেষ্ট হতে পারে যে, তার *মুসনাদে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ* নামের

হাদীস-সংকলন গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে এক হাজার পাঁচশো চল্লিশখানা হাদীস।

মুহাম্মাদী মাদরাসার সেই অনন্য প্রতিভা ও সেরা শিক্ষার্থী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই সকল হাদীস মুখস্থ করেছিলেন এবং মুসলিম জাতির কল্যাণে সেগুলো বর্ণনা করে গিয়েছেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের বিখ্যাত দুই হাদীস গ্রন্থে সেই প্রাচীন গ্রন্থ থেকে প্রায় দুইশো হাদীস গ্রহণ করেছেন।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম জাতির জন্য যুগ যুগ ধরে হয়ে থাকেন হেদায়েত ও আলোর বাতিঘর। কারণ, আল্লাহ তাআলা তার জীবনকে দীর্ঘ করেছিলেন প্রায় শতাব্দীকাল।

***

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদর ও ওহুদের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। কারণ, প্রথমত তিনি ছিলেন ছোট। দ্বিতীয়ত তার প্রতি পিতার নির্দেশ ছিল, নয় বোনকে রেখে তিনি যেন অন্য কোথাও না যান। কারণ, তিনি ছাড়া ওই বোনদের দেখাশোনার আর কেউ ছিল না।

জাবের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন,

'ওহুদ যুদ্ধের আগের রাতে আমাকে ডেকে আমার পিতা বললেন, আগামীকাল যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল সাহাবী শহীদ হবেন সম্ভবত আমি তাদের বাইরে থাকব না। আল্লাহর কসম, আমি রাসূলের পর তোমাকেই আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হিসাবে রেখে যাচ্ছি। আমার ঘাড়ে রয়েছে বেশ কিছু ঋণের বোঝা, তুমি সেগুলো শোধ করে দিয়ো। তোমার বোনদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কোরো। তাদের প্রতি সদয় থেকো।

পরের দিন ওহুদ যুদ্ধে দেখা গেল আমার পিতার কথাই সত্য হলো। তিনিই হলেন সেই যুদ্ধের প্রথম শহীদ। তার দাফন শেষ করে আমি হাজির হলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে। আমি শোকাচ্ছন্ন ও হতাশাগ্রস্ত আওয়াজে তার কাছে নিবেদন করলাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা ছিলেন ঋণগ্রস্ত। তার সেই ঋণ আমি কীভাবে পরিশোধ করব? কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। তার রেখে যাওয়া বাগানের উৎপাদিত সামান্য খেজুরই আমার একমাত্র সম্পদ। আমার নয় বোনের ভরণ-পোষণের জন্যও আমার কাছে একমাত্র অবলম্বন ওই খেজুরগুলোই। এখন যদি আমি বোনদের দিকে তাকাই, তাহলে পাওনাদারদের ঝামেলা সইতে হবে। আর যদি সেই ঝামেলা মেটাতে চাই, তাহলে বোনদের কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিতে হবে।। আমি এখন কোনদিকে যাব? কী করব? কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আমার দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার সব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে নিয়ে আমাদের খেজুর বাগানে হাজির হলেন। খেজুর কেটে যেখানে জমা করা হয়েছিল সেখানে গিয়ে তিনি আমাকে বললেন,

'পাওনাদারদের সকলকে ডেকে আনো।'

আমি তাদের ডেকে আনলাম। আল্লাহর নবী নিজ হাতে ওই সামান্য খেজুর থেকে ঝুড়ি ভরে ভরে পাওনাদারদের দিতে থাকলেন। আল্লাহ তাআলার অসীম দয়ায় আমার পিতার বিশাল ঋণ ওইটুকু খেজুর থেকেই সম্পূর্ণ পরিশোধ হয়ে গেল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, খেজুরের স্তূপ আগে যেমন ছিল এখনো ঠিক তেমনই আছে। মনে হলো একটি খেজুরও সেখান থেকে কমে যায়নি।'

***

জাবের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা শহীদ হয়ে যাওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সংঘটিত আর

কোনো যুদ্ধই তার থেকে ছোটেনি। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি যোগ দিয়েছেন। সেই সকল যুদ্ধেই ছিল তার কিছু স্মরণীয় ঘটনা।

প্রিয় পাঠক, চলুন অন্তত একটি ঘটনা আমরা জাবের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা থেকে শুনি। তিনি বলেন,

'খন্দক যুদ্ধের সময় আমরা খনন কাজে ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ এমন একটি কঠিন শিলাপাথর সামনে এসে গেল, যা কোনোভাবেই আমরা তুলতে বা ভাঙতে পারলাম না। নিরুপায় হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক কঠিন শিলাপাথরের কারণে আমাদের খনন কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের কোদাল দিয়ে ওই পাথরটির কিছুই করতে পারছি না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'ঠিক আছে, চলো আমিও একটু চেষ্টা করে দেখি।'

এ কথা বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমরা দেখলাম, তীব্র ক্ষুধার কারণে তাঁর পেটে বাঁধা রয়েছে পাথর। আমরা সকলেই তখন তিনদিনের অনাহারী। এই তিনদিনে একদানা খাদ্যও আমাদের কারও পেটে পড়েনি। সেই অবস্থাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটিতে জোরে আঘাত করলেন। কী আশ্চর্য! আমরা দেখলাম ওই ভয়ানক শক্ত পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

সেই সময় রাসূলের তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হলো। তাই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি একটু বাড়ি যেতে পারব?'

তিনি বললেন,
'যাও, ঘুরে এসো।'

আমি বাড়ি চলে গেলাম এবং আমার স্ত্রীকে বললাম,

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি ক্ষুধার্ত যা দেখে মনে হলো যে, এত বেশি ক্ষুধার যন্ত্রণা সইবার ক্ষমতা পৃথিবীর আর কোনো মানুষের নেই। তোমার কাছে কি তাঁকে খাওয়ানোর মতো কিছু আছে?'

তিনি বললেন,

'আমার কাছে সামান্য যব আর ছোট্ট একটি বকরির বাচ্চা আছে।'

আমি দেরি না করে বকরির বাচ্চাটি জবাই করে কেটে ধুয়ে চুলায় চড়িয়ে দিলাম। এরপর যবগুলো পিষে আটা বানিয়ে স্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। তিনি লবণ ও পানি দিয়ে আটা ছানতে শুরু করে দিলেন। ওদিকে পাতিলের গোশত দেখলাম সিদ্ধ ও নরম হওয়ার কাছাকাছি। আটা ছানাও হয়ে গেছে। সুতরাং আমি দৌড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে গেলাম। আওয়াজ নিচু করে বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার জন্য সামান্য একটু খাবার তৈরি করেছি। আপনি চাইলে একজন বা দু'জনকে সঙ্গে নিতে পারেন।'

তিনি খাবারের পরিমাণ জানতে চাইলেন। আমার কাছ থেকে সব বিবরণ শুনে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন,

'হে খন্দকের মুজাহিদ ভাইয়েরা, জাবের তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে। সবাই চলো আমার সঙ্গে।'

এরপর তিনি আমাকে বললেন,

'তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বলো, গোশতের পাতিল যেন চুলা থেকে না নামায় এবং আমি না আসা পর্যন্ত যেন রুটি না বানায়।'

আমি ভীষণ লজ্জিত ও চিন্তিত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলাম। মনে মনে ভাবলাম যে,

ছোট্ট একটি ছাগল আর মাত্র তিন কেজি যবের রুটি, খন্দকের প্রায় তিন হাজার ক্ষুধার্ত সৈনিকের এতে কী হবে?

আমি বাড়ি পৌঁছে স্ত্রীর কাছে বললাম,

'আরে সর্বনাসী! আমার কপাল পুড়েছে! এখন কী করি! আল্লাহর রাসূল তো খন্দকের সকল মুজাহিদকে নিয়ে আসছেন। এত মানুষকে খেতে দেব কী?'

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল,

'আচ্ছা আল্লাহর রাসূল কি খাবারের পরিমাণ জানতে চাননি?'

আমি বললাম,

'হ্যাঁ, তা তো তিনি জানতে চেয়েছিলেন এবং আমি তাঁকে বলেছিও। কিন্তু...'

স্ত্রী বলল,

'তাহলে আর এত চিন্তা করছেন কেন? এখন তো পুরা বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দেখবেন।'

স্ত্রীর সেই এক কথাতেই আমার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এলেন সকল আনসার ও মুহাজির ভাই। তিনি সকলকে হুকুম করলেন,

'একসঙ্গে ভিড় করবে না। একে একে আসবে।'

তিনি আমার স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন,

'রুটি বানানোর জন্য তুমি আরও একজনকে সঙ্গে নাও, রুটি বানাতে থাকো, পাতিল থেকে চামচ ভরে ভরে গোশত আর ঝোল দেওয়া রুটি তিনি নিজ হাতে সাহাবীদের সকলের হাতে হাতে তুলে দিলেন।

এরপর জাবের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন,

'আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এতগুলো মানুষ খেয়ে চলে গেলেন অথচ গোশতের পাতিল যেমন পূর্ণ ছিল তেমনই রয়েছে। আটার খামির যে পরিমাণ ছিল এখনো তা-ই আছে।'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার স্ত্রীকে বললেন,
'তোমরা খাও এবং প্রতিবেশীদের দাও।'

সত্যিই আমরা খেয়ে সারা দিন ধরে প্রতিবেশীদের মাঝে দিতে থাকলাম।'

***

একবার জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোমের উদ্দেশে বের হলেন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর নিয়তে।

তার সেনাদলের নেতৃত্বে ছিলেন মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খাসআমী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

সেনাসদস্যদের খোঁজ নেওয়া, তাদের মনোবল বাড়ানো এবং সেনা অফিসারদের প্রাপ্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেনাপতি মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খাসআমী চলমান এই সেনাদলের পেছন দিকে কখনো আবার মাঝের দিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন।

এই ঘোরাঘুরির মাঝে তিনি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহকে দেখলেন যে, তিনি খচ্চরের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

সেনাপতি জানতে চাইলেন,
'কী ব্যাপার জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আপনাকে বাহন দান করেছেন হাঁটার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য, তাহলে বাহনের পিঠে না চড়ে হেঁটে যাচ্ছেন কেন?

এর জবাবে জাবের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,
'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান থেকে শুনেছি,

مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে যার দুই পা ধূলিমলিন হবে, আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দেবেন।'

এই জবাব শুনে সেনাপতি সেখান থেকে চলে গেলেন সেনাদলের একেবারে সম্মুখভাগে। সেখান থেকে চিৎকার করে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে জাবের, আপনি বাহনে না চড়ে হাঁটছেন কেন?'

জাবের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বুঝতে পারলেন যে, সেনাপতি কী চাচ্ছেন। সুতরাং তিনিও সকল সৈনিক শুনতে পারে এমন উচ্চ আওয়াজে বললেন,

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় যার দুই পা ধূলিমলিন হবে, তার ওপর আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।'

এই হাদীস শোনামাত্রই সেই দলের সকল মুজাহিদ নিজেদের বাহন থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে গেলেন। সকলেই চান জাহান্নাম থেকে মুক্তির এই সুবর্ণ সুযোগ যেন হাতছাড়া না হয়।

ফলে ইতিহাসে এই সেনাদলের মতো এত বেশি পায়েহাঁটা (পদাতিক বাহিনী) সৈনিক আর কোনো বাহিনীতেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

***

একজন জাবের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি অভিনন্দন। জীবনের ধাপে ধাপে তার অনন্যতা প্রকাশিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে তিনি বাইআত গ্রহণ করেছিলেন একেবারে শৈশবে...

প্রিয় নবীজির শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন, তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছিলেন এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীগণও তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছিলেন একেবারে নিষ্পাপ কৈশোরে...

প্রিয় নবীর সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়ে লড়াই করেছিলেন টগবগে তারুণ্যে...

আল্লাহর উদ্দেশ্যে জিহাদী পথের ধূলিতে মলিন হয়েছিলেন জীবনের সন্ধ্যায় বার্ধক্যের চূড়ান্ত সীমায়...

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ,* ১ম খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা।
২. *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)
৩. *তারীখুল ইসলাম* লিয-যাহাবী, ৩য় খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-ইসাবাহ,* ১ম খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা,* ১০২৬।
৫. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবাহ,* ১ম খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা।
৬. *সিফাতুস সফওয়াহ,* ১ম খণ্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন,* ১ম খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা।
৮. *আত-তাবারী,* (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)
৯. *জামেউল উসূল* লিবনিল আসীর, ১ম খণ্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী।
১০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৪র্থ খণ্ড, ৮৬ ও ৯৭ পৃষ্ঠা।
১১. *সীরাতু ইবনে হিশাম,* ৩য় খণ্ড, ২১৭-২১৮ পৃষ্ঠা।
১২. *মাজমাউয যাওয়ায়িদ,* ৯ম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

সালিম মাওলা আবী হুযাইফা

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

সালিম যদি জীবিত থাকত, তাহলে তাকেই নিযুক্ত করতাম আমার পরবর্তী খলীফা।

—উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

সুবাইবা বিনতে ইয়াআর নিজের ক্রীতদাস সালিমকে স্বাধীন করে দিলেন নাবালক বয়সে। অপ্রাপ্তবয়সী হলেও তার কোমল স্বভাব, উত্তম ও উন্নত চালচলন সর্বোপরি ভবিষ্যতে একজন নেককার ও সৎ মানুষ হওয়ার ইঙ্গিতগুলোই মালকিন সুবাইবাকে এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

সুতরাং তিনি মুক্ত করে দিলেন ছোট্ট ক্রীতদাস সালিমকে।

কিন্তু আবদে শামস গোত্রের অন্যতম শীর্ষ প্রভাবশালী সুবাইবার যুবক স্বামী আবু হুযাইফা ইবনে উতবার কাছে মনে হলো এত অল্প বয়সে ছোট্ট একটি ছেলের স্বাধীন হয়ে জীবনযাপন কষ্টকর। নিজের ব্যয়ভার বহনসহ, অভিভাবক ছাড়া জীবনের জটিল বিষয়গুলো একাকী একটি বালকের পক্ষে সমাধান কীভাবে সম্ভব? এসব বিষয় চিন্তাভাবনা করে আবু হুযাইফা ইবনে উতবা সালিমের হাত ধরে নিয়ে গেলেন কাবাচত্বরে। সেখানে দলে দলে বিক্ষিপ্ত কুরাইশী লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন,

‘হে কুরাইশের লোকসমাজ, আমার স্ত্রী সুবাইবা এই ছোট্ট সালিমকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। আর আমি এখন ওকে আমার পালকপুত্র হিসাবে বরণ করে নিলাম। তোমরা সাক্ষী থেকো, এখন থেকে আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের ধরন হবে পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের মতন।’

কুরাইশের লোকজন তাকে বাহবা দিয়ে বলে উঠল,
‘আরে উতবার বেটা, কাজের মতো কাজ করেছ তুমি।’

সেই দিন থেকে মানুষের মুখে মুখে রটে গেল তার নাম ‘সালিম ইবনে আবী হুযাইফা’।

***

এর অল্প কিছুকাল পরেই পবিত্র মক্কাভূমিতে জ্বলে উঠল এক ঐশী আলোর মশাল। মহান আল্লাহ সত্য দীন ও হেদায়েতের নীতিমালা পাঠালেন আখেরী নবীর মাধ্যমে। সেই পবিত্র ঐশী আলোতে আলোকিত হয়ে উঠল আবু হুযাইফা ও তার পালকপুত্র সালিমের হৃদয়। তারা দু’জন সর্বাগ্রে সত্য দীন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে শামিল হলেন।

সুতরাং পিতা-পুত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন এবং একই সঙ্গে তারা এক-অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহকে মেনে নিলেন প্রভু হিসাবে আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর বিশেষ বান্দা ও আখেরী নবী হিসাবে ঘোষণা দিয়ে উচ্চারণ করলেন ইসলামের বিপ্লবী কালেমা কালেমা-ই শাহাদাত,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه

***

আবু হুযাইফা ও তার পালকপুত্র সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ইসলাম গ্রহণ করার পর খুব বেশি কাল পার হয়নি এরই মধ্যে দীন

ইসলাম যুগ যুগ ধরে প্রচলিত 'পালক সন্তান' প্রথাকে বাতিল ও বিলুপ্ত ঘোষণা করল।

ইসলাম মানুষকে নির্দেশ দিলো পালক সন্তানদেরকে তাদের প্রকৃত পিতা-মাতার কাছে ফিরিয়ে দিতে। যেন প্রকৃত বংশধারা রক্ষা পায় এবং জাহেলী যুগের অন্যতম এই প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। পালক সন্তানদের বিষয়ে মহান আল্লাহর শ্বাশ্বত এই বাণী নাজিল হলো,

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

'তোমরা তাদেরকে (পালক সন্তানদের) তাদের প্রকৃত পিতৃপরিচয়ে ডাকো।' –সূরা আহযাব : (৩৩) ৫

মুসলিম জাতি মহান প্রতিপালকের উক্ত নির্দেশ পালনে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হলেন। তারা নিজেদের পালকপুত্রদের প্রকৃত বংশপরিচয় খুঁজে পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে অবগত হয়ে তাদের ফেরত দিতে শুরু করলেন।

কিন্তু আবু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতৃপরিচয় উদ্ধার করতে পারলেন না। কারণ, একেবারে শিশুকালে তাকে চুরি করে মক্কায় আনা হয়েছিল এবং দাসবাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ছোট্ট অবস্থায় তার পক্ষে নিজের পিতামাতার নাম-ঠিকানা কিছুই স্মরণ রাখা সম্ভব হয়নি।

আবু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন অনুসন্ধান করে করে তার পালকপুত্রের পিতৃপরিচয় উদ্ধারে ব্যর্থ হলেন, তখন সকলেই 'সালিম' নামের সঙ্গে 'মাওলা আবী হুযাইফা' (আবু হুযাইফার মুক্তদাস) যোগ করে দিলো। তখন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি 'সালিম মাওলা আবী হুযাইফা' নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন।

***

তবে আবু হুযাইফা এবং সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার মধ্যকার সম্পর্কটি দাস ও মনিবের মতো ছিল না। ছিল ভাইয়ের সঙ্গে

ভাইয়ের মতো গভীর ও অকৃত্রিম বন্ধন। দীন ইসলাম তাদের দু'টি হৃদয়কে গেঁথে রেখেছিল একই চেতনায় আর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস তাদের দুইটি অন্তরকে আবদ্ধ করে দিয়েছিল ঈমানী ভ্রাতৃত্বের গভীর বন্ধনে।

আবু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চাইলেন তাদের দুইজনের সম্পর্কের গভীরতা আরও বৃদ্ধি পাক। দূর হোক প্রচলিত বংশমর্যাদার মিথ্যা অহংকার, মুছে যাক শ্রেণিবৈষম্য ও মানুষে মানুষে উঁচু নীচুর ভেদাভেদ। সাম্যের ধর্ম ইসলাম যেগুলোর কবর রচনা করে দিয়েছে।

সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি নিজের কুরাইশী, আবদে শামসীয়া উচ্চবংশীয়া ভাতিজিকে সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

ফলে এককালের ক্রীতদাস সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি এতদিন ছিলেন তার শুধু একজন দীনি ভাই, এখন থেকে তিনি হবেন তার একজন নিকটাত্মীয়ও।

***

এর অল্প কিছুকাল পরেই কুরাইশীদের জুলুম, নির্যাতনের ভয়াবহ ঘটনাবলি ওই দুই ভাইকে আলাদা করে দিলো। শুরুতে ইসলাম গ্রহণকারী অগ্রণী মুসলিমদের মতোই সীমাহীন কষ্ট ভোগ করার পর জালেমদের অত্যাচার থেকে ঈমান, আকীদা ও দীন রক্ষার উদ্দেশ্যে এক সময় আবু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাবাশায় হিজরত করলেন।

পক্ষান্তরে সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভাবলেন অন্য কথা। তিনি ভাবলেন, আল্লাহর নবী থেকে যাচ্ছেন মক্কায়। কুরআন নাজিল হতে থাকবে এখানেই। সুতরাং তিনি কুরআন আঁকড়ে ধরে রাসূলের কাছাকাছি মক্কায় পড়ে থাকাকেই প্রাধান্য দিলেন। যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যখন যে আয়াত নাজিল হবে, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তা

শিখতে পারেন এবং আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ বিনীতভাবে তিলাওয়াত করতে পারেন।

অবতীর্ণ মোট সূরাগুলো তিনি মুখস্থ করে নেন। গভীর চিন্তা ও গবেষণা করেন, আবেগ ও ভাবনা দিয়ে কুরআনের সূরাসমূহের তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে থাকেন। এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তিনি পরিণত হন কুরআনের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের মাঝে অন্যতম। হয়ে উঠেন সেই চার ভাগ্যবানের একজন যাদের কাছে কুরআন শেখার নির্দেশনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'তোমরা শেখার উদ্দেশ্যে চার ব্যক্তির কাছে কুরআনের তিলাওয়াত শুনতে চেয়ো :

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ
২. সালিম মাওলা আবী হুযাইফা
৩. উবাই ইবনে কাআব
৪. মুআয ইবনে জাবাল, রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাঈন।

***

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমও সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই শ্রেষ্ঠত্ব সব সময়ই মানতেন। কুরআনের হিফয ও এর নিখুঁত তিলাওয়াত, এর অর্থ, ব্যাখ্যা ও গভীর তাৎপর্য উপলব্ধিতে তার বিশেষজ্ঞতাও ছিল তাদের মাঝে সর্বজনস্বীকৃত।

মক্কা থেকে মুসলিমগণ যখন হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন...

সেখানের সকলেই তাদের নামাযের ইমাম হওয়ার জন্য আহ্বান করলেন সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে। ফলে তখন থেকেই তিনি তাদের নামায পড়াতে থাকলেন যতদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় না পৌঁছলেন। অথচ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুসহ শীর্ষ সাহাবায়ে কেরামের বড় একটি দল।

আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় হিসাবে হিজরতের পর সালিম এবং আবু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার মাঝে আবারও সাক্ষাৎ হয়ে গেল এবং তারা দুইজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বদর যুদ্ধের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সমবেত হলেন।

মুসলিম বাহিনী যেই মুহূর্তে মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সেই সময় সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ভাই আবু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উদ্দেশ্যে বললেন,

'আবু হুযাইফা, ওই দেখুন আপনার পিতা উতবা ইবনে রাবীআ চিরতরে ইসলাম ও মুসলিমদের খতম করে দেওয়ার লক্ষ্যে সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন।'

আবু হুযাইফা বললেন,

'হ্যাঁ, দেখেছি। তুমি আল্লাহর ওই দুই দুশমনকে দেখো, আমার চাচা শাইবা ইবনে রাবীআ আর ভাই ওয়ালীদ ইবনে উতবা কীভাবে বাবার ডানে-বামে দাঁড়িয়েছে...

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমি এখনই তিনটাকে এক এক করে খতম করে দিতাম অথবা প্রসন্ন হৃদয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যেতাম।'

***

বদর যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হলো তখন আবু হুযাইফা এবং সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা নিহতদের লাশ দেখতে লাগলেন। হঠাৎ করেই তারা দেখলেন আবু হুযাইফার পিতা উতবা, চাচা শাইবা এবং ভাই ওয়ালীদের লাশ। সকলেই তারা নিহত হয়েছে। আবু হুযাইফা ওই লাশগুলো দেখার পর বললেন,

'সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি ওদের সবাইকে খতম করে আপন নবীর চক্ষু শীতল করেছেন।'

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় যতগুলো যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, ওই দীনি দুই ভাই সেই সকল যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। দু'জন একই সঙ্গে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্যের হক আদায় করতে থেকেছেন। এভাবে চলতে চলতে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতকালে সংঘটিত 'ইয়ামামা'র যুদ্ধের সময় এসে গেল।

মহান আল্লাহর সেই কঠিন অগ্নিপরীক্ষা ও মহাফেতনার মুহূর্তে ফেতনাবাজ, ভণ্ড মুসাইলামাকে মোকাবেলার জন্য সিদ্দীকে আকবর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৎপর হয়ে উঠলেন। সকল অঞ্চলের মুসলিম উম্মাহকে ওই ইসলাম ও মুসলিমবিনাশী ভয়ংকর ফেতনার টুঁটি চেপে ধরার জন্য জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করলেন।

সালিম এবং আবু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাও আল্লাহ তাআলার দীন হেফাজতের জন্য মুসাইলামাকে খতম করার এই লড়াইয়ে শরীক হলেন।

***

ইয়েমেনের 'ইয়ামামা' অঞ্চলে মুখোমুখি হলো দুই বাহিনী। তাদের মাঝে দুইবার সংঘটিত হলো ভয়ংকর দু'টি যুদ্ধ—যার দৃষ্টান্ত যুদ্ধের ইতিহাসে খুঁজেই পাওয়া যায় না।

প্রথমবার আবু জাহালের পুত্র ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে এবং দ্বিতীয়বার খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সাহস ও বীরত্বের এমন এমন অভিনব ইতিহাস রচনা করল যার বর্ণনা দিতে অক্ষম সকল বর্ণনাকারী।

অপরদিকে মুরতাদ বাহিনী মুসাইলামাতুল কায্যাবের নেতৃত্বে এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করল যা বীরত্ব, সাহস ও আত্মত্যাগের বিচারে মুসলিম বাহিনীর তুলনায় মোটেও কম নয়।

কিন্তু উভয় যুদ্ধেই বিজয়ের পাল্লা ভারী ছিল মুসাইলামাতুল কায্যাবের পক্ষে...

দ্বিতীয়বার যুদ্ধের সময় পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ রূপ নিল যে, সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের তাঁবুতেও তারা আক্রমণ করে বসল। তছনছ করে ফেলল মুসলিম বাহিনীর মান-মর্যাদা। এমনকি তারা মুসলিম সেনাপতির স্ত্রীকেও বন্দী করে ফেলত যদি তাদেরই একজন এই কাজে ভীষণ বিরোধিতা না করত।

***

এবার মুসলিম সৈনিকদের হৃদয়ে আগুন জ্বলে উঠল। আত্মাভিমান ও আত্মমর্যাদাবোধ টগবগিয়ে উঠল তাদের বুকের মধ্যে। তাদের ভেতর থেকেই গর্জে উঠলেন কয়েকজন দুর্ধর্ষ বীর যোদ্ধা। জান্নাতের অনন্ত অসীম জীবন লাভের আশায় দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিলেন, যা আজ হোক কাল হোক খতম হবেই।

সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেনাদলের সমস্যা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধান করলেন। নতুনভাবে সেনাদল পুনর্গঠন করলেন। মুহাজির দলের পতাকা তিনি অর্পণ করলেন আবু হুযাইফার মুক্তদাস সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে।

আনসার বাহিনীর পতাকা দিলেন সাবেত ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে।

পুনর্গঠিত ও নতুন চেতনায় উজ্জীবিত সেনাদলের এক মুহাজির সৈনিক যায়েদ ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গী সৈনিক ভাইদের মরণ কামড় দিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতে অনুপ্রেরণা দিয়ে বললেন,

'সৈনিক ভাইয়েরা! দাঁতে দাঁত কামড়ে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে থাকো। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো। কোনোভাবে পিছপা হোয়ো না।

আমার সঙ্গী মুজাহিদ ভাইয়েরা, আজকের এই মুহূর্তের পর আমি আর কখনো একটি শব্দও উচ্চারণ করব না আল্লাহর নামে আমি এই শপথ করলাম। আজ হয়তো মুসাইলামা ও তার দলবলের পরাজয় হবে, নয়তো আমার জীবন যাবে। আমি শহীদ হয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার সর্বশক্তি উৎসর্গের কথা তাঁকে বলব।'

এই কথা বলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুবাহিনীর ওপর। এক এক করে তাদের সারি ভেদ করে শত্রুসৈন্যদের গর্দানে তরবারি চালাতে চালাতে এক সময় তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

তারই পথ অনুসরণ করে এবার সৈনিকদের সামনে এগিয়ে এলেন আবু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি সৈনিকদের সকলকে সম্বোধন করে বললেন,

'হে কুরআনের সেনাদল, তোমরা কুরআনের পথনির্দেশ মেনে চলো। কুরআনের আলোয় জীবনের সকল অঙ্গনকে আলোকিত ও সজ্জিত করে তোলো।'

এই কথা বলেই তিনি ঝড়ের গতিতে দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুঃসাহসী বীরের মতো শত্রুদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন।

আবু হুযাইফার মুক্তদাস সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুহাজির সৈনিকদের উদ্দেশে বললেন,

'হে কুরআন প্রেমিক সেনাদল, আমার দিক দিয়ে যদি মুসলিম সেনাদল আক্রান্ত হয়, তাহলে বুঝে নিয়ো কুরআনপ্রেমিক হিসাবে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ এই পৃথিবীতে আর একটিও নেই।'

এই কথা বলেই তিনি মুহাজির বাহিনীর পতাকা সমুন্নত করে রণাঙ্গনে ঢুকে পড়লেন। শত্রুদের আক্রমণে এক সময় তার ডান হাত কাটা পড়ে গেল। বাম হাত দিয়ে তিনি পতাকা উঁচিয়ে রাখলেন। এক সময় তার বাম

হাতও কাটা গেল। তখন তিনি দুই বাহু দিয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ইসলামী ঝান্ডার পতন ঠেকিয়ে রাখলেন...

কিন্তু কর্তিত দুই হাতসহ সকল জখম দিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। জমিনে পড়ে রইল রক্তমাখা এক ক্ষতবিক্ষত খুনরাঙা নিস্প্রাণ দেহ।

***

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রণাঙ্গনে পড়ে থাকা আহত ও নিহতদের নিরীক্ষণ করতে করতে গিয়ে দাঁড়ালেন সালিম মাওলা আবী হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পাশে। সে সময় তিনি ছিলেন জীবনের অন্তিম মুহূর্তে। সেনাপতিকে পাশে পেয়ে তিনি জানতে চাইলেন,

'হে খালিদ, মুসলিম মুজাহিদদের খবর কী?'

তিনি উত্তরে বললেন,

'আল্লাহর রহমতে তারা ভণ্ড মুসাইলামাকে হত্যা করে তার দলবলকে পরাজিত করেছে।'

সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

'আমার ভাই আবু হুযাইফার কী খবর?'

সেনাপতি বললেন,

'তোমার ভাই ভীরু-কাপুরুষ নন, একজন দুঃসাহসী মরদে মুজাহিদ হিসাবে লড়াই করে শাহাদাতের অসীম মর্যাদায় ভূষিত হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেছেন।'

সালিম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবনের শেষ ইচ্ছা জানিয়ে সেনাপতিকে বললেন,

'আমাকে দয়া করে আমার ভাইয়ের পাশে নিয়ে শুইয়ে দিন।'

সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বললেন,

'তোমার এই অন্তিম ইচ্ছা আল্লাহ আগেই পূর্ণ করে রেখেছেন। তোমার ভাইয়ের দেহ দূরে নয়, তোমার পায়ের কাছেই আছে। তোমরা দুই ভাই একদম কাছাকাছি ও পাশাপাশি রয়েছ।'

এই কথা শুনে এক বুক প্রশান্তিতে তিনি চোখ বুজলেন আর বলতে থাকলেন,

'হে আমার ভাই আবু হুযাইফা, এখানে এই দুনিয়ায় আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাশাপাশিই ছিলাম। ইনশাআল্লাহ জান্নাতেও আমরা থাকব পাশাপাশিই।'

এরই সঙ্গে তিনি ত্যাগ করলেন শেষ নিঃশ্বাস।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৩০৫২।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা।
৪. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।
৫. *হায়াতুস সাহাবা*, সূচি দ্রষ্টব্য।
৬. *আস-সীরাহ* লিবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ১২৩, ৩৩৪ এবং সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

আমর ইবনুল আস

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

আমর ইবনুল আস দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার সম্পর্কে মহান নবীর মন্তব্য, বিলম্বিত লোকগুলোও ইসলাম কবুল করেছে। অবশেষে ঈমান এনেছে আমর ইবনুল আস।

'হে আল্লাহ, তুমি ভালো কাজের নির্দেশ দিয়েছ, তা না করে তোমার অবাধ্য হয়েছি ...

মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছ, অথচ আমরা সেটাও মেনে চলিনি...

ওগো দয়ালু ক্ষমাশীল প্রভু, একমাত্র তোমার ক্ষমা ছাড়া যে আর কোনো গতি নেই।'

এই ব্যাকুল আশা ও বিগলিত প্রার্থনার মাধ্যমে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইহজীবনকে বিদায় জানিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

***

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনের রয়েছে এক বর্ণাঢ্য ও বিস্তৃত কাহিনি...

তিনি আপন জীবনে দু'টি বৃহৎ ও জনবহুল অঞ্চল মিসর ও ফিলিস্তীনকে এনে দেন ইসলামী শাসনের অধীনে...

আর মুসলিম জাতির জন্য রেখে গেছেন এমন এক সমৃদ্ধ জীবন যা যুগ যুগ ধরে বিশ্বজুড়ে মানুষের মুখে মুখে আলোচিত ও জীবন্ত।

***

এই কাহিনির সূচনা অর্থাৎ আমর ইবনুল আসের জন্ম হয় হিজরতের প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্বে আর সমাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে তেতাল্লিশ হিজরীতে।

তার পিতার নাম আস ইবনে ওয়াইল। যিনি জাহেলী যুগের একজন নামকরা নেতা। একজন বিখ্যাত সরদার। তা ছাড়া তিনি ছিলেন সেই সকল মানুষের অন্তর্ভুক্ত যাদের বংশধারা গিয়ে মিলিত হয় কুরাইশের সর্বোচ্চ মর্যাদার শাখায়।

আর তার মা? তিনি অবশ্য উল্লেখ করার মতো তেমন কেউ ছিলেন না। ছিলেন একজন ক্রীতদাসী।

মায়ের এই বিষয়টিকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত আমর ইবনুল আসের বিরোধীপক্ষ। তিনি যখন শাসকের আসন অলংকৃত করে বসতেন অথবা বক্তৃতার উদ্দেশ্যে উঁচু মঞ্চে আরোহণ করতেন, তখন ওই বিরোধী হিংসুকের দল মায়ের প্রসঙ্গ তুলে তাকে বিব্রত করত।

এমনকি এক হিংসুক তো বেশ কিছু অর্থকড়ির প্রলোভন দেখিয়ে এক লোককে ভাড়া করল, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মিম্বরে বসলে তার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে হবে।

চুক্তি অনুসারে লোকটি গিয়ে ভরা মজলিসে বলে বসল,

'আমি গভর্নরের মায়ের পরিচয় জানতে চাই।'

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বহু কষ্টে ভেতরের রাগ দমন করলেন। বাহিরে নিজেকে স্বাভাবিক রেখে সহনশীলতার

পরিচয় দিলেন। এবং চরম বিচক্ষণতা ও কৌশল প্রয়োগ করে ভাড়া করা লোকটির উদ্দেশে বললেন,

'আমার মায়ের নাম নাবিগা, তার বাবার নাম আব্দুল্লাহ।

জাহেলী যুগের একদল দস্যু আক্রমণ করে আমার মায়ের পরিবারে। পরে তারা আমার মাকে উকায বাজারে বিক্রি করে দেয়। তাকে কিনে নেয় আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআন এবং হাদিয়াস্বরূপ দান করেন আস ইবনে ওয়াইলকে (তার পিতা)।

আর সেখানেই তিনি জন্ম দেন এক পুত্রসন্তান... আমর ইবনুল আসকে।

আজ আমাকে দেখে যাদের অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলতে থাকে তাদের কেউ যদি আপনাকে অর্থকড়ির প্রলোভন দিয়ে এখানে পাঠিয়ে থাকে, তাহলে নিঃসংকোচে আপনি গ্রহণ করুন তাদের অর্থ।'

***

মক্কার নির্যাতিত মুসলিম জাতি যখন কুরাইশের চরম নির্যাতন ও ভয়াবহ উৎপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য হাবাশার উদ্দেশে হিজরত করলেন এবং সেই দেশে স্বাধীন ও মুক্তভাবে বসবাস করতে থাকলেন, তখন কুরাইশের জুলুমবাজ নেতারা পরিকল্পনা করল তাদের আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনার এবং তাদের আবারও নানাভাবে শাস্তি ও নির্যাতনের মুখোমুখি করার। আর এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তারা বাছাই করল আমর ইবনুল আসকে। কারণ, তার ও হাবাশার বাদশাহ 'নাজাশী'র মাঝে ছিল পুরোনো বন্ধুত্ব।

কুরাইশ নেতারা নাজাশী এবং তার সভাসদবৃন্দের পছন্দীয় বিভিন্ন উপহারসামগ্রী দিয়ে আমর ইবনুল আসকে হাবাশায় পাঠাল।

তিনি হাবাশায় নাজাশীর কাছে পৌঁছার পর প্রাণখুলে বাদশাহকে অভিবাদন জানিয়ে তার উচ্চমর্যাদা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করার পর তাকে জানালেন,

‘মহামান্য বাদশাহ নামদার!

আমাদের কওমের কিছু লোক পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে এক নতুন ধর্মের আবিষ্কার করেছে। মক্কার সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এখন তারা আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আমাকে আপনার কাছে এই আবেদন জানিয়ে পাঠিয়েছে যে, আপনি দয়া করে ওদেরকে কওমের নেতৃবৃন্দের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিন, যেন আবার পূর্বপুরুষের ধর্মে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া যায়।’

আমর ইবনুল আসের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নাজাশী কয়েকজন সাহাবীকে ডেকে পাঠালেন। তাদের কাছে তাদের দীন সম্পর্কে জানতে চাইলেন যা তারা পালন করে। জানতে চাইলেন তাদের মাবুদ সম্পর্কে—যাকে তারা বিশ্বাস করে এবং তাদের সেই নবী সম্পর্কে যিনি এই দীন নিয়ে এসেছেন।

এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সাহাবীদের বক্তব্য শুনে নাজাশীর মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল। বিশ্বাস আর প্রশান্তিতে হৃদয় ভরে গেল। তাদের ধর্মের মূলবিশ্বাস ও আকীদার কথা জেনে তার এত ভালো লাগল যে, তাদের ধর্মের প্রতি তার গভীর আস্থা, ভক্তি ও ভালোবাসা জন্ম নিল এবং ওই ধর্মের অনুসারীদের সকলকেই নিজের খুব আপন মনে হলো।

সে কারণেই বাদশাহ আমর ইবনুল আসের কাছে তাদের হস্তান্তর করার প্রস্তাব অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। শুধু তা-ই নয়, তার পছন্দনীয় সকল উপহারও ফেরত দিয়ে দিলেন।

***

আমর ইবনুল আস যখন সেখান থেকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন, তখন নাজাশী বিস্ময় প্রকাশ করে তাকে বললেন,

‘হে আমর ইবনুল আস, তোমার এত দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা সত্ত্বেও কীভাবে ‘মুহাম্মাদ’ এর সত্যতা ও তার দীন ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে অক্ষম হলে?

আল্লাহর কসম! তিনি বিশেষভাবে তোমাদের এবং ব্যাপকভাবে সারা বিশ্বের মানুষের জন্য আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবী এ কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

আমর ইবনুল আস আশ্চর্য হয়ে বললেন,
'মহামান্য বাদশাহ, আপনি কি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত?'

নাজাশী আগের চেয়ে বেশি জোর দিয়ে বললেন,
'আল্লাহর কসম! একেবারে একশো ভাগ নিশ্চিত... সে জন্যই তোমার কাছে আমার অনুরোধ হে আমর, আর দেরি কোরো না, সোজা গিয়ে মুহাম্মাদ ও তার সত্য দীন মেনে নাও, ইসলাম কবুল করে নাও।'

***

আমর ইবনুল আস নাজাশীকে বিদায় জানিয়ে হাবশা ত্যাগ করলেন। মক্কার উদ্দেশে চলছিলেন কিন্তু তার মনের মধ্যে তখন চলছিল চরম দ্বিধাদ্বন্দ্ব। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে, তিনি কী করবেন, কোন দিকে যাবেন। নাজাশীর কথাগুলো তার অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মুহাম্মাদ ও তার সত্য ধর্ম সম্পর্কে তার জোরালো মন্তব্য তাকে মুহাম্মাদের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

কিন্তু মুহাম্মাদের কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য তার কপালে জুটতে জুটতে অনেক সময় পেরিয়ে গেল। অষ্টম হিজরীতে গিয়ে তার সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব মিটে গেল। আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিলেন ইসলাম কবুলের জন্য।

তিনি দ্রুতগতিতে ছুটে যেতে থাকলেন মদীনার উদ্দেশে, রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার জন্য।

পথিমধ্যে তার সাক্ষাৎ হলো খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং উসমান ইবনে তালহার সঙ্গে। তার মতোই তাদেরও গন্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল একই। সে কারণে তিনি ওই দু'জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে যেতে থাকলেন।

রাসূলের কাছে পৌঁছার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং উসমান ইবনে তালহা তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণের কঠিন শপথ নিলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মুবারক হাত বাড়িয়ে দিলেন আমর ইবনুল আসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমর তখন নিজের হাত টেনে নিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হয়ে বললেন,

'কী ব্যাপার আমর! হাত গুটিয়ে নিলে কেন?'

তিনি জবাব দিলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক শর্তে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারি, আমার ইতিপূর্বের সকল পাপের মার্জনা হতে হবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভয় দিয়ে বললেন,

اِنَّ الْاِسْلَامَ وَالْهِجْرَةَ يَجُبَّانِ مَا قَبْلَهُمَا

'ইসলাম এবং হিজরত পূর্বের সকল পাপ মুছে দেয়।'

এ কথা শুনে তিনি আনন্দের সঙ্গে তাঁর মুবারক হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণের বাইআত করলেন।

এই ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে গেলেও আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হৃদয়ে এর এক গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেল। তাই তিনি সব সময় বলতেন,

'আল্লাহর কসম! আমি লজ্জায় কখনো রাসূলের চোখে চোখ মেলে তাকানোর সাহস পাইনি। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, আমি দু'চোখ ভরে তাঁর চেহারা মুবারক দেখার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি।'

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি তাকিয়ে ছিলেন নবীসুলভ নূরানী দৃষ্টি দিয়ে। যার ফলে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তার

বিরল প্রতিভা। ধরতে পেরেছিলেন তার অনন্য সাধারণ যোগ্যতা। সে কারণেই নবীজি তাকে 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, অথচ সেই বাহিনীতে ছিলেন মুহাজির, আনসার ও অগ্রণী মুসলিমদের শীর্ষ সাহাবায়ে কেরাম।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ওফাত হয়ে গেল এবং খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হলো সিদ্দীকে আকবর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর, তখন মুরতাদ-বিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পালন করেন অসাধারণ ভূমিকা।

ইসলাম ত্যাগের সেই ফেতনার বিরুদ্ধে তিনি গ্রহণ করেন এমন দৃঢ় অবস্থান যা স্মরণ করিয়ে দেয় আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দৃঢ়তাকে।

আমের গোত্রে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার মেহমান হলেন। সেই সময় সেই গোত্রপ্রধান কুররা ইবনে হুবাইরা মুরতাদ হওয়ার ইচ্ছা থেকে তার কাছে এসে অভিযোগ জানালেন।

'হে আমর, তোমরা আরবদের ওপর যে করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ (অর্থাৎ যাকাত), সেটাকে তারা খুশিমনে গ্রহণ করতে পারেনি।

অতএব, তোমরা যদি তাদেরকে এই করের দায় থেকে মুক্ত করে দাও, তাহলে তারা মনপ্রাণ দিয়ে তোমাদের সকল কথা শুনবে এবং প্রতিটি কথায় আনুগত্য প্রকাশ করবে।

আর যদি তোমরা এটা করতে অস্বীকার করো, তাহলে মনে রেখো আরবরা আর কখনোই তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না।'

এসব কথা শোনার পর আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমের গোত্রের প্রধানকে ধমক দিয়ে বললেন,

‘আরে কপাল পোড়া কুররা, তুই কি কাফের হয়ে গেলি? আর আরবরা মুরতাদ হয়ে যাবে বলে কি আমাদের ভয় দেখাতে চাস?

মনে রাখিস তোর মতিগতি যদি ঠিক না হয়, তাহলে আল্লাহর কসম! তুই পাতালে লুকিয়ে থাকলেও আমি খুঁজে বের করব এবং ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করে তোকে মারব।’

***

প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে এবং মুসলিম উম্মাহর শাসনভার দিয়ে গেলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে, তখন খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আল্লাহ প্রদত্ত অনন্য সাধারণ মেধা ও প্রতিভাকে, তার দক্ষতা ও বিচক্ষণতাকে ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণে ব্যবহার করলেন।

এর ফলে তারই হাতে আল্লাহ তাআলা ফিলিস্তীন ও এর আশপাশের শহরগুলো একের পর এক বিজয় দান করলেন।

একের পর এক রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে অবশেষে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধে এগিয়ে গেলেন।

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৃতীয় পবিত্রতম ভূমি ও প্রথম কিবলার এই অবরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুললেন, তখন রোমান বাহিনীর প্রধান সেনাকর্তা ‘আরইয়াতুন’ এর হৃদয়ে হতাশা জেঁকে বসল, যা তাকে বাধ্য করল এই পবিত্র ভূমির নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে। এতে ‘আল-কুদস’ এর কর্তৃত্ব আবারও ফিরে এল মুসলিম জাতির হাতে।

এই পর্যায়ে সেখানে খ্রিষ্টধর্মীয় প্রধান ধর্মগুরু আগ্রহ ব্যক্ত করলেন যে, এই পবিত্র ভূমির হস্তান্তর প্রক্রিয়া আমরা মুসলিম জাহানের খলীফা স্বয়ং উমরের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করতে চাই।

তাই আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিঠি লিখে খলীফাকে আমন্ত্রণ জানালেন বাইতুল মুকাদ্দাস হস্তান্তর অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে নিজ হাতে এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে। যথারীতি খলীফা সেখানে হাজির হয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে বাইতুল মুকাদ্দাস ক্রুসেড বাহিনীর হাত থেকে দখল মুক্ত করে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে বুঝে নেওয়ার দলিল স্বাক্ষর করলেন।

এভাবেই আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে পনেরো হিজরীতে 'আল-কুদস' বা পবিত্র ভূমির নিয়ন্ত্রণ মুসলিম জাতির হাতে এসে গেল।

উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ এবং সেখানে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অসাধারণ কৃতিত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই তিনি বলতেন,

لَقَدْ رَمَيْنَا اَرْيَطُوْنَ الرُّوْمِ بِاَرْيَطُوْنِ الْعَرَبِ

'আমরা রোমান পণ্ডিতকে পরাজিত করেছি আরব পণ্ডিতের সাহায্যে।'

অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল বিশাল বিজয় অর্জন করেছিলেন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তা সত্ত্বেও তাকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা হয় 'মিসর বিজেতা' হিসাবে। সমৃদ্ধ মিসর জয় করে এই ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটিকে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তও করেছিলেন ইতিহাসের এই মহানায়ক।

আর এরই মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীর সামনে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল আফ্রিকা মহাদেশ, পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ এবং স্পেন জয়ের সবগুলো পথ।

ওইসব পথ ধরেই মুসলিম বাহিনী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ওই অঞ্চলসমূহ দখলে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

***

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য এখানেই শেষ নয়। তিনি ছিলেন আরবের বিখ্যাত এক কৌশলী। ছিলেন ক্ষণজন্মা এক বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। তার প্রখর মেধা ও অসাধারণ কৌশলের এক আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছিল মিসর জয়ের পথে।

তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পেছনে লেগেছিলেন মিসর অভিযানের অনুমতির জন্য। তিনি দু'একদিন পরপরই খলীফার কাছে অনুমতি চান আর খলীফা সেটা নাকচ করে দেন। এভাবেই নাছোড়বান্দা আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পীড়াপীড়িতে একদিন খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই অনুমতি দিয়েই দিলেন। চার হাজার মুসলিম সৈনিক দিয়ে তাকে রওনা করে দিলেন।

অনুমতি পাওয়ার পর এই সৈনিকদের নিয়ে তিনি আর কোনো দিক তাকালেন না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে থাকলেন। পক্ষান্তরে তিনি রওনা করার অল্প সময় পরেই খলীফার দরবারে এসে উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আমীরুল মুমিনীন,

আমর ইবনুল আস একজন বেপরোয়া ও দুঃসাহসী যোদ্ধা। নেতৃত্বের প্রবল আগ্রহও তার মধ্যে বিদ্যমান। এ কারণেই আমার আশঙ্কা যে, হয়তো সে জরুরি প্রস্তুতি ছাড়াই মিসরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে। ফলে হয়তো সে মুসলিম সৈনিকদের বিপদের মধ্যে ঠেলে দেবে।'

এসব কথা শুনে খলীফা উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাঁর মনে হলো আমর ইবনুল আসকে মিসর অভিযানের অনুমতি না দিলেই ভালো হতো। এরপর একটি চিঠি দিয়ে খুব দ্রুত একজন দূত পাঠিয়ে দিলেন।

***

এই দূত মুসলিম বাহিনীকে ধরতে পারল ফিলিস্তীনের 'রাফা' অঞ্চলে গিয়ে। সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন জানতে পারলেন যে, খলীফার চিঠি নিয়ে দূত এসেছে, তিনি চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে উৎকণ্ঠা ও শঙ্কা অনুভব করলেন। তার মনে হলো চিঠিটা তার জন্য সুবিধাজনক হবে না।

তিনি কৌশলে পরিস্থিতির মোকাবেলা করলেন। তৎক্ষণাৎ দূতকে সাক্ষাতের অনুমতি না দিয়ে দ্রুতগতিতে মিসর সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করলেন। এরপর দূতকে ডেকে তার থেকে খলীফার চিঠি নিয়ে দেখলেন তাতে লেখা আছে,

'মিসর প্রবেশের পূর্বেই যদি আমার চিঠি পেয়ে যাও, তাহলে ফিরে আসবে নিজের ঠিকানায়। আর যদি মিসরে প্রবেশ করার পর এই চিঠি পাও, তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করে সামনে অগ্রসর হও।'

তিনি সৈনিকদের ডেকে খলীফার চিঠি পড়ে শোনানোর পর বললেন,

'আপনারা কি জানেন যে, এখন আমরা সকলে মিসরের ভূমিতেই অবস্থান করছি?'

সবাই একবাক্যে জবাব দিলেন,

'জি, হ্যাঁ।'

তখন তিনি বললেন,

'তাহলে আমাদের এখন আল্লাহর উপর ভরসা করে সামনেই এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

তিনি বাহিনীকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন এবং তার হাতেই আল্লাহ তাআলা মিসরকে মুসলিম শাসনাধীন করে দিলেন।

***

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রখর বুদ্ধি ও কৌশলের আরও একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ,

তিনি মিসরের একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ অবরোধ করলেন। অবরুদ্ধ রোমান সেনাপতি মুসলিম সেনাপতির কাছে আবেদন জানালেন যে, পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার জন্য একজন দূত পাঠান।

এই আলোচনা ও সমঝোতার জন্য কোনো কোনো সৈনিক নিজেকে পেশ করলেন। কিন্তু সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আমার বাহিনীর পক্ষ থেকে দূত হিসাবে আমিই যাব ওখানে।'

তিনি চলে গেলেন রোমান সেনাপতির কাছে। মুসলিম সেনাপ্রধানের পাঠানো দূত হিসাবে তিনি দুর্গে প্রবেশ করলেন।

***

আমর ইবনুল আসের সেনাপতির পরিচয় না জেনে রোমান সেনাপতি তার মুখোমুখি হলো। তাদের দু'জনের মাঝে অনেক কথা হলো, আলোচনা চলল। যা থেকে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তা ও বিরল প্রতিভার প্রকাশ ঘটল। সে আলোচনা থেকে রোমান সেনাপতি ভালোভাবে বুঝতে পারল যে, এই সৈনিকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার কত বেশি সমৃদ্ধ। রোমান সেনাপতি একজন সাধারণ মুসলিম সৈনিকের এত তীক্ষ্ণ মেধা, প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার খবর পেয়ে মনে মনে ভীষণ ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল। এবং মনে মনে তাকে হত্যার পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলল। কিন্তু বাহিরের আচরণে প্রকাশ করল সম্পূর্ণ আলাদা রূপ। সে আমর ইবনুল আসকে প্রচুর দামি উপহারসামগ্রী দিয়ে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল। আর গোপনে গোপনে দুর্গের প্রহরীদের হুকুম দিয়ে রাখল, যেন তাকে দুর্গ থেকে বের হওয়ার আগেই হত্যা করা হয়।

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিদায় নেওয়ার পর প্রহরীদের চোখ দেখেই বুঝে গেলেন। তাদের মনের ভেতরের হত্যার

ইচ্ছাটা তিনি তাদের চোখের ভাষায় পড়ে ফেললেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেনাপতির কাছে ফিরে এসে বললেন,

'মহামান্য সেনাপতি আমার জন্য যেসব দামি উপহারসামগ্রী দান করেছেন, তা দেখে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, আপনার সদয় অনুমতি পেলে আমি আরও দশজন সৈনিককে নিয়ে আসতে চাই যেন তারাও আপনার দামি উপহার পেয়ে আনন্দ লাভ করতে পারেন।'

এই কথা শুনে রোমান সেনাপতি আনন্দে আটখান হয়ে গেলেন। মনে মনে বললেন,

'এর চেয়ে বড় সুযোগ আর কী হতে পারে? আমি মাত্র একটা শত্রুকে খতম করতে চেয়েছিলাম কিন্তু এখন তো দেখছি নিজ উদ্যোগে দশটা এসে হাতে ধরা দিতে চায়...'

তিনি দুর্গের প্রহরীদের ইঙ্গিত করলেন যেন তাকে যেতে দেওয়া হয়।

এভাবেই রোমান সেনাপতির ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়ে প্রাণ হারানো থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

মিসর যখন সম্পূর্ণরূপে বিজিত হলো এবং মুসলিম বাহিনী এর নিয়ন্ত্রণভার বুঝে নিল, তখন হঠাৎ রোমান সেনাপ্রধান মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধান আমর ইবনুল আসের সামনাসামনি হয়ে পড়ল। সে অবাক হয়ে আমরকে বলল,

'আরে এ কী দেখছি! আপনিই কি সেনাপতি নাকি?'

আমর বললেন,

'জি, আমিই সেনাপতি। সেদিন আপনার সেই হত্যাপরিকল্পনা সত্ত্বেও এটাই বাস্তব যে, আপনার ষড়যন্ত্র সফল হলে একজন মুসলিম সেনাপতিই নিহত হতো।'

***

এতকিছু সত্ত্বেও আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আরও একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই, তিনি ছিলেন খুবই স্পষ্ট ও মিষ্টিভাষী এক তুখোর বক্তা।

এমনকি উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমর ইবনুল আসের সুমিষ্ট, সুস্পষ্ট ভাষার কথা ও তুখোর বক্তব্যকে মনে করতেন—মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার একটি নিদর্শন।

কারোর কথায় জড়তা অথবা তোতলামো দেখলে খলীফা বলতেন,

'আমি মহান আল্লাহকে অসীম ক্ষমতাবান হিসাবেই বিশ্বাস করি...
এত তোতলা লোকটির সৃষ্টিকর্তা আর দুর্দান্ত বাগ্মী আমর ইবনুল আসের সৃষ্টিকর্তা একই। তিনি সবকিছু করতে পারেন।'

আমর ইবনুল আসের একটি অমূল্য বাণী,
'মানুষ তিন ধরনের, পূর্ণ, অর্ধ ও শূন্য।

পূর্ণ মানুষ সেই ব্যক্তি, যার দীনদারি ও জ্ঞানবুদ্ধি দু'টোই পূর্ণাঙ্গ। এর ফলে তিনি যেকোনো কাজের পূর্বে চিন্তাশীল ও জ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাই সর্বদা আল্লাহর রহমত পান এবং সফল হন।

অর্ধ মানুষ সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানবুদ্ধি ও দীনদারিতে পূর্ণতা দান করলেও সে কোনো কাজেই কারোর সঙ্গে পরামর্শ করে না। তার মনোভাব এই, আরে এমন মানুষ কোথায় আছে যার কথা মেনে চলা যায়? নিজের মত ছেড়ে যার মত গ্রহণ করে নেওয়া যায়? নিজের ইচ্ছায় চলার কারণে সে কখনো ঠিক করে আবার কখনো ভুলভ্রান্তি করে।

শূন্য মানুষ হলো সেই ব্যক্তি, যার দীনদারিও নেই জ্ঞানবুদ্ধিও নেই। সে সব সময় ভুলের মধ্যেই থাকে। ব্যর্থতা আর বিফলতাই হয়ে যায় তার চিরসঙ্গী।

আমি নিজে প্রতিটি কাজে অন্যের পরামর্শ নিয়ে থাকি। এমনকি প্রয়োজন হলে আমার ক্রীতদাসদের সঙ্গেও পরামর্শ করে থাকি।'

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন খুব অসুস্থ হয়ে বিছনায় পড়ে গেলেন এবং অনুভব করলেন যে, মৃত্যু তার খুবই নিকটবর্তী, সে সময় তার দু'চোখ বেয়ে ঝরতে লাগল অশ্রুর প্লাবন। তিনি পুত্রকে ডেকে বললেন,

'আমি যতটুকু বুঝি, আমার জীবনের ছিল তিনটি অবস্থা। প্রথম অবস্থায় ছিলাম কাফের, তখন মারা গেলে জাহান্নাম হতো আমার জন্য অবধারিত।

এর পরের অবস্থায় আমি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণের শপথ নিয়েছি। সে সময় আমি রাসূলের সামনে ছিলাম ভীষণ লজ্জিত। তাঁর জীবদ্দশায় কখনোই আমি সেই লজ্জার কারণে তাঁর দিকে সোজাসুজি চোখ মেলে তাকাতে পারিনি। জীবনের সেই দ্বিতীয় অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে গেলে সকলেই বলাবলি করত, আমর বড়ই ভাগ্যবান, ভালোভাবে ইসলাম গ্রহণ করে ভালোভাবেই মৃত্যুবরণ করেছে।

এরপর এসেছে আমার জীবনের তৃতীয় ও শেষ অবস্থা। এ সময় আমি বেশকিছু বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। জানি না সেগুলোর কারণে আমি লাভবান হব নাকি ক্ষতিগ্রস্ত?'

এই কথাগুলো বলার পর তিনি দেয়ালের দিকে ফিরে বলতে থাকলেন,

'হে আল্লাহ, তুমি যেগুলো করার নির্দেশ দিয়েছ, সেগুলো না করে তোমার অবাধ্য হয়েছি। তুমি যা নিষেধ করেছ সেই নিষেধ অমান্য করেও তোমার নাফরমান হয়েছি।

ওগো দয়ালু আল্লাহ, তোমার ক্ষমা ছাড়া আর কোনো গতি নেই।'

এরপর গলায় হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর কোনো শক্তিধর নেই, যার কাছে সাহায্য চাইব...

তুমি ছাড়া তো আর কোনো নির্দোষ নেই যার কাছে আমার ওযর পেশ করব...

আমি তো নই অহংকারী...

আমি শুধুই ক্ষমাপ্রার্থনাকারী...

হে ক্ষমাশীল আল্লাহ, আমার সকল পাপ মাফ করে দাও।'

বারবার এই কথা কয়টি বলতে থাকলেন। বলতে বলতেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৫৮৮২।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৫০৮ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৮ম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা।
৬. *কাদাতু ফাতহি বিলাদিশ শামি ও মিসর*, ১২৩ পৃষ্ঠা।
৭. *তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী*, ২য় খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-আলাম*, ৫ম খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা।

আবু লুবাবা

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

তোমরা জেনে রাখো, সে (আবু লুবাবা) যদি আমার কাছে আসত, আমি অবশ্যই তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম...

—মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হিজরতের দুই বছর পূর্বের কথা। ইয়াসরিবের (মদীনার) মুশরিকদের অনেকগুলো কাফেলা হজ পালনের জন্য মক্কার উদ্দেশে রওনা করল।

এই কাফেলাগুলোর মধ্যে ছিল সত্তরজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার একটি কাফেলা। যারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন আগেই। এই কাফেলার প্রতিটি সদস্য মক্কার উদ্দেশে রওনা করেছেন বুকের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে, সেখানে গিয়ে মহান নবীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হবে। যিনি শাশ্বত এই দীন ইসলামের ধারক, বাহক, প্রচারক এবং যিনি এই পৃথিবীর আখেরী নবী। না দেখেই যার প্রতি এরা প্রায় সকলেই ঈমান এনেছেন।

মক্কায় পৌঁছার পরপরই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন 'আইয়ামে তাশরীকের'

(কুরবানীর ঈদের পরবর্তী তিন দিন) দ্বিতীয় দিনে তাঁর সঙ্গে সকলেই গোপন সাক্ষাতে মিলিত হবেন।

এই সাক্ষাতের স্থান হবে মিনার জামরায়ে উলার কাছে।

সময় হবে রাতের শেষ প্রহরে, যেন কুরাইশের কেউ জানতে না পারে।

শেষ রাতের গভীর অন্ধকার সবকিছুকেই গোপন করে রাখে। আর মুমিনদের অন্তর ছাড়া সে সময় সারা জগৎ থাকে গভীর ঘুমে বিভোর।

***

সেখানেই আনসারদের মধ্যে অগ্রণী মুসলিমগণ কুরাইশের আগোচরে তাদের নবীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরম সৌভাগ্যে ধন্য হলেন।

সেখানে তারা শুধু সাক্ষাৎই করলেন না, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিজেদের হাত বাড়িয়ে ধরে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের বাইআত গ্রহণ করুন। আমরা যেকোনো মূল্যে আপনার সঙ্গে করা আমাদের শপথ রক্ষা করব। কারণ, আমরা বংশ-পরম্পরায় যোদ্ধা জাতি। অস্ত্র ধরতে আমরা বিন্দুমাত্র ভয় পাই না।'

এরপর তারা নবীজির হাতে হাত রেখে এই মর্মে শপথ নিলেন যে,

'নবীজি এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন হিজরত করে মদীনায় যাবেন, তখন তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে হেফাজত করবেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা শত্রুর আক্রমণ যেকোনো অবস্থাতেই তারা যেভাবে নিজেদের জীবন, স্ত্রী ও সন্তানদের জীবন রক্ষা করে থাকেন, ঠিক সেভাবেই তাঁদেরও রক্ষা করবেন।'

এই কঠিন শপথ গ্রহণকারীদের অগ্রভাগে ছিলেন আমাদের কাহিনির মধ্যমণি আবু লুবাবা রিফাআ ইবনুল মুনযির রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

ঈমানদীপ্ত এই বাইআত গ্রহণকারীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে নবীজি তাদের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় বারোজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করলেন এবং তাদেরকে অন্য সকলের দলপতি ও মুখপাত্র বানিয়ে দিলেন।

সেই দলপতিদের মধ্যে বিশেষ একজন ছিলেন আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

***

আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই মুমিনদলের সম্মুখ সারিতে ইয়াসরিবে ফিরে এলেন, যারা মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ পেয়ে মহাখুশি, যারা নবীজির সাক্ষাৎ-সৌভাগ্য লাভে গৌরবান্বিত, বাইআতের শর্তগুলো পূরণের সংকল্পে সুদৃঢ়।

তারা মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করলেন। আরম্ভ করে দিলেন মক্কা থেকে হিজরতকারী দলসমূকে গ্রহণ করার প্রস্তুতি।

পরে এক সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে হিজরতের অনুমতি দিলেন, তখন তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু, হিজরতের সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার উদ্দেশে রওনা করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াসরিবের উঁচু উঁচু টিলা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই মদীনার সকল মানুষ এসে ভিড় করল মহান নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। সর্বশ্রেণির মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল তাদের মহান মেহমানকে এস্তেকবালের উদ্দেশ্যে।

আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন সেই অভ্যর্থনাকারীদের অগ্রভাগে।

সময় গড়াতে থাকল... এক সময় মদীনার নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত হলো।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিহাদের অনুমতি প্রদান করলেন। অনুমতি পেয়েই তিনি বদর প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

মুসলিম সৈনিকদল যখন মদীনা থেকে বের হলো আল্লাহর দুশমনদের মুখোমুখি হওয়ার উদ্দেশ্যে। শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই মুসলিম সেনাদলের সঙ্গী হয়ে আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও বদরের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন।

কিন্তু অল্প কিছুদূর যেতে না-যেতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু লুবাবাকে ডেকে বললেন,

'তুমি মদীনায় ফিরে যাও, আমার প্রতিনিধি হিসাবে মদীনায় দায়িত্ব পালন করো।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মেনে নিয়ে তিনি মদীনায় ফিরে গেলেন। শাহাদাতের সৌভাগ্য এবং জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তার অন্তরে ভীষণ পরিতাপ ও হতাশা জেগে উঠলেও তিনি কিছুই করতে পারলেন না। কারণ, এটাই রাসূলের নির্দেশ। আর তাঁর নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয়।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফিরে এলেন বটে কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন তার অন্তরে কোন্ ভাবনা ও আবেগের দ্বন্দ্ব চলছে।

একবার তার মনে হচ্ছে, স্বয়ং রাসূলের প্রতিনিধি হয়ে মদীনায় থাকার মতো এমন গৌরব ও মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে?

আরেকবার মনে হচ্ছে, স্বয়ং রাসূলের নেতৃত্বে ইসলামের প্রথম এই জিহাদে অংশগ্রহণের সওয়াব ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো এতবড় ক্ষতি আর কী হতে পারে?

সে কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি বললেন,

'সেও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতোই সওয়াব পাবে। গনিমতেরও অংশ পাবে। যেন সে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।'

***

আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আপন প্রভুর প্রতি নিষ্ঠাবান এবং আকাবার রাতে রাসূলের হাতে হাত রেখে করা শপথের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত থেকেই জীবন পরিচালনা করতে থাকেন। এভাবে চলতে চলতেই এসে যায় বনূ কুরাইযার যুদ্ধের সময়।

এখানেই ঘটে তার জীবনের এমন এক পদস্খলন যা তিনি কখনো কল্পনাই করতে পারেননি। ঈমানী জীবনে এভাবে তার পা পিছলাতে পারে সেটা কখনোই তিনি ভাবতেও পারেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধের পরপরই রওনা করলেন বনূ কুরাইযার উদ্দেশ্যে। কারণ, খন্দকের যুদ্ধে এরা মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে শত্রু কুরাইশকে সাহায্য করেছিল। যা ছিল রাসূলের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

মুসলিম জাতির সঙ্গে তাদের এই গাদ্দারি, খেয়ানত ও চুক্তিভঙ্গের অপরাধে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমকে সঙ্গে নিয়ে তাদের আশ্রয় নেওয়া দুর্গের কাছে পৌঁছে গেলেন।

কঠোরভাবে তাদের সেই দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। পঁচিশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর নিরুপায় হয়ে তারা রাসূলের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব

পাঠাল যে, 'আমরা কিছু শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করতে চাই। আলোচনার জন্য একজন লোক পাঠান।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে,

'তাদের কোনো শর্ত গ্রহণ করা হবে না। ফয়সালা যা-ই হোক মাথা পেতে নেওয়ার অঙ্গীকার ছাড়া তাদের আর কোনো কথাই শোনা হবে না।'

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের আগেই তাঁর ফয়সালা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে,

'ওদের অস্ত্রধারণ উপযোগী সকল পুরুষকেই হত্যা করা হবে।'

রাসূলের এই সিদ্ধান্ত ইহুদীরা কেউ জানত না।

বনূ কুরাইযার লোকদের শর্ত ও প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে দেওয়ার পর তারা এবার বিনীত আবেদন জানাল,

'আমাদের কাছে আবু লুবাবাকে পাঠিয়ে দিন, আমরা তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।'

আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তারা আপন মনে করল, কারণ, জাহেলী যুগে বনূ কুরাইযার সঙ্গে তার কওমের মৈত্রীচুক্তি ছিল।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের এই আবেদন কবুল করে আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি তাদের মাঝে গিয়ে পৌঁছলে নারী ও শিশুরা তাকে ঘিরে ধরে বিলাপ করে কাঁদতে থাকল। বড় বড় পুরুষ লোকেরা এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞসা করল,

'আচ্ছা মুহাম্মাদের ফয়সালা যা-ই হোক; নিঃশর্তে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করলেই কি ভালো হবে? তুমি কি মনে করো?'

আবু লুবাবা বললেন,

'হ্যাঁ।'

মুখে এইটুকু বলার পর তিনি গলায় হাত দিয়ে জবাই করার ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাদের হত্যা করার ফয়সালা হয়েছে।

আবু লুবাবা বলেন,

'আল্লাহর কসম! এই ইশারা করার পর মুহূর্তের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করে ফেলেছি। রাসূলের গোপন ফয়সালার কথা তাঁর শত্রুদের কাছে প্রকাশ করে দিয়ে আমি আমানতের খেয়ানত করেছি। আমি ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভাবতে থাকলাম, এখন আল্লাহর অসন্তোষ থেকে বাঁচব কীভাবে?'

***

আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখান থেকে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে গেলেন না। সোজা চলে গেলেন নিজ বাড়িতে। একটি লোহার শিকল খুঁজে বের করলেন এবং একজনকে বললেন, মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে সেটা দিয়ে তাকে বেঁধে রাখতে। দণ্ডায়মান অবস্থায় শিকলবন্দী হয়ে বললেন,

'যতক্ষণ পর্যন্ত আমার তওবা কবুল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজেকে এই বন্দীদশা থেকে মুক্ত করব না। কোনোরকম খাদ্য-পানি স্পর্শ করব না। এতে যদি আমার মৃত্যুও হয়ে যায় হোক।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবু লুবাবাকে এই অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং সব কথা বিস্তারিত জানতে পারলেন, তখন তিনি মন্তব্য করলেন,

'শুনে রাখো, সে যদি আমার কাছে সব কথা জানাত, তাহলে আমি অবশ্যই তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমার আবেদন করতাম। কিন্তু সে নিজে নিজেই এসব কিছু করে ফেলেছে। সুতরাং যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা

তওবা কবুল করে তাকে মুক্ত না করছেন ততক্ষণ আমি তাকে মুক্ত করতে পারি না।'

***

এভাবে বন্দী অবস্থায় খাদ্য-পানি ছাড়া আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কয়েকদিন কেটে গেল। ধীরে ধীরে তার শরীর শুকিয়ে গেল। তিনি দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। এরপর আরও কয়েকদিন পার হলে তার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে পড়ল।

তার ছোট্ট একটি মেয়ে বিলাপ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে আসত, নামাযের সময় তার বাঁধন খুলে দিত, নামায শেষ হলে আবারও তাকে সেভাবেই বেঁধে রাখত।

***

আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এভাবেই লাগাতার ছয় দিন ছয় রাত নিজেকে মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে শিকলে বেঁধে রাখার পর সপ্তম রাতের শেষ প্রহরে আসমান থেকে তার তওবা কবুলের সুসংবাদ এসে গেল। সে রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তার স্ত্রী উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে।

***

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেন,

'আমি শেষ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসির আওয়াজ শুনে জিজ্ঞাসা করলাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কী কারণে হাসছেন? আল্লাহ আপনাকে সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল রাখুন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'আল্লাহ তাআলা আবু লুবাবার তওবা কবুল করেছেন।'

আমি জিজ্ঞসা করলাম,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি তাকে এই সুসংবাদ শোনাতে পারি?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

‘তুমি চাইলে অবশ্যই শোনাতে পারো।’

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূলের অনুমতি পেয়ে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন (তখনো পর্দার বিধান নাজিল হয়নি) এবং বললেন,

‘আবু লুবাবা, খুশির খবর শোনো। তোমার তওবা আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন।’

***

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন,

‘সকলেই ছুটে চলে এল আবু লুবাবার কাছে তাকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু সে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলো,

‘আল্লাহর কসম! যতক্ষণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র হাতে আমাকে মুক্ত না করবেন, ততক্ষণ নিজেকে মুক্ত করতে চাই না।’

এরপর যখন নবীজি ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে এলেন, তখন নিজ হাতে তাকে মুক্ত করে দিলেন।

***

আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার তওবা কবুল হওয়ায় কী পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির কারণে তিনি কতটা উৎফুল্ল হয়েছিলেন কারও পক্ষেই সেটা আন্দাজ করা ও কল্পনা করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে বলেন,

وَاٰخَرُوۡنَ اعۡتَرَفُوۡا بِذُنُوۡبِهِمۡ خَلَطُوۡا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنۡ يَّتُوۡبَ

عَلَيۡهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

'আর কোনো কোনো লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেক কাজ ও অন্য একটি বদ কাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।' –সূরা তাওবা : (০৯) ১০২

সেই দিন থেকে যখনই তিনি এই আয়াত পড়তেন, যতবার পড়তেন, ততবার তার দু'চোখ ভরে যেত অশ্রুতে। আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেছেন সেই অসীম আনন্দেই তার দু'চোখ প্লাবিত হতো আনন্দের অশ্রুতে।

তথ্যসূত্র :

১. *সীরাতু ইবনি হিশাম*, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, এবং সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩য় খণ্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা; ৪র্থ খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী...
৩. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা; ৩য় খণ্ড, ৪৫৭ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-ইসাবা*, ৪র্থ খণ্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৯৮১।
৫. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৪র্থ খণ্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা।
৬. *উসদুল গাবাহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা।

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

আল্লাহ তাআলা রাওয়াহার পুত্র আব্দুল্লাহর ওপর রহম করুন। নিশ্চয় সে এমন সমাবেশগুলো পছন্দ করত, যেগুলো নিয়ে ফেরেশতারা গর্ব ও প্রতিযোগিতা করে।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

اَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهْ - لَتَنْزِلَنَّ اَوْ لَتُكْرَهِنَّهْ

مَالِيْ اَرَاكِ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّةْ - هَلْ اَنْتَ اِلَّا نُطْفَةٌ فِيْ شَنَّهْ

'হে আমার নফস, দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে তোকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। যুদ্ধে তোকে নামতেই হবে। স্বেচ্ছায় না হলে তোকে নামানো হবে বল প্রয়োগে।

কেন তুই জান্নাতকে অপছন্দ করছিস?! (অর্থাৎ যুদ্ধে শহীদ হলে সোজা জান্নাতে যাবি, সেই যুদ্ধের প্রতি তোর দ্বিধার প্রকৃত অর্থ তো এটাই যে, জান্নাতকেই তোর অপছন্দ) ছি ছি হে নফস, ভুলে গেছিস যে, তুই আসলে মাতৃগর্ভে নিক্ষিপ্ত এক ফোঁটা বীর্য?'

নফসের বিরুদ্ধে আগুন জ্বালানো এই নিন্দাকাব্যই নির্ধারণ করেছিল বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত।

সমাপ্তির রেখো টেনে দিয়েছিল তার জীবনীর সর্বশেষ পরিচ্ছেদের—যা শৌর্যবীর্যে ভরপুর। গৌরবগাথা ও সুকীর্তিতে পূর্ণ। দ্যুতিময় ইবাদত ও তাকওয়ার আলোতে সমুজ্জ্বল।

***

নবুওয়াতের নূর যে সময় মক্কার জমিনে আলো ছড়িয়ে দিলো, সে সময় আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ছিলেন ইয়াসরিবের একজন স্বনামধন্য সৃজনশীল কবি।

খাযরাজ গোত্রের একজন বিখ্যাত সরদার।

হেদায়েত ও হকের আহ্বান শোনামাত্রই আল্লাহ তার অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিলেন ইসলামের জন্য। তখন থেকেই তিনি সমরাস্ত্র আর মুখের ভাষার অস্ত্রকে কাজে লাগাতে শুরু করেন সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর আনুগত্যে আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির পেছনে।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন কাব্যশক্তি দিয়ে রক্ষা করতে থাকেন শত্রুদের ছুঁড়ে দেওয়া নিন্দাকাব্যের আক্রমণ থেকে।

নিজের ভাষা ও বক্তৃতার অস্ত্র দিয়ে তাঁর দাওয়াতের কাজে শক্তি জোগাতে থাকেন।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে এবং তার দুই কবিবন্ধু সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাজিল করেন। উদ্ভ্রান্ত ও লক্ষ্যহীন কবিদের বিভ্রান্তি ও ত্রুটি আলোচনার পর ঈমানদীপ্ত ও শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে তাদের ব্যতিক্রম করায় তারা উন্নীত হয়েছেন মর্যাদার শীর্ষ চূড়ায়।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ. اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ. وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ.

'বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখো না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফেরে? আর এমন কথা বলে যা তারা করে না।' –সূরা আশ্‌-শুআরা : (২৬) ২২৪-২২৬

এর পরপরই আল্লাহ তাআলা ব্যতিক্রমী কবি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এবং অন্য দুই মুমিন কবির ঈমান, আমল ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বলেন,

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

'তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কীরূপ?' –সূরা আশ্‌ শুআরা : (২৬) ২২৭

কোনো মানুষের জন্য এরচেয়ে বেশি সম্মানের, অধিক মর্যাদার আর কী হতে পারে যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তার সম্পর্কে কুরআন নাজিল করে দিলেন।

এবং আল্লাহর বর্ণিত তার গুণ বৈশিষ্টগুলো দিন ও রাতের বিভিন্ন সময় তিলাওয়াত শুরু হলো। এবং কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তিলাওয়াত চলতেই থাকল।

***

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আকাবার রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণের মুবারক অনুষ্ঠানে ছিলেন বাহাত্তর জনের কাফেলার এক গর্বিত সদস্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই কাফেলা থেকে যে বারোজনকে আমীর মনোনীত করেছিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ছিলেন তাদের অন্যতম।

খাযরাজ বংশীয় এই তরুণ যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকেই সংকল্প করেছিলেন যে, গোটা জীবনকেই আল্লাহর আনুগত্যের জন্য উৎসর্গ করবেন।

সেই সংকল্পের কারণেই তিনি ছিলেন জীবনভর একজন ইবাদতগুজার আবেদ ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ।

ছিলেন রাতের ইবাদতগুজার আর দিনের ঘোড়সওয়ার।

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে বলেন,

'আমরা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে রাসূলের সঙ্গে একটি সফর করছিলাম। গ্রীষ্মের তাপদাহ ছিল এত ভয়াবহ যে, মানুষ সূর্যের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য মাথার ওপর হাত দিয়ে ছায়া তৈরির চেষ্টা করত। এমন তীব্র গরমের মধ্যেও জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল রোযা রেখেছেন।

এ ছাড়া গোটা কাফেলার মধ্যে আর মাত্র একজন রোযাদার মানুষ পাওয়া গেল, তিনি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।'

***

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধ আর জিহাদের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছেন। জিহাদের ময়দানে শহীদের মর্যাদা

লাভের মধ্য দিয়েই তার জীবনের শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে জিহাদে শরীক হয়েছিলেন বদর... ওহুদ... খন্দক... হুদাইবিয়া ও খাইবারে।

আহা! কী অপূর্ব তার মর্যাদা!
কত মহান তার জীবন ও কর্ম!

***

হিজরতের অষ্টম বর্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তিন হাজার মুসলিম সৈনিক পাঠালেন সিরিয়াতে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে।

নিজের মুক্তদাস যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এই সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করার পর বললেন,

'যায়েদ যদি শহীদ বা আহত হয়, তাহলে সেনাপতি হবে জাফর ইবনে আবী তালেব...

জাফর যদি শহীদ বা আহত হয়ে যায়, তাহলে সেনাপতি হবে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা...

যদি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও শহীদ হয়ে যায় অথবা আহত হয়, তাহলে মুসলিম বাহিনী নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর মনোনীত করে তার হাতে সেনাপতির দায়িত্ব তুলে দেবে।'

***

এই সেনাদল মদীনা থেকে রওনা করার পূর্বে সকলেই এই দলকে বিদায় জানাতে এল। তবে বিদায় জানানোর ক্ষেত্রে সকলেরই বিশেষ আকর্ষণ ছিল সেই তিন সেনাপতি, যাদের ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপতি হিসাবে ঘোষণা করেছেন। বিদায় জানাতে আসা সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম যখন

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট গেলেন তিনি তখন কাঁদতে শুরু করে দিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম তখন জিজ্ঞাসা করলেন,
'হে ইবনে রাওয়াহা, আপনি কিসের জন্য কাঁদছেন?'

তিনি বললেন,
'আল্লাহর কসম, পার্থিব কোনো মোহে আমি কাঁদছি না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে জাহান্নাম সম্পর্কে একটি আয়াত শুনেছি। যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা।' –সূরা মারয়াম : (১৯) ৭১

এতে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, সকলের মতো আমাকেও জাহান্নামের পথ পাড়ি দিতে হবেই। কিন্তু আমার জানা নেই, আমি কি সেটা অতিক্রম করতে পারব? পারব কি জাহান্নাম থেকে মুক্ত হতে?'

***

সেনাদল চলতে শুরু করলেন উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন,

'আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন। সকল আক্রমণ থেকে আপনাদের হেফজত করে আবার সকলকে নিজ নিজ পরিবারের কাছে ফিরিয়ে আনুন।'

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের ওই 'পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার' দুআ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করতে থাকলেন,

لَكِنَّنِيْ أَسْأَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً - وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا

أَوْ طَعْنَةً بِيَدَىْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً - بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الْأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

حَتّٰى يُقَالَ إِذَا مَرُّوا عَلٰى جَدَثِيْ - أَرْشَدَه اللهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

'১. কিন্তু আমি প্রত্যাবর্তন চাই না, চাই দয়ালু আল্লাহর অসীম ক্ষমা আর দয়া। আর আমি তাঁরই পথে এমন ভয়াবহ তরবারির আঘাত পেতে চাই যা ফেনা তুলে ফেলে।

২. অথবা চাই চূড়ান্ত আঘাতকারী রক্তপাগলের এমন বল্লমের আঘাত যা নাড়িভুঁড়ি ও কলিজা ভেদ করে বেরিয়ে যাবে।

৩. এমনকি মানুষ যখন আমার কবরের পাশ দিয়ে যাবে তখন বলবে বাহবা বাহবা কত ভালো যোদ্ধা ছিল! আর কত সফলতা পেয়েছিল!'

***

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক এতিম বালককে লালন-পালন করতেন। যায়েদ ইবনে আরকাম নামের সেই বালকটিকে তিনি নিজের উটের পেছনে চড়িয়ে এনেছিলেন। মদীনার সীমা ছেড়ে আসার পর বালক যায়েদ শুনতে পেল, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নিজের উটকে ডেকে বলছেন,

اِذَا اَدَّيْتِنِيْ وَحَمَلْتِ رَحْلِيْ - مَسِيْرَةَ اَرْبَعٍ بَعْدَ الْحُسَاءِ

فَشَانُكِ فَانْعَمِيْ وَخَلَاكِ ذَمٌّ - وَلَا اَرْجِعِ إِلٰى اَهْلِيْ وَرَائِيْ

'চার দিনের পথ অতিক্রম করার পর যখন তুমি পৌঁছে দেবে গন্তব্যে। তুমি নিজেকে নিজেই খেয়াল রেখো, সুখে থেকো। আমার কোনো অভিযোগ নেই তোমার ব্যাপারে। আমি আর কখনোই আমার পরিবারে ফিরব না।'

বালক যায়েদ এই কথায় কাঁদতে শুরু করে দিলো।

এতে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে লাঠি দিয়ে হালকা গুঁতা মেরে বললেন,

‘আরে বোকা, আল্লাহ তাআলা আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিলে তোমার কী অসুবিধা।

তুমি আমার এই উটনীতে চড়েই মদীনায় ফিরে যেয়ো।’

***

মুসলিম বাহিনী জর্ডানের মাআন ভূমিতে যখন পৌঁছল, তারা জানতে পারল যে, রোমসম্রাট সামান্য দূরে বালকা অঞ্চলে অবতরণ করেছেন। তার সঙ্গে আছে এক লক্ষ রোমান যোদ্ধা সৈনিক। লাখাম, জুযাম ও কুযাআসহ বিভিন্ন গোত্রের আরও এক লক্ষ খ্রিষ্টান আরব সৈনিক সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

***

মুসলিম বাহিনী ‘মাআন’ অঞ্চলে অবস্থান করলেন দুই রাত। এ সময় তারা শত্রুবাহিনীর বিশাল সৈন্যসংখ্যার বিপরীতে নিজেদের অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যের তুলনা করে বলতে শুরু করলেন,

‘আমরা সৈন্যসংখ্যার এই বিশাল তারতম্যের বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পত্রমারফত জানিয়ে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা করি। তিনি যা আদেশ করবেন সেটাই আমরা করব।’

বেশির ভাগ সৈনিকের এই মনোভাব বুঝতে পেরে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে উঠলেন,

يَا قَوْمُ ! إِنَّ الَّتِيْ تَطْلُبُوْنَ قَدْ اَدْرَكْتُمُوْهَا ....

وَنَحْنُ مَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ ....

وَإِنَّمَا نُقَاتِلُهُمْ بِهَذَا الدِّيْنِ الَّذِيْ اَكْرَمَنَا اللهُ بِهِ ....

فَانْطَلِقُوْا، فَهِيَ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ....

إِمَّا النَّصْرُ ... وَإِمَّا الشَّهَادَةُ ....

'হে মুসলিম সৈনিক ভাইয়েরা,

আমরা সকলে সব সময় যে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা বুকে লালন করে থাকি, সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ আজ আমাদের হাতে এসে ধরা দিয়েছে।

আমরা ইসলামের সৈনিকেরা কখনোই শক্তি দিয়ে কিংবা সংখ্যার জোরে লড়াই করি না। আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ি বিশ্ববিজয়ী ইসলামী আদর্শ দিয়ে, যা দিয়ে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন।

সুতরাং সৈনিক ভাইয়েরা, এগিয়ে চলুন সামনে। আমাদের যেকোনো একটি লক্ষ্য আজ অবশ্যই পূরণ হবে। হয়তো বিজয় নয়তো শাহাদাত।'

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই জ্বালাময়ী বক্তব্য যেন প্রতিটি সৈনিকের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। শাহাদাতের জযবায় সকলেই নিজেদের চেয়ে সংখ্যায় প্রায় সত্তর গুণ বেশি শত্রুবাহিনীর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

'মূতা' অঞ্চলে দুই অসম বাহিনী মুখোমুখি হলো।

***

প্রথম সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা নিয়ে মুসলিম সেনাদলের অগ্রভাগে থেকে সামনে এগিয়ে যেতে থাকলেন। দুঃসাহসী বীরের আদর্শ এই সেনাপতি লড়তে থাকলেন শত্রুর বিরুদ্ধে। সন্ত্রস্ত

হয়ে পড়ল শত্রুবাহিনী তাঁর সাহস দেখে। তরবারি, তির আর বর্শার অসংখ্য আঘাত তাঁর সারা শরীরজুড়ে লাগলেও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভয় পেয়ে পেছনে ফেরেননি। ফলে একটি আঘাতও তার পিঠে লাগতে পারেনি। এভাবে চরম দুঃসাহস দেখিয়ে লড়তে লড়তে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় সেনাপতি জাফর ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের পতাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। যিনি আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আপন সহোদর ভাই এবং শক্তি, সাহস আর বীরত্বে তাঁরই মতো এক দুর্দান্ত যোদ্ধা।

তিনি সেনাপতি হয়ে রণাঙ্গনে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধ আবারও তুমুল আকার ধারণ করল। রোমানদের আক্রমণ মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র হয়ে উঠল। পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করার জন্য জাফর ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তরবারির কোপে আবৃত্তি করতে করতে শত্রুবাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا - طَيِّبَةٌ وَّبَارِدٌ شَرَابُهَا

وَالرُّوْمُ رُوْمٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا - كَافِرَةٌ بَعِيْدَةٌ اَنْسَابُهَا

عَلَيَّ اِذْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

'আহা! কতই-না অনাবিল সুখের ঠিকানা ওই জান্নাত, গন্তব্য আমার কত কাছে। যেন আমাকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেখানের ঠাণ্ডা সুমিষ্ট পানি দিয়ে আজ মেটাব তৃষ্ণা।

শত্রু রোমানরা তো কামনা-বাসনার গোলাম, ওরা জাহান্নামের কীট,
কাফের ওরা, আল্লাহর এ জমিনের ওরা পরগাছা,
যাকেই পাব ওদের কচুকাটা করে সাফ করব আগাছা।'

তিনি শত্রুদের সারিতে ঢুকে তরবারির আঘাতে শত্রু সৈন্যদের কচুকাটা করতে করতে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। হঠাৎ এক আক্রমণে তার ডান হাত কেটে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাম হাত দিয়ে ইসলামী পতাকা ধরে ফেললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও এক আক্রমণে তার বাম হাতটিও কাটা পড়ে গেল। তিনি কাটা হাতের বাহু দিয়ে পতাকাটি বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রইলেন। শত্রুদের আরও এক আক্রমণে তার শরীর দু'ভাগ হয়ে গেল। এভাবেই লড়াই করতে করতে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন।

***

ঠিক তখনই সামনে এগিয়ে এসে পতাকা ধরে ফেললেন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। পূর্বের দুই সেনাপতির শহীদ হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় সেনাপতি হিসাবে পতাকা হাতে নিয়ে তিনি নিজেকে নিজেই বলতে শুরু করলেন,

يَا نَفْسُ اِلَّا تُقْتَلِيْ تَمُوْتِيْ - هَذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيْتِ

وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيْتِ - اِنْ تَفْعَلِيْ فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ

'হে নফস, আজ লড়াই করে যদি শহীদ না হও, তার মানে অনিবার্য মৃত্যু থেকে বেঁচে যাওয়া নয়। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। মরতে তোমাকে হবেই।

এতকাল ধরে যে শাহাদতের তামান্না বুকে পুষে রেখেছ, আজ তা-ই বাস্তবায়নের সুযোগ এসে গেছে। আগের দু'জনের মতোই যদি শহীদ হতে পারো, তাহলেই তুমি সার্বিক ও সত্য পথ পেলে।'

এই আবৃত্তির পর তিনি পূর্বের দুই সেনাপতির লাশের দিকে তাকালেন। রক্তে রঞ্জিত ওই দু'টি লাশ দেখে তার মনে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভয় ও দ্বিধা জেগে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নফসকে তিরস্কার করে তিনি হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন,

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهْ - لَتَنْزِلَنَّ أَوْ لَتُكْرَهِنَّهْ

مَالِيْ أَرَاكِ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّةْ - هَلْ أَنْتِ إِلَّا نُطْفَةٌ فِيْ شَنَّةْ

'আল্লাহর নামে কসম করে বলছি হে নফস, যুদ্ধে তোকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। স্বেচ্ছায় না নামলে তোকে বল প্রয়োগে নামানো হবেই। আরে নফস, তুই কি জান্নাতকেই অপছন্দ করছিস? তুই তো মাতৃগর্ভের এক ফোঁটা বীর্যই। ছি ছি।'

মুহূর্তের দ্বিধা মুহূর্তের মধ্যেই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পতাকা হাতে তুলে নিয়ে তিনি রণাঙ্গনে নেমে পড়লেন। তার চাচাতো ভাই এসে এক টুকরো হাড্ডি যাতে অল্প গোশত লেগে ছিল, দিয়ে বললেন,

'ভাইজান, এইটুকু খেয়ে একটু শক্তি সঞ্চয় করুন। গত তিন দিন সামান্য কোনো দানাপানিও পড়েনি আপনার পেটে।'

তার হাত থেকে সেই হাড্ডিটা নিয়ে দাঁত লাগিয়ে সামান্য গোশত ছিঁড়ে মুখে দিতেই তাঁর চোখে পড়ল চারদিকে মুসলিম সৈনিকদের লাশ। তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলেন,

'আরে রাওয়াহার ব্যাটা, তুমি এত খারাপ!

চারদিকে মুসলিম সৈনিকদের কত লাশ, আর এরই মধ্যে তুমি গোশত চিবাচ্ছ?'

তিনি সেই হাড্ডি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তরবারি উঁচু করে কোনো কিছুর পরোয়া না করে শত্রু রোমান বাহিনীর সারিতে ঢুকে একটা একটা করে শত্রু খতম করতে থাকলেন। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ! লড়াই করতে করতেই শহীদ হয়ে গেলেন।

***

আল্লাহ রহম করুন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার প্রতি।

দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন,

‘নিশ্চয় সে এমন মজলিসগুলোই পছন্দ করত, যেগুলো নিয়ে ফেরেশতারা গর্ব করে।’

তথ্যসূত্র :

১. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

২. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা।

৩. *আস-সীরাতু* লিবনি হিশাম, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

৪. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৪৬৭৬।

৫. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা।

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

জাহেলী যুগে তুমি কত ভালো সরদার ছিলে! ইসলামী যুগেও তুমি চমৎকার সরদার।

—জারীরকে উদ্দেশ্য করে উমর ইবনুল খাত্তাব

বিদায় হজের অল্প কয়েকদিন পূর্বে মসজিদে নববীর একটি চলমান দৃশ্য।

জুমআর খুতবা শোনার প্রস্তুতি নিয়ে উপস্থিত সকল সাহাবী মসজিদের পবিত্র অঙ্গনে নিজ নিজ স্থান দখল করে বসে আছেন।

ইতিমধ্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে চড়তে শুরু করেছেন।

সেটা দেখামাত্রই উপস্থিত সকলেই সজাগ হয়ে ওঠেন। চোখ, কান আর মন লাগিয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে তারা খুতবা শুনতে থাকলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের ব্যাপারে সাবধান করলেন, জান্নাতের ব্যাপারে আশান্বিত করলেন। উপস্থিত মনোযোগী শ্রোতাদের উপদেশ ও নসিহত প্রদান করলেন। মুসলিমদের

ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে ভুলভ্রান্তি, ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরলেন।

***

এই চলমান দৃশ্যের মাঝখানে...

ইয়েমেনের বাজীলা গোত্রের বিরাট এক প্রতিনিধিদল মসজিদে এসে পৌঁছল। উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়া। সুখে, দুখে সর্বাবস্থায় আনুগত্যের শপথ ও বাইআত নেওয়া।

এই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সকলেই উপস্থিত-মুসল্লিদের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়লেন। এই বিরাট প্রতিনিধিদলের সরদার, তাদের সর্বজনমান্য অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী।

উপস্থিত যে মুসল্লিগণ এতক্ষণ মুহূর্তের জন্যও রাসূলের দিক থেকে দৃষ্টি সরাচ্ছিলেন না, হঠাৎ তারাই জারীরের দিকে হাঁ করে তাকাতে লাগলেন।

দীর্ঘ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন।

এমনকি জারীরের মনে হতে লাগল যে, তারা যেন আগে থেকেই তাকে চেনে, অথবা যেন তাদের কাছে আগেই কেউ তার বিশদ বিবরণ ও পরিচিতি দিয়ে রেখেছে।

ফলে তারা এখন সেই বিবরণ মিলিয়ে দেখে নিশ্চিত হতে চাচ্ছে যে, এটাই সেই ব্যক্তি কি না।

নামায শেষ হওয়ামাত্রই জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী তার পাশে বসা মুসল্লিকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আচ্ছা, সকলেই আমার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকিয়ে দেখছিলেন, আমাকে বারবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিলেন।

এমনকি মনে হচ্ছিল যে, তারা যেন সবাই আমাকে দেখার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন...

বিষয়টা কী নিছক কাকতালীয়, না এর পেছনে কোনো রহস্য লুকানো আছে?'

তিনি জবাব দিলেন,

'সবাই আপনাকে ওইভাবে তাকিয়ে দেখছিলেন এর কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ পূর্বেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, আপনার নেতৃত্বে আপনার কওমের বিরাট এক প্রতিনিধিদল আসছে। এমনকি আপনার বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব ও শনাক্তকরণ চিহ্ন উল্লেখ করে তিনি বলেন,

يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْيَمَنِ .... عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلِكٍ

'কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের মাঝে এসে পৌঁছবেন এমন এক ইয়েমেনী, যিনি ইয়েমেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যার চেহারায় রয়েছে বিশেষ রাজকীয় ছাপ।'

এ কথা শুনে জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চোখেমুখে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। খুশিতে তার চেহারা ঝলমলিয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গুণ ও বিশেষণ তার ব্যাপারে প্রয়োগ করেছেন, সেটা ভেবে তার হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে উঠল।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায, তাসবীহ ও দুআ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নবীজি তাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'হে জারীর, কী উদ্দেশ্যে এসেছ?'

জারীর বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এবং আমার কওম আপনার কাছে ইসলাম কবুলের বাইআত গ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'আমি তোমাদের বাইআত গ্রহণ করব এই মর্মে যে,

(ক) তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করবে, এক লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য মাবুদ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল।

(খ) নামায আদায় করবে।

(গ) যাকাত প্রদান করবে।

(ঘ) রমযানের রোযা করবে।

(ঙ) বাইতুল্লাহর হজ করবে।

(চ) মুসলিম জাতির কল্যাণ-চিন্তা করবে।

(ছ) শাসকের আনুগত্য করবে, এমনকি সে কোনো কালো ক্রীতদাস হলেও।'

তিনি সকল শর্ত মেনে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং বাইআত গ্রহণ করলেন।

***

সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবী জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে উঠল। এবং সেদিন থেকেই তিনি প্রিয় নবীর কাছ থেকে লাভ করলেন এত আদর-সম্মান যা অল্প কজন অগ্রণী মুসলিম ছাড়া আর কেউই লাভ করতে পারেননি।

তিনি মৃত্যু পর্যন্ত একটি দিনের জন্যও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরে থাকেননি। আর যখনই যতবারই তিনি প্রিয় নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, চেহারা হয়ে উঠত মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল ও ঝলমলে।

একবার তিনি নবীজির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন,

'এসো জারীর।'

তাকে বসতে দেওয়ার জন্য কিছু না পেয়ে প্রিয় নবী নিজের শরীর মুবারকের চাদর খুলে ভাঁজ করে বসার জন্য দিলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত জারীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চাদরটি হাতে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর সেটাতে চুমু দিতে দিতে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, যেভাবে আপনি আমাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে আপনার শান, মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিন।'

তখন নবীজি উপস্থিত সকলকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন,

'তোমাদের কাছে যখন কওমের কোনো সম্মানিত মানুষ আসে, তোমরা তার সঙ্গে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার আচরণ করবে।'

***

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করে ঈমানী কাফেলায় শরীক হওয়ার পর থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং তাঁর পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন। তার ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তাঁরা অর্পণ করেন।

ইন্তেকালের অল্প কিছুদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডেকে বললেন,

'হে জারীর, কাবার বিকল্প 'যুল খালাসা' ধ্বংস করে সেখানের শিরকী কর্মকাণ্ড বন্ধ করে আমার মনে কি একটু শান্তি পৌঁছে দিতে পারবে?'

জারীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি অবশ্যই আপনার প্রশান্তির জন্য এই কাজ করব।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে যেই ‘যুল খালাসা’ মুক্ত পৃথিবী দেখে যেতে চান, যেখানের অপকর্মসমূহের চির অবসান চান, সেই ‘যুল খালাসা’ অন্য কিছু নয়, মক্কা থেকে ইয়েমেনের পথে প্রায় সাতদিনের দূরত্বে অবস্থিত ‘তাবালা’ শহরের বিশেষ একটি মন্দির। যেখানে ছিল বেশ কিছু বিশেষ মূর্তি। শুভ্রসাদা রঙের সেই মূর্তিগুলোর মাথায় আঁকা ছিল রাজমুকুট।

এই ‘যুল খালাসা’ দেবী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিল উমামা গোত্র।

আর খাসআম, বাজীলা, উয্দ প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা এই মন্দিরকে বিশেষ মন্দির হিসাবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হজের মতো এখানে তাওয়াফ করত। এখানে পশুবলি দিত।

শুধু এতটুকুই নয়, ইসলাম অবমাননার চূড়ান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা এই মন্দিরের নাম রেখেছিল ‘ইয়েমেনী কাবা’।

***

বাজীলা গোত্রে অবিসংবাদিত নেতৃত্বের এবং ইয়েমেনী সকল গোত্রের মাঝে বিশেষ মর্যাদার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জারীর আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নির্বাচিত করলেন।

জারীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একশো পঞ্চাশজন বীর যোদ্ধা বাছাই করলেন।

রওনার প্রক্কালে তিনি রাসূলের কাছে বিদায় নিতে এসে জানালেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার বিশালাকৃতির লম্বা দেহের কারণে ঘোড়ার পিঠে আমার অবস্থান দৃঢ় হয় না। সামনে-পেছনে কিংবা ডানে-বামে নড়তে থাকে। আমার জন্য একটু দুআ করে দিন।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বুকের ওপর নিজের মুবারক হাত রেখে দুআ করলেন,

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا

‘হে আল্লাহ, ঘোড়ার পিঠে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার অবস্থান অনড় ও সুদৃঢ় করে দাও। তাকে বানিয়ে দাও হেদায়েতপ্রাপ্ত ও হেদায়েতের কর্মী।’

প্রিয় নবীর এই দুআর ফলে সেই দিন থেকে তিনি হয়ে ওঠেন দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে সবচেয়ে বেশি অনড় অবস্থানকারীদের অন্যতম।

***

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দলবল নিয়ে ‘যুল খালাসা’ মন্দিরে পৌঁছে গেলেন।

সর্বপ্রথম এর পরিচালক-পৃষ্ঠপোষকদের হত্যা করলেন। সবগুলো দেবীমূর্তির গায়ে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই-ভস্ম বানিয়ে ফেললেন। মন্দিরটি পশুবলির বেদিসহ ভেঙে চুরমার করে ফেললেন।

এক দূতমারফত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘যুল খালাসা’ মন্দির, দেব-দেবী, পূজারি ও সকল পৃষ্ঠপোষককে হত্যার সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন। যা শুনে নবীজি ব্যথা ও চিন্তামুক্ত হলেন। পরবর্তীকালে এখানেই স্থাপিত হলো তাবালা শহরের বিশাল জামে মসজিদ।

***

'যুল খালাসা' ধ্বংসের পর জারীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনায় না ফিরে ইয়েমেনের উদ্দেশে সফর অব্যাহত রাখলেন। নবীজির নির্দেশমতো সে অঞ্চলের শাসকদের কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান পৌঁছে দিতে।

ইয়েমেনের তদানীন্তন প্রধান শাসকের দরবারে জারীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত দূত হিসাবে উপস্থিত হলেন। তার কাছে ইসলামের বিভিন্ন সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুললেন। কুরআনের কিছু অংশের তিলাওয়াতও তাকে শোনালেন। জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করলেন।

মহান আল্লাহর অসীম দয়া! তিনি ইয়েমেনী বাদশাহ 'যুলকালা'র হৃদয়কে ইসলাম গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। ইসলাম কবুলের জন্য তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং অবলিম্বে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ঈমানের আলোর মিছিলে শামিল হয়ে গেলেন।

ইয়েমেনী এই বাদশাহ জীবনের দীর্ঘ এক অংশ শিরকের অন্ধকারে কাটানোর পর আল্লাহ প্রদত্ত ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্যে খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সেই উল্লাস প্রকাশ পেল এভাবে যে, ইসলাম গ্রহণের সেই সৌভাগ্যময় দিনে তিনি চার হাজার ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিলেন।

এবং বিরাট অনুসারী দল সঙ্গে নিয়ে মদীনায় হাজির হলেন প্রিয় নবীর সাক্ষাৎ-সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার মায়া ছেড়ে মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছেন।

ব্যথাতুর হয়ে তিনি নিজের কওমকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন সিরিয়ার 'হিমস' নগরীতে। একেই বানালেন নিজের নতুন আবাস, নতুন ঠিকানা, নতুন দেশ।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের খলীফা নির্বাচিত হলে

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের ও কওমের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন তার আনুগত্যে।

প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও তার ওপর আস্থা রেখে ইয়েমেনের জমিন থেকে উত্থিত 'রিদ্দতের ফিতনা' (ভণ্ড নবীদের অনুসরণের মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগ) এর টুঁটি চেপে ধরার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

জারীর আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সর্বোত্তম উপায়ে সেই দায়িত্ব পালন করেন। মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজের ও তার কওমের তরবারির লড়াই অব্যাহত রাখেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য দাপটের কোমর ভেঙে দিয়ে আবার সকল মুরতাদের ইসলামে ফেরানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন।

***

দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতকালেও জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের শক্তি ও বুদ্ধির সর্বাত্মক ব্যবহারের মাধ্যমে খলীফার সহযোগিতা অব্যাহত রাখেন। খলীফার সহযোগী সভাসদ ও উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন।

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে খুবই অন্তরঙ্গ ও আপন ভাবতেন। মাঝে মাঝে তার তীক্ষ্ণ মেধা এবং জটিল পরিবেশে উপস্থিতবুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

***

একদিন খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জারীরসহ আরও বেশ কয়েকজন মুসলিমের সঙ্গে মসজিদে বসে নামাযের অপেক্ষা করছিলেন।

হঠাৎ কারও বায়ু নির্গমনের আওয়াজ শোনা গেল। সকলেই নীরব ও শান্তভাবে বসে রইলেন। অযুর উদ্দেশ্যে কেউই না বের হওয়ার কারণে সেখানে তৈরি হলো একটি অস্বস্তিকর, গুমোট পরিবেশ।

প্রত্যেকেই আশঙ্কার করতে থাকলেন যে, সকলেই হয়তো আমাকেই 'দায়ী' ভাবছেন।

খলীফার আশঙ্কা হলো যে, লোকলজ্জার ভয়ে লোকটি বিনা অযুতেই নামাযে শামিল হয়ে যেতে পারে। সে কথা ভেবেই তিনি বলে বসলেন,

'ঘটনাটি যার দ্বারাই ঘটুক, তাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, দয়া করে বাইরে গিয়ে অযু করে আসুন।'

অবস্থা হয়ে উঠল আরও বেশি জটিল। একে অন্যের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হতে থাকল। এই জটিল লজ্জাজনক অবস্থায় সুন্দর সমাধান বের করে জারীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলীফাকে অনুরোধ করলেন,

'আমীরুল মুমিনীন, আমাদের সকলকেই অযু করে আসতে বলুন।'

এই প্রস্তাবে খলীফা পুলকিত হয়ে উঠলেন। তার দুশ্চিন্তা কেটে গেল। তিনি আগের নির্দেশ পরিবর্তন করে বললেন,

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা সকলেই গিয়ে অযু করে আসুন।'

এরপর তিনি জারীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন,

'আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন, কত চমৎকার সরদার ছিলে তুমি জাহেলী যুগে! আর এখন কত চমৎকার নেতা ইসলামী যুগে।'

এবার উপস্থিত সকলেই অযু করতে চলে গেলেন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ১১৩৬।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা।
৪. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৭৪০ পৃষ্ঠা।
৫. *তারীখু ইবনি খাইয়্যাত*, ১১১ পৃষ্ঠা ও তৎপরবর্তী।
৬. *তাহযীবুত তাহযীব*, ২য় খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-মাআরিফ*, ১২৭ পৃষ্ঠা।
৮. *হায়াতুস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ১৭৮, ৩৫৩, ৩৫৫, ৬০১ পৃষ্ঠা; ২য় খণ্ড, ৫১৭, ৭৩২, ৭৫৮ পৃষ্ঠা; ৩য় খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা।
৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা; ৫ম খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা; ৮ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।
১০. *কানযুল উম্মাল*, ৭ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।
১১. *ফাতহুল বারী*, ৮ম খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা।

উবাই ইবনে কাআব আল-আনসারী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহীর বাণী লেখক এবং মুসলিম জাতির এক বিরল প্রতিভা।

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, উদ্ভূত জটিল সমস্যায় তার কাছে সমাধান জানতেন, জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তার দ্বারস্থ হতেন। -ইবনে হাজার

কে সেই মহান ব্যক্তি, ঊর্ধ্বজগতে যার নাম পিতার নামসহ আলোচিত হয়েছে?

কে সেই সৌভাগ্যবান, যাকে কুরআন পড়ে শোনানোর জন্য রাসূলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? সেই নির্দেশ রক্ষায় নিজেই তিনি যাকে কুরআন পড়ে শুনিয়েছেন।

কে সেই বিখ্যাত ব্যক্তি যাকে খলীফা উমর ইবনে ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আখ্যায়িত করতেন 'সাইয়্যিদুল মুসলিমীন' (মুসলিমদের নেতা) বলে।

নিশ্চয় তিনিই হলেন বিখ্যাত সাহাবী উবাই ইবনে কাআব আল-আনসারী আন-নাজ্জারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহী লেখক।

যিনি মুসলিম জাতির এক বিরল প্রতিভা, তাদের এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব।

***

উবাই ইবনে কাআব তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন, যখন রাসূলের পক্ষ থেকে ইয়াসরিবে প্রেরিত হন ইসলামের সর্বপ্রথম সুসংবাদবাহী মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। যদিও উবাই ইবনে কাআবের ইসলাম কবুলের জন্য কোনো আহ্বানকারী প্রয়োজন ছিল না। তাকে কেউ আল্লাহর দীন ইসলাম কবুল করতে বলুক—এমন কোনো দরকারই তার ছিল না।

কেউ এসে তাকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আগমন সংবাদ জানাক—তিনি মোটেও এর মুখাপেক্ষী ছিলেন না।

কেননা, জাহেলী যুগেও লিখতে ও পড়তে পারদর্শী হাতেগোনা কয়েকজনের তিনি ছিলেন অন্যতম।

ইহুদী ও নাসারাদের কাছে বিদ্যমান পবিত্র ধর্মগ্রন্থ তাওরাত, ইনজীল ও যবূরের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রত্যেক বিষয়ে তিনি অর্জন করেছিলেন বিশেষজ্ঞতা।

ফলে তিনি আখেরী নবীকে খুব ভালোভাবে জানতেন, তাঁর আগমন সংবাদ পাওয়ার পূর্বেই।

তিনি সর্বশেষ নবীকে নাম-ধামসহ চিনতেন...
তাঁর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গুণ ও বৈশিষ্ট্যও জানতেন...
তাঁর স্পষ্ট আলামত ও নিশানার কথাও জানতেন...

এসব কারণে তিনি শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবীকে তার কোনো নিকটজনের চাইতে বেশি ভালোভাবে চিনতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে আকাবার বাইআত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী বাহাত্তর সদস্য যখন ইয়াসরিব থেকে মক্কার উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন, উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন তাদের একেবারে প্রথম সারিতে।

***

পরে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওওয়ারায় এসেছিলেন, তখন তিনি উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে গ্রহণ করলেন নিজের ওহী লেখক হিসাবে।

সে জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যত চুক্তিপত্র, অঙ্গীকারনামা, দানপত্র ও চিঠিপত্র প্রস্তুত হতো, সবগুলোর নিচেই এই বিখ্যাত সাহাবীর নাম অঙ্কিত থাকত।

প্রত্যেক দলিলের নিচে তিনি লিখতেন,

সাক্ষী, অমুক অমুক
লেখক, উবাই ইবনে কাআব

সাহাবী উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই ধারার অনুসরণেই পরবর্তীকালে মুসলিম জাতির উলামায়ে কেরাম নিজ নিজ লেখনীর সমাপ্তি টানেন এভাবেই,

'এটি লিখেছেন, অমুক'

***

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দান করেন এমন বিশাল দায়িত্ব যার সামনে অন্য সকল মর্যাদা তুচ্ছ হয়ে যায়, তাকে ভাবেন এমন আস্থার যোগ্য যার সামনে ম্লান হয়ে যায় অন্য সকল আস্থা।

সেটা ছিল কুরআনের জন্য তাকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবা এবং 'ওহীলেখক' দলের মধ্যে তাকে শামিল করে নেওয়া।

এই দায়িত্বের কল্যাণেই তার সামনে খুলে গেল এক মহাসৌভাগ্যের অবারিত দুয়ার। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তিনি সরাসরি রাসূলের পবিত্র জবান থেকে লাভ করতে পারেন একেবারে তরতাজা রূপে। একেবারে সদ্য অবতীর্ণ হিসাবে।

***

উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুরআনের এমন মিষ্টিস্বাদ উপভোগ করেন, যা মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অল্প কজন সাহাবী ছাড়া আর কেউই ভোগ করতে পারেননি।

তিনি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পাঠানো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ কুরআনুল কারীমে দেখতে পেয়েছিলেন এমন এমন হৃদয়স্পর্শী চমৎকার বর্ণনা, শব্দ ও ভাষাশৈলীর এমন অপূর্ব শক্তিশালী উপস্থাপনা, জীবন ও চরিত্রগঠনের আদেশ-উপদেশপূর্ণ এমন উন্নত দিকনির্দেশনা এবং মর্ম ও ব্যাখ্যার এমন তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপকতা, যা তিনি খুঁজে পাননি পূর্বে পঠিত আসমানি অন্য গ্রন্থগুলোতে।

এ কারণেই তিনি হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে কুরআনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন....

দেহ ও মনের সকল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে ছিলেন কুরআনকে...

কুরআনের জন্যই বর্জন করেছিলেন অন্য সকল আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাকে...

একসময় কুরআনই হয়ে উঠল তার একমাত্র ব্যস্ততার বিষয়...

কুরআনের তিলাওয়াত, গবেষণা এবং তার নির্দেশনামতো জীবনগঠন এটাই হয়ে উঠল তার দিনরাতের সার্বক্ষণিক কর্মসূচি...

কুরআনই হলো তার হৃদয়ের প্রশান্তি, অন্তরের আনন্দ।

তিনি নির্জন ও নিরালায় বসে কুরআনের অবিরাম তিলাওয়াত করতে থাকতেন। জীবন রক্ষার উপযোগী সামান্য সময়ের অনিবার্য ঘুম অথবা এমন কোনো বিষয় যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সামনে না আসা পর্যন্ত চলতেই থাকত তার তিলাওয়াত।

তিনি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা করতেন একজন শিক্ষার্থী ও কুরআনী চেতনার ধারক হিসাবে...

তিনি কুরআনের গভীরে পৌঁছে যেতেন, অন্তর্নিহিত রহস্য ও মর্ম উদ্ধার করতেন একজন কুরআনের শিক্ষক ও এর আদর্শ প্রচারক হিসাবে।

এভাবেই একসময় তিনি পরিণত হন মুসলিম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কুরআন-বিশেষজ্ঞ। সে কারণে বিভিন্ন সাহাবীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে মানুষ বলাবলি করতেন,

'মুসলিম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দীক...'

'আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় আপসহীন, বলিষ্ঠ ব্যক্তি উমর উবনুল খাত্তাব...'

'হালাল- হারাম বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মুআয ইবনে জাবাল...'

'ফারায়েয (বাধ্যতামূলক বিধানাবলি) সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি যায়েদ ইবনে সাবেত...'

'সত্য ভাষণে এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু যর গিফারী...'

'আমানতদারি ও বিশ্বস্ততায় শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ...'

'আল্লাহর কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উবাই ইবনে কাআব...' রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাঈন।

***

দামেস্কের পশ্চিমাঞ্চলীয় এক গ্রাম 'জাবিয়া'। এখানের এক সমাবেশে খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বক্তব্যের একপর্যায়ে বলেন,

'ভাই সকল!

যে ব্যক্তি কুরআনের বিষয়ে জানতে চায় সে যেন উবাই ইবনে কাআবের কাছে যায়।

যে ফারায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চায় সে যেন চলে যায় যায়েদ ইবনে সাবেতের কাছে।

যে মাসআলা-মাসায়িল বিষয়ে জানতে চায় সে যেন মুআয ইবনে জাবালের কাছে যায়।

যে ব্যক্তির প্রয়োজন অর্থ-সম্পদ সে যেন চলে আসে আমার কাছে।

কারণ, আমাকে আল্লাহ বানিয়েছেন সম্পদের হেফাজতকারী শাসক এবং অভাবীদের মাঝে তার বণ্টনকারী।'

***

আল্লাহ তাআলা উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দান করেন এমন এক অনন্য মর্যাদা, যার কারণে তার হৃদয় মহান আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

আল্লাহর দেওয়া সীমাহীন মর্যাদা প্রাপ্তির অসীম আনন্দে উল্লসিত এই মহান সাহাবীর দু'চোখ বেয়ে বইতে থাকে আনন্দের অশ্রুধারা।

বিষয়টি ছিল এই, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন,

'হে উবাই, আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন যেন তোমাকে কুরআন পড়ে শোনাই।'

এ কথা শুনে তিনি ভ্রুর ওপর হাত রেখে অবাক হয়ে রাসূলের প্রতি হাঁ করে তাকালেন। যেন তার কান যা শুনল তা বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই সারা দুনিয়ার সব বিস্ময় কণ্ঠে ঢেলে জিজ্ঞাসা করলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার কাছে কি আল্লাহ আমার নাম বলেছেন?!
আমি কি আলোচিত হয়েছি রাব্বুল আলামীনের কাছে?!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভাব ও ভাষা দেখে মৃদু হেসে বললেন,

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ হে উবাই, তোমার নাম ধরেই আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন।’

এ কথা শুনে খুশি ও আনন্দে উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চোখমুখ ঝলমল করে উঠল।

দু’চোখে আনন্দের অশ্রু বইতে লাগল শ্রাবণের অঝোর ধারায়।

প্রাণখুলে বারবার বলতে থাকলেন,
‘প্রশংসা তোমার হে আল্লাহ।’ ‘শোকর তোমার...।’

***

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাআবকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন,

‘হে উবাই, কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত কোনটি?’

তিনি উত্তরে বললেন,
‘কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত হলো আয়াতুল কুরসী।’

এই উত্তর শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশি হলেন এবং তার বুকের ওপর নিজের পবিত্র হাত রেখে বললেন,

‘হে আবুল মুনযির, জ্ঞানসাধনায় তুমি সফল হও, সুখী হও।’

***

উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দীনি মর্যাদা কেমন শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল সেটা বোঝা যায় এই তথ্য থেকে, তিনি সেই মহাসৌভাগ্যবান ছয়জনের এক সদস্য যারা স্বয়ং রাসূলের জীবদ্দশায় উদ্ভূত সমস্যা ও সংকটের সমাধানে নিজেদের মত বা ফতোয়া প্রদান করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ফতোয়া প্রদানকারী ভাগ্যবান তিন মুহাজির সাহাবী হলেন,

- উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু...
- উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু...
- আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু...

আর ভাগ্যবান তিন আনসারী সাহাবী হলেন,

- উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু...
- মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু...
- যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু...

***

উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেমনিভাবে ইলমের জগতে ছিলেন একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র, একইভাবে তাকওয়া ও পরহেজগারি, ইবাদত ও যুহদের ময়দানেও ছিলেন এক উজ্জ্বল প্রদীপ।

একদিন তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করছেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যে রোগ-শোক ও বিপদ-মুসিবতে আক্রান্ত হই এতে কি আমাদের কোনো উপকারিতা আছে?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন,

'সামান্য কাঁটা ফোটার কষ্ট অথবা এরচেয়ে কমবেশ যা-ই হোক না কেন ফল একই।'

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুআ ও প্রার্থনা করলেন,

'মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যেন জ্বরে আক্রান্ত থাকেন। তবে সেই জ্বর যেন তাকে হজ-উমরা পালনে, আল্লাহর জন্য জিহাদে গমন এবং জামাতের সঙ্গে নামায আদায়ে বাধা দিতে না পারে।'

এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব সময়ই তার শরীর থাকত উত্তপ্ত। যে কেউ স্পর্শ করলেই বুঝতে পারত তার শরীরের সেই জ্বরের উত্তাপ।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে মিলিত হওয়ার পর উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের জীবনকে উজাড় করে দেন মানুষকে কুরআনী শিক্ষা দানের কাজে, আল্লাহর দীনের বিধি-বিধান ও ইসলামী শরীয়তের হুকুম-আহকাম শিক্ষাদানে এবং মানুষকে জান্নাতের পথের সন্ধান দানে।

এর ফলে দলে দলে মানুষ তার কাছে আসতে থাকে। বহু মানুষ তার চারপাশে ভিড় করতে থাকে।

একদিন তার কাছে এসে এক ব্যক্তি বললেন,
'হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী, আমাকে একটু উপদেশ দিন।'

তিনি বললেন,
'কুরআনকে জীবনাদর্শ হিসাবে আঁকড়ে ধরো,

তোমার জীবনসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও একমাত্র মীমাংসা হিসাবে কুরআনের বর্ণিত নীতিমালাতেই তুষ্ট থাকো। কারণ, এটাই তোমাদের জন্য রাসূলের স্থলাভিষিক্ত—যে কথা তিনি নিজেই তোমাদের বলে গিয়েছেন।

মনে রেখো, কুরআন তোমাদের জন্য সুপারিশকারী, কুরআন মান্য ও অনুসরণীয়....

কুরআন পাপীদের বিরুদ্ধে সন্দেহাতীত সাক্ষ্য প্রদানকারী...

কুরআন এমন বিস্ময়কর গ্রন্থ যেখানে তোমাদের এবং পূর্বসূরিদের আলোচনা রয়েছে...

এতে সমাধান রয়েছে তোমাদের অভ্যন্তরীণ সকল সমস্যার...

এতে বিবৃত হয়েছে তোমাদের সংবাদ এবং তোমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ ও পরবর্তীদের সংবাদ।'

***

অন্য একজন এসে তাকে বললেন,

'হে আবুল মুনযির, আমাকে একটু নসিহত করুন।'

তিনি বললেন,

'খবরদার! নিজেকে কোনো অনর্থক কাজে জড়িয়ো না।

জীবিত ব্যক্তির এমন কিছু দেখে ঈর্ষা কোরো না, মৃত্যুর পর যেটাকে ঈর্ষাযোগ্যই মনে হবে না। এমন কারও কাছে সাহায্য চেয়ো না, যে তোমার অভাব পূরণের পরোয়া করে না।'

***

খাবার চুরি হয়ে যাওয়ার কারণে বিষণ্ন এক ব্যক্তি মসজিদে গেলেন, উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে সালাম দিলেন এবং তার প্রতি সমবেদনার উদ্দেশ্যে বললেন,

'আল্লাহর জন্য কেউ কিছু ত্যাগ করলে, তার বদলে আল্লাহ তাকে আরও উত্তম বস্তু দান করেন...

আর কেউ হারাম উপায়ে কিছু গ্রহণ করলে আল্লাহ তার কাছ থেকে ওর চেয়ে আরও ভালো কিছু কেড়ে নেন।'

***

উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত আশ্রয়স্থল হয়ে রইলেন ইলম শিক্ষার্থীদের কাছে। বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা তার কাছে এসে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতেন। তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এ শিক্ষাদানের ধারা।

জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

'আমি ইলম শেখার উদ্দেশ্যে মদীনায় এসে মসজিদে নববীতে ঢুকলাম। দেখতে পেলাম অনেকগুলো হালাকা বা শিক্ষার আসর। শিক্ষার্থীরা কোনো একজন শিক্ষককে ঘিরে বসে আছেন। আমি একটি একটি হালাকা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। সবশেষে একটি হালাকায় গিয়ে থামলাম। সেখানে শিক্ষকের আসনে বসা মানুষটি ছিলেন দুর্বল ও শীর্ণদেহী। তার অবয়বে স্পষ্ট ছিল ক্লান্তির ছাপ। তার পোশাকের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি দীর্ঘ পথ সফর করে এসেছেন।

যাই হোক, সেই হালাকায় আমি বসে পড়লাম। শিক্ষক দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করলেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলোচনা শেষ হলে তিনি উঠে পড়লেন এবং বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। আমি তখন পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম,

'এই উস্তাদ কে?'

লোকটি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিরস্কার করে বললেন,
'ছি ছি, তুমি চেনো না উনাকে?!...

তিনিই তো বর্তমান মুসলিম জাতির সরদার...
উবাই ইবনে কাআব আল-আনসারী।'

জুনদুব বলেন,
'আমি তাকে অনুসরণ করতে করতে তার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। বাড়িটি ছিল ফকির-মিসকিনদের মতোই ভাঙাচোরা।

বুঝলাম, তিনি একজন নির্মোহ যাহেদ ও দুনিয়াত্যাগী আবেদের সাদাসিধা জীবনযাপন করেন।

আমি তাকে সালাম দিলাম, তিনি খুব সুন্দর করে সালামের জবাব দেওয়ার পর জানতে চাইলেন,

'কোথা থেকে এসেছেন?'

আমি বললাম,

'ইরাক থেকে এসেছি।' এরপর আমি তাকে প্রশ্ন করতে যাব এমন সময় তিনি বলে উঠলেন,

'আজ দরসে অনেক বেশি সময় লেগেছে। উপস্থিতি বেশি ছিল।'

তার এই কথা শুনে আমার খুব রাগ হলো। আমি কেবলামুখী হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত তুলে বলতে লাগলাম,

'হে আল্লাহ, তোমার কাছে জানাচ্ছি আমার মনের ব্যথা...

কত অর্থ খরচ করে, কত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে, শরীরের আরাম হারাম করে ইলম শিখতে এলাম। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে এলাম তারা দেখছি বিরক্ত হচ্ছে আমাদের দেখে...'

আমার কথাটি শোনামাত্রই উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাঁদতে শুরু করলেন। আমাকে খুশি করার চেষ্টায় তিনি বললেন,

'আরে বোকা! আমি কখন বিরক্ত হলাম? তুমি যা বুঝেছ আমি সেটা বোঝাতে চাইনি।'

এরপর তিনি বললেন,

'আমি তোমার নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি হে আল্লাহ, যদি তুমি আগামী জুমআ পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখো, তাহলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান থেকে যা শুনেছি তা স্পষ্ট করে আলোচনা করব। এবং এতে কারোর কোনো অভিযোগ এবং তিরস্কারের পরোয়া করব না।'

তার এই কথা শোনার পর আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম এবং পরের জুমআর দিনের অপেক্ষা করতে থাকলাম।

বৃহস্পতিবারে একটি প্রয়োজনে আমি বের হয়ে দেখি রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। যে পথেই যাই, দেখি মানুষ আর মানুষ।

বাধ্য হয়ে একজন পথচারীকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

'ভাই, এত মানুষ কিসের জন্য পথে? কী হয়েছে?'

– 'নিশ্চয় আপনি এখানের স্থানীয় মানুষ নন?'

– 'ঠিকই ধরেছেন ভাই, এখানে আমি একজন পরদেশি।'

– 'ভাই, আজ সাইয়িদুল মুসলিমীনের বিদায় হয়ে গেছে। উবাই ইবনে কাআব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইন্তেকাল হয়ে গেছে।'

***

আল্লাহ তাআলা উবাই ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কবরকে সমুজ্জ্বল করে দিন, যিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ওহী লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

যিনি ছিলেন এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কুরআন-বিশেষজ্ঞ।

মহান আল্লাহ তাআলা হয়েছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাকেও করেছেন সন্তুষ্ট।

তথ্যসূত্র :

১. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।
২. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।
৩. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১ম খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৩২।
৫. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা।
৬. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা।
৭. *আত-তাবাকুতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা।

মাইসারা ইবনে মাসরূক আল-আব্‌সী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম সেনাপতি যিনি মাত্র ছয় হাজার যোদ্ধা নিয়ে বিশাল শক্তিধর রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের তিন বছর পরের কথা।

জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর বাণী নিয়ে রাসূলের কাছে হাজির হলেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

'অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন আপনাকে যা আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।' —সূরা আল-হিজর : (১৫) ৯৪

মহান আল্লাহর এই নির্দেশ নাজিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন যে, ইসলাম প্রচারের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেল। তাঁকে এখন গোপনীয়তা ছেড়ে প্রকাশ্য পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হতে হবে।

সে জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই নির্দেশ বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠলেন এবং প্রকাশ্যে মানুষকে আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতে শুরু করে দিলেন।

আরবের প্রতিটা সমাবেশেই তিনি ছুটে গিয়ে ইসলামের বাণী পেশ করতে থাকেন, প্রতিটা গোত্র-শাখাগোত্রের মানুষদের কাছে গিয়েই দীনপ্রচারের কাজে সহযোগিতা ও সমর্থন চাইতে থাকেন।

***

আরবের সকল কবীলা, গোত্র ও উপগোত্রের লোকেরা প্রতিবছর প্রায় দুই মাসব্যাপী চলা উকায, মাজান্না ও যুল মাজায মেলাগুলোতে অংশগ্রহণ করত...

সেখানে কেনাবেচা করত নানা রকম পণ্য...

স্বরচিত কাব্য প্রতিযোগিতার জমজমাট আসর বসানো হতো...

মঞ্চে উঠে নিজ নিজ গোত্রের ঐতিহ্য-অবদানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের আয়োজন থাকত...

আয়োজন থাকত নানা রকম চিত্তবিনোদনের...

গানবাদ্য, নৃত্যগীত আর মদ্যপানের ব্যবস্থা হতো ওই মেলাগুলোর প্রধান আকর্ষণ...

দুই মাসব্যাপী দীর্ঘ এই বাণিজ্য ও আনন্দমেলা শেষ করেই সবাই ছুটে চলে যেত পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে হজ পালনের উদ্দেশ্যে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরববাসীর এই মহামিলনকে গণ্য করতেন ইসলাম প্রচারের এক মহামূল্যবান ও সোনালি সুযোগ। যেখানে সমবেত হয়ে থাকে সমগ্র আরবের প্রায় সকল মানুষ...

তিনি একটি একটি করে প্রত্যেক কবীলা-গোত্রের কাছে যেতেন...

আলাদা আলাদা করে প্রত্যেক পরিবারের খোঁজ নিতেন।

তাদের কাছে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। ইসলাম কবুলের আহ্বান তুলে ধরতেন। তাদের কাছে কুরাইশদের অসহযোগিতার কথা জানিয়ে আপন প্রভুর দীনপ্রচারের মহান কাজে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা চাইতেন। সহযোগিতার পুরস্কার হিসাবে তাদের নিশ্চিত জান্নাত পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেন।

তাঁর এসব বক্তব্য শোনার পর শ্রোতাদের অবস্থা হতো তিন ধরনের।

একদল তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করত, পাথর ছুঁড়ে মারত আবার কেউ কেউ তাঁর কাছাকাছি উট বেঁধে দিত যেন তাঁকে লাথি মেরে ফেলে দেয়।

অল্প কিছু মানুষ এমনও হতেন, যারা কোমল ভাষায় তাঁর কথার জবাব দিতেন।

কিন্তু মানুষের এত বাধা, অসহযোগিতা ও কষ্টপ্রদান সত্ত্বেও তিনি ক্লান্ত হন না, বিরক্ত হয়ে কাজের গতি কমান না। হাল ছাড়েন না।

***

ওই রকম এক বিশাল মেলার উৎসবে যোগ দিলেন 'আব্‌স' গোত্রের লোকজন। কেনাবেচা শেষ করে যথারীতি তারা হজ পালনের উদ্দেশ্যে মিনায় চলে গেলেন। সেখানে মসজিদে খাইফের কাছাকাছি 'জমরায়ে উলা'তে অবস্থান নিলেন।

এখানেই তাদের কাছে এলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি নিজের উটনীতে চড়ে, নিজের প্রিয়পাত্র যায়েদ ইবনে হারেসাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

আব্‌স গোত্রের লোকজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আলোচনা অনেকবার শুনলেও এতদিনেও তাঁকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পায়নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাহন থেকে নেমে তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন। অতি চমৎকারভাবে তাদের কাছে

ইসলামের সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করলেন। কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করে শোনালেন। জান্নাতের অকল্পনীয় আনন্দ ও সুখের বর্ণনার পাশাপশি জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব ও শাস্তির বিবরণ তুলে ধরলেন। আল্লাহর নির্দেশিত দীনপ্রচারের এই মহৎ কাজে নিজ বংশ কুরাইশের সহযোগিতা না পাওয়ার বেদানাদায়ক সংবাদ শুনিয়ে তিনি তাদের কাছে এই কাজে তাকে সমর্থন ও সহযোগিতার আবেদন জানান। তিনি আব্‌স গোত্রের লোকদের জানিয়ে দেন যে, মহান প্রভুর এই দীন প্রচারের কাজে যারা তাকে সহযোগিতা করবে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত লাভের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

***

ওই কওমের লোকদের মধ্যে একজন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন। নাম তার মাইসারা ইবনে মাসরূক আল-আব্‌সী।

তিনি কওমের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন,

'হে আমার কওমের ভাইয়েরা, চলুন আমরা এই মানুষটিকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর কাজে সহযোগিতা করি। কারণ, আল্লাহর কসম তাঁর মতো এত চমৎকার, এত আকর্ষণীয় কথা ইতিপূর্বে আর কখনো শুনিনি।'

এই কথা শুনে কওমের একজন তাকে বোঝাল এই বলে,

'মাইসারা, ব্যাপারটি নিয়ে আপনার এই উল্টো ভাবনা ভাবা উচিত নয়। শুনলেন না, তাঁর নিজ কওমই তাঁকে সাহায্য করেনি। আপনার আমার চেয়ে তারাই এর ব্যাপারে বেশি জানে। তাঁর মধ্যে সত্যিকারেই ভালো কিছু থাকলে তাঁর কওম নিশ্চয় তাঁকে পরিত্যাগ করত না। তারা নিশ্চয় এই ভাবে তাঁকে বিভিন্ন কওমের কাছে ধরনা দেওয়ার সুযোগ দিত না। এভাবেই তিনি সকল গোত্রের কাছেই সহযোগিতা চেয়ে বেড়ালেও দেখা যাচ্ছে তাঁকে সাহায্যের জন্য কেউই এগিয়ে আসেনি।'

অন্য আরেকজন বলে উঠল,

'মাইসারা, আমিও বলছি বিষয়টিকে এখানেই শেষ করে দাও।

লোকটি যাকেই তার অনুগত বানিয়ে নিজ কওমের কাছে যাবে, সেটাই হবে এবারের উৎসবকালের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘটনা।'

এসব কথা শুনে মাইসারা খুব ব্যথিত হয়ে জোরালো ভাষায় বললেন,

'আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, এই মহান মানুষটির প্রচেষ্টা একদিন অবশ্যই সফল হবে এবং তাঁর দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে...

তোমরা আমার কথা মেনে নিয়ে তাঁকে আশ্রয় দাও। তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করো।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইসারার কথা শুনে অভিভূত হয়ে পড়লেন। আশান্বিত হয়ে তার কাছে এগিয়ে গেলেন।

মাইসারা তখন বললেন,

'আল্লাহর কসম! আপনার কথার চেয়ে উত্তম কথা আমার জীবনে আজ পর্যন্ত শুনিনি। আপনি যে বিষয়ের দাওয়াত পেশ করছেন, এর চেয়ে ভালো কোনো বিষয়ের কথা আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি।

কিন্তু আমার কওমের লোকেরা আমার সঙ্গে একমত হতে পারল না।
আপনি তো সবই দেখলেন তারা কীভাবে আমার বিরোধিতা করছে।
আমি একা কওমের বিরুদ্ধে কী করতে পারি?'

***

আব্‌স গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাক্ষাতের পর এক এক করে কেটে গেল কুড়ি বছর। এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে ঘটে গেছে কত পরিবর্তন! আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর সৈনিক মুসলিমদের শক্তিশালী করে দিয়েছেন। মদীনায় তাঁর রাসূলের রাষ্ট্রক্ষমতাকে সুসংহত করেছেন। তাঁর সুখ্যাতি ও পরিচিতিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। এককালে যেই জালেম কুরাইশ মক্কার ভূমিতে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, সেই মক্কাভূমিকে তিনি জয় করে নিয়েছেন। সেই দুর্বিনীত জালেম কুরাইশকে মহান আল্লাহ তাঁর নবীর অনুগত করে দিয়েছেন।

এখনো যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, আরব ভূমির সকল প্রান্ত থেকে তারা দলে দলে ছুটে আসছে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণের জন্য। তাঁর হাতে আনুগত্যের শপথ নেওয়ার জন্য।

বিদায় হজের অল্প কদিন পূর্বে যেসব প্রতিনিধিদল এসে প্রিয় নবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তাদেরই একদলের সদস্য ছিলেন মাইসারা ইবনে মাসরূক আল-আব্‌সী।

তিনি রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে কালেমা শাহাদাত পাঠ করার পর জিজ্ঞাসা করলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে কি চিনতে পেরেছেন?'

তিনি জবাব দিলেন,

'হ্যাঁ, তুমি তো মিনা প্রান্তরে খাইফের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থানকারী গোত্রের সেই যুবক, যে আমার পক্ষে সেদিন অনেক জোরালো ভূমিকা পালন করেছিল।'

মাইসারা বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের আব্‌স গোত্রের অস্থায়ী সেই অবস্থানস্থলে যখন আপনি উটনীর পিঠ থেকে অবতরণ করেছিলেন, আপনার কথাগুলো শোনার প্রথম মুহূর্ত থেকেই আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল আপনার অনুসারী হব।

কিন্তু দেখুন ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! সেই আমার ইসলাম গ্রহণ করতে মাঝখানে কুড়িটি বছর পেরিয়ে গেল। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার ইসলাম গ্রহণ করতে কত বিলম্ব হলো! অথচ সেইদিন যারা আমার সঙ্গে ছিল তারা কেউই আজ বেঁচে নেই। আমার জানতে ইচ্ছা করে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখন তারা কোথায় আছে?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'ইসলাম গ্রহণ ছাড়াই যার মৃত্যু হয়েছে, তার ঠিকানা নিঃসন্দেহে জাহান্নাম।'

এ কথা শুনেই মাইসারার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল, তারপর তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَنِىْ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ

'অসংখ্য অগণিত প্রশংসা জানাচ্ছি সেই মহান আল্লাহর প্রতি যিনি আপনার মাধ্যমে আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।'

***

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন এই নশ্বর পৃথিবীর মায়া ছেড়ে।

খেলাফত রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হলো সিদ্দীকে আকবার রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর।

'রিদ্দতের' ফিতনা ব্যাপকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আরব ভূমির চতুর্দিকে দলে দলে ইসলাম ত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল।

আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ 'যাকাত অস্বীকার'-এর এক নতুন ফেতনা দাঁড় করিয়ে বলতে লাগল,

'নামায আমরা ঠিকঠাক মতোই আদায় করব, কিন্তু যাকাত দেব না।'

'একদিকে যাকাত অস্বীকার' আর 'অন্যদিকে ইসলাম ত্যাগ করে ভণ্ড নবীর অনুসরণ' এই দ্বিমুখী ফেতনার চাপে মুসলিমসমাজ কোণঠাসা হয়ে পড়ল। সদ্য গঠিত ইসলামী রাষ্ট্র মদীনার জনগণ আতঙ্কিত হলেন এই ভেবে যে, উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল রওনা করে দেওয়ার ফলে মদীনা এখন মুজাহিদশূন্য। মদীনার এই অরক্ষিত অবস্থার কথা ভেবে মুরতাদ ও ধর্মত্যাগীরা মদীনার ওপর আক্রমণ করে বসে কি না।

সম্ভাব্য ওইসব আশঙ্কা ও আতঙ্কের কথা ভেবে অনেকেই খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে অনুরোধ করলেন,

‘মহামান্য খলীফা,

যারা যাকাত দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে, তাদের যাকাতের জন্য বাধ্য না করে বরং তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করুন। কেননা, তারা নামাযকে অস্বীকার করছে না। অতএব তাদের সুযোগ দিলে নামায আদায় করতে করতে একসময় ঈমান সুদৃঢ় হয়ে গেলে তারা নিজেরাই আবার যাকাত দেওয়া শুরু করে দেবে।’

সাহাবীদের মাঝে সর্বাধিক নরম ও কোমল ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই নরম ও মিষ্টি অনুরোধ শোনার সঙ্গে সঙ্গে চরম গরম হয়ে উঠলেন এবং আহত সিংহের মতো গর্জে উঠে বললেন,

وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ... وَالَّذِىْ بَعَثَ نَبِيَّه بِالْحَقِّ ’لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَه لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ

‘আল্লাহর কসম যারা নামায আর যাকাতের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করবে, আমি কিছুতেই তাদের ছেড়ে দেব না। তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

সেই আল্লাহর নামে কসম করে বলছি যিনি তাঁর নবীকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তারা যদি যাকাতের পশুর রশিগুলোও না দিতে চায়, যা রাসূলের সময় দেওয়া হতো, তাহলে আমি এর জন্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।’

***

সেই উদ্বেগজনক ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ফেতনার সময়ে একদিন মাইসারা ইবনে মাসরূক আল্ আবসী নিজ কওমের বেশ বড় একদল লোক সঙ্গে নিয়ে মুরতাদদের নাকের ডগার সামনে দিয়ে বের হলেন।

তারা সকলেই সম্পদের যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে নাদুসনুদুস ছাগলের পাল আর উত্তম জাতের উটের পাল ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

ওই পশুপালের পিঠে চাপানো ছিল ‘উশর’ হিসেবে প্রদেয় বিভিন্ন শস্য ও ফসল।

এই সব নিয়ে তারা হিজায ভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দীর্ঘ পথের উঁচু-নিচু চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়েই তাদের যেতে হচ্ছিল। উঁচু ভূমিতে চড়ার সময় ‘আল্লাহু আকবার’ আর নিচু জমিনে চলার সময় ‘সুবহানাল্লাহ’ পড়ে পড়ে তারা এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেন।

রাস্তার প্রশস্ততা দখল করে নেওয়া ওই বিশাল পশুপাল নিয়ে মাইসারা সদলবলে মদীনায় প্রবেশ করে সোজা বাইতুল মালের সামনে গিয়ে পশুপাল থামালেন। সেখানেই সেগুলো বাঁধলেন।

মাইসারার কর্মকাণ্ড দেখে মদীনার লোকেরা খুব খুশি হলেন। এমনকি যাকাত অস্বীকারের পরিবেশে প্রকাশ্যে যাকাতের বিশাল পশুপাল নিয়ে এভাবে যাকাতের জোরালো প্রচারে খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাইসারার প্রতি খুবই খুশি হয়ে বললেন,

‘যথাযথ যাকাত প্রদানের কারণে আল্লাহ তোমার এবং তোমার কওমের লোকদের ধনে ও জনে, জান-মালে বরকত দান করুন।’

এরপর খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মাইসারা ও তার কওমের অভিভাবক বানিয়ে দিলেন।

***

সেই দিন থেকে মাইসারা ইবনে মাসরূক আল-আব্‌সী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং আল্লাহর তরবারি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝে মহব্বতের গভীর বন্ধন দৃঢ় হয়ে উঠল। মাইসারা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেদিন থেকেই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পতাকাতলে শামিল হয়ে গেলেন এবং তখন থেকেই আল্লাহর পথে অবিরাম জিহাদ করতে থাকলেন। যদিও বয়সে তিনি ছিলেন একজন অতিবৃদ্ধ।

জর্ডানের এক ভয়ংকর যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা যথেষ্ট আশঙ্কাজনক। প্রতিপক্ষ রোমান বাহিনী তাদের প্রায় পরাজিত করে ফেলেছে।

শত্রু রোমান বাহিনীর সারি থেকে দুর্দান্ত পেশিবহুল, শক্ত-পোক্ত, তরতাজা এক যোদ্ধা সামনে বেরিয়ে প্রতিপক্ষ মুসলিম সেনাদের চ্যালেঞ্জ করে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাতে থাকল। ভয়ে মুসলিম সৈনিকরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু বৃদ্ধ মাইসারা ইবনে মাসরূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই নীরবতা সহ্য করতে না পেরে ওই রোমান যোদ্ধার উদ্দেশ্যে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বাধা দিয়ে বললেন,

‘প্রতিপক্ষ একজন শক্তিশালী যুবক, একজন বৃদ্ধ হয়ে তার মোকাবেলা করা আপনার ঠিক হবে না। আপনি ফিরে যান।’

মাইসারা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরপরও ওই রোমান সৈন্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে চাইলে সেনাপতি খালিদ তাকে ধাক্কা দিয়ে সৈনিকদের সারিতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বললেন,

‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে আপনি কি আমীরের কথা মেনে চলার শপথ গ্রহণ করেননি? তাহলে এই মুহূর্তে আমার হুকুম মেনে সৈনিকদের কাতারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ুন।’

আর তখনই রোমান সৈনিকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মুসলিম বাহিনীর এক টগবগে যুবক। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হলো। তবে শেষ পর্যন্ত মুসলিম সৈনিকই দুশমনকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠাল।

***

মহান কৌশলী আল্লাহর অপার কৌশল মূলত সেদিন মাইসারা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য বরাদ্দ ছিল অন্য কিছু। সুতরাং

সেদিনের ওই ময়দানেই মাইসারার সবকিছু শেষ হবে কীভাবে? মহান কৌশলী আল্লাহর হিসাবের খাতায় অঙ্কিত ছিল যে, তিনিই হবেন সেই মহান গৌরবদীপ্ত প্রথম মুসলিম সেনানায়ক যিনি মাত্র ছয় হাজার সৈনিক সঙ্গে নিয়ে বিশাল শক্তিধর রোমের ভেতরে ঢুকে আল্লাহর জন্য জিহাদ করে ভূমিধস বিজয় ও আল্লাহর সাহায্যে ধন্য হবেন বিজয়ীর বেশে অসংখ্য, অগণিত, অকল্পনীয় গনিমতসামগ্রী নিয়ে। যা ছিল সর্বকালের সকল আন্দাজ অনুমানের ঊর্ধ্বে।

তিনিই এই রোম বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম বাহিনীর সামনে খুলে দিয়েছিলেন বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার। কিছুকাল পরে ওই পথ ধরেই দিগ্বিজয়ী মুহাম্মাদ আল-ফাতেহই জয় করেছিলেন কনস্টান্টিনোপল।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩য় খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা; ৭ম খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।
২. *আল-কামিল*, ২য় খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা।
৪. *হায়াতুস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৪৬৯ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৮৩৮১।

হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

আল্লাহর সিংহ, আল্লাহর রাসূলের সিংহ এবং শাহাদাতপ্রাপ্ত শহীদদের সরদার।

এই বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমবয়সী। তারা দু'জন শৈশবে মক্কার গিরিপথে একই সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন।

তা ছাড়া তারা দু'জন ছিলেন পরস্পরের দুধ ভাই। দু'জনেই একই নারীর দুধপান করেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার শেকড়ের বন্ধন ছিল অতি মজবুত ও সুদৃঢ়।

তিনি আর কেউ নন, তিনিই হচ্ছেন হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, মহান রাসূলের আপন চাচা এবং 'সাইয়্যিদুশ শুহাদা' বা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বসেরা শহীদ।

***

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব তখন সবেমাত্র চল্লিশ পেরিয়েছেন।

এবং ওই সময় তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। ছিলেন তাদের নামকরা এক সিংহপুরুষ।

মক্কায় তার সদ্বংশ, নেতৃত্ব ও বীরত্ব ইত্যাদি হাজার রকমের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হতো। মক্কার আবালবৃদ্ধবনিতা তাকে প্রাণখুলে ভালোবাসত। ভক্তি ও শ্রদ্ধাও করত।

এগুলো সবই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার এত মধুর ও মজবুত বন্ধন সত্ত্বেও তার ঈমানের দাওয়াতের প্রতি তিনি কোনো গুরুত্বই প্রদান করলেন না।

আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিকটাত্মীয়দের কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান তুলে ধরলেন, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না।

***

এই হাশেমী সিংহপুরুষ ছিলেন একজন শৌখিন শিকারী। এতে পেতেন সীমাহীন আনন্দ। নিজের গর্বের সিংহভাগ শক্তিই ব্যয় করতেন এই শিকারের পেছনে।

একদিন তিনি ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে, বর্শা দুলিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে শিকার থেকে ফিরছিলেন, হঠাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআনের দাসী তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে খুবই উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল,

'হে আবু আমারা, আজ আপনার ভাতিজার ওপর আবু জাহাল যেভাবে আক্রমণ করেছে আর যে পরিমাণ গালাগালি তাকে করেছে, তা যদি আপনি দেখতেন আর শুনতেন, তাহলে আপনার এই নিশ্চিন্ত ফুর্তির মেজাজ থাকত না। অবশ্যই আপনার অবস্থা হতো অন্যরকম।'

দাসীর কথাগুলো শোনামাত্রই তার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। পিতৃহীন ভাতিজার এই অপমান তিনি কিছুতেই বরদাশত করতে পারেন না। তাই দাসীর কাছে জানতে চাইলেন,

‘এইটা কি তুমি একাই দেখেছ না আরও কেউ দেখেছে?’

দাসী জবাব দিলো,
‘আমি একা না, বহু মানুষ দেখেছে এই দৃশ্য...’

হাশেমী এই বীর সোজা গিয়ে পৌঁছলেন ‘সাফা’ পাহাড়ের পাদদেশে, যেখানে আবু জাহাল তার কওম বনূ মাখযূমের লোকদের নিয়ে এক আসরের মধ্যমণি হয়ে বসেছিলেন। সোজা গিয়ে আবু জাহালের মাথায় ধনুক দিয়ে এত জোরে আঘাত করলেন যে, মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেল।

তিনি ভরা মজলিসে চিৎকার করে কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’-র ঘোষণা দিলেন।

চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,
‘এবার নাও, আমি হামযা ইসলাম গ্রহণ করলাম। কোনো কুরাইশীর ক্ষমতা থাকলে আমাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখুক।’

‘মাখযূম’ গোত্রের লোকজন যখন দেখল যে, তাদের সরদার আবু জাহালের মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরছে, রক্তে তার চেহারা লাল হয়ে গেছে, এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা লাফিয়ে উঠে হামযাকে ঘিরে ধরল।

আবু জাহাল তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল,
‘খবরদার! কেউ হামযাকে ছোঁবে না। কারণ, জনসম্মুখে তার ভাতিজাকে গালাগালি ও রাগারাগি করায় আসলে তারই অপমান হয়েছে। তাকে এভাবে খেপিয়ে তোলা আমাদেরই ভুল।’

***

হাশেমী সিংহ হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়ল মক্কার সর্বত্র। মুশরিক দলের মাথার ওপর সংবাদটি বজ্রপাতের মতো আঘাত করে যেন তাদের সবকিছু লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেল।

অপরদিকে চাচার ইসলাম গ্রহণের সংবাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কতখানি খুশি হলেন সে কথা আর কী বলব!

একই সঙ্গে নগণ্যসংখ্যক দুর্বল মুসলিমদের সেদিন কী অবস্থা হলো? কুরাইশের এত বড় একজন প্রভাবশালী নেতা, বীর সিংহ এক দিকপালের তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় তাদের আনন্দ ও খুশির কথা আমি আর কী বলব? প্রিয় পাঠক আপনার যা ভালো লাগে বলুন! তাদের আনন্দ ও খুশির ব্যাপারে আপনাকে সুযোগ দেওয়া হলো, ভাবুন।

তবে তারা নিজেরা মনে করেন যে, মক্কার জীবনে তাদের সবচেয়ে আনন্দের এবং সর্বাধিক মর্যাদার দিন এসেছিল দু'টি,

এক. যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ...

দুই. যেদিন ইসলাম কবুল করেছিলেন হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু...

এই দুই দিকপাল ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ামাত্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জোরালো ভাষায় এই দাবি তুলে ধরলেন যে,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এভাবে নিজেদের লুকিয়ে গোপনে গোপনে ইবাদত-বন্দেগী আর নয়। আপনি এখনই চলুন, কুরাইশের সকলের সামনে প্রকাশ্যে কাবার তওয়াফ করবেন, তাদের দেখিয়ে, শুনিয়ে সেখানে নামায আদায় করবেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন। তাদের একজনকে সামনে একজনকে পেছনে নিয়ে তাদের প্রহরায় কাবা প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলেন। এবং এই প্রথম প্রকাশ্যে সাত বার বাইতুল্লাহ প্রদক্ষিণ করলেন, এরপর সেখানে প্রকাশ্যে যোহরের নামায আদায় করলেন।

এরপর প্রকাশ্যেই দারুল আরকামে ফিরে গেলেন। কুরাইশের লোকেরা মনে মনে রাগ ও ক্ষোভে ফেটে পড়লেও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না।

***

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করলেন, সর্বপ্রথম তিনি ইসলামের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে। এটাই ছিল ইসলামের জন্য উত্তোলিত সর্বপ্রথম পতাকা। [ভিন্নমতে ইসলামে সর্বপ্রথম পতাকা উত্তোলন করেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।)

বদর যুদ্ধের দিন হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এমন এক ভয়াবহ যোদ্ধারূপ প্রদর্শন করেছিলেন, এমন সব কৌশল দেখিয়ে ছিলেন, যার সামনে মুশরিক বাহিনীর পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর সামনে টিকে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

সত্য ও মিথ্যার প্রথম সেই সশস্ত্র লড়াইয়ের দিনে যখন মুসলিম ও মুশরিক বাহিনী মুখোমুখি দাঁড়াল, আরবের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী উটের মতো হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আত্মপ্রকাশ করলেন দুশমন সৈনিকদের বুকে ত্রাস হয়ে।

সেদিন তিনি বুকে বেঁধেছিলেন সেই বিখ্যাত ফিতা (বেল্ট), যা ছিল তার অনন্য বীরত্বের চিহ্ন, ছিল তারই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচিতিচিহ্ন। যেই ফিতাটি তৈরি করা হয়েছিল লালরঙা উটপাখির সুন্দর পালক দিয়ে। এই সব সাজে যখন তিনি মুসলিম বাহিনীর সম্মুখ সারিতে এসে দাঁড়ালেন...

উল্টো দিকে মুশরিক বাহিনীর সারি থেকে তখন সামনে এগিয়ে এল আসওয়াদ ইবনে আব্দুল আসাদ, যে ছিল হিংসুক, লম্পট ও বদমেজাজি। সে চিৎকার করে বলল,

'আমি লাত ও উয্যা দেবীর নামে শপথ করে বলছি, মুসলিম বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত জলাশয় থেকে অবশ্যই পানি পান করব। যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই, তাহলে ওই জলাশয়কেই ধ্বংস করে ফেলব যেন কোনো মুসলিম সৈনিকও পান করতে না পারে। এর জন্য প্রয়োজন হলে লড়াই করে জীবন দেব।'

তার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জের জবাবে হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। আরও বাড়াবাড়ি করলে হামযা তার পায়ের গোছায় তরবারির এমন এক কোপ মারলেন যাতে পায়ের গোছা উড়ে গেল দূরে। সে ধপাস করে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হাঁটুর নিচ দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকল। তারপরও সে হামাগুড়ি দিয়ে সেই জলাশয়ের দিকে আগাতে থাকল কসম পূর্ণ করার জন্য। হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবার চূড়ান্ত আঘাত করে তার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিলেন যেন গন্তব্যের দিকে পৌঁছুতে না পারে।

***

এরপর মুশরিক বাহিনীর সারি থেকে সামনে এগিয়ে এল উতবা ইবনে রাবীআ। তাকে এগিয়ে যেতে দেখে তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল তারই ভাই এবং পুত্র। যথাক্রমে শাইবা ইবনে রাবীআ এবং ওয়ালীদ ইবনে উকবা। সৈনিকদের কাতার থেকে সামনে এসেই তারা প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলল,

'সাহস থাকলে আমাদের সঙ্গে এসে মল্লযুদ্ধ করো।'

চোখের পলকে বর্শার বাঁটের মতো হালকা তিন আনসারী যুবক তাদের মোকাবেলার জন্য সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

উতবা জানতে চাইল,
'তোমরা কারা?'

তারা বললেন,
'আমরা আনসার বাহিনীর সদস্য।'

উতবা বলল,

'তোমাদের সঙ্গে আমাদের লড়াই নেই। তোমরা ফিরে যাও।'

এরপর তারা তিনজন একসঙ্গে চিৎকার করে বলল,

'মুহাম্মাদ! আমাদের জাতভাই কুরাইশী বীরদের পাঠাও। আমরা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনজন বীর কুরাইশীকে নির্দেশ দিয়ে বললেন,

'উবাইদা ইবনুল হারিস, হামযা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব এবং আলী ইবনে আবু তালিব তোমরা যাও...'

উতবা খুশি হয়ে বলল,

'হ্যাঁ, এমনটাই চাই। এবার হবে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই।'

আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গিয়ে তার সমবয়সী ওয়ালীদ ইবনে উতবার মুখোমুখি হলেন। সামান্য সময় লড়াই করেই তাকে হত্যা করে ফেললেন।

এরপর হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এগিয়ে গেলেন তার জুটি শাইবা ইবনে রাবীআর দিকে। বেশি সময় নিলেন না তিনিও। দেখতে না দেখতেই আল্লাহর দুশমনকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

এবার প্রবীণ উবাইদা ইবনুল হারিস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পালা। তিনিও তার প্রতিপক্ষ উতবা ইবনে রাবীআকে লড়াই করে হত্যা করে ফেললেন। তবে দুশমনের যে গভীর আঘাতে তিনি আহত হয়েছিলেন, তার প্রভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন।

দেখতে না দেখতেই কুরাইশের নামকরা এই তিন বীর যোদ্ধার লাশ যুদ্ধের ময়দান গরম করে তুলল। সাইয়িদুশ শুহাদা বীর হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই যুদ্ধে বীরত্ব ও রণকৌশলের এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন, যা দেখে মুশরিক বাহিনীর অন্তরে ভীতি ও ত্রাসের ছাপ বসে

গেল। মুসলিম বাহিনীর সামনে তারা ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হারিয়ে ফেলল। তবে তারা মুসলিম বাহিনীর বীর সিংহ হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিরুদ্ধে বুকভরা হিংসা ও প্রতিশোধের জিঘাংসা নিয়ে মক্কা ফিরে গেল।

***

মক্কার মুশরিক কুরাইশ বাহিনী পরবর্তীতে হৃদয়ের সেই জিঘাংসা ও প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হলো ওহুদের রণাঙ্গনে। আজ তাদের প্রত্যেকের অন্তরে সেই সকল মুসলিম সৈনিকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, যাদের হাতে তাদের স্বজনেরা বদরে নিহত হয়েছে। বিশেষত হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজ তাদের প্রতিটা সৈনিকের প্রধানতম লক্ষ্যবস্তু। কারণ, তিনিই বদরে হত্যা করেছেন তাদের বড় বড় জাঁদরেল নেতাদের।

ওহুদের ময়দানের প্রথম চিত্র—যেখানে মুসলিম বাহিনীর বিজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা বুঝেই কুরাইশ বাহিনী ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, আর ঠিক তখনই শুরু হয় ময়দানে পরাজয়ের দ্বিতীয় চিত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারবার করা সতর্কবাণী ভুলে ময়দানের দুর্বলতম, অরক্ষিত পাহাড়ি পথের প্রহরা ছেড়ে মুসলিম বাহিনী নিচে নেমে পড়ে। আর সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে বিখ্যাত বীর খালেদ ইবনুল ওয়ালীদের নেতৃত্বে পলায়নপর মুশরিক বাহিনী অরক্ষিত পাহাড়ের সেই দিক দিয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়ে। তারা এলোমেলো, অপ্রস্তুত মুসলিম বাহিনীর ওপর পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলাফল যা হবার তা-ই হয়। মুসলিম বাহিনীর অনেকেই শহীদ হন। অনেকেই এমনকি প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত অরক্ষিত রেখে পালাতে থাকেন।

ওহুদের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর এই চরম বিশৃঙ্খল ও পরাজয়ের অবস্থা দেখে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব চিৎকার করে বলতে লাগলেন,

‘আমি আল্লাহর সিংহ, আমি রাসূলুল্লাহর সিংহ...

হে আল্লাহ, মুশরিক বাহিনী তোমার দীন মেটানোর উদ্দেশ্যে যা করেছে, তার সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই...

হে আল্লাহ, মুসলিম বাহিনী যেভাবে তোমার নবী থেকে দূরে সরে গেছে, এদের পাপের শাস্তি আমাকে দিয়ো না। আমি ময়দান ছেড়ে পালাব না। আমি আসাদুল্লাহ...'

এরপর তিনি সিংহের মতো ডানে-বামে দুর্দান্ত গতিতে তরবারি চালাতে থাকলেন, হঠাৎ ওয়াহশী নামের এক হাবশী ক্রীতদাসের গোপন আক্রমণে তিনি শহীদ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন জমিনে। (আক্রমণকারী ওয়াহশী পরে মহানবীর কাছে ইসলাম কবুল করেন।)

***

মক্কা থেকে ওহুদের উদ্দেশে রওনার সময় কুরাইশ বাহিনী সঙ্গে এনেছিল একদল প্রতিহিংসাপরায়ণ নারী। বদর যুদ্ধে স্বজন হারানো এই নারীদলের নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা (পরবর্তীকালে ইসলাম কবুলকারিণী)।

ওহুদ যুদ্ধে অনেক মুসলিম সৈনিকের নিহত হওয়ার খবর বিশেষত আসাদুল্লাহ হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব নিহত হওয়ার খবর শুনে নারীরা এক ভীষণ পৈশাচিক আনন্দে মেতে উঠল।

তারা হিন্দ বিনতে উতবার নেতৃত্বে হুড়মুড় করে ময়দানে ঢুকে পড়ল। বদর যুদ্ধে হিন্দের পিতা উতবা, ভাই ওয়ালীদ আর চাচা শাইবা তিনজন উবাইদা, আলী ও হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের হাতে নিহত হওয়ায়, তাদের হত্যা-প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল তার বুকের মধ্যে। প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে তিনি লাশের সারিতে একে একে উল্টে উল্টে হত্যাকারীদের সন্ধান করতে থাকেন। নৃশংসতার ইতিহাস সৃষ্টি করে তিনি মরা লাশের পেট ফেঁড়ে, চোখ উপড়ে, নাক ও কান কেটে বিকৃত করতে থাকেন।

শুধু এতটুকুই নয়। কর্তিত সেই সব নাক ও কান সুতায় গেঁথে গলার মালা আর পায়ের মল বানিয়ে পরলেন। আর হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যার পুরস্কারস্বরূপ নিজের সকল স্বর্ণালংকার তুলে দিলেন ওয়াহশীর হাতে।

এই সব অপকর্ম শেষ করে অবশেষে তিনি পৌঁছে গেলেন হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লাশের কাছে। তার বুক ফেঁড়ে দু'ভাগ করে ফেললেন। তার কলিজা টেনে ছিঁড়ে বের করে চাবাতে থাকলেন। কিন্তু চিবিয়ে সেটা গেলা সম্ভব হলো না। তাই থু করে ফেলে দিলেন। এ কারণেই তার নাম হলো 'কলিজাখাদক নারী'।

***

যুদ্ধ থেমে গেল। চারদিকে মুজাহিদদের লাশের নৃশংস বিকৃতির খবর ছড়িয়ে পড়ল। মদীনাকে শোকের গভীর কালো ছায়া আচ্ছন্ন করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুপু সফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব এলেন শহীদ ভাই হামযার লাশের সঙ্গে কৃত বর্বরতম অবস্থা দেখার জন্য।

দূর থেকে তাকে দেখেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পুত্র যুবাইরকে তাড়া দিয়ে বললেন,

'শিগগির যাও, তোমার মাকে ফেরাও। শহীদ ভাইয়ের ভয়াবহ বিকৃত লাশ যেন তাকে দেখতে না হয়।'

দৌড়ে গিয়ে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাকে বললেন,

'মাগো, আল্লাহর রাসূল আপনাকে এখানে আসতে নিষেধ করেছেন। চলুন আমার সঙ্গে, আমরা বাড়ি ফিরে যাই।'

সফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন,

'কিন্তু কেন? আমি তো খবর পেয়েই দেখতে এসেছি। আমি জেনেছি যে, আমার ভাইয়ের মৃতদেহের সঙ্গে কীরূপ বীভৎস আচরণ করা

হয়েছে। এই বিকৃতি ও বীভৎসতা আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। তিনি দেখেছেন সবকিছু।

আল্লাহর কসম! আমি বিচলিত হব না; বরং আমি মনে করব আমার ভাইয়ের জীবন-মরণ আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত হওয়ার পর এমনকি মরণের পরেও তার সঙ্গে কৃত নৃশংসতারও তিনি পুরস্কার পাবেন এবং ইনশাআল্লাহ এই দৃশ্য দেখে ধৈর্য ধরার কারণে তিনি আমাদেরও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করবেন না।'

মায়ের এই সাহসী ও দৃঢ়চেতা মন্তব্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানোর পর তিনি যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন,

'তাহলে আর বাধা দিয়ো না। যেতে দাও তাকে।'

সফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা শহীদ ভাই আসাদুল্লাহ হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিকৃত মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়ালেন। 'ইন্না... লিল্লা...হি ওয়াইন্না... ইলাইহি রা...জিউ...ন' পড়লেন। তার জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর দুই প্রস্থ কাপড় বের করে দিয়ে বললেন,

'এই দু'টো দিয়ে তার কাফনের ব্যবস্থা করো।'

***

যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'ওই কাপড় দু'টি দ্বারা আমরা যখন হামযাকে কাফন পরাতে গেলাম তখন দেখতে পেলাম, তার পাশে একজন আনসারী শহীদের লাশ পড়ে আছে এবং হামযার মতো সেই লাশেরও বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আমাদের তখন ভীষণ দ্বিধা ও সংকোচ হতে লাগল যে, দুইটি কাপড় দিয়ে হামযার কাফন হবে আর তার পাশে আরেকজন আনসারী শহীদের মৃতদেহ বিনা কাফনে পড়ে থাকবে? তাই আমরা স্থির করলাম,

ওই দুই কাপড়ের একটি হবে হামযার কাফন, অন্যটি আনসারীর।

কাপড় দুইটির একটি ছিল বড় অন্যটি তুলনামূলক ছোট। আমরা লটারি করে সিদ্ধান্ত নিলাম কোনটি কাকে দেওয়া হবে।

হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন দীর্ঘদেহী মানুষ। এ জন্য সমস্যা হয়ে গেল। কাফনের কাপড়টি দিয়ে মাথার দিক ঢাকলে পায়ের দিক আলগা হয়ে পড়ছিল, আবার পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে পড়ছিল।

এই অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেলেন, 'মাথা ঢাকো আর পায়ের ওপর কয়েকটি গাছের পাতা বিছিয়ে দাও।'

***

প্রিয় পাঠক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ে প্রিয় চাচাকে হারানোর বেদনা আর সেই শোকাচ্ছন্ন মুহূর্তে তাঁর একান্ত যন্ত্রণার কথা কি আপনি ভাবতে পারেন? এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য জীবনে তিনি আর দেখেননি। তিনি একবুক যন্ত্রণাভরা দৃষ্টিতে শহীদ চাচার ছিন্নভিন্ন দেহের দিকে তাকিয়ে বলেন,

'ওগো চাচা, আল্লাহর অসীম রহমত বর্ষিত হোক আপনার প্রতি...

সকল স্বজনের কাছে আপনি ছিলেন অতি আপনজন...

আপনি ছিলেন অতি সৎকর্মপরায়ণ...

যারা আপনার মৃতদেহের এই ভয়াবহ দুর্গতি ঘটিয়েছে, আমি তাদের ছেড়ে দেব না...

আল্লাহর কসম! আমি সুযোগ পেলে তাদের সত্তরটি লাশের একই অবস্থা করে এর উপযুক্ত বদলা নেব...'

এই বজ্রকঠিন শপথ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর অমোঘ বাণী নিয়ে হাজির হলেন,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ

'আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও, তবে সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে যেই পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা সবর করো, তাহলে অবশ্যই সেটা সর্বোত্তম সবরকারীদের জন্য।' –সূরা নাহাল : (১৬) ১২৬

'ধৈর্যই সর্বোত্তম' এর বিধান পাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণের সেই সংকল্প ত্যাগ করলেন এবং সেই বজ্রকঠিন শপথের কাফ্ফারা আদায় করলেন। এরপর ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের দাফনের নির্দেশনা দিয়ে তিনি বললেন,

أُنْظُرُوْا أَكْثَرَ هٰؤُلَاءِ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ، فَاجْعَلُوْهُ أَمَامَ أَصْحَابِهِ

'যার যতবেশি পরিমাণ কুরআন মুখস্থ ছিল তাকে ততবেশি মর্যাদার অধিকারী হিসাবে অন্য সাথিদের তুলনায় আগে কবরে রাখো।'

সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নির্দেশমতো সকল শহীদের দেহ কবরে রাখার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আবার পর্যবেক্ষণ করলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে আল্লাহর জন্য জীবন উৎসর্গকারী এই সকল সঙ্গীকে দাফন করার পর বললেন,

'আল্লাহর জন্য, তাঁর দীন রক্ষার স্বার্থে যে কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হবে, হাশরের ময়দানে সে এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার আঘাতের স্থান থেকে তাজা রক্ত ঝরতে থাকবে। সেই রক্তের বর্ণ হবে রক্তের মতোই লাল কিন্তু তা থেকে সুঘ্রাণ ছড়াবে মেশ্‌ক আম্বরের। হাশরের ময়দানে আমি নিজেই এদের শাহাদাতের পক্ষে সাক্ষ্য দেব।'

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদদের দাফন কাজ শেষ করে শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে, যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে মদীনায় ফিরছিলেন। আব্দুল আশ্‌হাল গোত্রের আনসার পল্লির পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলেন, মহিলারা তাদের হারানো স্বজনদের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করছেন।

এই কান্নার আওয়াজ মুহূর্তের মধ্যে তাঁর হৃদয়ের অবদমিত কান্নার বাঁধ ভেঙে দিয়ে তাঁর গভীর শোককে ভীষণভাবে উসকে দিলো। তাঁর লুকানো যন্ত্রণা একেবারে তাজা হয়ে উঠল এবং বরফের মতো গলে গলে পড়তে থাকল তাঁর পবিত্র দুই চোখের অশ্রুধারা হয়ে। তিনি নিঃশব্দ চিৎকারে বলে উঠলেন,

'আহারে আমার চাচা হামযা! তার জন্য কান্নারও কেউ নেই।'

প্রাণের চেয়ে প্রিয় রাসূলের এই আক্ষেপের কথা শুনতে পেয়ে কয়েকজন আনসারী সাহাবীর হৃদয়ে যেন ভূমিকম্পের কাঁপন ধরে গেল। তারা তাদের স্ত্রী-কন্যাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর চাচার স্মরণে কান্নাকাটির জন্য।

তাদের কান্নাকাটি শোনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের বললেন,

'আল্লাহ তাআলা আনসার সাহাবীদের ওপর রহম করুন।

তোমাদের ওপরও আল্লাহ রহম করুন, এখন তোমরা ফিরে যাও।

তোমরা অনেক সমবেদনা জানিয়েছ। আমরা তোমাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ ও আপ্লুত হয়েছি।'

তথ্যসূত্র :

১. *আস-সীরাতুল নববিয়্যাহ* লিবনি হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা। সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
২. *হায়াতুস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা এবং ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৩. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা।
৪. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা এবং সূচিপত্র।
৫. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ১৮৬২।
৭. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা।
৮. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা।
৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩য় খণ্ড, ৩০ ও ২৩৪ পৃষ্ঠা এবং ৪র্থ খণ্ড, ১১ ও পরবর্তী।
১০. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।
১১. *আল-মাগাযী*, ৩৭ পৃষ্ঠা।
১২. *আস-সীরাতুল হুলিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা।

আবু আকীল আল-আকীকী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

আবু আকীল সব সময় আল্লাহর কাছে শাহাদাতের জন্য দুআ করতেন, অবশেষে তিনি তা লাভ করেই ফেলেন। আমার জানামতে তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ সাহাবীদেরই একজন।

–উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার ভণ্ড মুসাইলামার ইসলামবিরোধী অপতৎপরতা ভয়াবহ রূপ নিল...

তার কওম বনূ হানীফার চল্লিশ হাজার মানুষ অস্ত্রশস্ত্রসহ সর্বশক্তি নিয়ে তার পিছে দাঁড়াল...

এ ছাড়া বিভিন্ন মিত্রগোত্র থেকে আরও প্রায় বিশ হাজার লোক তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হলো। ফলাফল এই হলো, তার এই দলই হয়ে গেল আরবের সর্ববৃহৎ সেনাদল।

একই সঙ্গে তাদের সংখ্যা প্রতিদিন যেভাবে বেড়ে যাচ্ছিল, তাতে আশঙ্কা হচ্ছিল যে, তার সেনাসংখ্যা খলীফাতুল মুসলিমীনের সেনাসংখ্যার চেয়ে অচিরেই কয়েকগুণ বেশি হয়ে যাবে।

এ ছাড়া তখন মুসলিম জাতির ওপর নেমে আসা ভয়াবহ আপদ শুধু কেবল মুসাইলামা আর তার দুর্ধর্ষ বাহিনীর মধ্যেই সীমিত ছিল না; বরং বিপজ্জনক আশঙ্কা দেখা দিচ্ছিল অন্যান্য মুরতাদদের মাধ্যমেও, যারা এতদিন মুমিনদের মধ্যেই পরিগণিত হতো। যারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী দাবি করে...

যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে...

নামায ঠিকঠাক মতো আদায় করার ব্যাপারে তাদের কোনোই আপত্তি নেই...

তাদের দাবি শুধু এটুকুই যে, খলীফা যেন তাদের যাকাত দিতে বাধ্য না করেন...

পক্ষান্তরে মুসাইলামা এবং তার দলের লোকেরা স্পষ্ট ভাষায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকেই অস্বীকার করে...

তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনকেও তারা অমান্য করে...

তারা বিশ্বাস করে এমন ভণ্ডের প্রতি যে দাবি করে, সে আল্লাহ তাআলার নবী।

এই ভয়াবহ মিথ্যাশক্তিকে যদি প্রতিরোধ না করা হয়, তাহলে এই ভণ্ড তার দলবল নিয়ে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করে দেবে...

এবং এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করা হবে, যেন আরব ভূমিতে আর কখনোই মহান আল্লাহর ইবাদত না চলতে পারে।

***

খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভণ্ড মুসাইলামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সেনা পাঠালেন আবু জাহালের পুত্র ইকরিমার নেতৃত্বে।

ইকরিমা ইবনে আবু জাহাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন এক দুর্দান্ত ও দক্ষ যোদ্ধা।

ছিলেন দুর্ধর্ষ, দুর্দমনীয় বীর। ঐতিহ্যগত যোদ্ধা।

তা ছাড়া তার নেতৃত্বে শরীক ছিলেন আরবের বড় বড় ও বিখ্যাত এমন সব অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর যোদ্ধা, যারা কোনো দলে যোগ দিলে নিশ্চিত মনে করা হতো তাদের বিজয়।

কিন্তু মুসাইলামা তাদের এমনভাবে পরাজিত করল যে, মুসলিম বাহিনীর হুঁশ উড়ে গেল। আর এদের পরাজয়ের খবর শুনে খলীফা রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন এবং অবিলম্বে পরাজিত দলের কাছে দূত মারফত নির্দেশনা দিয়ে পাঠালেন,

'খবরদার! তোমরা মদীনায় ফিরে এসে মুসলিম জাতির মনোবল দুর্বল করবে না। তোমরা যেখানে আছ সেখানেই অবস্থান করো।'

খলীফা এক চিঠিতে সেনাপতিকে তিরস্কার করে ফরমান জারি করলেন,

'পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়াই কেন তাড়াহুড়ার মধ্যে এই যুদ্ধ করা হলো? এই বাহিনীর সকলের প্রতি জরুরি সরকারি নির্দেশ এই, আমি তোমাদের কারোর চেহারা দেখতে চাই না এবং তোমরাও কেউ আমার চেহারা দেখবে না। খবরদার! কেউ মদীনায় ফিরবে না।'

***

ইকরিমা বাহিনীর পরাজয় মুসলিম জাতির অন্তরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করল...

ভণ্ড মুসাইলামার ফেতনা কত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, সেটা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলো...

খলীফাতুল মুসলিমীন এই ভয়াবহ সর্বগ্রাসী ফেতনা থেকে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন...

তিনি সাময়িকভাবে যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদদের দিক থেকে মনোযোগ একটু সরিয়ে রাখলেন, যেন ভণ্ড মুসাইলামার বিরুদ্ধে সর্ববৃহৎ সেনাসমাবেশ ঘটানো যায় এবং নিজেদের সর্বাধিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় লাভ করা যায়।

***

খলীফা সেনাদলকে তিনটি ভাগে ভাগ করলেন :

এক. মুহাজিদরদের দল, যারা আল্লাহ ও রাসূলের জন্য জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যারা ইসলাম প্রচারের স্বার্থে সকল প্রকার যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করেছেন।

যারা একটি একটি ইট গেঁথে ইসলামের সুবিশাল ও সুরম্য অট্টালিকা গড়ে তুলেছেন, যার গাঁথুনিতে মিশিয়েছেন নিজেদের ঘাম আর অশ্রু।

দুই. আনসারীদের দল, যে মহান ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছেন। প্রয়োজনে তাঁকে সাহস ও শক্তি জুগিয়েছেন, শত্রুদের থেকে দিয়েছেন সুরক্ষা। তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

তিন. মরুচারী বেদুইন আরবদের দল, যারা ছিলেন শক্তিশালী আরব যোদ্ধা বাহিনী।

এ ছাড়াও খলীফা এই সেনাদলে যুক্ত করলেন একদল কুরআনে কারীমের বাহক হাফেযকে। যাদের বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্বদাই সজাগ এবং মনোযোগী।

আরও যুক্ত করলেন একদল বদরী সাহাবী। যদিও বদর যুদ্ধে অংশ নেওয়া শ্রেষ্ঠ মর্যাদার এ সকল সাহাবীর ব্যাপারে খলীফা বলতেন যে, আমি আল্লাহর রাসূলের এই সাহাবীদের কোনো যুদ্ধে পাঠাতে চাই না। আমি চাই তারা নির্বিঘ্নে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকুন।

কারণ, আল্লাহ তাআলা তাদের উসিলায় উম্মতের বিপদ-আপদ দূর করে দেবেন। এবং তাদের মাধ্যমেই মুসলিম বাহিনীর প্রতি আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় সহজতর হবে।

এরপর এই বাহিনীর সেনাপতির ভার অর্পণ করলেন মহান আল্লাহর খোলা তরবারি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের হাতে।

***

ভণ্ড মুসাইলামার পুত্র শুরাহবীল এসে দাঁড়াল সারিবদ্ধ সেনাদলের সামনে। তাদের মাঝে ক্ষুদ্র গোত্রীয় তেজ ও চেতনার আবেগ উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল,

'হে হানীফ গোত্রের সিংহ পুরুষেরা,

আজ তোমাদের সামনে সুযোগ এসেছে হানীফ গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের। আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধা। আমরাই বিজয় ছিনিয়ে আনব। আমরা কারোর কাছে পরাভূত হব না।

হানীফ গোত্রের বীর যোদ্ধারা, খবরদার! আজ যদি তোমরা পরাজিত হও, তাহলে এর পরিণতি কী হবে ভেবে দেখেছ? তোমাদের প্রিয় স্ত্রীদের বানানো হবে ক্রীতদাসী...

অতএব প্রিয় স্ত্রী ও আদরের সন্তানদের হেফাজত করো।

শত্রুদের বিরুদ্ধে মজবুতভাবে ময়দানে দাঁড়াও...

নিজ বংশের মর্যাদা টিকিয়ে রাখতে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

এই সব আবেগঝরা কথা শেষ হতে না-হতেই হানীফ গোত্রের সৈনিকেরা মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যেভাবে পাথর ঝাঁপিয়ে পড়ে...

প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে প্রবল স্রোতের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

মুসলিম বাহিনীর সারি তারা তছনছ করে দিয়ে পরাজিত করে দিলো।

সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পর্যন্ত তার সেনাপরিচালনা কেন্দ্র থেকে অপসারণ করে দেওয়া হলো।

শুধু তা-ই নয়, তার স্ত্রী উম্মে তামীম তাদের হাতে বন্দী হয়ে গেলেন এবং ঘাতকদের একজন বাধা না দিলে তিনি নিশ্চিত নিহত হয়ে যেতেন।

***

বিজ্ঞ মুসলিম সেনাপতি বিচলিত না হয়ে প্রতিপক্ষের এই আঘাতে স্থির ও শান্ত রইলেন...

কেননা, তিনি জানতেন নিশ্চিতভাবে, সত্যের পক্ষে আল্লাহর সাহায্য আসবেই...

কোনো নৈরাশ্যই তাকে স্পর্শ করেনি।

তিনি আল্লাহর রহমতের প্রতি অসীম ভরসা রেখে পরাজয়ের কারণ খোঁজার চেষ্টা করলেন। সেনা অফিসারদের সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শও করলেন। চিন্তাভাবনা ও পরামর্শের পর আল্লাহর রহমতে তিনি পরাজয়ের কারণ খুঁজে পেলেন। সেটা হলো, মুসলিম সেনাদলের তিনভাগে বিভক্ত হওয়ায় প্রত্যেকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া।

তিনি উচ্চকণ্ঠে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন,

'সৈনিক ভাইয়েরা, তোমরা আলাদা আলাদা হয়ে যাও। তোমাদের প্রতিটি দলের যুদ্ধপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা হবে। এবার সকলেই স্পষ্ট জানতে পারবে যে, মুসলিম বাহিনী কোন দিক দিয়ে কাদের দুর্বলতার কারণে আক্রান্ত হলো। কোন দলের ত্রুটির কারণে পরাজয় এল।

***

সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের ওই উচ্চকণ্ঠের ঘোষণা মুসলিম সৈনিকদের দীনি চেতনা উজ্জীবিত করে তুলল। আল্লাহর রাহে জীবন কুরবানী করে শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের বুকের মধ্যে জ্বলে উঠল।

ওই ভাষণ তাদের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিলো আবরণ...

ফলে তারা দেখতে পেলেন জান্নাতের অপরূপ বালাখানাগুলো দুয়ার খুলে শহীদদের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে।

আর ঠিক তখনই মুসলিম সৈনিকদের ভেতর থেকে প্রকাশ পেতে থাকল এমন এমন বীরত্বের কাহিনি, ইতিহাস আজ পর্যন্তও যার নজির খুঁজে পায়নি।

আল্লাহর সৈনিকদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করলেন এমন এমন অসম সাহসী বীর, ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমা আজও ম্লান করতে পারেনি যার ঔজ্জ্বল্য।

আর সেই সকল ঐতিহাসিক বীরপুরুষের শীর্ষ সারিতে ছিলেন আমাদের এ কাহিনির মহানায়ক আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাবা আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। যার ডাকনাম আবু আকীল আল-আকীকী।

প্রিয় পাঠক, চলুন তার চমৎকার সেই বীরত্বের কাহিনি শোনা যাক সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার বর্ণনায়।

***

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন,

'ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল, তখন আবু আকীল আল-আকীকী উত্তপ্ত ডেগের মতো টগবগ করছিলেন। সিংহের মতো লাফাচ্ছিলেন।

পরে যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করল তিনি নিজেকে মুসলিমদের জন্য ঢাল বানিয়ে দিলেন। নিজের বুক পেতে শত্রুর আক্রমণ গ্রহণ করে মুসলিম সৈনিকদের রক্ষা করলেন।

সেদিন তিনিই হয়েছিলেন সর্বপ্রথম তিরবিদ্ধ ব্যক্তি।'

***

শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তির ঢুকে গিয়েছিল আবু আকীল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বুকের মধ্যে। তবে সেটা তার হৃদ্‌যন্ত্রকে স্পর্শ করেনি; বরং দুই বাহু বরাবর বুকের মধ্যখানে আটকে ছিল। তিনি হাত দিয়ে শক্ত করে ধরলেন সেই তির এবং সজোরে টেনে বের করে ফেললেন। এরপর আবারও লড়াই চালিয়ে যেতে থাকলেন। একসময় প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে তিনি দুর্বল হয়ে গেলেন এবং জমিনের ওপর পড়ে গেলেন।

আমরা তখন তাকে তুলে তার তাঁবুতে নিয়ে গেলাম। সেটা ছিল বেশ কাছেই।

আবার যখন প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে গেল এবং মুসলিম সৈনিকদের অবস্থা একেবারেই বেদনাদায়ক, সেই মুহূর্তে চরম আহত আবু আকীল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বারা ইবনে মালিক আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উচ্চকণ্ঠের আহ্বান শুনতে পেলেন। তিনি চিৎকার করে ডাকছেন,

'তোমরা কোথায় হে আমার আনসার ভাইয়েরা?
কোথায় তোমরা?
আমি বারা ইবনে মালিক আল-আনসারী...
তোমরা আমার কাছে এসো হে আনসারী ভাইসকল...'

***

এরপর মাআন ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজ তরবারির খাপ ভেঙে ফেলে দিলেন। লাফিয়ে উঠে সামনের দিকে চলে গেলেন। একটু উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন,

'হে আনসার ভাইসকল, তোমাদের কাছে মহান আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি...

যারা আল্লাহর রাসূলকে সাহায্য করেছিলে, তোমরা সেই আনসার ভাইয়েরা...

আজ আবারও একবার দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো...'

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন,

চারদিকের এই নাজুক অবস্থার মধ্যে হঠাৎ আমি আবু আকীলকে দেখলাম, তিনি এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি দৌড়ে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

'কী হলো চাচা, উঠে পড়লেন কেন?'

তিনি বললেন,

'তুমি কি আনসার সমাজকে সম্বোধন করে বারা ইবনে মালিক ও মাআন ইবনে আব্দুল্লাহর ব্যাকুল আহ্বান শুনতে পাওনি?'

আমি বললাম,

'তারা সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে ডাকেনি। বিশেষত আহত কাউকে তো মোটেও ডাকেনি।'

তিনি বললেন,

'তারা দু'জনই ডাক দিয়েছেন 'আনসার'দের। আর আমি তাদেরই একজন। হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের ডাকে আমাকে সাড়া দিতেই হবে।'

এরপর তিনি কোমরবেঁধে ডান হাতে তরবারি নিয়ে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা দিতে দিতে ময়দানে ঢুকে পড়লেন,

'হে আনসার ভাইয়েরা, আজ আবার যুদ্ধ করো হুনাইনের মতো...
আজ আরও একবার আক্রমণ চালাও হুনাইনের মতো...

এই আহ্বানে সকল আনসারী সৈনিক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল...

মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগে তারা দুঃসাহসী আক্রমণে এগিয়ে যেতে থাকল...

মরণনেশায় ঝলসে ওঠা এই আনসারীদের দুর্বার আক্রমণে এবার ভণ্ড মুসাইলামা ও তার বাহিনী টিকতে না পেরে পিছু হটতে শুরু করল।

অবশেষে তারা মুসাইলামা ও তার বাহিনীকে তাড়া করে বিখ্যাত সেই প্রাচীরবেষ্টিত বাগানে ঢুকিয়ে দিলেন। (এখানেই তাদের কচুকাটা করা হয় আর এই বাগানের নাম হয়ে যায় 'হাদীকাতুল মউত' বা মৃত্যুবাগান।)

এইখানে আমরা মুহাজিররাও তাদের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলাম। মিলেমিশেই তরবারি চালাতে থাকলাম।

এই পর্যায়ে হঠাৎ আমি মৃত্যুবাগানের ফটকের কাছে দেখতে পেলাম আবু আকীলকে। দেখলাম তার কাঁধ থেকে একেবারে সম্পূর্ণ হাত কাটা এবং কর্তিত সেই হাতটি পাশেই মাটির ওপর পড়ে আছে।

তার শরীরে দেখা যাচ্ছে চৌদ্দটি ভয়ংকর আঘাত। যার প্রতিটি আঘাতেই মৃত্যু অনিবার্য হওয়ার কথা।

তখন ছিল তার জীবনের একবারেই শেষ সময়। হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় আছেন। আমি খুবই কষ্টের সঙ্গে তার পাশে এসে ডাকলাম,

'হে আবু আকীল,

মৃদু আওয়াজে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন,

'কারা পরাজিত? তাড়াতাড়ি বলো আমাকে 'কারা হলো পরাজিত?

আমি বললাম,

'সুসংবাদ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন ভণ্ড নবী নিহত হয়েছে।'

পরম খুশিতে তিনি আকাশের দিকে আঙুল তুলে মহান আল্লাহর সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা জানালেন।

এরপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন...

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন,

‘আমি মদীনায় ফিরে আসার পর আবু আকীলের সকল খবর সবিস্তারে উমর ফারূকের কাছে তুলে ধরলাম।

ঘটনা শুনতে গিয়ে বারবার তার চোখ অশ্রুভরাক্রান্ত হয়ে উঠল। শেষে তার জন্য দুআ করলেন এবং মন্তব্য করলেন এই বলে,

‘আল্লাহ তাআলা আবু আকীলের ওপর রহম করুন। তাঁর বিশাল, বিস্তৃত রহমত ও করুণার চাদরে তাকে ঢেকে রাখুন।

তিনি (আবু আকীল) সদাসর্বদা ব্যাকুল হয়ে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের প্রার্থনা করতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সেটা পেয়েও গেলেন।

আমার জানামতে তিনি ছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের একজন এবং তাঁর নির্বাচিত অনুসারীদের অন্যতম।’

তথ্যসূত্র :

১. *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা।
২. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৫১৫০।
৫. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা।

সাঈদ ইবনুল আস

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ ও কণ্ঠে সর্বাধিক মিলবিশিষ্ট সাহাবী।

সাঈদ ইবনুল আস আল-উমাউই, আল-কুরাইশী, একজন উচ্চ-মর্যাদাবান সাহাবী...

নেতৃত্বসিক্ত এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

তার দাদার নামও সাঈদ, যাকে বলা হতো 'মুকুটধারী'।

কারণ, তিনি পাগড়ি পরলে কুরাইশ বংশের অন্য কেউ আর একই বর্ণের পাগড়ি পরত না যতক্ষণ তিনি সেটা না খুলতেন। তার প্রতি সীমাহীন মর্যাদাবোধ ও অসীম ভক্তির কারণেই কুরাইশের সকলে অলিখিত এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতেন।

তার পিতা আস ইবনে সাঈদ। তিনি ছিলেন কুরাইশের অন্যতম শীর্ষ নেতা। বদর যুদ্ধে তিনি এবং উতবা একসঙ্গে মুশরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। দু'ভাই একই সঙ্গে নিহত হয়েছিলেন। তবে আসের মৃত্যু হয়েছিল আলী ইবনে আবী তালিব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে।

বদর প্রান্তরে সাঈদের পিতা ও চাচা যখন নিহত হন, সে সময় সাঈদ ছিলেন বারো বছর বয়সী এক বালক। ফলে পিতৃহীন এই বালকের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। কারণ, ছোট্ট এই বালকটির সঙ্গে ছিল তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সংযোগ।

ফলে সাঈদ ইবনুল আস লালিত-পালিত হলেন অত্যন্ত দানবীর, আবেদ যিন্‌নূরাইন উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তত্ত্বাবধানে।

ধাপে ধাপে তার জীবনের গতি এগিয়ে গেছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই মেয়ে উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দুই স্ত্রীর সযত্ন পরিচর্যায়।

ফলে তিনি মর্যাদা ও মহত্ত্ব লাভ করেন পরম্পরাগতভাবে।

উত্তম স্বভাব আর উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা তিনি অর্জন করেন এর সঠিক ও সুন্দরতম উৎস থেকে।

ইসলামের শিক্ষা পেয়েছেন সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম থেকে।

তিনি কুরআন পড়ে শুনিয়েছেন কুরআন-অনুরক্ত উসমান ইবনে আফ্‌ফানকে।

কুরআনের আয়াত শেখার সৌভাগ্য তিনি পেয়েছিলেন খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মুবারক থেকে। এর ফলেই তিনি কণ্ঠস্বরের বিচারে ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক সাদৃশ্যতম। এ ছাড়াও তিনি কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের কারণে হয়েছিলেন সেই বারোজন সৌভাগ্যবানের অংশ—যারা উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনকালে কুরআন সংকলন করেছিলেন এবং জনগণকে কুরআনের নির্ভুল শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত হয়েছিলেন।

***

সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মাত্র কৈশোরে পদার্পণ করেন, তখন থেকেই তার মধ্যে দেখা যায় নেতৃত্বের গুণাবলি। প্রকাশ পায় খ্যাতিমান হওয়ার আলামত।

বর্ণিত আছে যে এক মহিলা নিয়ত করেছিলেন তার কাছে যত চাদর আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে দামি চাদরটি তিনি দেবেন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে।

সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত আরব ব্যক্তি কে? এটা নির্ধারণ এর জন্য কেউ একজন মহিলাকে বলেছিল, এই কিশোর অর্থাৎ সাঈদ ইবনুল আসকে দিলেই আপনার নিয়ত পূর্ণ হয়ে যাবে।

এরপর জমকালো কারুকার্যময় যেকোনো কাপড়ের নাম হয়ে যায় তার নামানুসারে 'সাঈদিয়্যাহ'।

যারা অল্প বয়সেই সাঈদ ইবনুল আস সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'ভবিষ্যতে সে নেতৃত্বের আসনে বসবে' সেই সকল ব্যক্তির মন্তব্য ছিল যথার্থ ও সঠিক।

কারণ, পরবর্তী জীবনে দেখা যায় তিনি গভর্নর হিসাবে বারবার মুসলিম জাতির শাসনকাজ পরিচালনা করেছেন। বিভিন্ন রণাঙ্গনে সেনাদলের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন, অনেক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে একাধিক রাজ্য ও এলাকাও জয় করেছেন। এমনকি পারস্যের দু'টি অঞ্চল তাবারিস্তান এবং জুরজানের বিজয় আল্লাহ তাআলা তার হাতেই দান করেছেন।

এমনকি খলীফা উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ থেকে তিনি মদীনার গভর্নর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন, মজলুম হয়ে খলীফার শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি খলীফার নির্দেশমতো রাসূলের শহর মদীনাতেই সেই দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছিলেন।

***

কিন্তু সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে গুণটি মানুষের মুখে মুখে তার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে আলোচিত হতো, সেটা হলো ব্যাপক দানশীলতা। এমনকি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে উপাধি দিয়েছিলেন 'কুরাইশের দানশীল' বলে।

আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দিয়েছিলেন সম্পদের এত প্রাচুর্য যা ছিল একেবারে হিসাব ছাড়া।

আর সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও আল্লাহর দেওয়া সেই হিসাব ছাড়া সম্পদ আল্লাহর বান্দাদের মাঝে খরচ করতেন হিসাব ছাড়াই।

তার এই ব্যাপক দান-খয়রাত সম্পর্কে অনেক চমৎকার কাহিনি ও আবেগময় ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। ইতিহাসের পাতা যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রতি জুমআর দিন অনেকগুলো থলে বানাতেন। অর্থভর্তি সেই থলেগুলো দরিদ্র মুসল্লিদের সামনে রেখে দিতেন। নামাযের পর তারা অতি আনন্দে বাড়ি ফিরতেন। কারণ, চাওয়া ছাড়াই তারা পেয়ে গেছেন তাদের প্রয়োজন।

***

জনৈক ব্যক্তি নিয়মিত তার কুরআন শিক্ষার মজলিসে হাজির থাকতেন এবং তার কাছে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। লোকটি তীব্র অভাবে পড়ে অনাহারে দিন কাটাতে লাগলেন। লোকটির স্ত্রী তাকে বললেন,

'আমাদের আমীর সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিখ্যাত দানবীর। আপনি তার কাছে নিজের অভাবের কথা জানালে নিশ্চয় তিনি আপনাকে অর্থকড়ি কিছু দেবেন।'

স্বামী বললেন, 'ছি ছি! তুমি কি আমাকে লাঞ্ছিত করতে চাও? তার কাছে নিজের অভাবের কথা জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

যত দিন যায় লোকটির অভাব তীব্র হতে থাকে, আর স্ত্রীর পীড়াপীড়িও বাড়তে থাকে গভর্নরের কাছে অভাবের কথা জানানোর জন্য। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই লোকটি সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মজলিসে গিয়ে হাজির হন, যেভাবে প্রতিদিনই যান।

মজলিস শেষে সকলেই যখন চলে গেলেন, লোকটি যথারীতি নিজের জায়গায় বসেই রইলেন।

সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেই তার কাছে গিয়ে বললেন,

'আমার মনে হয় তুমি এখানে বিনা প্রয়োজনে বসে নেই।'

লোকটি কিছুই না বলে নীরব হয়ে থাকলেন।

সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী ও অন্যান্য লোকদের নির্দেশ দিলেন,

'তোমরা যাও।'

তাঁরা সকলেই বের হয়ে যাওয়ার পর তিনি লোকটিকে বললেন,

'দেখো, তুমি আর আমি ছাড়া এখানে আর কেউ নেই, এবার বলো...'

লোকটি তবুও নীরব। কিছুই বলল না।

তখন তিনি বাতি নিভিয়ে দিয়ে বললেন,

'তোমার ওপর আল্লাহর রহম করুন! এবার বলো তোমার প্রয়োজন কিসের? এখন তো তুমি আমার মুখটাও দেখতে পাচ্ছ না। তাহলে আর লজ্জা কিসের?'

এবার লোকটি বললেন,

'মাননীয় আমীর, ভীষণ অভাবের কারণে আমাদের দিন কাটছে অনাহারে। বিষয়টি আপনাকে জানাতে এসেছি কিন্তু লজ্জায় মুখ খুলতে পারছি না।'

সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'তুমি শান্ত ও স্বাভাবিক হও। আর লজ্জা পেতে হবে না, কিছু বলতে হবে না। আগামীকাল সকালে তুমি আমার অমুক লোকের সঙ্গে দেখা করবে।'

পরের দিন সকালে তিনি সেই লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তখন তিনি জানালেন,

'গভর্নর আপনাকে কিছু জিনিস দিতে বলেছেন। সেই জিনিসগুলো নেওয়ার জন্য কয়েকজন কুলি নিয়ে আসুন।'

লোকটি বললেন,
'আমার কাছে কোনো কুলি নেই।'

এরপর তিনি স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে তাকে তিরস্কার করে বললেন,

'তোমার কথা শুনতে গিয়ে গভর্নরের সামনে আমার মুখে চুনকালি লাগল। তিনি আমাকে এমন কী দিতে বললেন যা আনতে কুলি লাগবে? আমার তো মনে হয় না যে, কিছু আটা বা খাদ্যদ্রব্য ছাড়া তিনি অন্য কিছু দিতে বলেছেন...

যদি অর্থকড়ি কিছু দিতে বলতেন, তাহলে তো হাতে হাতেই দিয়ে দেওয়া যেত। কুলি লাগত নাকি?'

স্ত্রী বললেন,
'যা-ই দিতে বলেছেন আপনি সেটাই নিয়ে আসবেন, এই অভাবের দিনে যা পাওয়া যায় তা-ই ভালো।'

লোকটি আবার ফিরে গেলেন গভর্নরের ম্যানেজারের কাছে।

লোকটিকে ফেরত আসতে দেখে ম্যানেজার তাকে বললেন,

'আমি গভর্নরকে জানিয়েছিলাম যে, লোকটির কাছে আপনার উপঢৌকন বয়ে নেওয়ার মতো কোনো কুলি নেই। সে কারণে গভর্নর এই তিনটি ক্রীতদাস পাঠিয়েছেন। এরাই আপনার মাল বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

লোকটি আগে আগে চলতে লাগলেন আর আমীরের দেওয়া উপঢৌকনের বোঝা মাথায় নিয়ে তিন গোলাম তার পিছে পিছে চলতে থাকল। বাড়িতে পৌঁছার পর বোঝা নামিয়ে দেখলেন, প্রত্যেক গোলামের মাথায় দেওয়া হয়েছে দশ হাজার দিরহাম। অর্থাৎ আমীর সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে দিয়েছেন ত্রিশ হাজার দিরহাম। তিনি অভিভূত ও আবেগাপ্লুত হয়ে গোলামদের বললেন,

'তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। এইগুলো ঘরের কোণে রেখে তোমরা এখন চলে যেতে পারো।'

তারা বলল,
'আমীর তো আমাদের তিনজনকেই আপনার জন্য হাদিয়া হিসাবে দান করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি কাউকে যদি গোলামের হাতে হাদিয়া পাঠান, তাহলে ওই গোলামও হয় তার জন্য হাদিয়া। যাই হোক আমরা তিনজন এখন থেকে আপনারই গোলাম।'

***

একবার জনৈক বেদুইন এসে সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি ম্যানেজারকে বললেন,

'ওকে পাঁচশো দিয়ে দাও।'

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন,
'পাঁচশো দিরহাম না দিনার?'

গভর্নর বললেন,
'ইচ্ছা তো ছিল দিরহামই কিন্তু তোমার অন্তরে যখন 'দিনার'-এর বিষয়টি জেগেছে, তাহলে ওকে পাঁচশো দিনারই দিয়ে দাও।'

বেদুইন পাঁচশো দিনারের এত বড় অঙ্ক পেয়ে আনন্দে কাঁদতে শুরু করে দিলো। সাইদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

‘কাঁদছ কেন? কান্নার তো কিছু দেখছি না। তুমি কি এই হাদিয়া নিতে চাও না?’

বেদুইন বলল,

‘কেন নয়? এটা তো অবশ্যই গ্রহণ করেছি। কিন্তু ভাবছি যে, আপনার মতো এত বড় দানবীরকে এই মাটি কীভাবে লুকিয়ে রাখবে।’

***

সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজপুত্র আমরকে বলতেন,

‘বেটা, কাউকে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই দিয়ে দিতে চেষ্টা কোরো।

কেউ যখন লজ্জায় লাল হয়ে তোমার সামনে প্রার্থনার হাত বাড়াবে অথবা কারোর বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার মতো ঢিব ঢিব করতে থাকে যে ‘দেবে নাকি খালি হাতে ফেরাবে?’

এই অবস্থায় যদি তোমার সকল সম্পদও তাকে দিয়ে দাও, তবুও তো তাকে হাতপাতার লজ্জা থেকে বাঁচাতে পারলে না।’

***

যখন সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অন্তিম মুহূর্ত এসে গেল, তিনি ছেলেদের ডেকে কাছে বসিয়ে বললেন,

‘হে আমার পুত্রগণ, আমার মৃত্যুর কারণে আমার বন্ধু-স্বজনেরা যেন শুধু আমাকে ছাড়া অন্য কোনো কিছুর অভাব বোধ না করে।

সুতরাং তাদের সঙ্গে ঠিক সেই সম্পর্কই বজায় রাখবে যা আমি আমার জীবদ্দশায় রাখতাম। তাদের সেই সকল ভাতা, অনুদান চালু রাখবে যা আমি চালু রেখেছিলাম।

তাদের যেন চাওয়ার কষ্ট না করতে হয়, সেদিকে খেয়াল রেখো।

কারণ, কোনো মানুষ যখন বাধ্য হয়ে কিছু চায়, তখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অস্থিরতা ও অশান্তি তৈরি হয়। কেঁপে ওঠে তার শিরা-উপশিরা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয়ে।

আল্লাহর কসম! নিজের বিছানায় ছটফট করা একজন লোকের এই ভাবনা যে, তুমি তার প্রয়োজন মোটানোর যোগ্য, এটা তোমার প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ—দানের অনুগ্রহের চেয়েও।'

***

যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন তার ছেলে আমর ইবনে সাঈদ যিনি আশদাক নামে পরিচিত, দামেস্কে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পিতার ইন্তেকালের খবর জানাতে এলেন। খবর শুনে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেঁদে ফেললেন, এরপর 'ইন্না লিল্লাহ' পড়লেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আপনার পিতার কোনো ঋণ আছে?'

ছেলে, 'হ্যাঁ।'

মুআবিয়া, 'পরিমাণ কত?'

ছেলে, 'তিন লক্ষ দিরহাম।'

মুআবিয়া, 'ওইটা পরিশোধের দায়িত্ব নিলাম আমি।'

ছেলে, 'তিনি আমাকে অসিয়ত করেছেন আমি যেন তার ঋণ পরিশোধ করি শুধু তার জমিন বিক্রির অর্থ দ্বারা।'

তখন মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ঋণ-পরিমাণ অর্থ দিয়ে জমিন কিনে নিলেন।

***

সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পুত্র আমর মদীনায় ফিরে এসে সর্বত্র ঘোষণা করিয়ে দিলেন,

'সাঈদ ইবনুল আসের কাছে কারোর যদি পাওনা থাকে, সে যেন তার ছেলে আমরের কাছ থেকে তা বুঝে নেয়।'

এই ঘোষণার পর এক যুবক এসে যোগাযোগ করল। তার কাছে এক টুকরো চামড়ায় লেখা ছিল, সে সাঈদ ইবনুল আসের কাছে পাবে বিশ হাজার দিরহাম।

আমর যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'আপনি আমার পিতার কাছে কীভাবে পাওনাদার হলেন?'

যুবকটি বললেন,
'আপনার পিতা গভর্নর ভবন থেকে কাজকর্ম সেরে বের হয়েছিলেন। আমি তাকে অনুসরণ করে পিছে পিছে চলতে লাগলাম। তিনি যখন আমাকে দেখতে পেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন,
'তোমার কি কোনো কিছু লাগবে?'

আমি বললাম,
'না, কিছুই লাগবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে আপনার সঙ্গে থাকতে।'

এই কথা শুনে তিনি বললেন,
'আল্লাহ যেন তোমার সঙ্গী হয়ে যান।'

এরপর তিনি বললেন,
'বেটা, দোয়াত, কলম আর এক টুকরো চামড়া নিয়ে এসো।'

আমি তার নির্দেশমতো ওইগুলো হাজির করলাম। তখন তিনি আমার জন্য বিশ হাজার দিরহামের কথা লিখে দিলেন এবং বললেন, পরবর্তী ফসলের সময় এলে তোমাকে ওই অর্থ পরিশোধ করে দেব।

আমর ইবনে সাঈদ সব কথা শোনার পর নির্ধারিত অর্থ দেওয়ার পর আরও কিছু বেশি করে দিলেন।

লোকজন এটা দেখে বলাবলি করতে লাগল,
'আমরের মতো এমন মহৎ ও উদার পুত্র যিনি রেখে যান, তার কখনো মৃত্যু হয় না। তিনি হয়ে যান অমর।'

***

আল্লাহ আপন সন্তুষ্টি দান করুন কুরআনের হাফেয...
দানশীল, দাতা সাঈদ ইবনুল আসের প্রতি...
তার কবরকে করে দিন আলোকিত।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৩২৬৮।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৪র্থ খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা।
৫. *তাহযীবু ইবনি আসাকির*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা।
৬. *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, ৫ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, ১৫৪, ১৬৬, ২১৭; ৮ম খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

জুলাইবীব

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

জুলাইবীব আমার প্রিয় আর আমি জুলাইবীবের

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন, সেদিন জুলাইবীব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন এক প্রাণোচ্ছল কিশোর। সবেমাত্র দশের গণ্ডি পেরোনো এক চঞ্চল বালক।

তার ছোট ছোট দু'টি চোখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখামাত্রই ওই পবিত্র চেহারার ছবিটি যেন তার ছোট্ট হৃদয়ের গভীরে গেঁথে যায়।

তার অন্তরে তৈরি হয় প্রিয় নবীর ভালোবাসার দুর্বার আকর্ষণ।

ফলে তিনি ভুলে যান ছোট ছোট ও সমবয়সী খেলার সাথিদের কথা, এতদিন যারা ছিল তার একমাত্র বন্ধু-স্বজন এবং তিনি নিজেও ছিলেন তাদের আপনজন।

তখন জুলাইবীবের ছিল না কোনো পরিবার-পরিজন, ছিল না কোনো ধন-সম্পদ।

ফলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদকেই বানিয়ে নিলেন নিজের ঘর আর গৃহহীন, আশ্রয়হীন 'আহলুস্ সুফ্‌ফাহ' এর সকলকে বানালেন বন্ধু ও পরিবার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া হিসাবে যে খাবার দেওয়া হতো, অথবা যে সাদাকা তাঁর কাছে পাঠানো হতো, সেই পূর্ণ সাদাকা ও খাবারের অংশ রাসূল সুফ্‌ফাহওয়ালাদের দিলে জুলাইবীব তাদের সঙ্গে যৎসামান্য খেয়ে কোনোরকম জীবনধারণ করতেন।

জুলাইবীব ছিলেন হালকাদেহী, মিশুক ও রসিকস্বভাব মানুষ।

ফলে তিনি মদীনার আনসারদের বাড়িতে বাধাহীনভাবে আসা-যাওয়া করতেন, আর নির্দোষ কৌতুক ও মিষ্টি রসিকতা দিয়ে তাদের মাঝে আনন্দ বিতরণ করতেন।

তখনো পর্যন্ত তিনি ছিলেন ছোট্ট নাবালক, ফলে তার জন্য কোনো বাড়িতেই প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। এমনকি নারীরাও নিজেদের আড়াল করতেন না।

***

এরপর জুলাইবীব একসময় যৌবন বয়সে পদার্পণ করলেন, তখন স্বামীরা স্ত্রী-কন্যাদের বোঝানো শুরু করেন যে, এতদিন যেভাবে তোমরা জুলাইবীবকে দেখে এসেছ, এখন আর সে আগের মতো ছোট নেই। বড় হয়ে গেছে। এখন থেকে তার সঙ্গে পর্দা করতে হবে এবং আগের মতো তাকে আর বাড়িতে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

***

জুলাইবীবের যৌবনে পদার্পণের পর একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'জুলাইবীব, তুমি কি বিয়ে করবে না?'

তিনি বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, বিয়ে যে করব, আমার মতো এমন নিঃস্ব ফকিরের কাছে মেয়ে দেবে কে?

আমি এমন এক যুবক যার কাছে না আছে মোহরানা, আর না স্ত্রীর ভরণপোষণ করার মতো অর্থ।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'আমি তোমার জন্য নেককার স্ত্রীর খোঁজ করব, আর বিয়ের পর আল্লাহ তাআলাই আপন অনুগ্রহে তোমাদের দু'জনের অভাব দূর করে দেবেন।'

***

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের মাঝে প্রচলন ছিল এ রকম যে, তারা যখন কোনো মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করতেন, অথবা যখন বিবাহিত কোনো মহিলার স্বামী মারা যেত, তখন তারা সর্বপ্রথম বিষয়টি রাসূলের সামনে উপস্থাপন করতেন যেন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ওই মেয়ের ব্যাপারে রাসূলের কোনো আগ্রহ আছে কি না। রাসূলের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরেই কেবল সাহাবায়ে কেরাম কোনো মেয়ে বা বিধবার বিবাহ অন্যত্র নির্ধারণ করতেন।

***

দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে, এর মধ্যে এমন একটি মেয়ের প্রসঙ্গও তাঁর সামনে উত্থাপিত হয়নি যাকে জুলাইবীবের জন্য মানানসই মনে করা যায়। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উদ্যোগেই রওনা করলেন এক আনসারী সাহাবীর উদ্দেশ্যে। সেই আনসারী সাহাবীকে বললেন,

'তোমার অমুক মেয়েটার কি বিয়ে দেবে?'

এ কথা শুনে তো লোকটি খুশিতে আটখান হয়ে বললেন,

'অবশ্যই দেব ইয়া রাসূলাল্লাহ... আর অবশ্যই তা অনেক বড় সৌভাগ্য আমার...

কী যে কপাল আমার! আল্লাহর রাসূল আমার জামাই হবেন!

এত বড় সম্মান আমার! এত বড় মর্যাদা আমার!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'আরে আমি তো আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কথা বলিনি...'

এই কথা শোনার পর আনসারী লোকটির আনন্দ-উচ্ছলতা হঠাৎ নিভে গেল। তিনি জানতে চাইলেন

'তাহলে কার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'জুলাইবীবের সঙ্গে...'

আনসারীর চেহারায় এতক্ষণ যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল এখন একেবারেই আকস্মিক সেখানে ভাটার টান শুরু হয়ে গেল। তিনি বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে একটু সময় দিন যেন ওর মায়ের সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে পারি। কারণ, আমি চাই না এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে তাকে বাদ দিয়ে আমি একাই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলি।'

***

লোকটি ভীষণ বিষণ্ন মনে বাড়ি গেলেন।

তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তার স্ত্রী জুলাইবীবের মতো কাউকেই নিজের মেয়ের বর হিসাবে মেনে নেবে না।

তিনি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। জুলাইবীব জামাই হিসাবে তার পছন্দ নয়। একই সঙ্গে তার মনে এটাও মোটেও সহনীয় নয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। হোক সেই প্রস্তাব যতই কষ্টসাধ্য।

বাড়ি পৌঁছে তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন,

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার মেয়ের জন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন,

'আমার মেয়ের জন্য...
আল্লাহর রাসূল প্রস্তাব দিয়েছেন আমার মেয়ের জন্য...
আহারে কী সৌভাগ্য মেয়েটার...
মারহাবা... মারহাবা... রাসূলুল্লাহকে...
শুভেচ্ছা তাঁকে, সুস্বাগতম তাঁর জন্যে...
মেনে নিলাম প্রস্তাব, অবশ্যই বিয়ে দেব রাসূলুল্লাহর সঙ্গে...
আরে এর চেয়ে বড় সম্মান ও সৌভাগ্য আর কি আছে?'

লোকটি বললেন,

'কিন্তু তিনি নিজের জন্য প্রস্তাব দেননি।'

কথাটি শুনে তার স্ত্রীও ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন এবং ভগ্ন আওয়াজে জিজ্ঞাসা করলেন,

'তাহলে কার জন্যে আমাদের মেয়ের প্রস্তাব এনেছেন?'

স্বামী বললেন,

'জুলাইবীবের জন্য।'

স্ত্রী বললেন,

'জুলাইবীব?!!... অসম্ভব...
আল্লাহর কসম আমার মেয়েকে জুলাইবীবের সঙ্গে বিয়ে দেব না।'

স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন,

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কী জবাব দেব?'

স্ত্রী বললেন,

'তোমার যা ইচ্ছা তা-ই বলে দাও। যেকোনো ওযর পেশ করো।
আমি কোনোভাবেই জুলাইবীবকে মেয়ের বর হিসাবে মেনে নেব না।'

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আলোচনা চলতে থাকে। আওয়াজ উঁচু হয়ে যায় উভয়ের।

স্বামী চেষ্টা করতে থাকে এ কথাটি বোঝাতে যে, বিষয়টি অন্য যেকোনো মানুষের আনা প্রস্তাবের মতো নয়।

স্ত্রী মেয়ের বিয়ে জুলাইবীবের মতো একজনের সঙ্গে—এই আলোচনায় কোনোভাবেই নম্রতা দেখাতে নারাজ। এ বিষয়ে তিনি স্বামীর একটি কথাও শুনতে চান না।

শেষ পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টায় নিরাশ হয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে রাসূলের কাছে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন। হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন তাদের মেয়ে। মেয়েটি বাবা-মায়ের আলোচনার কিছু কথা দূর থেকে শুনছিল। তাই ভূমিকা না করে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন,

'কে আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন?'

মা জবাব দিলেন,

'প্রস্তাব এনেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুলাইবীবের জন্য। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছি...। কারণ, তোমার মতো সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী তরুণী মেয়ের স্বামী হওয়া উচিত অনেক মর্যাদাসম্পন্ন।'

মেয়েটি বলল,

'ছি ছি, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে? আল্লাহর কসম, আমি এমন নই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেব। তোমরা আল্লাহর রাসূলের প্রস্তাব মেনে নাও। কারণ, নবী তো মুমিনদের জন্য তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি আপন। আমাকে তোমরা জুলাইবীবের সঙ্গেই দিয়ে দাও। আর নিশ্চিত আস্থা ও বিশ্বাস রাখো যে, আল্লাহ তাআলা কিছুতেই আমাকে ক্ষতির মধ্যে ফেলবেন না।'

মা মনের ব্যথা মনে রেখেই নীরব হয়ে রইলেন, আর পিতা চললেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে। গিয়ে বললেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এবং আপনার প্রস্তাব শিরোধার্য। আমাদের মেয়ের বিয়ে দিন জুলাইবীবের সঙ্গে।’

এ কথা শুনে রাসূলের পবিত্র মুখে খুশির ঢেউ খেলে গেল। তিনি মেয়েটির জন্য দুআ করলেন,

اللّٰهُمَّ صُبَّ عَلَيْهَا صَبًّا، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا

‘আল্লাহ, এই মেয়েটির ওপর সকল প্রকার কল্যাণ ঢেলে দাও। তার জীবনে দিয়ো না কোনো প্রকার কষ্ট।’

এরপর তিনি নিজেই জুলাইবীবের সঙ্গে ওই মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিলেন।

***

নববধূকে নিয়ে জুলাইবীবের মধুময় দিনগুলো অতিদ্রুত কাটতে থাকল। কিন্তু হাতেগোনা কয়েকটা দিন যেতে না-যেতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের আহ্বান জানালেন। আল্লাহর রাস্তায় তাঁর সঙ্গে জিহাদে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকলেন। জুলাইবীব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের সেই ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করলেন। নববধূকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন রাসূলের সঙ্গে।

***

রাসূলের নেতৃত্বে যুদ্ধ সমাপ্ত হলো। মহান আল্লাহ বিজয় দান করলেন তাঁর নবীর পক্ষে। যুদ্ধের শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন,

‘তোমাদের সঙ্গীসাথি কাউকে কি হারিয়েছ? দেখো কেউ অনুপস্থিত কি না?’

সাহাবীরা একবাক্যে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কাউকে হারাইনি। আমাদের সাথিসঙ্গী সকলেই উপস্থিত।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন,

'কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি জুলাইবীব এখানে নেই। তোমরা তাকে খোঁজো।'

রাসূলের নির্দেশে তখন সকল সাহাবী পুরো যুদ্ধের মাঠে জুলাইবীবকে খুঁজতে শুরু করলেন। হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল জুলাইবীব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মৃতদেহ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, জুলাইবীব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একাই সাতজন মুশরিককে নিজের তরবারির আঘাতে হত্যা করে অবশেষে নিজেও শহীদ হয়ে তাদের মাঝেই পড়ে আছেন।

তারা রাসূলের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন,

'ওই যে ওইখানে জুলাইবীব সাত দুশমনকে হত্যা করার পর নিজেও নিহত হয়ে পড়ে আছেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন,

'সাতজনকে হত্যা করার পর তারাও তাকে (জুলাইবীবকে) হত্যা করেছে। সে আমার প্রিয়জন আমিও তার প্রিয়জন, সে আমার প্রিয়জন আমিও তার প্রিয়জন।'

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবর খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। খননকাজ শেষ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে গিয়ে নিজের মুবারক দুই হাতে নিলেন জুলাইবীবের মৃতদেহ। এরপর নিজের হাতেই তার দেহ কবরে শোওয়ালেন এবং নিজের মুবারক হাতে তার কবরে মাটি দিলেন।

***

জুলাইবীবের স্ত্রী ইদ্দত পালন শেষ হলে তাকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কত আগ্রহী মানুষ যে এলেন তার কোনো হিসাব-নিকাশ নেই।

এমনকি আনসারী বিধবা নারী হিসাবে একমাত্র তার ক্ষেত্রেই এমন অসংখ্য প্রস্তাব আর আগ্রহী মানুষের খোঁজ পাওয়া যায়।

কারণ, সকলেই জানতেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মেয়ের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন,

'আল্লাহ তাআলা যেন তার ওপর সকল কল্যাণ ঢেলে দেন এবং তার জীবনে যেন না রাখেন কোনো প্রকারের কষ্ট।'

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ১১৭৯।
৩. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা।
৪. *ইবনে হিব্বান*, ৯ম খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা।

সাআদ ইবনে মুআয

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

বদর যুদ্ধে আনসার সৈনিকদের পতাকাবাহী

পবিত্র ভূমি মক্কা মুকার্‌রামায় যে সময় নতুন নবুওয়াতের চাঁদ উদিত হয়...

সে সময় সাআদ ইবনে মুআয ছিলেন মদীনার শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা, বিশাল শক্তিধর ও ব্যাপক মর্যাদার অধিকারী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

তিনি ছিলেন আব্দুল আশহাল গোত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

আর আব্দুল আশহাল ছিল তখন মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের প্রধান শীর্ষ শাখা।

আউসের এই যুবক সরদার মক্কার ইসলাম-প্রচারক মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিভিন্ন খবর শুনতেন, তবে ওগুলোর দিকে তিনি তেমন একটা মনোযোগ দিতেন না।

তিনি জানতেন ওই প্রচারক এখানে অবস্থান নিয়েছেন তারই খালাতো ভাই সাআদ ইবনে যুরারাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মেহমান হিসাবে। তিনি এটাও জানতেন, মদীনার সমাজে নতুন ধর্ম-প্রচারের কাজে তারা দু'জন পরস্পরকে সহযোগিতা করছেন। এ কারণেই তিনি

ওদের কাজে, ওদের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করেননি। যেন নিজের খালাতো ভাইয়ের সঙ্গেই আবার কোনো ঝামেলায় না জড়াতে হয়।

***

আউস সরদার সাআদ ইবনে মুআয উসাইদ ইবনে হুযাইরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের আব্দুল আশহাল পল্লির এক প্রান্তে ঘোরাঘুরি করতে করতে হঠাৎ দেখতে পেলেন মক্কার ইসলাম-প্রচারক মুসআব ইবনে উমাইর এবং তার মেজবান পাশেরই একটি বাগানে খেজুর গাছের শীতল ছায়ায় বেশ আরামে বসে আছেন, সেখানের কুয়ার ঠাণ্ডা পানি পান করছেন।

নতুন ধর্মে বিশ্বাসী কিছু মানুষও তাদের পাশে জড়ো হয়েছে। তারা মুসআবকে প্রস্তাব করছে তাদেরকে আল্লাহর দীন সম্পর্কে কিছু শোনাতে এবং আল্লাহর কিতাব থেকে তাদের কিছু শিখিয়ে দিতে।

এই রকম একটি দৃশ্য হজম করা আউসের টগবগে তরুণ সরদারের জন্য বেশ কষ্টকর হয়ে গেল। তার মনে হলো,

'আমার খালাতো ভাই এবং তার ওই মেহমান এত বড় দুঃসাহস কোথায় পেল যে, আমার ঘরের দুয়ারে মানে আমার হৃৎপিণ্ডের ওপর বসে মুহাম্মাদের ধর্ম প্রচার করছে?'

এর একটা বিহিত করতেই হবে।

তিনি ভীষণ রেগে সঙ্গী উসাইদ ইবনুল হুযাইরকে হুকুম দিলেন,

'এক্ষুনি যাও ওদের কাছে। ওই মক্কার যুবক যে আমাদের ধর্ম, আমাদের দেব-দেবীর দোষারোপ করে দুর্বল, অসহায় ও অবহেলিত লোকদের ভুল বুঝিয়ে নতুন ধর্মে দীক্ষিত করে; এক্ষুনি তাকে ধমক দিয়ে বলে এসো—আজকের পর আর কখনোই যেন আমাদের এই এলাকায় পা না রাখে।'

তিনি আবার বললেন,

‘সাআদ ইবনে যুরারাহ যদি আমার আপন খালাতো ভাই না হতো, তাহলে আজ আমি তোমাকে দেখাতাম কীভাবে ওদের দু’জনকেই উচিত শিক্ষাটা দিতে হয়।’

***

উসাইদ ইবনুল হুযাইর বর্শাটা নিয়ে সাআদ ইবনে যুরারাহ এবং তার মেহমান মুসআব ইবনে উমায়েরের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। অন্তরে পুষে রাখা একগাদা রাগ নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালেন।

তাকে দেখামাত্র মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একগাল মিষ্টি হাসিমাখা চেহারায় কোমল বাক্যে অভ্যর্থনা জানালেন। আবেগপূর্ণ ভাষায় সম্বোধন করে অতিযত্নে তাকে বসিয়ে ইসলামের কথা বলতে লাগলেন। তাকে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত শোনাতে থাকলেন। যা পাষাণ হৃদয়কে মোমের মতো কোমল করে দেয় এবং ঘৃণাভরা অন্তরকে আকর্ষণ করে। ওইসব কুরআনী আয়াত শুনতে শুনতে উসাইদের চেহারা থেকে রাগ ও ক্রোধের গুমোট অন্ধকার দূর হয়ে যায়। সেখানে ফুটে ওঠে আনন্দ ও খুশির উজ্জ্বল আলোকিত প্রকাশ। আরও একটু পরে তার চোখেমুখে ঝলমলিয়ে ওঠে তীব্র আনন্দ আর প্রচণ্ড খুশি। সেই আনন্দ আর খুশির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার কণ্ঠে, তিনি অভিভূত হয়ে বলে ওঠেন,

مَا أَعْذَبَ هَذَا الْكَلَامَ وَمَا أَحْسَنَه !

‘আহা, কত মধুমাখা এইসব বাণী! আহা, কতই-না চমৎকার এই বাণী!

এরপর তিনি আর দেরি করতে চাইলেন না। সোজা চলে এলেন আসল প্রশ্নে। বললেন,

‘আচ্ছা, কেউ যদি তোমাদের এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তাকে কী করতে হয়?’

মুসআব ইবনে উমায়ের বললেন,

'খুব সহজ, আপনি গোসল করে শরীর পবিত্র করে পবিত্র পোশাক পরে পবিত্র কালেমা পড়ে সত্যের সাক্ষ্য দেবেন। তারপর দুই রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাবেন। ব্যাস শেষ। এবার উঠুন, ওই যে গোসলের পানি একদম নিকটেই... ।'

উসাইদ ইবনুল হুযাইর সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। গোসল সেরে এসে কালেমা শাহাদাত পড়লেন এরপর দুই রাকাত শুকরিয়ার নামায পড়ে মুসআবকে বললেন,

'আমার পর আর একজন মানুষ আছে সে যদি আপনাদের অনুসারী ও সঙ্গী হয়ে যায়, তাহলে তার কওমের একটা মানুষও আর দূরে থাকবে না। আমি এখনই তাকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। আপনারা চমৎকারভাবে তার সামনে ইসলামের মর্ম উপস্থাপন করবেন।'

***

উসাইদ ফিরে গেলেন এবং গিয়ে পৌঁছলেন কওমের মিলনায়তনে (ক্লাবঘরে)। সাআদ ইবনে মুআয তাকে আসতে দেখে গভীর ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরখ করার পর পাশের লোকদের বললেন,

'আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, উসাইদ যেই মানসিকতা নিয়ে গিয়েছিল, ফেরার সময় সেটা একেবারেই বদলে গেছে। সেখান থেকে অন্য উসাইদ ফিরেছে। যে গিয়েছিল সে আর নেই।'

এরপর সাআদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'উসাইদ, তুমি ওইখানে গিয়ে কী করে এলে?'

তিনি জবাব দিলেন,

'আমি ওদের দু'জনের সঙ্গেই আলোচনা করেছি। আমি ওদের মধ্যে সমস্যার কিছু দেখলাম না।'

সাআদ ইবনে মুআয রাগে দাঁত কটমট করে লফিয়ে উঠলেন। উসাইদের হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিয়ে বললেন,

‘আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না যে, সেখানে তুমি কোনো কিছু করতে পেরেছ। ওদের প্রচারকাজ যদি এই ভাবেই চলতে থাকে, তাহলে কালকেই দেখব ওরা আমার ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের দাওয়াত দিচ্ছে; আমার ও আমার পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করাতে উদ্বুদ্ধ করছে।’

***

এরপর সাআদ ইবনে মুআয নিজেই ওই জায়গায় গেলেন, যেখানে মুসআব ইবনে উমায়ের এবং তার মেজবান বসে ছিলেন।

তার খালাতো ভাই সাআদ ইবনে যুরারাহ তাকে আসতে দেখে মুসআবকে বললেন,

‘হে মুসআব, আপনার কাছে আসছেন ওই কওমের সরদার। যদি সে আপনার অনুসারী হয়ে যায়, তাহলে তার কওমের আর একজন মানুষও দূরে পড়ে থাকবে না। অতএব একটু ভেবে দেখুন তার জন্য আপনি কী করতে পারেন?’

ততক্ষণে সাআদ তাদের দু’জনের কাছে চলে এল। সেখানে দাঁড়িয়ে খালাতো ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন,

‘হে আবু উমামা, তোমার আর আমার মাঝে যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা না থাকত, তাহলে নিশ্চয় তুমি এই এতখানি সাহস দেখাতে না। আমাদের এলাকায়, আমাদের সীমানায় ঢুকে তুমি আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এভাবে কাজ করে যাচ্ছ?’

মিষ্টি হাসিমুখ আর নম্রভাষা নিয়ে মুসআব তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন,

‘ভাই, যদি একটুখানি বসে আমার দু’টো কথা শোনেন। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমার কথা আপনার যদি ভালো লাগে, যদি আপনার আগ্রহ জাগে, তাহলে আমার দাওয়াত কবুল করবেন আর যদি আমার কথা আপনার ভালো না লাগে, তাহলে এক্ষুনি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব।’

‘আল্লাহর কসম! তোমার কথা খুবই যুক্তিসম্মত। ঠিক আছে বলো।’

মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে ইসলামের মর্ম উপস্থাপন করলেন। কুরআনের কিছু আয়াতও তাকে শোনালেন, যা শুনে সাআদের হৃদয় বিনীত ও বিনম্র হয়ে উঠল। তার গোটা শরীরে এক অনাস্বাদিত প্রশান্তি নেমে এল। তার আত্মাও সেই প্রশান্তির সরোবরে সাঁতার কেটে বেড়াতে লাগল।

আর একটুও দেরি না করে তিনি মুসআবকে বলে উঠলেন,

‘আচ্ছা, এই প্রশান্তি ও কল্যাণের ধর্মে দীক্ষিত হতে চাইলে কী করতে হয়?

আল্লাহর কসম! এত আকর্ষণীয়, মর্যাদাপূর্ণ ও শান্তির বাণী জীবনে কখনো শুনিনি।’

আউস গোত্রের সরদার স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই কালেমা পড়লেন এবং ঈমানের আলোর কাফেলায় শামিল হয়ে গেলেন।

***

সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের বর্শা হাতে ফিরে এলেন কওমের মিলনায়তনে। সেখানে উপস্থিত লোকেরা তাকে আসতে দেখে মন্তব্য করল,

‘আল্লাহর কসম! সাআদ ইবনে মুআয যাওয়ার সময় যেই ভাব ও মনোভাব নিয়ে গিয়েছিল এখন ফিরে আসছে ভিন্ন ভাব ও মনোভাবকে সঙ্গে নিয়ে।’

তিনি মিলনায়তনে উপস্থিত হয়ে বললেন,

‘হে আব্দুল আশহাল গোত্রের ভাইয়েরা, আমাকে আপনারা কেমন দৃষ্টিতে দেখেন?’

সকলে সমস্বরে বললেন,

'আমাদের দৃষ্টিতে আপনি আমাদের সুযোগ্য নেতা, আপনিই আমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণী, আপনার মতামতটা আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

এই জবাব শোনার পর তিনি সোজা ভাষায় নিজের মতামত ঘোষণা করলেন,

'আপনাদের প্রত্যেক নারী-পুরুষ যতক্ষণ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন না করবেন, ততক্ষণ আমার সঙ্গে কোনোরূপ কথাবার্তা বলা হারাম।'

আব্দুল আশহাল গোত্রে সেই দিন সন্ধ্যায় একজন নারী-পুরুষও ইসলামের আলো গ্রহণ থেকে দূরে ছিলেন না। সরদারের নির্দেশ পেয়ে সেই গোত্রের প্রতিটা নারী-পুরুষই ইসলাম কবুল করে নেন।

***

সেদিন থেকে ইসলামের প্রথম সুসংবাদবাহী মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অবস্থান পরিবর্তন হলো। ঠিকানা পরিবর্তন করে তিনি উঠলেন নতুন ঠিকানায়। আউসের সরদার সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িই হলো তার ইসলামী দাওয়াতের নতুন ঠিকানা। নতুন আশ্রয়স্থল।

এখন আনসারদের প্রতিটি বাড়ি মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীতে ভরে উঠল।

আর এভাবেই মক্কা থেকে হিজরতকারীদের জন্য মদীনার সকল দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গেল। যার ফলে তারা দলে দলে এবং আলাদা আলাদা হিজরত করে মদীনায় আসা শুরু করলেন। মদীনার বিশাল বিস্তৃত পরিসরে তারা এসে খুঁজে পেলেন নিরাপত্তা আর নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাদ।

***

সাআদ ইবনে মুআযের ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের জন্য এক বিশাল কল্যাণ আর মুসলিম জাতির জন্য ব্যাপক বরকতময়।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অবদান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ে তৈরি করে তার প্রতি মুগ্ধতা ও ব্যাপক ভালোবাসা।

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট সূচনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুধু কুরাইশী বাণিজ্য-কাফেলা আক্রমণের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন, কিন্তু দেখতে না-দেখতেই তিনি পড়ে গেলেন এক মহাসংকটময় পরিস্থিতিতে।

বিষয়টি এই, রাসূলের সঙ্গে শুধু বণিকদলের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে যে সকল মুসলিম মদীনা থেকে বেরিয়েছিলেন, সর্বসাকুল্যে তাদের সংখ্যা চল্লিশের বেশি হবে না। [আবু সুফিয়ানের বণিকদল মুসলিমদের আক্রমণের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে সাহায্য চেয়ে মক্কায় সংবাদ পাঠায়। আবু জাহালের নেতৃত্বে প্রায় এক হাজার সশস্ত্র বাহিনী কাফেলাকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে বের হয়। আবু সুফিয়ান সুযোগ বুঝে পালাতে সক্ষম হয়। তখন সে বণিক কাফেলার নিরাপদ থাকার সংবাদ জানিয়ে আবু জাহালের কাছে মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠায়। কিন্তু আবু জাহাল মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প নিয়ে বদর প্রান্তরে এসে অবস্থান নেয়। –অনুবাদক]

কিন্তু পরিস্থিতি একেবারেই আকস্মিকভাবে মোড় নেয় ভিন্ন দিকে। ইসলামবিদ্বেষী, দুর্ধর্ষ বিশাল এক বাহিনীর মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ এসে যায় মুসলিম বাহিনীর সামনে।

অথচ রাসূলের কাছে সে সময় তিনশো সতেরো (ভিন্ন মতে ৩১৩/৩১৪/৩১৫) জনের বেশি জিহাদ করার মতো মানুষ ছিল না। পরিস্থিতিও এমন যে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তাঁর সামনে মাত্র দু'টি পথই খোলা ছিল। হয়তো আবু জাহালের বিশাল দুর্ধর্ষ মুশরিক বাহিনী—যারা বদর প্রান্তরে অবস্থান নিয়েছে—এদের বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিয়ে মদীনায় নিজ অবস্থানে ফিরে যাওয়া।

এতে ওই মুশরিক বাহিনী মদীনার পথেঘাটে অলিগলিতে ঘুরেফিরে মুসলিম জনসাধারণকে আতঙ্কিত করার ব্যাপক সুযোগ পেয়ে যাবে এবং মদীনা ও মক্কার মধ্যে অবস্থানকারী সকল গোত্রের সামনে নিজেদের বিশাল শক্তি প্রদর্শন করবে।

আর দ্বিতীয় পথটি হলো, নিজের মাত্র তিনশো'র সামান্য অধিক মুজাহিদের ক্ষুদ্র একটি বাহিনী নিয়েই বিশাল মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়া।

কিন্তু শেষোক্ত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটি অনেকাংশে নির্ভর করছে আনসার সাহাবীদের ওপর। কারণ, তাঁর সৈনিকদের সিংহ-ভাগই তারা।

তা ছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় রয়েছে। সেটা এই, মদীনার লোকেরা যখন 'দ্বিতীয় আকাবা'তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তারা রাসূল হিজরত করে মদীনায় গেলে তাঁর হেফাজত প্রসঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেখানে তারা বলেছিলেন,

'আমরা আপনাকে সেভাবেই বিপদাপদ ও শত্রু থেকে রক্ষা করব যেভাবে নিজেদের এবং স্ত্রী ও সন্তানদের জীবন রক্ষা করে থাকি।'

এই অঙ্গীকারের মধ্যে এমন কোনো কথা ছিল না যে, তাঁর সঙ্গে ঘরবাড়ি ফেলে বাইরে গিয়েও যুদ্ধ করবে।

প্রধানত আনসার সাহাবীদের এই দিক বিবেচনায় রাখার কারণেই লড়াই করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে বিলম্ব করছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বিষয়টি অনুমান করতে পেরে সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়িয়ে দৃপ্তপ্রত্যয় ও চূড়ান্ত সংকল্পভরা কয়েকটি শব্দে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আনসার বাহিনীর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘোষণা দিয়ে বললেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনাকে বিশ্বাস করেছি, আপনার কাছে আমরা অঙ্গীকার করেছি এবং আপনার নির্দেশ শুনব, মানব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার যা ইচ্ছা নির্দ্বিধায় তা-ই করুন...

যেই মহান আল্লাহ আপনাকে সত্য আদর্শ দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি, আপনি যদি এই সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, অবশ্যই আমরা আপনার সঙ্গে নির্দ্বিধায় সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা অবশ্যই যুদ্ধের ময়দানে অবিচল শত্রুর মোকাবেলায় সৎ এবং সাহসী।

নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে আমাদের এমন কিছু দেখাবেন যাতে আপনার মনপ্রাণ জুড়িয়ে যাবে।'

সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সব কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতবেশি খুশি হলেন যা অবর্ণনীয়।

সুতরাং যুদ্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে তিনি আনসার বাহিনীর পতাকা তুলে দিলেন সাআদ ইবনে মুআযের হাতে আর মুহাজির বাহিনীর পতাকা দিলেন আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে।

***

খন্দক যুদ্ধের সময়ও সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বিষয়টি ছিল এই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে, আরবের বিভিন্ন গোত্র মিলে মদীনাবাসীদের ওপর তীব্র চাপ প্রয়োগ করছে, তখন তিনি এই চাপ লাঘবের উদ্দেশ্যে গাতফান গোত্রের নেতাদের ডেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি এমনকি তাদের এইরূপ প্রস্তাবও দেন যে, গাতফান গোত্র যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালে তাদের দেওয়া হবে

মদীনার এক-তৃতীয়াংশ ফসল। এই লোভনীয় প্রস্তাব তারা মেনে নেওয়ার আশ্বাসও দেয়।

সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন জানতে পারলেন যে, গাতফান নেতৃবৃন্দ আর রাসূলের মাঝে কী আলোচনা চলছে তখনই তিনি রাসূলের কাছে গিয়ে বললেন,

'এটা কি আপনার পছন্দনীয়? সে রকম হলে তো সেটা শিরোধার্য।

নাকি শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে আপনি এটা করছেন? আমাদের চাপ কমাতে?'

রাসূল বললেন,

'এটা আমি শুধুই তোমাদের জন্য করছি। আল্লাহর কসম, আমি দেখছি যে, গোটা আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। তোমাদের ভীষণ চাপে ফেলে দিয়েছে। সে জন্যই আমি এটা করেছি।'

সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথার উত্তরে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এবং ওইসব কওমের লোকেরা শিরক এবং মূর্তিপূজায় ডুবে ছিলাম। সেই সময় একই আদর্শে থাকা সত্ত্বেও তারা কখনোই আমাদের ফল ফসলের লোভ করতে পারেনি কিনে নেওয়া ছাড়া এবং আমরা তাদের দেওয়া ছাড়া।

অথচ আজ যখন আল্লাহ তাআলা ইসলামের মর্যাদা দিয়ে আমাদেরকে ওদের থেকে পৃথক করে দিয়েছেন, আপনার মতো শ্রেষ্ঠ নবীর সঙ্গী হওয়ার গৌরব দান করেছেন, এখন আমরা ওদেরকে আমাদের ফসল দিয়ে দেবে? এটা হতেই পারে না।

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা ওদের তরবারির আঘাত ছাড়া আর কিছুই দেব না। যতদিন পর্যন্ত মহান আল্লাহ ওদের আর আমাদের মাঝে কোনো ফয়সালা না করছেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।'

সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই কথায় প্রিয় নবী খুব খুশি হলেন এবং পূর্বের সেই ভাবনা ত্যাগ করলেন।

এই খন্দকের যুদ্ধেই সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমন এক তিরের আঘাতে আক্রান্ত হলেন যা তার হাতের জীবনশিরা কেটে অকার্যকর করে দিলো। যার ফলে তার জীবনটাই বিপন্ন হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে এসে তার মাথা তুলে নিজের কোলের ওপর রেখে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। বিষণ্ন ও ব্যথাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন,

'হে আল্লাহ, তোমার দীনের জন্য সাআদ সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করেছে...

তোমার রাসূলকে সত্য জেনেছে...
তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পূর্ণ পালন করেছে...
অতএব তুমি তার রুহ কবুল করে নাও সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতিতে।'

মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করা সাআদের চোখমুখ রাসূলের দুআ শোনার পর খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল এবং দুই চক্ষু মেলে বললেন,

'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ... আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল...'

এই কথা বলার পরই তার রুহ উড়াল দিলো মহান প্রভুর নির্দেশে...।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৩২০৪।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।
৩. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা; ৩য় খণ্ড, ২৪১, ৪২৭ পৃষ্ঠা।
৪. *কানযুল উম্মাল*, ৭ম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।
৫. *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ৯ম খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা।
৬. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা।
৭. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা।
৮. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৩য় খণ্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা।
৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩য় খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা; ৪র্থ খণ্ড, ১১০ ও ১১৮ পৃষ্ঠা।

শাদ্দাদ ইবনে আউস আল-আনসারী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

নিশ্চয় কিছু মানুষকে প্রচুর ইলম ও জ্ঞান দান করা হয় হিলম ও সহনশীলতা নয়, আবার কাউকে প্রচুর সহনশীলতা দেওয়া হয় জ্ঞান নয়। তবে শাদ্দাদ ইবনে আউস ছিলেন এমন বিরল ব্যক্তি যাকে একই সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল জ্ঞান ও সহনশীলতা দু'টোই।'

—শাদ্দাদের ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের মন্তব্য

এই বিখ্যাত সাহাবী জ্ঞান ও সহনশীলতার আধার...

এক বিখ্যাত ইবাদতগুজার...

আনসার সাহাবীদের অন্যতম যাহেদ... দুনিয়াবিমুখ, নির্মোহ ব্যক্তি...

যিনি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায় পূর্ণাঙ্গ, পরিতৃপ্ত...

আল্লাহর চিরন্তন দীনের জ্ঞানে সিক্ত আর সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর ছিলেন সুদৃঢ় ও শক্ত।

নিশ্চয় তিনিই শাদ্দাদ ইবনে আউস ইবনে সাবেত আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেড়ে উঠেছিলেন এমন পরিবারে, যে পরিবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছিল নিজেদের সামর্থ্যের সবটুকু উজার করে। যারা নিজেদের সার্বিক শক্তি, সাহায্য ও সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

তার পিতা আউস ইবনে সাবেত ছিলেন সেই ভাগ্যবান সত্তর ব্যক্তির একজন যারা আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণের শপথ নিয়েছিলেন। একই সঙ্গে যারা এই অঙ্গীকারেও আবদ্ধ হয়েছিলেন যে, মদীনায় হিজরত করে এলে তারা নবীজি এবং তাঁর মক্কার সঙ্গীদের সেভাবেই হেফাজত করবেন যেভাবে নিজেদের জানমালের এবং স্ত্রী-সন্তানদের হেফাজত করে থাকেন।

শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আউস ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর সঙ্গে কৃত নিজেদের সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন এবং নিজের সর্বশক্তিই উজাড় করে দিয়েছিলেন দীন ইসলামের জন্যে।

ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদ করতে করতেই জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে সন্তুষ্টির সঙ্গে মহান রবের সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন।

তার চাচা হাস্সান ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবি,

যিনি কাফের মুশরিক কবিদের বিরুদ্ধে ধারালো কাব্যের অস্ত্র দিয়ে রাসূলের পক্ষে তীব্র প্রতিরোধকারী...

যিনি মঞ্চে মঞ্চে অনলবর্ষী বক্তৃতার মাধ্যমেও রাসূলকে মুশরিকদের আক্রমণ থেকে হেফাজতকারী...

যে কাব্য ও বক্তৃতা হতো মুশরিকদের জন্য ধারালো তির ও তরবারির চেয়েও বেশি লক্ষ্যভেদী।

এসব কিছুর বাইরে শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেওয়া হয়েছিল এমন এক বিরল সৌভাগ্য যা মদীনার আর কোনো যুবককেই দেওয়া হয়নি।

তাদের পরিবার পেয়েছিল রাসূলের মেয়ে রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং তার নেককার, পরহেজগার স্বামী উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মেজবান হওয়ার গৌরব। যিনি ছিলেন যিননূরাইন অর্থাৎ রাসূলের এক মেয়ের পর আরেক মেয়ের স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য লাভকারী এবং 'ছাহিবুল হিজরাতাইন' অর্থাৎ প্রথমে হাবাশায় পরে মদীনায় হিজরতের মর্যাদা লাভকারী।

***

বিষয়টির ব্যাখ্যা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে যখন মদীনায় হিজরত করে চলে এসেছিলেন, তখন মক্কা থেকে আসা মুহাজির সাহাবী এবং মদীনার আনসার সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে দেন। সেই বন্ধন গড়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাদ্দাদ ইবনে আউসের পিতাকে পছন্দ করেন জামাই উসমান ইবনে আফ্‌ফানের জন্য। আর শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাকে মনোনীত করেন নিজের মেয়ে রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মেজবান হিসাবে।

ফলে উসমান ইবনে আফ্‌ফান এবং তার স্ত্রী এই ঈমানদীপ্ত পরিবারের মাঝে থেকে এমন আন্তরিকতা ও যত্ন লাভ করেন, যা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে মানানসই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্কের কারণেই শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইলম অর্জন করতে পেরেছিলেন মূল উৎস থেকে। সে কারণেই বিখ্যাত সাহাবী আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فَقِيهًا ... وَإِنَّ فَقِيهَ هذِهِ الْأُمَّةِ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ

'প্রত্যেক জাতির একজন ফকীহ্ থাকেন, আর এই উম্মতে মুহাম্মাদীর ফকীহ হলেন শাদ্দাদ ইবনে আউস আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।'

***

উসমান ইবনে আফ্ফানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তাকে একজন বিখ্যাত আল্লাহভীরু, নির্মল ও স্বচ্ছ ব্যক্তির কাছে ইবাদত ও যুহদের অনুশীলন করার সুযোগ করে দিয়েছিল। ফলে ইবাদত যুহদের এই ময়দানে তিনি এমন উঁচুস্থানে উপনীত হয়েছিলেন, যেখানে পৌঁছতে পেরেছিলেন কেবল সামান্য কজন সাহাবীই। লাভ করতে পেরেছিলেন এমন সৌভাগ্য, যা লাভ করেছিলেন কেবল অগ্রবর্তী মুসলিমগণই।

বর্ণিত আছে যে, তিনি সামান্য বিশ্রামের জন্য বিছানায় গেলেও এপাশ-ওপাশ করতে থাকতেন, যেন তাকে গরম তাওয়ার ওপর শোয়ানো হয়েছে, সেভাবেই ছটফট করতেন আর বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّ نَارَ جَهَنَّمَ أَقْلَقَتْنِيْ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَنَامَ
وَأَذْهَبَتِ الْكَرٰى عَنْ عَيْنِيْ فَمَا أُطِيْقُ أَنْ أَغْفُوَ

'আয় আল্লাহ, জাহান্নামের আগুন আমাকে অস্থির করে দিয়েছে, আমি ঘুমাতে পারি না। জাহান্নামের চিন্তা আমার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে, আমার দু'চোখ মেলাতেই পারি না।'

এ কথা বলেই তিনি উঠে পড়তেন এবং একটানা ফজর পর্যন্ত নফল পড়তে থাকতেন।

***

শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন সেই বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের একজন, যারা ছিলেন একই সঙ্গে জ্ঞান ও সহনশীলতার

অধিকারী। এ জন্যই তার সম্পর্কে যারা ভালো জানতেন এমন সাহাবায়ে কেরামের মন্তব্য ছিল এই,

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُؤْتَى عِلْمًا وَلَا يُؤْتَى حِلْمًا ، وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى حِلْمًا وَلَا يُؤْتَى عِلْمًا ، وَإِنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ أُوْتِيَ الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ مَعًا.

'নিশ্চয় কিছু মানুষকে জ্ঞান দেওয়া হয় সহনশীলতা ছাড়া, আবার কিছু মানুষকে সহনশীলতা দেওয়া হয় জ্ঞান ছাড়া কিন্তু শাদ্দাদ ইবনে আউসকে দেওয়া হয়েছিল একই সঙ্গে জ্ঞান ও সহনশীলতার বিরল দু'টি বৈশিষ্ট্য।'

খলীফা উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভালোভাবে জানতেন, শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মহৎ চরিত্র ও উন্নত বৈশিষ্ট্যের কথা। সে কারণেই তিনি তাকে সিরিয়ার হিমস নগরীর গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দান করেন, সাঈদ ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেকে ওই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর।

ওই অঞ্চলের জনগণের চরিত্র ছিল এমন, কোনো গভর্নরের ব্যাপারেই তারা সন্তুষ্ট হতো না। কিন্তু শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পেয়ে তারা খুব খুশি হয়েছিলেন।

সে কারণেই তিনি তৃতীয় খলীফা উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হিমস নগরীর দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিন্তু ওই দুর্ঘটনার পর তিনি নিজেকে সরকারি দায়িত্ব থেকে সরিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

***

তৃতীয় খলীফা শহীদ হওয়ার পর শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অনুভব করলেন যে, এই ভয়াবহ ফেতনা মুসলিম উম্মাহকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছে। তিনি ওই ফেতনায় নিজের জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

সে কারণেই স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে রাসূলের শহর মদীনার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অক্ষুণ্ন রেখে এই শহরে আর অবস্থান না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বের হয়ে পড়লেন।

পবিত্র ভূমি ফিলিস্তীনের উদ্দেশে রওনা করলেন। এরপর রাসূলের মেরাজ ভূমি প্রথম কেবলা এবং এই তৃতীয় হারামে (পবিত্র ভূমিতে) বসবাস করেই জীবন কাটিয়ে দেন।

তারপরও তিনি সারা জীবনই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত ভূমি পবিত্র মদীনা এবং নূরের উৎস মক্কা মুকার্‌রমার প্রতি বোধ করতেন তীব্র আকর্ষণ।

***

মাজাশে গোত্রের এক যুবক বর্ণনা করেন,

'আমি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে শাম দেশ থেকে রওনা করলাম। পথে এক স্থানে চোখে পড়ল কয়েকটি তাঁবু। সেগুলোর মধ্যে একটি তাঁবু ছিল বেশ বড়। আমি সঙ্গীদের বললাম,

'তোমরা বড় তাঁবুওয়ালাকে খোঁজো। নিশ্চয়ই তিনি হবেন এই কওমের সরদার।'

এরপর আমরা বড় তাঁবুটির কাছে গিয়ে জোরে সালাম দিলাম। একটি লোক সেখানে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনিই বেশ হাসিমুখে আমাদের সালামের জবাব দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁবু থেকে বেড়িয়ে এলেন মর্যাদাপূর্ণ চেহারার এক প্রবীণ ব্যক্তি।

তার ওপর দৃষ্টি পড়ামাত্রই আমরা তার ব্যক্তিত্বে এত বেশি প্রভাবিত হলাম, যা আর কখনো কোনো প্রভাবশালী বা কোনো পিতাকে দেখেই হইনি।

এবার তিনিই আমাদের সালাম দিলেন। আমরা খুবই ভক্তির সঙ্গে তার সালামের জবাব দিলাম। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কোথা থেকে কোন উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন?

আমরা বললাম,
'আমরা এই কয়েকজন যুবক বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি।'

আমাদের কথা শুনে খুব উৎসুক দৃষ্টিতে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন, মনে হলো আমাদের কথাগুলো তার হৃদয়ে লুকানো ব্যথার আগুনকে উসকে দিয়েছে।

তিনি বললেন,
'আমার মন চাচ্ছে যে, তোমাদের সঙ্গেই বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওনা হই। এবং আল্লাহর সাহায্য পেলে তোমাদের সঙ্গেই বের হয়ে যাব।'

***

এবার তিনি সন্তানদের ডাকলেন, তাঁবুগুলো থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলে বের হয়ে এল। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারার মেলা। তিনি সকলকে কাছে টেনে নিয়ে বিভিন্ন কথা বললেন। শেষে তাদের নসিহত করে বললেন,

'আমার পুত্ররা, সামান্য অংশ ছাড়া তোমরা ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের কিছুই দেখোনি...

তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, ভালো ও কল্যাণের সম্পূর্ণটাই রয়েছে জান্নাতে আর মন্দ ও অকল্যাণেরও সম্পূর্ণটা রয়েছে জাহান্নামে...

পৃথিবী এমন এক ছিটিয়ে দেওয়া খাদ্য যা নেককার ও বদকার সকলেই খেতে পারছে...

আর আখেরাত এমন সত্য প্রতিশ্রুতি, যেখানে এই পৃথিবীর সকল কর্মকাণ্ডের ফয়সালা করবেন একজন সুবিচারক মহান রাজাধিরাজ।

দুনিয়া ও আখেরাত দু'টোরই অনেক দেওয়ানা আছে...

তোমরা আখেরাতের দেওয়ানা হও। খবরদার দুনিয়ার দেওয়ানা হোয়ো না।'

এরপর তিনি তাদের কাছে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বললেন,
'এই যুবকদের সঙ্গেই আমি বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাওয়ার সংকল্প করেছি।'

এই কথা শুনে ছেলেরা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নিজেদের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে বারবার নিজেদের জন্য দুআর আবেদন জানাল।

মুজাশে গোত্রের যুবক বলেন,
'আমার পাশের একজনের কাছে জানতে চাইলাম,
এই মানুষটি কে যার প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্য থেকে ইলম ও হিকমতের নূর ছিটকে বের হচ্ছে?'

তারা বললেন,
'ইনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী এবং আরেকজন সাহাবীর পুত্র। ইনিই শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।'

এরপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি আমাদের জন্য ছাতু আনালেন। পানি ও মিষ্টি মিশিয়ে মাখালেন। আমাদের মেহমানদারি করলেন।

***

রওনা করার সময় আমরা তাকে নিয়ে বের হলাম। অনেক পথ পাড়ি দেওয়ার পর আমরা একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছলাম। আমরা একটু বিশ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রাবিরতি দিলাম। তিনি নিজের এক গোলামকে নির্দেশ দিয়ে বললেন,

'কিছু ভালো খাবার-দাবারের আয়োজন করো, খেয়ে যেন 'মত্ত' হয়ে উঠতে পারি।'

আমরা তাঁর মুখ দিয়ে 'মত্ত হওয়া' কথাটি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

আমাদের ভেতর থেকে এক যুবক তো বলেই ফেলল যে,

'আপনার কথাটি যেন কেমন লাগছে।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন,

'জাযাকাল্লাহু খাইরান।'

এরই সঙ্গে অত্যন্ত অনুশোচনাদগ্ধ কণ্ঠে বললেন,

'আল্লাহর কসম! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে বাইআত নেওয়ার পর থেকে চিন্তা না করে কখনোই কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করিনি এই একটি মাত্র শব্দ ছাড়া।

অতএব আমার মুখ থেকে বের হওয়া ক্রুটিপূর্ণ এই শব্দটি তোমরা মনে রেখো না এবং আমার নামে এর প্রচারও কোরো না।

আমার থেকে যদি মনে রাখতে চাও, তাহলে এইটা মনে রেখো যা আমি তোমাদের জন্য এখন বর্ণনা করছি।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষ স্বর্ণ রৌপ্য যেভাবে যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে, প্রিয় নবীর সোনা-রুপার চেয়ে দামি এই বাণীগুলো সেভাবেই সংরক্ষণ করে রেখো,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْأَمْرِ ' وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ...

وَاَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ ' وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ...

وَاَسْأَلُكَ يَقِيْنًا صَادِقًا ' وَقَلْبًا سَلِيْمًا ...

وَاَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ ...

وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ...

وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ...

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ...

হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাই কাজে-কর্মে স্থিরতা, আর চাই হেদায়েতের ওপর অবিচলতা...

আমি তোমার কাছে চাই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক, আরও তাওফীক চাই সর্বোত্তমরূপে ইবাদতের...

চাই সত্য ইয়াকীন এবং রোগমুক্ত সুস্থ হৃদয়...

আমাকে দান করো তোমার জ্ঞানের কল্যাণ...

আমাকে হেফাজত করো তোমার জ্ঞানের অকল্যাণ থেকে...

আমি সকল পাপ থেকে তোমার ক্ষমা ভিক্ষা চাই, যে সম্পর্কে তুমি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত...

নিশ্চয় তুমি সকল অদৃশ্য বিষয়ে সম্যকরূপে অবগত...'

***

মহান আল্লাহ শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি নিজের সন্তুষ্টি দান করুন এবং তাকেও সন্তুষ্ট করে দিন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতকে তার ঠিকানা বানিয়ে দিন।

তিনি ছিলেন খাঁটি তওবাকারী, কল্যাণে নিমগ্ন, অন্যায় অকল্যাণ থেকে দূরে।

তিনি ছিলেন সর্বদাই আল্লাহ ও রাসূলের পছন্দকে অগ্রগণ্যকারী।

তথ্যসূত্র :

১. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা।
২. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৫০৭ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৩৮৪৭।
৫. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।
৬. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৭০৮ পৃষ্ঠা।

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর
(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

আল্লাহর কসম! আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের জন্মের সময় যারা আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন তারা সৎকর্ম ও সংখ্যা উভয় বিচারে বেশি ছিলেন সেই হতভাগাদের চেয়ে যারা তার মৃত্যুর সময় আনন্দে তাকবীর দিয়েছিল।

–আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব

মদীনার উঁচু উঁচু টিলা পর্যন্ত পৌঁছলেন বহু কষ্টে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে দুই ফিতা (বেল্ট) ওয়ালী আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মেয়ে আসমা...

অন্য সকল হিজরতকারী নারী-পুরুষের হয়েছিল শুধু দীর্ঘ সফরের কষ্ট।

আর তার কষ্ট, আহা তিনি ভুগেছিলেন সফরের দীর্ঘ কষ্টের চেয়েও বেশি গর্ভের কষ্টে।

আসমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মদীনার কাছাকাছি 'কুবা'য় বাহন থামাতে না-থামাতেই শুরু হয়ে গেল প্রসববেদনা...

তিনি প্রসব করলেন এক পুত্রসন্তান আর এই সন্তানই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর মদীনাকে উলট-পালট করে দিলো।

বিষয়টি এই যে মদীনার ইহুদীরা ভুয়া আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, আমাদের ধর্মযাজকেরা মুহাজির মুসলিমদের বিরুদ্ধে জাদু করেছে। যার প্রভাবে হিজরতকারী নারী-পুরুষের কখনোই কোনো সন্তান হবে না। তারা চিরস্থায়ী বন্ধ্যা হয়ে থাকবে...

***

ভাগ্যবান শিশুটির জন্মের খবর ছড়িয়ে পড়তে না-পড়তেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনা শহরের অলিগলি মুখরিত হয়ে উঠল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' স্লোগানে। মুসলিমরা একে অন্যকে ওই সন্তানের সুসংবাদ দিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন,

'ইহুদীরা ভণ্ড, ইহুদীরা মিথ্যুক।'

***

ভাগ্যবান নবজাতককে কোলে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। তিনি বাচ্চাটিকে নিজের কোলে বসালেন এবং একটি 'আজওয়া' খেজুর চিবিয়ে একটু একটু করে বাচ্চাটিকে খাইয়ে দিলেন। ভাগ্যবান শিশুটি একটু একটু করে প্রিয় নবীর পবিত্র লালামেশানো সেই খেজুর চেটে খেয়ে নিল।

নবীজি তার নাম রাখলেন 'আব্দুল্লাহ' যা ছিল তার নানা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নাম এবং তার ডাকনাম ঠিক করলেন 'আবু বকর'। এটাও তার নানার ডাকনাম।

এবার তিনি শিশুর নানাকে নির্দেশ দিলেন ওর কানে আযান ও একামত দিতে। তিনি যথারীতি রাসূলের নির্দেশ পালন করে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামতের শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন।

ফলে সৌভাগ্যবান শিশুটির পেটে সর্বপ্রথম ঢুকেছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখের লালা। আর সর্বপ্রথম আওয়াজ তার কানে পড়েছিল আযান ও একামতে উচ্চারিত আল্লাহ,

রাসূল, নামায ও সফলতার কথা। যে বাণীগুলো তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছিল তারই নানার বিশ্বাসদৃপ্ত কণ্ঠে।

***

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উন্নত ও উচ্চবংশ ছিল এতটাই সম্মানের, যা খুব কম মানুষই লাভ করতে পারে।

তার পিতা, যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। যিনি জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া দশ ভাগ্যবানের অন্যতম। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ সহচর ও 'হাওয়ারী'।

তার মা, আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা। রাসূলের পবিত্র মুখ যাকে আখ্যা দেয় 'যাতুন নিতাকাইন' (দুই বেল্টধারিণী) বলে।

তার নানা, আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। যিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম খলীফা এবং যিনি তার নির্বাচিত অকৃত্রিম বন্ধু।

তার খালা, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। যিনি নির্দোষ, নিষ্পাপ ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী এবং যার চারিত্রিক পবিত্রতা অহীর দ্বারা প্রমাণিত।

তার দাদি, আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু।

তার পিতার ফুফু, উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। আরব নারীদের প্রধান।

ইসলাম ছাড়া আর কিছুই কি পারে ওই বংশগত সম্মানের চেয়ে উচ্চ হতে?

ঈমান ছাড়া আর কোনো কিছুই কি পারে ইবনুয যুবাইরের ওই বংশমর্যাদার চেয়ে উন্নত হতে?

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জন্মেছিলেন নবী পরিবারের পবিত্র পরিবেশে। সেই পবিত্র পরিবারের বিশুদ্ধ আবহেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন আর ওই পরিবারিক উত্তম শিক্ষা, সংস্কার আর আদব-কায়দা নিয়েই তিনি একটু একটু করে বিকশিত হয়েছিলেন।

ফলে তার খালা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে তিনি ছিলেন স্বামী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পিতা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পর এ জগতের সবচেয়ে বেশি আপন ও সবচেয়ে বেশি প্রিয়জন।

***

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হলেন, তখন তার পিতা যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাকে আদেশ দিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্যের, তাঁকে মেনে চলার বাইআত নিতে। পিতার আদেশমতো তিনি তারই বয়সী ছোট্ট আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালেবকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওই ছোট্ট বালককে বড় মানুষের মতো বাইআত নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে আসতে দেখলেন, তাঁর পবিত্র চেহারায় মিষ্টি হাসির ঝলক ছড়িয়ে পড়ল। তারা কাছে আসতেই নিজের পবিত্র হাতটি মমতার সঙ্গে তাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদের দু'জনকে বাইআত করে নিলেন।

***

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবনভর রাসূলের হাতে গ্রহণ করা এই বাইআতের স্মৃতি স্মরণ করতেন। জীবনের প্রতিটি কাজে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। নিজের সন্তানদেরও সেই আদর্শ আঁকড়ে ধরে

রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একবার তার এক পুত্রকে দীর্ঘ সময় বাড়িতে অনুপস্থিত পাওয়া গেল। ফিরে আসার পর তিনি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'বেটা, সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে?'

'বাবা, একদল লোকের দেখা পেয়েছিলাম, কখনোই এদের মতো এত ভালো মানুষ আর দেখিনি। ওরা আল্লাহর যিকির করছিল খুব নিমগ্ন হয়ে। যিকির করতে করতেই কেউ কেউ রাগে ফুলে উঠছিল। আবার কেউ কেউ ভয়ে কাঁপছিল। এমনকি আল্লাহর ভয়ে যিকির করতে করতে তারা বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন। আমার খুবই ভালো লাগছিল, তাই সারা দিন বসেছিলাম ওদের কাছেই।'

তিনি ছেলেকে বললেন,

'বেটা, আর কখনো ওদের কাছে যেয়ো না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন তিলাওয়াত করতে এবং আল্লাহর যিকির করতে দেখেছি। তাঁর যিকির সর্বোত্তম, সবচেয়ে খাঁটি ও নির্ভেজাল।

আমি আরও দেখেছি রাসূলের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমকে কুরআন পড়তে এবং যিকির করতে। কিন্তু কখনোই তাদের এ রকম ফুলে যেতে, কেঁপে উঠতে অথবা আল্লাহর ভয়ে বেহুঁশ হতে দেখিনি।

তোমার কি মনে হয়, ওই লোকগুলো রাসূলের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের চেয়েও বেশি আল্লাহভীরু?'

***

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যেমনিভাবে তাকওয়া ও ইসলাহ, আল্লাহর ভয় এবং আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, একইভাবে শিশুকাল থেকেই তাকে ঘোড়দৌড় ও যুদ্ধের ওপরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

তার পিতার তীব্র ইচ্ছা ছিল তাকে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া, যেন তার পুত্র রণাঙ্গনগুলোতে উপস্থিত থাকে এবং বিভিন্ন বিজয় অভিযান স্বচক্ষে দেখতে পারে।

এ কারণেই তিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় ছেলেকে মদীনা থেকে সিরিয়াতে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার জন্য একটি চমৎকার ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাকে দেখেশুনে রাখার জন্য একজন দায়িত্বশীল লোকও ভাড়া করেছিলেন।

এর ফলে তার সুযোগ হয়েছিল ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ সেনাদলের যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখার এবং বিশাল সেনাদলের আক্রমণ ও প্রতিরোধ দেখার।

সুযোগ হয়েছিল জয় ও পরাজয়ে বিশাল সেনাদলের সঙ্গী হওয়ার।

এসব কারণে একসময় তিনি হয়ে ওঠেন একজন সাহসী যোদ্ধা, হয়ে পড়েন একজন ইবাদতগুজার।

***

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন থেকে তরবারি ধারণের যোগ্য হয়েছেন তখন থেকে মুসলিম বাহিনীর কোনো যুদ্ধ থেকেই দূরে থাকেননি।

মুজাহিদ বাহিনীর যত যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছেন, সবগুলোতেই রয়েছে বিশেষ অবদান যা স্মরণীয় ও প্রশংসনীয়।

মুসলিম জাহানের খলীফা উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মিসরের গভর্নরকে আফ্রিকায় অভিযান চালানোর নির্দেশ দিলেন। খলীফার নির্দেশমতো মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী আফ্রিকার উদ্দেশে বের হয়ে গেল।

কিন্তু অল্প কদিন যেতে না-যেতেই ওই দলের সঙ্গে খলীফার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এতে ওই সেনাদল সম্পর্কে খলীফা ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

সে কারণেই তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন সেই দলটিকে সাহায্যের জন্য এবং খলীফার কাছে নিয়মিত সেই দলের সংবাদ পাঠানোর উদ্দেশ্যে।

***

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের খোঁজখবর নিলেন। তিনি জানতে পারলেন যে, সেনাপতি প্রতিদিন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। এরপর তার সেনাদল এবং শত্রুসেনারাও বৈরী আবহাওয়া এবং প্রচণ্ড গরমের কারণে বিশ্রামে চলে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সেনাপতিকে পরামর্শ দিলেন যে, সেনাদলকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলুন।

একদল যুদ্ধ করবে দিনের প্রথমার্ধে...

অন্যদল যুদ্ধ করবে দিনের শেষার্ধে...

বিশ্রাম নেবে উভয় দল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, তবে যুদ্ধ চলতে থাকবে সারা দিন...

এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করলে শত্রুবাহিনী নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পাবে না।

সেনাপতির খুব পছন্দ হলো এই সুন্দর পরিকল্পনা। দ্রুত তিনি সেটা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিলেন।

তিনি স্বেচ্ছায় আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে পদত্যাগ করে তার অনুগত সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করতে থাকলেন।

***

পরের দিন উভয় দল যথারীতি আগের মতোই যুদ্ধ শুরু করল...

কিন্তু যোহরের সময় হওয়ামাত্রই শত্রুবাহিনী বিশ্রামে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু তখনই তারা দেখতে পেল মুসলিম বাহিনীর এক নতুন দল যুদ্ধ চালাতে পূর্ণশক্তি, উদ্যম ও সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসছে...

ভয় ও আতঙ্কে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল...

তাদের মাঝে পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখলেন এটাই আমাদের জন্য সোনালি সুযোগ। তিনি ত্রিশজন চৌকস সৈনিক বাছাই করে বললেন,

'তোমরা দেখতে থাকো আমি কী করি, তোমরা শুধু খেয়াল রাখবে কেউ যেন পেছন থেকে আমার ওপর আক্রমণ না করতে পারে।'

***

শত্রুবাহিনীর সেনাপতি জারজীর তার ছাইরঙা বাহনে চড়ে সেনাদলের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছিলেন। দুইজন দাসী ময়ূরের সুদৃশ্য পালক দিয়ে তার মাথার ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই সেনাপতিকে দেখিয়ে তার নির্বাচিত সৈনিকদের বললেন,

'আমি যাচ্ছি ওর কাছে, তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং পেছন থেকে আমার ওপর আক্রমণকারীকে ঠেকাও।'

এ কথা বলেই তিনি সুদৃঢ় মনোবল, সংকল্প আর নির্ভুল পরিকল্পনা নিয়ে ধীরে ধীরে শত্রুসৈন্যদের সারি ভেদ করে এগুতে লাগলেন...

সৈন্যরা তাকে ভাবল মুসলিমদের দূত হয়তো সেনাপতির সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। তিনি শত্রুবাহিনীর মাঝামাঝি স্থানে যখন পৌঁছলেন, সেনাপতি তার মতলব বুঝতে পেরে ভীষণ ভয়ে পালাতে শুরু করল।

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার পিছু ধাওয়া করলেন। সামান্য কিছুদূর গিয়েই তিনি পলায়নপর সেনাপতিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন ধারালো বর্শা। এক আঘাতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দ্রুত তার কাছে পৌঁছে গেলেন এবং খুব নিকট থেকে তরবারির এক আঘাতেই তাকে হত্যা করলেন। তার মাথাটা কেটে বর্শায় গেঁথে উঁচু করে ধরলেন এবং উচ্চ আওয়াজে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলেন। যা শুনে সকল মুসলিম তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললেন।

তাকবীর ধ্বনি মুসলিম বাহিনীর অন্তরে জাগিয়ে তুলল ইসলামী জোশ...

আর মুশরিকদের অন্তরে ছড়িয়ে দিলো ভীতি ও আতঙ্কের কালো ছায়া...

তখন তারা ইবনুয যুবাইর এবং তার বাহিনীকে পিঠ দেখিয়ে হুড়মুড় করে পালিয়ে গেল।

***

আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ধন্য করেছিলেন উঁচু স্তরের তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির পবিত্রতা দ্বারা। তাই দেখা যায় জীবনভর তিনি ছিলেন দিনে রোযাদার আর রাতভর ইবাদতগুজার। আল্লাহর ঘর মসজিদগুলোতেই লেগে থাকত তার অন্তর। সে কারণে সর্বসাধারণের মাঝে তার পরিচিতি হয়ে গিয়েছিল 'মসজিদের পায়রা' নামে।

শোনা যায়, তিনি রাত কাটাতেন তিন ভাবে,

এক রাত কাটাতেন নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায়...
পরের রাত কাটাতেন রুকু অবস্থায়...
এর পরের রাত কাটাতেন ভোর পর্যন্ত দীর্ঘ সেজদায়...

***

হজের মওসুমে তার যে অবস্থা হতো, তা দেখে মুমিন-মুসলিমদের হৃদয়ে প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হয়ে যেত। তাদের অন্তরে জেগে উঠত সুপ্ত ঈমানী জযবা-আবেগ।

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আস্ সাকাফী বর্ণনা করেন,

'আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইহরাম বেঁধে 'ইয়াওমুত তারবিয়া'র একদিন পূর্বে বের হলেন। তিনি 'তালবিয়া' পড়তে থাকলেন। আহা! সে কী হৃদয়নিংড়ানো, আবেগ জাগানো মধুর তালবিয়া! আমার জীবনে আর কখনো এত চমৎকার তালবিয়া শুনিনি।

এরপর তিনি মহান আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা আদায় করলেন। মনপ্রাণ উজাড় করে মহান প্রভুর প্রশংসা ও স্তুতি গাইলেন। এরপর সমবেত উপস্থিতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'হামদ ও সালাতের পর, আপনারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আল্লাহর ঘরের তাওয়াফের উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর ঘরের মেহমানদের সম্মানিত করবেন।

আপনাদের মধ্যে যারাই আল্লাহর দেওয়া সেই সম্মান প্রতিদান ও সওয়াব চাইতে এসেছেন, মনে রাখবেন আল্লাহ মহান, তিনি তাঁর দুয়ারের প্রার্থীকে কখনোই নিরাশ করেন না।

আপনারা কাজের মাধ্যমে নিজেদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করুন, কারণ কথার মূল ভিত্তি হলো কাজ...

নিয়তকে নির্ভেজাল রাখুন, কারণ আমলের উত্তম প্রতিদান নির্ভর করে খাঁটি নির্ভেজাল নিয়তের ওপর।

এই পবিত্র দিনগুলোর ব্যাপারে খুব সাবধান, কারণ এই দিনগুলোতে খুব বেশি গুনাহ মাফ করা হয়।

তিনি আবার তালবিয়া (লাব্বাইক...) পড়তে লাগলেন, তা শুনে অন্যরাও উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়া শুরু করলেন...

সেই দিন তিনি এত বেশি কাঁদলেন, যে কান্না আমি আমার জীবনে আর দেখিনি।'

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যাকে হক ও সত্য বলে বিশ্বাস করতেন সারা জীবন সেই সত্যের পক্ষে লড়াই করে গেছেন।

এমনকি সত্যের পক্ষে লড়াই করতে করতেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মিনজানিক থেকে ছুঁড়ে দেওয়া পাথরের আঘাতে পবিত্র কাবা প্রান্তরে শহীদ হয়ে যান।

তিনি নিহত হয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়লে হাজ্জাজ ও তার বাহিনীর লোকেরা আল্লাহু আকবার বলে আনন্দ প্রকাশ করে।

বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তাদের সেই তাকবীর ধ্বনি শুনে মন্তব্য করেন,

وَاللهِ ! اِنَّ الَّذِيْنَ كَبَّرُوْا عِنْدَ وِلَادَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ' اَكْثَرُ وَاَبَرُّ مِنَ الَّذِيْنَ كَبَّرُوْا عِنْدَ مَوْتِه.

'আল্লাহর কসম! যারা আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের জন্মের সময় আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা সংখ্যা ও সৎকর্মের বিচারে অনেক বেশি ছিলেন সেই সব হতভাগার চেয়ে, যারা তাঁর মৃত্যুর সময় আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিল।'

তথ্যসূত্র :

১. *হায়াতুস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
২. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা।
৩. *সীরাতু ইবনি হিশাম*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৪. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৪৬৮২।
৬. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা।
৭. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৭৬৪ পৃষ্ঠা
৮. *তাহযীবু ইবনি আসাকির*, ৭ম খণ্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা।
৯. *আত-তাবারী*, ৭ম খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা।
১০. *তারীখুল খামীস*, ২য় খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা।
১১. *ওফাতুল ওফিয়্যাত*, ১ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা।

কা‘কা‘ ইবনে আমর

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

‘খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের সঙ্গে’

একা কা‘কা‘ ইবনে আমরের হুংকার প্রতিপক্ষ সেনাদলের মাঝে এক হাজার মুজাহিদের চেয়েও বেশি ভয়ংকর।

–আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

ওই যে হিজরতের নবম বর্ষে, মুসলিমরা যাকে ‘প্রতিনিধি আগমনের’ বছর বলে থাকে,

আর ওই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর মদীনা প্রশস্ত হৃদয় খুলে দিচ্ছে... আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এক বা একাধিক প্রতিনিধিদলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে...

প্রতিনিধিদলগুলো আসছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা এবং তাঁর মুবারক হাতে আনুগত্যের বাইআত নিতে,

ওই তো বনূ তামীম বা তামীম গোত্রের বড় বড় মহামান্য নেতা, দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে, পালিয়ে পালিয়ে থেকে আজ এসেছেন ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে, তারা মদীনায় আসছেন অনুগত ও সমর্পিত হয়ে...

তারা বাইআত গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন...

যখন তারা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে এবং তাদের জন্য রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষিত উপহার বুঝে নিতে সকলেই ব্যস্ত...

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক তামীমী যুবকের প্রতি তাকিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে যেন যুবকটির ভবিষ্যৎ ফুটে উঠেছিল, তাই তিনি জানতে চাইলেন,

– যুবক, তোমার নাম কী?

– কা'কা' ইবনে আমর।

– হে কা'কা', জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছ?'

– আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্যের শপথ বুকে ধরে, উত্তম ঘোড়ায় চড়ে, ধারালো বর্শা হাতে দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিয়েছি।

– একদম খাঁটি কথা বলে দিয়েছ।

সেই দিনের পর থেকে কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের জীবন ও তরবারিকে নিবেদন করলেন আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের উদ্দেশ্যে, আর ঘোড়ার পিঠকেই বানালেন নিজের বিছানা।

প্রিয় পাঠক, চলুন জীবনের চমৎকার কিছু সময় আমরা ব্যয় করি কা'কা' ইবনে আমর এবং তার মহান সেনাপতি ইসলামের অক্ষত তরবারি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা-র সঙ্গে।

***

'রিদ্দা'র (মুরতাদ-বিরোধী) যুদ্ধ শেষ করে কেবলই বিশ্রাম নিতে যেতে না-যেতেই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে পৌঁছল খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চিঠি। তিনি খালিদকে নির্দেশ দিয়েছেন, অবিলম্বে ইরাক অঞ্চল জয়ের

উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে, পারস্যদের কবল থেকে সেখানের লোকদের ইসলামে দীক্ষিত করতে।

কিন্তু খালিদের অধিকাংশ সেনা রিদ্দার কয়েকটি ভয়ংকর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, বেঁচে থাকা অল্প কিছু সৈনিক—তারাও এখন ছুটি কাটাতে নিজ নিজ পরিবারের মাঝে ফিরে গেছেন। যাদের সঙ্গে তার নিজেরও কোনো যোগাযোগ নেই অনেক দিন ধরে।

সুতরাং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই মুহূর্তে বিশাল সেনাবাহিনীর সামান্য কয়েকজনকেই জোগাড় করতে পারবেন।

উপায়ন্তর না দেখে তিনি খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে সাহায্যের আবেদন করে চিঠি লিখলেন।

খলীফা যখন খালিদের চিঠি খুলে তার সাহায্যের আবেদন সম্পর্কে জানলেন, তখন আশপাশের দায়িত্বশীলদের বললেন,

'খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ সেনা সাহায্য চেয়েছেন, অতএব আপনারা কা'কা' ইবনে আমরকে পাঠিয়ে তার সাহায্য করুন।'

এ কথা শুনে বিস্ময়ে সকলের মুখ 'হাঁ' হয়ে গেল। অবাক বিস্ময়ে তারা বললেন,

'হে আমীরুল মুমিনীন, যে সেনাপতি বেশির ভাগ সেনাসদস্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে আপনার কাছে সেনা সাহায্য চেয়েছেন, তাকে আপনি সাহায্য করবেন শুধু একজন সৈনিক দিয়ে?'

খলীফা সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, একজনকে দিয়েই তাকে সাহায্য করো।

আর সেই একজন কা'কা' ইবনে আমরের হুংকার প্রতিপক্ষ সেনাদলের মাঝে এক হাজার মুজাহিদের চেয়ে বেশি ভয়ংকর...

তা ছাড়া সেই সেনাদল কখনোই পরাজিত হয় না যাদের মাঝে থাকে কা'কা'...'।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দশ হাজার সৈনিক নিয়ে রওনা করলেন ইরাকের উদ্দেশে। সঙ্গে রয়েছেন কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু—যাকে খলীফা গণনা করেছেন এক হাজার মুজাহিদের সমান।

সেনাপতি খালিদ প্রথমে যাত্রা শুরু করলেন ইরাকের 'হাফীর' অঞ্চলটির দিকে—যা মরুভূমি-সংলগ্ন পারস্য উপসাগরের কাছাকাছি অবস্থিত।

আর পারস্য সম্রাটের মনোনীত এই অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন 'হুরমুয'।

হুরমুযের কথা প্রিয় পাঠকের না জানা থাকলে বলি, তিনি ছিলেন সেই সকল পারস্যবাসীর অন্যতম, যারা আপন যুগে স্পর্শ করেছিলেন মর্যাদার শীর্ষ চূড়া।

তার সেই শীর্ষ মর্যাদা বোঝানোর জন্য লক্ষ মুদ্রার মুকুটের চেয়ে বড় আর কোনো ইশতেহার ছিল না।

পারস্যবাসীর স্বভাব ছিল কওমের মধ্যে মর্যাদার তারতম্যের আলোকে মুকুট তৈরি করা, আর সেই নীতির আলোকে মর্যাদার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলে তার মুকুটের মূল্য হতো লক্ষ মুদ্রা।

পারস্যবাসীর কাছে এত শীর্ষ মর্যাদাবান মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আরবদের ব্যাপারে হুরমুয ছিলেন অন্যতম নিকৃষ্ট ও নিষ্ঠুর এক প্রশাসক।

এ কারণে আরবরা তাকে ভীষণ ঘৃণা করত। এমনকি কারও নিকৃষ্টতা বোঝাতে আরবের মানুষের মধ্যে প্রবাদ চালু হয়,

"أَشَرُّ مِنْ هُرْمُزْ" এবং "أَكْفَرُ مِنْ هُرْمُزْ"

অর্থাৎ 'হুরমুযের চেয়ে বেশি খারাপ' এবং হুরমুযের চেয়ে বেশি নেমকহারাম'।

***

মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গন্তব্যে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে হুরমুযের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠালেন। যাতে তিনি লিখলেন,

أَمَّا بَعْدُ... فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، أَوِ اخْتَرْ لِنَفْسِكَ وَقَوْمِكَ الذِّمَّةَ، وَادْفَعُوْا لِلْمُسْلِمِيْنَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّأَنْتُمْ صَاغِرُوْنَ ...

وَإِلَّا فَلَا تَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ ...

فَقَدْ جِئْتُكَ بِقَوْمٍ يُحِبُّوْنَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّوْنَ الْحَيَاةَ .

'পরসংবাদ এই যে, ইসলাম গ্রহণ করুন, তাহলে শান্তিতে থাকতে পারবেন। দ্বিতীয় বিকল্প ইসলামী রাষ্ট্রের জিম্মি নাগরিক হয়ে থাকার সুযোগ। সে ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রকে 'জিযিয়া' বা নিরাপত্তা কর দিতে হবে। এতে আপনারা রাষ্ট্রের চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের মর্যাদা ও সকল স্বাধীনতা ভোগ করবেন। মুসলিম নাগরিকদের মতোই ইসলামী রাষ্ট্র আপনাদের সকল প্রকার নিরাপত্তা দিতে বাধ্য থাকবে।

দ্বিতীয় বিকল্প যদি গৃহীত না হয়, তাহলে এর ভয়াবহ পরিণতির জন্য আমরা নই, আপনারই দায়ী থাকবেন। নিজেরাই নিজেদের তিরস্কার করবেন।

কারণ, আমি যুদ্ধের জন্য এমন এক কওমকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে ঠিক সেই রকমই ভালোবাসে, ঠিক যে রকম আপনারা ভালোবাসেন জীবনকে।'

***

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চিঠি পড়ে হুরমুযের হুঁশ-জ্ঞান উড়ে গেল। পারস্য সম্রাট আযদাশীরের কাছে চিঠি দিয়ে মুসলিম বাহিনীর ইরাক পৌঁছার খবর জানালেন।

সেনাবাহিনীকে সমবেত করে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝিয়ে অতিদ্রুত তাদের প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। তাদের নিয়ে হাফীর অঞ্চলে পৌঁছলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের পূর্বে। পানির স্থান নিজেদের দখলে নিয়ে নিলেন।

ওদিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন দলবল নিয়ে হাফীরে পৌঁছলেন, সৈনিকদের স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে অবতরণ করতে বললেন। জনৈক সৈনিক তখন বলে উঠলেন,

'মহামান্য সেনাপতি, আমাদের শত্রুরা পানির ওপর দখল নিয়েছে আর আমাদের এদিকে পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। আশঙ্কা হচ্ছে আমরা তৃষ্ণায় ছটফট করে মরে যাব।'

এ কথা শুনে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা বললেন,

'দেখো, আমি যেখানের কথা বলেছি তোমরা সেখানেই ঘাঁটি করো। এরপর পানির ঘাটেই শত্রুদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করো।

আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অবশ্যই পানি সেই দলের অধিকারে আসবে যারা পানির পিপাসায় বেশি ধৈর্য ধরবে এবং পানির জন্য কাতর না হয়ে নিজেদের স্বাভাবিক রেখে যুদ্ধ করতে পারবে।

ইনশাআল্লাহ তোমরাই হবে বেশি ধৈর্যশীল।'

***

উভয় দল সারিবদ্ধ হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল।

হুরমুয অবস্থান নিলেন নিজ দলের একেবারে সম্মুখভাগে। তার ডানে-বামে রাখলেন দু'জন বিশেষ নিরাপত্তারক্ষী।

তিনি অন্তরে লুকিয়ে রেখেছিলেন প্রতারণা ও গাদ্দারির এক গোপন পরিকল্পনা।

***

হুরমুয নিশ্চিত ছিলেন, তিনি যদি মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে হত্যা করতে পারেন, তাহলে এর অর্থ হবে তিনি বিজয়ের পথে পাঁচ ভাগ রাস্তার চার ভাগই পার করে ফেললেন।

পাশাপাশি তিনি এ ব্যাপারেও নিশ্চিত ছিলেন যে, মুখোমুখি লড়াইয়ে তাকে হত্যা করার সাধ্য তার নেই এবং কখনোই সেই সাধ্য তার হবে না। অতএব উপায় একটি—প্রতারণা ও গাদ্দারীর আশ্রয় নেওয়া।

তারপর মানুষ তাকে 'প্রতারক' বলুক অথবা ধোঁকাবাজ-গাদ্দার যা খুশি বলুক তাতে তার কিচ্ছু যায় আসে না।

এ কথা তিনি তার বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে গোপনে গোপনে জানালেন, তাদের সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা সাজালেন এবং প্রত্যেকের করণীয় ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিলেন।

***

হুরমুয সৈনিকদের কাতারের মাঝখান থেকে বেরিয়ে দুই দলের মধ্যবর্তী (বর্ডারে) দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলতে লাগলেন,

'খালিদ, তুমি কোথায়? আমার সামনে বেরিয়ে এসো।'

এরপর একটু একটু করে পিছিয়ে পারস্য দলের কাছাকাছি আর মুসলিম বাহিনী থেকে দূরে সরে গেলেন।

ওদিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুরমুযের চিৎকার ও হুংকার শোনামাত্রই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং পায়ে পায়ে হেঁটে তার উদ্দেশ্যে এগুতে থাকলেন।

তবে তিনি নিজের তরবারি বের না করে আসছিলেন দেখে হুরমুযের বিশেষ বাহিনীর লোকজন খাপমুক্ত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে।

এই রকম পরিবেশে সেখানে নিক্ষিপ্ত তিরের বেগে হাজির হলেন দুঃসাহসী সেই যোদ্ধা—যাকে খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক হাজার যোদ্ধার সমান গণ্য করেছেন। তিনি নিজেকে ওই জটলায় ছুঁড়ে দিলেন এই কথা বলে,

'হে আল্লাহর দুশমন, কা'কা' ইবনে আমর এসে গেছে...'

হুরমুয আর তার বিশেষ বাহিনীর ওপর বজ্রপাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাকে অনুসরণ করলেন আরও কয়েকজন সেরা মুসলিম যোদ্ধা।

দুই দল দুই দিকে দাঁড়িয়ে। মাঝখানে উভয় পক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু'টি অংশে ঝড়ের গতিতে ঘটে গেল খণ্ডযুদ্ধ। আর সেই খণ্ডযুদ্ধের মধ্য দিয়েই সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুরমুযের দেহ থেকে প্রাণ বের করে নিলেন।

কা'কা' এবং তার সঙ্গীরা যুদ্ধনীতি ভঙ্গকারী ক্ষুদ্রদলের সবগুলোকে পারস্য বাহিনীর সকল সৈনিকের চোখের সামনে মেরে কচুকাটা করে ময়দানে তাদের লাশ ফেলে রাখলেন...

কিন্তু এই সকল ভয়ংকর দৃশ্য দেখে বিশাল পারস্য বাহিনীর কারও নড়াচড়া করারও সাহস হলো না। সকলেই চুপচাপ দেখতে থাকল দৃশ্যগুলো।

এরপর মুসলিম বাহিনী একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুবাহিনীর ওপর। আতঙ্কিত পারস্য বাহিনী মুসলিম বাহিনীর তাড়া খেয়ে হুড়মুড় করে পালাতে গিয়ে কিছু লোক মরল আর কিছু লোক আহত হলো। সার্বিকভাবে পারস্য বাহিনীর চরম পরাজয় হলো।

যুদ্ধ সমাপ্ত হলে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন,

'খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দূরদর্শিতা সত্যিই অতুলনীয়। মানুষ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন খুবই নির্ভুল...

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফার মন্তব্য কতই-না নির্ভুল ছিল! তিনি বলেছিলেন,

যেই সেনাদলে কা'কা' ইবনে আমর উপস্থিত থাকে সেই দল কখনোই পরাজিত হয় না।'

***

হাফীর যুদ্ধ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ আর কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার সম্পর্ক মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুলল।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রণাঙ্গনে জটিল ও দুর্বিষহ মুহূর্তে এই সৈনিকের যুতসই ভূমিকা, অবদান ও সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাৎক্ষণিক ক্ষমতা বুঝতে পেরেছিলেন।

ফলে খালিদ তাকে সেনা নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বরণ করে নিলেন। ইয়ারমূক ও অন্যান্য যুদ্ধে তাকেই বানালেন নিজের ডানপার্শ্বস্থ সেনাদলের প্রধান। দামেস্ক বিজয়ের দিন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের সঙ্গে কা'কা' রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার এমন দুঃসাহসী ভূমিকা আছে, যার ঝুঁকি নিতে পারে কেবল তারাই, যাদের হৃদয় পাথরনির্মিত আর চেতনাগুলো কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত।

***

দামেস্ক বিজয় অভিযানে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে কর্মরত চারজন সেনা অধিনায়কের একজন।

কিন্তু খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ গোটা সেনাদলের প্রধান সেনাপতি হন বা কোনো রেজিমেন্টের সেনা অধিনায়ক, সর্বাবস্থাতেই তার প্রধান আকাঙ্ক্ষা হতো এই যে, কা'কা' ইবনে আমর যেন তার সঙ্গে থাকেন।

এর কারণ, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সর্বদাই তীব্র বাসনা থাকত যে, তিনি এবং তার সঙ্গী মিলে কোনো না-কোনো অলৌকিকতা সৃষ্টি করবেন।

আর সেই অলৌকিককতা সৃষ্টির জন্য কা'কা' ইবনে আমরের সমতুল্য আর আছে কে?

***

সেকালে দামেস্ক শহর ছিল চতুর্দিক থেকে সুদৃঢ় সীমানা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

আর সেই সীমানা প্রাচীরকে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল বিশাল ও গভীর খাল। প্রাচীরের ছিল মোট পাঁচটি গেট। যুদ্ধ ছাড়া সাধারণ শান্তির সময়ে সেগুলো প্রতিদিন সকালে খুলে দেওয়া হতো, যেন মানুষ নিজ নিজ প্রয়োজনে শহর থেকে বের হতে পারে। আবার প্রতি সন্ধ্যায় সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হতো, যেন মানুষ নিজেদের জানমালকে চোর-ডাকাতের হাত থেকে নিরাপদ ভেবে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে।

শহরটিতে কোনো যোদ্ধার আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে প্রহরীরা গেটগুলো বন্ধ করে দিত এবং বিশাল ও গভীর খাল পানি দিয়ে পূর্ণ করে দিত। শহরটিকে তখন মনে হতো একটি সুরক্ষিত দ্বীপ—যা সুরক্ষিত সীমানা প্রাচীর এবং পানি পরিবেষ্টিত।

***

প্রধান সেনাপতি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দামেস্ক শহরের পাঁচটি দরজার দায়িত্ব নিজে-সহ অন্য চার অধিনায়কের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তিনি নিজে নামলেন 'জাবিরা' গেটে...

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামলেন 'তাওমাআ' গেটের সামনে...

শুরাহবীল ইবনে হাসানাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামলেন 'ফারদীস' গেটের সামনে...

ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামলেন 'ছোট' গেটের সামনে...

আর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, তিনি এবং তার সঙ্গী কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা নামলেন পূর্ব গেটের সামনে—যা ছিল সবচেয়ে বেশি মজবুত এবং সুরক্ষিত।

***

মুসলিম বাহিনী সুরক্ষিত শহরের পাশে ক্ষেপণাস্ত্র তাক করল। (প্রাচীনকালের ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা হতো। এর নাম ছিল মিনজানিক।) আর নগর প্রাচীরের দরজাগুলোর কাছে ফিট করল ট্যাংক। (সে কালের এই যন্ত্রটির বিশাল পেটের মধ্যে কয়েকজন সৈনিককে ঢুকিয়ে ধাক্কা দিয়ে দুর্গের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো। যন্ত্রটির পেটের মধ্যে বসে বসে তারা দেয়াল ছিদ্র করে ফেলত। এর নাম 'দাব্বাবা'।)

শহরের রক্ষীবাহিনী ট্যাংকের সৈনিকদের কঠোরভাবে প্রতিরোধ করল এবং ক্ষেপণাস্ত্রের পাথর নিক্ষেপের পরও প্রাচীরের কোনো ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হলো না।

এ কারণে মুসলিম বাহিনী শত্রুদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে অবরোধ ছাড়া কোনো বিকল্প খুঁজে পেল না।

***

কিন্তু দামেস্ক অবরোধ করেও মুসলিম বাহিনী সুবিধা করতে পারল না। অবরোধ প্রায় সাত মাসে গিয়ে ঠেকল।

এত দীর্ঘ অবরোধেও দামেস্ক শহরের ভেতরে থাকা অবরুদ্ধ বাসিন্দাদের কষ্ট খুব তীব্র বলে মনে হলো না। বরং উল্টো অবরোধকারীদের কষ্ট ধীরে ধীরে তীব্র হতে থাকল।

ধীরে ধীরে মুসলিম সৈনিকদের কণ্ঠে হতাশার সুর ফুটতে লাগল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল।

‘এই শহর কি আমরা কখনো জয় করতে পারব? আর কত সময় লাগবে?’

এই হতাশামিশ্রিত প্রশ্নের জবাব দেবেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং তার আস্থাশীল সৈনিক কা‘কা‘ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা।

***

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের গোয়েন্দা দলের মাধ্যমে নিয়মিত দামেস্কের ভেতরের খবরাখবর জানতে পারতেন এবং সেখানের ঘটনাবলি দেখতে পেতেন। একদিন তার গোয়েন্দাদল এসে জানাল,

‘মাননীয় সেনানায়ক, দামেস্ক নগরীর প্রধান প্রশাসকের একটি সন্তান হয়েছে। সন্তানের আশায় আশায় জীবন পার করে দেওয়া নিরাশ এই প্রশাসক বার্ধক্যের এই সন্তান পেয়ে খুশিতে প্রায় সবকিছু ভুলে গেছে।

এই তীব্র আনন্দে তিনি এক জমকালো ওলীমা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আগামী পরশু রাতের সেই আনন্দ অনুষ্ঠানে তিনি সকল সেনাসদস্যের পাশাপাশি নগররক্ষী সেনাদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেখানে সকলেই উন্নতমানের লোভনীয় খাবার খাবেন। মদের নেশা আর নৃত্যগীতে তারা সারা রাত মেতে থাকবেন। সুতরাং এই সুযোগকে হাতছাড়া করা যাবে না হে আমীর।’

ঐশী অনুপ্রেরণায় জাগ্রত এই সেনানায়ক দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। রশি দিয়ে কয়েকটি মই-সিঁড়ি বানালেন, এ ছাড়াও এই অভিযানের জন্য বেশ কিছু রশির মাথায় ফাঁস-গিরা তৈরি করলেন।

***

রাত যখন গভীর হলো এবং আঁধারের চাদর দিয়ে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে দিলো, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সৈনিকদের বললেন,

'আমরা নগর প্রাচীরের ওপর চড়ব, তোমরা আমাদের তাকবীর ধ্বনি শুনতে পেলে সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন আমাদের অনুসরণ করে প্রাচীরের ওপর চড়বে আর বাকি সদস্যরা দরজার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

করণীয় কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়ে তিনি নিজে এবং কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাসহ ছোট্ট এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য নিয়ে রওনা করলেন। তারা বিশাল ও গভীর খাল পাড়ি দিলেন চামড়ার মশক ফুলিয়ে তার ওপর ভেসে ভেসে সাঁতার কেটে কেটে। এবার নগর প্রাচীরের পাদদেশে পৌঁছার পর মাথায় ফাঁস-গিরাওয়ালা রশিগুলো প্রাচীরের ওপর দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে গম্বুজের মতো উঁচু উঁচু মাথায় আটকিয়ে দিয়ে, রশি বেয়ে বেয়ে কয়েকজন প্রাচীরের একেবারে মাথায় পৌঁছে গেলেন। এবার রশির তৈরি মইগুলো কিছু বাহিরে ঝুলিয়ে দিলেন যেন নিচের লোকেরা ওপরে চড়তে পারে আর কয়েকটি মই ঝুলিয়ে দিলেন ভেতরে যেন নিচে শহরের উদ্দেশ্যে নামা যায়। এবার খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলেন। সেনা অধিনায়কের সংকেত পেয়ে অপেক্ষমাণ সৈন্যরা খাল পার হলেন।

তিনি নিজে কা'কা' ইবনে আমরের সঙ্গে রশির মই বেয়ে প্রাচীরের প্রধান ফটকের সামনে নেমে পড়লেন। প্রথমে ফটকরক্ষী সেনাদের হত্যা করলেন তারপর ফটকের তালা খুলে দিলেন। আল্লাহর সেনাদল মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা ওপর দিয়ে নিচ দিয়ে দলে দলে স্রোতের মতো দামেস্ক শহরে ঢুকতে থাকল। তাকবীর (আল্লাহু আকবার) আর তাহলীল (লা..ইলা..হা ইল্লাল্লা..হ) ধ্বনিতে দামেস্ক প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

সুরক্ষিত শহরের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। শহরের রক্ষীবাহিনী ভয়ে অস্থির ও দিশাহারা হয়ে পড়ল। তারা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল,

'মুসলিম বাহিনী জোরপূর্বক শহরে প্রবেশ করলে যোদ্ধাদের হত্যা করবে, তাদের সন্তানাদিকে বন্দী করবে এবং সকল সম্পদকে গনিমত হিসাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে। এর চেয়ে উত্তম এটাই যে,

আমরা নিজ হাতে নগর প্রাচীরের অন্য ফটকগুলো খুলে দিই যেন তারা শান্তভাবে শহরে প্রবেশ করে।'

অবশেষে তারা সেটাই করল। অন্য চারটি ফটক নিজেরাই খুলে দিলো। অবশ্য তারা না খুললেও মুসলিম বাহিনী নিজেরাই খুলে ফেলত আল্লাহর সাহায্যে।

***

প্রিয় পাঠক, আবারও আমাদের দেখা হবে কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনের আরও এক কিস্তিতে—যিনি নিজেকে এবং নিজের অস্ত্রশস্ত্রকে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ঘোড়ার পিঠকেই যিনি বানিয়েছিলেন বিছানা।

কা‘কা‘ ইবনে আমর
(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

কাদেসিয়া রণাঙ্গনে

‘এক’

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক বিজয় শেষে কা‘কা‘ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাত্রই কিছুটা বিশ্রাম নিতে গিয়েছেন, কিন্তু ততক্ষণে আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সরকারি চিঠি এসে গেল আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে। তাতে রয়েছে খলীফার জরুরি বার্তা,

‘তোমার অমুক অমুক সৈনিককে এক্ষুনি কাদেসিয়া রণাঙ্গনে সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেবে। খবরদার! এক মুহূর্তও যেন বিলম্ব না হয়।’

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলীফার নির্দেশ বাস্তবায়নে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়লেন। সেনাদল সাজিয়ে হাশেম ইবনে উতবাকে আমীর বানিয়ে কা‘কা‘ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলাকে অগ্রবাহিনীতে যুক্ত করে তাদের দু’জনকে বললেন,

'খবরদার! সাবধান! কোনোক্রমেই বিলম্ব করা যাবে না। মুসলিম বাহিনী এই মুহূর্তে কাদেসিয়াতে পারস্য জাতির বৃহত্তম সেনাসমাবেশের সম্মুখীন। তোমাদের প্রত্যেকের সাহায্য এই মুহূর্তে তাদের খুবই প্রয়োজন। তারা চাতক পাখির ন্যায় তোমাদের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন।

***

অগ্রবাহিনীকে নিয়ে কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা রওনা করলেন। এই অগ্রবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার।

ক্ষুধা, তৃষ্ণাকে উপেক্ষা করে, আরাম ও বিশ্রামের তোয়াক্কা না করে রাতদিন অবিরাম চলতে থাকলেন তিনি নিজে এবং সঙ্গী সৈনিকেরা। এভাবেই তারা হাশেম ইবনে উতবার অনেক আগে চলে গেলেন। পরের দিন সুবহি সাদিকের সময় হতে না-হতেই তারা কাদেসিয়ার অদূরে উঁচু উঁচু টিলার কাছে পৌঁছে গেলেন।

***

কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বুঝতে পারলেন, কাদেসিয়া যুদ্ধের প্রথম দিনটি ছিল মুসলিম বাহিনীর জন্য ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।

শত্রুবাহিনীর বিশাল জনসংখ্যা, বিপুল পরিমাণে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ছাড়াও বিশাল হাতিবাহিনী মুসলিম বাহিনীর অশ্বদলকে সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত করে পেছনের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। ময়দানে মুসলিম বাহিনীর টিকে থাকাই কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল।

তারা মনে মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাহায্যের অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহায্য নিয়ে এসেছেন মাত্র এক হাজার সৈন্যের। এই এক হাজার সৈন্য পারস্যের বিশাল বাহিনীর সামনে কী কাজে লাগবে?

তবে ঐশী মদদ ও অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত সেনানায়ক মুসলিম বাহিনীর চোখে এবং শত্রু মুশরিক বাহিনীর চোখে এক হাজারকে বানিয়ে দিলেন কয়েক হাজার।

কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধাকে ভাগ করলেন দশ ভাগে। প্রত্যেক ভাগে থাকল একশো জন করে। প্রথম দলকে তিনি নির্দেশ দিলেন মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশে রওনা দিতে। তাদের বিশেষভাবে বলে দিলেন এমনভাবে ধুলা ওড়াতে, যেন দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত শুধু ধুলা ছাড়া আর কিছুই চোখে না পড়ে।

এরপর পরবর্তী নয় দলের সবগুলোকে একই নির্দেশনা দিয়ে বললেন, কোনো দল তাদের পূর্ববর্তী দল দৃষ্টিসীমার আড়াল না হওয়া পর্যন্ত রওনা করবে না।

***

এরপর তিনি নিজে প্রথম দলের অগ্রভাগে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে অগ্রসর হওয়া শুরু করলেন। যার উচ্চৈঃস্বর ও হুংকারের ব্যাপারে খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মূল্যায়ন ছিল, '...তার হুংকার এক হাজার যোদ্ধার চেয়েও ভয়ংকর।' প্রথম দল কাদেসিয়ার সেনাপতি সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে পৌঁছে তাকে খলীফার পাঠানো সাহায্য পৌঁছার সুসংবাদ দিলেন।

মুসলিম ও পারস্য উভয় সেনাদলই দেখতে পেল অশ্ববাহিনীর খুরের আঘাতে উত্থিত ধুলায় আচ্ছাদিত দিগন্ত...

শুনতে পেল তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত...

উভয় দলই দেখল মুসলিম বাহিনীর প্রতীক্ষিত সাহায্য একটির পিছে আরেকটি রেজিমেন্ট এসেই যাচ্ছে। এসব কিছু দেখে শুনে পারস্য

সৈনিকদের অন্তরে ভয় ও আতঙ্ক জেঁকে বসল আর মুসলিম সৈনিকদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হলো ইসলামী জোশ ও জযবা। জেগে উঠল দীনি আবেগ ও উদ্দীপনা। সেই আবেশেই তারা সমস্বরে এমনভাবে তাকবীর ও তাহলীলের স্লোগান দিতে থাকল, যা শত্রুদের অন্তরে কাঁপন ধরিয়ে দিলো।

সেদিন একেবারে প্রথম প্রভাতের শুভ্ররেখা দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বজ্রকণ্ঠে 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা..ইলা..হা ইল্লাল্লা..হ' স্লোগান দিতে দিতে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন...

নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দুই বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে ঔদ্ধত্যের সুরে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,

'আছে কোনো মায়ের দুলাল? বুকে সাহস থাকলে আমার সঙ্গে এসে লড়াই করো...'

কে সেখান থেকে কা'কা' ইবনে আমরের বিরুদ্ধে লড়তে বের হবে, দেখার জন্য সব সৈনিকের দৃষ্টি আটকে রইল পারস্য বাহিনীর ওপর।

***

কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বীরত্ব ও দুঃসাহসী চ্যালেঞ্জের অল্প কিছু সময় পর শত্রুবাহিনীর ভেতর থেকে অস্ত্রসজ্জিত এক লড়াকু যোদ্ধা বেরিয়ে এসে বলল,

'আমি, আমি তোমার সঙ্গে লড়ব... 'তুমি জানো কি আমি কে?...

আমি বাহমন, 'পোল-ব্রিজ'-এর যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর দুর্দান্ত সেনাপতি...

তোমাদের সেনাপতি আবু উবাইদা আস সাকাফী আর তার দলবলকে সেখানে কচুকাটা করেছিলাম আমিই।' (পোল যুদ্ধের কাহিনি জানতে আবূ উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী [রাযি.]-এর জীবনী দেখুন : পৃষ্ঠা নং ৩১২)

এ কথা শোনামাত্রই কা‘কা‘ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাজার যোদ্ধার আওয়াজে হুংকার দিয়ে বলতে থাকলেন,

"يَا لَثَارَاتِ يَوْمِ الْجِسْرِ"

‘বদলা বদলা বদলা চাই! পোল যুদ্ধের বদলা চাই।’

‘পোলের যুদ্ধ’ ছিল মুসলিম জাতির জন্য এক ভয়ংকর বিষাদ ও শোকের ঘটনা। যেখানের খলনায়ক ছিল মুখোশধারী এই ‘বাহমন’।

***

কা‘কা‘ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তরবারি বের করলের এবং ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাহমনের ওপর আহত সিংহের মতো। আঘাতের পর আঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। অবশেষে তার ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পাওয়ামাত্রই সর্বশেষ আঘাতে তাকে শেষ করে দিতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন যেন তার কষ্ট বেশি হয়। এরপর তাকে ছোট ছোট আঘাত করে কষ্ট দিতে থাকলেন। এই দৃশ্য দেখে পারস্য সৈনিকদের অন্তর সন্ত্রস্ত আর দৃষ্টিগুলো হয়ে পড়ল বিস্ফারিত। আর মুসলিম সৈনিকেরা আনন্দে স্লোগান দিতে থাকল ‘আল্লা..হু আকবার, আল্লা..হু আকবার’

‘মেরে ফেলো ওকে হে কা‘কা‘...

আবু উবাইদ আস সাকাফীর বদলা নাও...’

মুসলিম সৈনিকদের এই স্লোগান শোনার পর কা‘কা‘ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক আঘাতে তাকে মেরে ফেললেন। তার মৃতদেহ মাটির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। রক্তের মধ্যে বাহমনের মৃতদেহ ছটফট করতে থাকল।

মুসলিম সৈনিকদের মুখে মুখে গুঞ্জরিত হলো মহান আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার সুর ‘আলহামদুলিল্লাহ লা..ইলা..হা ইল্লাল্লা..হ ধ্বনির

মাধ্যমে। কাদেসিয়ার ময়দানে চতুর্দিক থেকে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল সেই আওয়াজ।

***

মহাবীর কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ময়দান ছাড়লেন না; বরং সেখানে দাঁড়িয়ে আবারও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,

'আছে কি কোনো যোদ্ধা? মেকাবেলা করার কেউ আছে?'

'বিখ্যাত বীর' এর ব্যাজ ধারণকারী দুই যোদ্ধা একসঙ্গে বের হয়ে এল এবার, তাদের মুখোমুখি হলেন তিনি নিজে এবং হারেস ইবনে যাবয়্যান... তাদেরও সেই একই পেয়ালার ঘোল খাওয়ালেন কিছুক্ষণ পূর্বে যে পেয়ালার ঘোল খাইয়েছিলেন মুখোশধারী বাহমনকে।

এবার কা'কা' রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উচ্চৈঃস্বরে মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন,

'হে নওজোয়ান মুসলিম সেনারা, শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণ শুরু করো, বর্শা নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। হাতের কাছে পেলে তরবারি দিয়ে কোপাও। প্রাণসংহার সুবিধাজনক হয় ধারালো তরবারি দিয়েই।'

এই নির্দেশ পাওয়ামাত্রই মুসলিম সেনারা বিদ্যুতগতিতে শত্রুদের ওপর সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঈগলের মতো ছোঁ মেরে শিকার ধরতে লাগল। আর তাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হলো—'পোল হত্যার বদলা চাই, বদলা বদলা বদলা চাই।'

***

সেদিন পারস্যবাহিনী ময়দানে তাদের হাতির দল নামালোই না।

এর কারণ বিগত দিনের অর্থাৎ সেই পোল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। মুসলিম বাহিনী সেই যুদ্ধে তাদের হাতিগুলোর রশি কেটে দিয়ে মাহুতকে বসার সিটসহ চিৎপটাং করে নিজেদের হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মরার ব্যবস্থা

করেছিল। পারস্যরা সেই দুঃসহ স্মৃতি ভুলতে পারেনি, দিনের বেলার সেই আঘাতের ক্ষতিপূরণ তারা রাতের বেলা করতে সক্ষম হয়নি।

এবার কা'কা ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চাচাতো ও ফুফাতো ভাইদের কয়েকটি দলকে বললেন, গোটা দশেক বিশালাকৃতির উট এনে মোটা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলতে। এরপর শুধু দুই চোখ খোলা রেখে নানা রঙের বোরখায় পুরো আবৃত করে সেগুলোর পিঠে চড়ে শত্রুদের অশ্ববাহিনীর ওপর আক্রমণ করতে।

শত্রুদের অশ্ববাহিনী যখন তাদের দিকে এগুতে দেখল বিশাল আকৃতির এইসব আজগুবি প্রাণীকে, ভয়ে সেগুলো লাফালাফি শুরু করে দিলো যেভাবে মুসলিম বাহিনীর ঘোড়ারা তাদের হাতি দেখে করেছিল।

এরপর ভয় পাওয়া ঘোড়াগুলো গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে গেল। এক পাও আগু-পিছু করল না।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেগুলো নড়াচড়া শুরু কলল, কিন্তু সামনের দিকে নয় উল্টোদিকে দৌড়ানো শুরু করল। ব্যস, মুসলিম বাহিনী এবার পলায়নপর সৈনিকদের পিছু ধাওয়া করে তরবারি আর বর্শা দিয়ে তাদের কচুকাটা করতে থাকল।

***

কাদেসিয়া যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনের গোধূলিলগ্ন। এই প্রায় দেড় দিনে কা'কা' রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শত্রুদের ওপর ত্রিশবার হামলা চালিয়েছেন এবং শুধু নিজ হাতেই তাদের ত্রিশজন দিকপাল (বড় বড় বিখ্যাত) সেনানায়ককে হত্যা করেছেন।

যুদ্ধ যখন থামল, মুসলিমরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির সঙ্গে বলতে লাগল,

'আগের বারের প্রতিশোধ আজ পূর্ণ হলো।'

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

'আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, শক্তিধর।' –সূরা আল-হজ : (২২) ৪০

***

এই ছিল কাদেসিয়া যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লড়াই।

তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে কী ছিল তার ভূমিকা? সেটা জানার জন্য চলুন দেখা যাক তার জীবনকাহিনির পরের কিস্তিতে।

কা‘কা‘ ইবনে আমর

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

কাদেসিয়া রণাঙ্গনে

‘দুই’

রাত হতে না-হতেই কাদেসিয়ার রণাঙ্গনে অন্ধকার ছেয়ে গেল, সৈনিকেরা অস্ত্র রেখে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলো...

কারণ, যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনটিও (আজকের দিন) ছিল আগের দিনের মতোই কঠিন ও কষ্টসাধ্য, কিন্তু কা‘কা‘ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দুই চোখে ঘুম নেই একটুও।

ঘুম আসবে কীভাবে?...

মুসলিম বাহিনী সেই কবে থেকেই শুনে আসছে হাশেম ইবনে উতবার নেতৃত্বে শাম থেকে তাদের সাহায্যে নতুন বাহিনী আসছে, সংবাদটি শোনার পর থেকেই তারা অপেক্ষায় পথ চেয়ে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তারা হতাশ হতে বসেছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে ইতিমধ্যে এক এক করে দু’টো দিনও পার হয়ে গেল। তারা দিশাহারা ও ব্যাকুল এই ভাবনায় যে, সাহায্য কি আদৌ আসবে? নাকি আসবে না? এলে কবে?

এই সকল বিষয় ভাবতে ভাবতে কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিদ্ধান্ত নিলেন যে, গতকাল যা করেছেন আজ আবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন।

***

সিদ্ধান্ত মোতাবেক কা'কা' রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের এক হাজার সৈনিককে গোপনে কাদেসিয়া থেকে একটু দূরে সেই স্থানে পাঠিয়ে দিলেন যেখানে এসে গতকাল তারা থেমেছিল।

তিনি সৈনিকদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, সুর্যোদয়ের পর একশো সৈনিকের একটি দল রণক্ষেত্রের উদ্দেশে রওনা করবে। প্রথম দল দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলে পরবর্তী একশো সৈনিকদল রওনা করবে।

আর প্রত্যেক দলই ধুলা উড়িয়ে এবং তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলবে। যেন মুসলিম বাহিনীর অন্তরে জেগে ওঠে আস্থা ও সংকল্প আর পারস্য বাহিনীর অন্তরে ছড়িয়ে পড়ে অস্থিরতা ও ভয়।

ভোরে সূর্যোদয় হতে না-হতেই মরুভূমির পেছন দিক দিয়ে রণাঙ্গনে তাকবীর ও তাহলীল ধ্বনি দিয়ে একের পর এক সেনা ব্যাটেলিয়ন প্রবেশ করতে শুরু করল।

কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটির পর একটি দলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কাতারের মধ্যে তাদের জায়গা নির্দেশ করে দিচ্ছিলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! সেনাদল আগমনের ধারা থামল না। দশ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও এসেই যাচ্ছে। তিনি বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে পারছেন না। অবশেষে গভীর পর্যবেক্ষণ করে হাশেম ইবনে উতবাকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, আজ সকালে তিনিও নিজ বাহিনী নিয়ে কাদেসিয়ায় পৌঁছেছেন।

হাশেম ইবনে উতবা এসেই কা'কা' রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেনাদল এবং তাদের কৌশলের কথা জেনেছেন। খুশি হয়ে তিনি তার

বাহিনীকেও একইভাবে একশো একশোতে ভাগ করে দিয়েছেন এবং ওই দলগুলোর মতো একইভাবে তাদের পিছে পিছে রণাঙ্গনে পৌঁছার নির্দেশ দিয়েছেন।

***

এই বিশাল সাহায্য দেখার পরও পারস্য বাহিনীকে খুব একটা দুর্বল করতে পারল না।

কারণ, তারা হাতিবাহিনীর পিঠের আসন ঠিক করে ফেলেছে। আসনগুলো বাঁধার জন্য নতুন রশির ব্যবস্থাও করে ফেলেছে আর নতুনভাবে সাজিয়ে হাতিবাহিনীকে সৈনিকদের একেবারে সামনের সারিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে একেবারে সিসাঢালা প্রাচীর।

পারস্য বাহিনীর মনে বেশ আস্থা ছিল যে হাতিগুলো আজ প্রথম দিনের চেয়ে বেশি শত্রুদের সর্বনাশ করবে।

এর কারণ আজ তারা এই বিশেষ বাহিনীর ব্যাপারে বেশ সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করেছে, যা আগে করা হয়নি।

বিশেষ অশ্বারোহী যোদ্ধাদল চারদিক থেকেই হাতিবাহিনীকে পাহারা দিচ্ছে, যেন প্রথম দিনের মতো মুসলিমরা এদের কাছে ভিড়তে না পারে। সেদিনের মতো তারা আজও যেন রশি কেটে হাতির পিঠে বাঁধা আসন এবং মাহুতকেও নিচে ফেলে দেওয়ার আয়োজন করতে না পারে। যার ফলে চালকবিহীন হাতি উল্টো দিকে ভাগতে শুরু করে দেয়।

***

যুদ্ধের চাকা ঘুরতে শুরু করলে মুসলিম বাহিনী প্রথম আঘাত করল হাতিরক্ষীদের ওপর। পারস্য বাহিনীও পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে প্রতিরোধ করতে থাকল মুসলিম বাহিনীর এই ঘাতক দলটিকে। যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করল এই হাতিবাহিনীকে কেন্দ্র করে। প্রচুর রক্তপাত হলো। আহত ও নিহত হলো বহু মানুষ।

মুসলিমরা সবকিছুর পরও ধৈর্য ধরে ময়দানে অটল রয়ে গেলেন। পরস্পরকে ধৈর্য ধরে অটল থাকার জন্য উৎসাহিত করলেন। শত্রুদলের প্রচণ্ড আক্রমণেও তারা অবিচল থাকলেন। ফলাফল এই হলো যে, তারা একে একে গোটা রক্ষীদল ধ্বংস করে দিলেন।

হাতির রক্ষাকারী দলকে ময়দানে খুঁজে পাওয়া গেল না। তারা হয় নিহত, আহত অথবা পলাতক।

***

কিন্তু দুর্বিনীত-বদমেজাজি এই প্রাণীগুলো যখনই বুঝতে পারল যে, তাদের রক্ষীদল তাদের ছেড়ে চলে গেছে অমনি তারা আতঙ্কিত ও উত্তেজিত হয়ে মুসলিম বাহিনীর কাতারে গিয়ে আক্রমণ করে বসল। এ যেন চলমান একদল দুর্গ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতিগুলো ডানে-বামে তাদের লম্বা লম্বা শুঁড় দিয়ে আঘাত করতে থাকল। সামনে যা পাচ্ছিল সব তছনছ করে দিচ্ছিল।

তরবারি কিংবা বর্শার কোনো আঘাতেই হাতির শুঁড়ে সুড়সুড়ি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হচ্ছিল না। দূর থেকে ধারালো তির ছুঁড়লেও অকারণ উত্তেজনা বাড়ানো ছাড়া হাতির আর কিছুই করতে পারছিল না।

***

প্রধান সেনাপতি সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাতিগুলোর কারণে মুসলিম বাহিনীর দিকে অগ্রসরমাণ দুর্যোগের বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আসন্ন দুর্বিপাকের যদি টুঁটি চেপে না ধরা যায়, তাহলে মুসলিম বাহিনীর ললাটে জুটবে এমন ভয়াবহ পরাজয় যার পরে আর উঠে দাঁড়ানোর কোনো শক্তিই থাকবে না।

হাতিগুলোর মধ্যে মুসলিম বাহিনীর জন্য সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক ছিল 'শ্বেতহস্তী'। আর সেটাই ছিল পারস্য সম্রাট 'ইয়াযদাজুর্দ' এর

রাজকীয় হাতি। দ্বিতীয় বিপজ্জনক হাতিটি চর্মরোগগ্রস্ত। অন্য হাতিগুলো ছিল ওই দু'টির অনুসারী। ওই দু'টোই যেন হাতিদের সেনাপতি।

***

সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণকারী একদল পারস্যবাসীর সঙ্গে হাতিগুলোর ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। তাদের কাছে হাতির হাত থেকে মুক্তির সহজ উপায় জানতে চাইলেন। তারা উপায় জানিয়ে বললেন,

'প্রধান হাতিদু'টির চোখ উপড়ে ফেলে শুঁড় কেটে দিলেই ওদের সকল কারিশমা শেষ হয়ে যাবে।'

পরামর্শমতো তিনি কা'কা' ইবনে আমর এবং তার ভাই আসেম ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে দায়িত্ব দিয়ে বললেন,

'সাদা হাতির চোখ উপড়ে, শুঁড় কেটে মুসলিম বাহিনীকে ওর অত্যাচার থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনাদের দু'জনের।'

একইভাবে তিনি আসাদ গোত্রের শক্তিমান দু'জন যোদ্ধাকে চর্মরোগগ্রস্ত হাতির দায়িত্ব দিলেন।

***

কা'কা' এবং তার ভাই আসেম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হাঁটা শুরু করলেন। সাদা হাতির উদ্দেশ্যে দুই ভাই কাতার ভেদ করে এগুতে থাকলেন। যখন তারা হাতিটির একেবারে কাছে পৌঁছে গেলেন, তখন কা'কা' হাতির ডান চোখের দিকে আর আসেম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বাম চোখের দিকে বর্শা তাক করে ধরলেন। একই সঙ্গে দুই ভাই দু'টি বর্শা সাদা হাতির চোখে ছুঁড়ে মারলেন। ব্যস, দু'টি ধারালো বর্শার ফলা দু'চোখের কোটরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বিশাল বপুর আতঙ্কিত হাতি তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এমনভাবে মাথা ঝাঁকাতে লাগল যে হাতির চালক ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল এবং তার পায়ে পিষ্ট হয়ে মরে গেল।

এবার চোখ হারানো হাতি মাটির ওপর লম্বা শুঁড় ঝুলিয়ে দিয়ে রাস্তা চেনার চেষ্টা করতে থাকল আর তখনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন কা'কা' রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তরবারির কোপে সেটা কেটে আলাদা করে ফেললেন।

অপরদিকে আসাদ গোত্রীয় মুসলিম দুই যোদ্ধা চর্মরোগের হাতিটির ওপর আক্রমণ করে এক চক্ষু গলিয়ে দিলেন এবং শুঁড়ে তীব্র জখম সৃষ্টি করলেন।

চরম আঘাতপ্রাপ্ত ও উত্তেজিত হাতি উল্টো পারস্য বাহিনীর কাতারে ঢুকে পড়ল এবং তাদের মাঝে ব্যাপকহারে ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকল। তারা তখন সজোরে তাকে খোঁচা মারল। খোঁচা খেয়ে সোজা সে মুসলিম বাহিনীর কাতারের দিকে ছুটে গেল।

এবার মুসলিমরাও তাকে মারল খোঁচা, ছুটে চলে গেল পারস্য সৈন্যদের দিকে।

এভাবেই একবার এদিক একবার ওদিক চলতে থাকল ছুটাছুটি।

এক সময় হাতিটি নদীর দিকে ছুটে গিয়ে পানির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্য হাতিগুলোও একে দেখে এর পিছে পিছে ছুটতে লাগল। মাহুতদের ডানে-বামে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সবগুলোই পানিতে ঝাঁপ দিলো।

***

'হাতিবাহিনী' ধ্বংসের একই সমান প্রভাব পড়ল মুসলিম বাহিনী এবং শত্রুবাহিনীর ওপর।

মুসলিম বাহিনীর ধৈর্য, পরস্পর ধৈর্যের অনুশীলন এবং আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার কারণে আল্লাহর সাহায্যের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা জন্ম নেয়।

আর পারস্য বাহিনী, তারা হাতিবাহিনীকে মনে করেছিল তাদের জন্য সম্রাট ইয়াযদাজুর্দের এক বিশাল সাহায্য ও আশীর্বাদ যা তাদের সংকল্প

ও সাহসকে সুদৃঢ় করেছিল। এখন সেই বাহিনী ধ্বংস হওয়ায় তাদের সাহস ও মনোবলে ধস নেমে এল।

***

উভয় দল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল তীব্র আগ্রহ নিয়ে, ঠাণ্ডা পানি পেলে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন করে। উভয় দলের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ ঘটল যাতে বহু যোদ্ধা ও যুদ্ধাস্ত্রের ক্ষয় হলো।

এভাবেই দিন ফুরিয়ে রাত ঘনিয়ে এল এবং এক নিকষ কালো অন্ধকার গোটা জগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, দুই দলের কেউই অস্ত্র ছেড়ে বিশ্রামে গেল না অন্য রাতের মতো। দিনের বেলার যুদ্ধকে তারা টেনে নিয়ে এল রাতের বেলাতেও। উভয় দল যেন সংকল্প করেছে, আজ তারা কিছুতেই অস্ত্র ত্যাগ করবে না প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন না করে।

পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এই দৃঢ়সংকল্প, জগৎজোড়া গভীর কালো অন্ধকার এবং রণাঙ্গনকে ঢেকে দেওয়া ধুলাবালির কারণে মুসলিম সেনাপতি সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাত থেকে মুসলিম সেনাদলের নিয়ন্ত্রণ আর পারস্য সেনাদলের ওপর থেকে সেনাপতি রুস্তমের নিয়ন্ত্রণ ছুটে গেল। উভয় সেনাপতি আপন আপন সেনাদলের ওপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন।

মুসলিম সেনাপতি সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বুঝে গেলেন যে, তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পারস্য বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তিনি খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন মুসলিম বাহিনীর ওপর অতর্কিতে পারস্যদের সম্মিলিত আক্রমণ এসে পড়ে কি না।

কিন্তু অবস্থা এমন যে, কা'কা' ইবনে আমরকে ফেরানোরও আর কোনো উপায় নেই। নিরুপায় হয়ে তিনি দুআ করলেন,

'ওগো দয়াময় আল্লাহ, কা'কা' ইবনে আমরকে মাফ করে দাও, তাকে সাহায্য করো শত্রুদের বিরুদ্ধে... ওগো রাহমানুর রাহীম, সে যদিও

আমার কাছে অনুমতি চেয়ে আক্রমণ করেনি, তবুও আমি তাকে অনুমতি দিয়ে দিলাম।'

তিনি আরও বেশি অস্থির হয়ে পড়লেন যখন দেখলেন যে, আরবের ছোট ছোট গোত্রের সৈনিকেরা একে একে সবাই কা'কা' এর পিছু নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

আসাদ গোত্রের সকল সৈনিকই গেছে। বাজীলা গোত্রের অশ্বারোহী, পদাতিক কেউই বাদ পড়েনি। কিন্দা গোত্রও গেছে, নাখা'ও গেছে...

অতএব উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সকল সৈনিককে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য 'সাধারণ নির্দেশ' ঘোষণা করা ছাড়া আর কোনো উপায় তার কাছে ছিল না। আর সে উদ্দেশ্যেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিলেন—'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।' এই সংকেত বুঝতে পেরে সর্বস্তরের সকল মুসলিম সৈনিক একযোগে শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

***

বিবদমান দুই সৈন্যদল গোটা রণাঙ্গনে বিস্তৃত যুদ্ধের লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে দিলো। জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো জ্বলজ্বল করা চোখগুলো ছাড়া সেই আঁধার রাতে আর কিছুই চোখে পড়ছিল না।

গোঁ গোঁ আর হুংকার ছাড়া সেখানে আর কোনো কথা ছিল না...

তরবারির ঝনঝনানি আর উত্থিত স্ফুলিঙ্গ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ ছিল না, ছিল না কোনো দৃশ্য।

***

সেই ভয়াবহ আঁধার ও আতঙ্কের কালো রাত পেরিয়ে যখন প্রভাতের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়ল, উভয় বাহিনীর ক্লান্তি তখন একেবারে প্রান্তসীমায় উপনীত...

সকল যোদ্ধার বাহু নিস্তেজ, সংকল্প ভঙ্গুর আর তরবারিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে...

সকলেরই তীব্র ইচ্ছা হচ্ছে, অস্ত্র ফেলে দিয়ে এখনই শুয়ে পড়ি, বিজয়ের ভাবনা পরে ভাবা যাবে।

***

এমন এক কঠিন মুহূর্তে কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম সৈনিকদের কাতারের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন,

'হে মুসলিম সেনাদল, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে সেই দলের পক্ষে, যারা হাল না ছেড়ে এই সংকটমুহূর্তে ময়দানে অবিচল থাকতে পারবে। সেই দল যারাই হোক।

তোমরা হও, বা হোক তোমাদের শত্রুরা...

আমি চাই একটুখানি ধৈর্য ধরে তোমরাই হও সেই অবিচল বাহিনী যাদের নামে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজয় লিখিত হবে।'

এরপর তিনি নিজের বিশেষ বাহিনীর কয়েকজন সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে পারস্য বাহিনীর সেনাছাউনিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তার দুঃসাহসী এই অমিত তেজ দেখে মুসলিম বাহিনীও আবার জ্বলে উঠে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন।

***

সেদিনের সূর্য বেশি উঁচুতে উঠতে পারল না, তার আগেই পারস্য সেনারা ঢুলতে ঢুলতে মুসলিম বাহিনীর তরবারির বলি হতে থাকল।

যুদ্ধের ময়দানে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হলো, যা রুস্তমের খাটের ওপর থেকে গম্বুজ ও ছাউনি উড়িয়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দিলো।

কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার সঙ্গীবাহিনী ছুটে গেল রুস্তমের সেই উন্মুক্ত খাটের দিকে তার জীবনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে। রুস্তম এই জানবাজ সৈনিকদের দেখে লাফিয়ে উঠলেন খাট থেকে। যখন দেখলেন যে, এই বাহিনী তাকে প্রায় অবরুদ্ধ

করে ফেলেছে, তখন তিনি নিজেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে কা'কা' রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এক বিশেষ সৈনিক তার ওপর লাফিয়ে পড়ে তরবারির এক কোপে তার কপাল দু'ভাগ করে ফেললেন।

এরপর তার খাটের ওপর চড়ে বসে চিৎকার করে বললেন,

'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রবের কসম, আমি রুস্তমকে খতম করেছি...

কাবার প্রভুর কসম, আমি বীর রুস্তমকে হত্যা করে তার খেল খতম করে দিয়েছি।

***

রুস্তমের জীবনাবসান ছিল ইতিহাসের মোড় ঘোরানো সর্ববৃহৎ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি। আর কা'কা' ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন সেই যুদ্ধের সর্বসম্মত সেনাপতি।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৭১২৭।
২. *আল-ইসতীআব*, ৩য় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা।
৪. *আত-তাবারী*, ৩য় খণ্ড, ২৬১, ৩৪৯, ৩৭৩, ৩৯৬, ৪৩৬, ৫৪২, ৫৫০ পৃষ্ঠা এবং ৪র্থ খণ্ড, ২৬, ৪৮৪ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৪৪, ৩৫১ পৃষ্ঠা।

আবূ উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী

(রাযিয়াল্লাহু আনহু)

পোল যুদ্ধের অধিনায়ক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বার্ধক্য ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় সময় গুনছেন।

মদীনার জনগণ তার সমবেদনায় কাতর হয়ে খোঁজ-খবর নিতে আসা-যাওয়া করছেন।

এই অবস্থার মধ্যেই সিদ্দীকে আকবার রাযিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী খলীফাকে ডেকে বললেন,

'উমর! আমার ধারণা আজকেই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। যদি তাই হয় তাহলে রাতের মধ্যে আমার দাফন শেষ করেই পারস্যসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করবে। যারা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুজাহিদ বাহিনীতে নাম লেখাবে তাদেরকে অবিলম্বে পারস্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুসলিম সেনাদলের সাহায্যে পাঠিয়ে দেবে।

সাবধান! এই অতি জরুরি দীনী কাজে যেন কোনো ভাবেই বিলম্ব না হয়। তোমার সামনে যত বড় বাধাই আসুক সর্বপ্রথম এই কাজটির সুরাহা করবে।'

সেই দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল।

***

প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তিম ইচ্ছা ও শেষ নির্দেশানুসারে দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু রাতের মধ্যেই তার দাফন কাজ সম্পন্ন করে ফেললেন। এরপর সূর্যোদয় হতে না হতেই তিনি সর্বপ্রথম মদীনার লোকজনকে সমবেত করে পারস্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। জিহাদের ফযীলত বর্ণনা করে তাদেরকে নাম লেখানোর জন্য প্রচুর উৎসাহ দিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! খলীফা হতবাক হয়ে দেখলেন, একজন মানুষও তার ডাকে সাড়া দিলো না। এর কারণ তাদের অন্তরে পারস্যযোদ্ধাদের সম্পর্কে শোনা নানারকম ভয়ঙ্কর তথ্য। তারা ভীষণ শক্তিশালী, তাদের অস্ত্র ও কৌশল খুবই মারাত্মক—এই জাতীয় নানা কথা শুনে শুনে তারা ভীত।

দ্বিতীয় দিন খলীফা আবারো মানুষকে একই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করলেন, আজও কেউই তার ডাকে সাড়া দিলো না।

তৃতীয় দিনেও তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং একজন মানুষেরও সাড়া পেলেন না।

চতুর্থ দিন তিনি আবারো খুব বিষণ্ন ও মনমরা হয়ে সমবেত জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাদেরকে পারস্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হতে উদ্বুদ্ধ করলেন, তার কথা শেষ হলে সামনে দাঁড়ালেন আবূ উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন,

‘হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার আহ্বান শুনে আপনার কথামতো সর্বপ্রথম আমার নাম লিখালাম। আমার সঙ্গে এই যুদ্ধে অংশ নেবে আমার তিন ছেলে, স্ত্রী ও আমার ভাই...’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা থেকে বিষণ্নতার কালো ছায়া কেটে গেল, খুশি ও আনন্দে ঝলমল করে উঠল। একই সঙ্গে উপস্থিত জনতার

মধ্যে ইসলামী আবেগ, জেহাদী জোশ ও জযবা টগবগিয়ে উঠল। দলে দলে তারা আসন্ন জিহাদি কাফেলায় নাম লেখাতে থাকল।

***

মুজাহিদ বাহিনীর নাম লিপিবদ্ধসহ অন্যান্য প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর খলীফার কাছে আবদার জানিয়ে একজন বললেন,

‘ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী কোনো মুহাজির অথবা আনসার সাহাবীকে এই সেনাদলের আমীর বানিয়ে দিন। কারণ, তারাই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার মানুষ।’

খলীফা জোরালো ভাষায় ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

‘না না, কিছুতেই না।

তাদের সম্মান ও মর্যাদার কারণ তো শুধু এটাই যে, ইসলাম কবূলের ক্ষেত্রে তারাই সকলের চেয়ে অগ্রগামী এবং আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে তারাই ছিলেন দ্রুতগামী...

আজ যখন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ক্ষেত্রে তারা হয়ে পড়েছেন ভারী ও ধীরগামী এবং অন্য কেউ হয়েছেন উদ্যমী ও অগ্রগামী, সুতরাং আজকের অগ্রগামীই হবেন নেতৃত্বের জন্য তাদের চেয়ে যোগ্য।

আল্লাহর কসম! যিনি জিহাদের আহ্বানে সর্বপ্রথম সাড়াদানকারী, এই বাহিনীর জন্য আমি তাকেই বানাব সেনাপতি।’

এবার তিনি আবূ উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফীকে ডেকে পারস্যবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রস্তুতকৃত মুসলিম সেনাদলের নেতৃত্বের পতাকা তুলে দিলেন তার হাতে।

***

আবূ উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পাঁচ হাজার সদস্যের সেনাদল নিয়ে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আপন ভাই, তিন ছেলে এবং স্ত্রী।

চলার পথে যত জনবসতি সামনে পড়েছে, তিনি সেখানের লোকদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এর ফলে তার পাঁচ হাজারের বাহিনী বাড়তে বাড়তে দশ হাজারে গিয়ে ঠেকেছে।

***

আবূ উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে অগ্রসরমান মুসলিম সেনাদলের সংবাদ পৌঁছে গেল পারস্যসেনাদলের কানে। এতে তারাও আরো বেশি সেনা সমাবেশ ঘটালো। সকল প্রকার সরঞ্জাম দিয়ে নিজেদেরকে সজ্জিত করে তুলল। আর দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করল, এবার মুসলিম বাহিনীকে তারা এমন মার দিবে, যেন ঘুরে দাঁড়ানোর আর কেউ না থাকে। এই বাহিনীর সেনাপতির পদে তারা নিয়োগ দিলো পারস্যসাম্রাজ্যের নামকরা একজন সেনাপতিকে, যার নাম 'জাবান' আর তার প্রধান সহযোগী ও ডান পার্শস্থ সেনারেজিমেন্টের প্রধান কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হলো বিখ্যাত পারস্য বীরযোদ্ধা 'মারদান'কে।

***

ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী নামারেক ময়দানে মুখোমুখি হলো পারস্যবাহিনী ও মুসলিম সেনাদল। উভয় দলের মাঝে সংঘটিত হলো এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। মুসলিম বাহিনী সেখানে সেনাপতি আবূ উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফীর নেতৃত্বে আত্মত্যাগ ও বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল, যা পারস্যসৈনিকদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরিয়ে দিলো এবং রীতিমতো তাদের অন্তরে কাঁপন ধরিয়ে দিলো। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এই গর্বিত সেনাবাহিনীকে তারা ন্যাক্কারজনকভাবে পরাজিত করে চরমভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিলো।

পারস্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি 'জাবান' বন্দী হলো মাতার ইবনে ফিযযা আত-তাইমী নামের একজন সাধারণ মুসলিম সৈনিকের হাতে। আর তার প্রধান সহযোগী, পারস্য বাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান কমান্ডার

'মারদান' ধরা খেলো মুসলিম সৈনিক আকতাল ইবনে শাম্মাখ আল-আকলী'র হাতে।

আকতাল তার বন্দীকে সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করে ফেললেন...

পক্ষান্তরে 'জাবান' বুঝে গেল, গ্রেফতারকারী মুসলিম সৈনিক মাতার ইবনে ফিযযা তাকে চিনতে পারেনি। অতএব সে অতি কাতর স্বরে মিনতি করে শারীরিক দুর্বলতা, অক্ষমতা ও বার্ধক্যের কথা বলে প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাতে থাকল...

মাতার ইবনে ফিযযার অন্তরে তার প্রতি করুণা জেগে উঠল এবং তাকে মুক্ত করে দিলেন।

বন্দী জাবান মুক্ত হয়ে বের হওয়ামাত্রই অন্য মুসলিম সৈনিকরা তাকে চিনে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ধরে নিয়ে সেনাপতি আবূ উবাইদ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললেন,

'এটা পারস্য সেনাপতি জাবান। তাকে না চিনেই আমাদের একজন সৈনিক বন্দী করার পর প্রাণভিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের মতে তাকে হত্যা করা উচিৎ। আপনি হুকুম করুন আমরা তাকে হত্যা করে ফেলি।'

মুসলিম সেনাপতি বললেন, 'আল্লাহর কসম! একজন মুসলিম সৈনিক তাকে নিরাপত্তা প্রদানের পর কিছুতেই আমি তাকে হত্যা করতে পারি না।

আমরা সকল মুসলিম এক দেহের মতো, একজন সদস্য যে নিরাপত্তা ঘোষণা করেছে, আমরা সকলেই তা রক্ষা করে চলতে বাধ্য।

তিনি মুক্ত করে দিলেন তাকে।

***

পরাজিত পারস্যসৈনিকেরা মুসলিম সেনাপতি আবূ উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং জিযিয়া বা কর দিয়ে

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হলো। পারস্যসৈনিকেরা তার জন্য নানা রকমের অকর্ষণীয় খাবার মিষ্টান্ন হাজির করল। সেগুলো যখন তার সম্মুখে রাখা হলো তিনি অনাগ্রহ প্রকাশ করে বললেন,

'আপনারা এইসব খাবার দিয়ে আমাকে যেভাবে সম্মান দেখাচ্ছেন, একইভাবে সকল সাধারণ মুসলিম সৈনিককেও কি এগুলো দিতে পারবেন?'

তারা জবাব দিলো,
'আজ আমরা সেটা পারব না কিন্তু পরবর্তীতে করব।'

তিনি বললেন,
'তাহলে এগুলো এখান থেকে সরিয়ে নিন, আমার দরকার নেই।'

এরপর অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে বললেন,
'স্বজন ও স্বদেশ থেকে এতদূর দেশে টেনে আনা সঙ্গীদেরকে বাদ দিয়ে আবূ উবাইদ যদি একা কোনো বিশেষ সুবিধা ভোগ করে, তাহলে তার চেয়ে নিকৃষ্ট স্বার্থপর মানুষ আর কে হবে?

আল্লাহর কসম! তোমরা যা কিছু এনেছ এবং যা কিছু আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন (গণীমত), তার একটি সামান্য দানাও আমি সেনাপতি হিসাবে বিশেষ সুবিধায় ভোগ করব না। একজন সাধারণ মুসলিম সৈনিক যা খাবে আমিও তাই খাব।'

পারস্যসৈনিকেরা একথা শোনার পর সবকিছু তুলে নিয়ে চলে গেল।

***

সেনাপতি আবূ উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু গণীমতের সকল মাল একত্র করার নির্দেশ দিলেন। সব মাল একত্র করার পর সেখানে পাওয়া গেল এক প্রকারের বিশেষ রাজকীয় খেজুর। পারস্যসম্রাটের খালাতো ভাই 'নারসী'-এর নাম অনুসারে এই খেজুরের নাম রাখা হয়

'নারসিয়ান'। এই খেজুর একমাত্র তিনিই উৎপাদন করতেন। অন্য সকল প্রজার জন্য এই বিশেষ খেজুরের উৎপাদন, ভক্ষণ সবই ছিল নিষিদ্ধ। এই খেজুর খেতেন শুধুমাত্র সম্রাট, তার পরিবারের লোকজন এবং যাদেরকে তারা উপহার হিসাবে দিতেন।

মুসলিম সেনাপতি এসব কথা শোনার পর সেই খেজুরের এক অংশ পারস্যের চাষীদের মাঝে ভাগ করে দিলেন—যারা কষ্ট করে চাষ করত, পেকে গেলে কাটত অথচ কোনোদিন এর স্বাদ নিতে পারত না।

তিনি গনিমতের এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালের জন্য মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন।

খলীফা উমরের উদ্দেশ্যে পত্র লিখে জানালেন,

'মহামান্য খলীফা!

আল্লাহ আমাদেরকে এমন এমন খাবারের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন যেগুলোকে পারস্যসম্রাটেরা নিজেদের জন্য সংরক্ষিত করে অন্য সকলের জন্য হারাম করে রেখেছিলেন।

শুধু পারস্যসম্রাটদের জন্যই সংরক্ষিত সেই খেজুর আমরা আমীরুল মুমিনীনের কাছে পাঠাচ্ছি, যেন আল্লাহ তাআলার এই বিশাল দান ও নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারেন।'

***

পারস্যসৈনিকদের এই চরম অপমানজনক পরাজয়ের সংবাদ সেনাপ্রধান রুস্তমের কানে পৌঁছে গেল। প্রধান সেনানায়ক জাবান এবং প্রধান সহযোগী মারদানের করুণ পরিণতির কথা জেনে তিনি রাগে ফেটে পড়লেন।

সামান্য কয়েকজন মূর্খ আরবের হাতে জগৎশ্রেষ্ঠ পারস্যসেনাবাহিনীর এই রকম নাকানি-চুবানি খাওয়ার অপমান তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারলেন না।

তিনি বড় বড় সেনাঅফিসারদের জরুরি তলব করে জানতে চাইলেন,

'আপনাদের জানামতে আরবদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন সেনাঅফিসার সবচেয়ে বেশি ক্ষ্যাপা?'

সকলেই একসুরে বললেন,
'মুখোশধারী বাহমান'।

রুস্তম খুশি হয়ে বললেন,
'একদম ঠিক'।

তিনি বাহমানকে ডেকে আশি হাজার ভয়াবহ যোদ্ধা সৈনিকের সেনাপতি বানিয়ে তার হাতে পতাকা তুলে দিলেন। উপরন্তু বিশটি বিশাল ও ভয়ঙ্কর প্রশিক্ষিত যোদ্ধা হাতি তার সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।

সেনাপতি বাহমান এই বিশাল সেনাদল নিয়ে রওনা করলেন এবং ফুরাত নদীর পূর্ব তীরবর্তী কূফানগরীর কাছাকাছি গিয়ে থামলেন।

অপরদিকে মুসলিম সেনাপতি আবূ উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী রাযিয়াল্লাহু আনহু একই নদীর তীরে পারস্যবাহিনীর সেনা ছাউনির উল্টো দিকে শিবির স্থাপন করলেন। বাহমান চিঠি লিখে মুসলিম সেনাপতিকে প্রস্তাব দিলেন,

'হয়তো আপনারা নদী পার হয়ে আসুন নয়তো আমরাই পার হয়ে যাব। তবে শর্ত এই যে পারাপারের সময় আমরা কেউই অন্যের ওপর আক্রমণ করব না।'

আবূ উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের সেনাঅফিসারদের কাছে নিজের মনোভাব জানিয়ে বললেন,

'পারস্যবাহিনী আমাদের চেয়ে বেশি দুঃসাহসী, বেশি মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে পারে, এমনটি হতে দেওয়া যাবে না।'

সেনাঅফিসারদের ব্যাপক আপত্তি সত্ত্বেও তিনিই নিজ বাহিনী নিয়ে নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পারস্যবাহিনীকে জানিয়ে দিলেন,

'আমরাই নদী পার হয়ে আসছি।'

***

নদী পারি দেওয়ার আগের রাতে আবূ উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী স্বপ্নে দেখলেন, আসমান থেকে একটি লোক নেমে এলেন নিচে। তার হাতে শরবত ভর্তি একটি জগ ছিল। তিনি সেই শরবত ঢেলে ঢেলে খাওয়ালেন তার স্বামী, স্বামীর ভাই এবং তিন ছেলেকে।

স্বামীর কাছে এই স্বপ্নের কথা জানালেন। স্বপ্নের কথা শুনে আনন্দে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন,

'দারুন স্বপ্ন! দারুন খুশির সংবাদ!

আমি, আমার ভাই ও তিন ছেলের জন্য শহীদী মৃত্যু নির্ধারণ হয়ে গেছে।'

এরপর তিনি সৈনিকদের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন,

'আমার প্রিয় সৈনিক ভাইয়েরা!

আজকের জিহাদে যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আপনারা আমার ভাই হাকামের নেতৃত্বে জিহাদ চালিয়ে নেবেন।

তিনি শহীদ হয়ে গেলে, আমার ছেলে ওহাবের নেতৃত্বে যুদ্ধ চলতে থাকবে।

'ওহাব' শহীদ হলে তার ভাই মালিক সেনাপতি হবেন।

তিনি শহীদ হলে সেনাপতি হবেন তার ভাই জাবর।

তিনি শহীদ হলে আপনারা যুদ্ধ চালাবেন 'মুসান্না ইবনে হারিসা আশ-শাইবানী'র নেতৃত্বে।'

এরপর তিনি মুসলিম সৈনিকদেরকে নদী পার হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেনাপতির নির্দেশ পেয়ে তারা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং প্রবল গতিতে নদীর স্রোতের মধ্য দিয়ে পূর্বতীরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

অবশেষে নদীর ওপর গড়ে তোলা পোল-সাঁকো পার হয়ে পূর্বতীরে পৌঁছে গেলেন।

***

উভয় বাহিনী যখন রণাঙ্গনে মুখোমুখি হলো, পারস্যসৈনিকদের অগ্রভাগে বিশাল বিশাল প্রশিক্ষিত হাতিবাহিনী দেখে মুসলিম বাহিনী চমকে উঠল। খেজুর ও অন্যান্য গাছের ঘন ডানপালা হাতিগুলোর পিঠ ও ঘাড়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক হাতির গায়ে ঝোলানো হয়েছে বড় বড় ঘণ্টাধ্বনি।

এতো বিশাল আকারের একেকটা হাতিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন গাছপালা গজানো একেকটা চলমান পাহাড়...

ইতিপূর্বে মুসলিম বাহিনী এমন দৃশ্য আর দেখেনি, ফলে তারা এসব দেখে ভড়কে গেল আর তাদের অশ্ববাহিনী তো ভয়ে লাফালাফি শুরু করে দিলো।

এ অবস্থা দেখে আবূ উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু চিন্তিত হয়ে গেলেন, তার বাহিনীকে বিজয় পেতে হলে সর্বপ্রথম এই হাতি ও চালকদের থেকে নিস্কৃতি পেতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। যেকোনো উপায়ে এদেরকে কুপোকাত করতেই হবে।

তিনি মুসলিম সৈনিকদের মাঝে ঘোষণা করে দিলেন, সর্বপ্রথম হাতি বাহিনীকে নিপাত করতে হবে। তোমরা হাতি বাহিনীর দিকে এগিয়ে যাও। হাতির লাগামসহ সকল রশি কেটে দিয়ে চালক ও আরোহীদের চিৎপটাং করে দাও। মাটিতে ধপাস করে পরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্শার আঘাতে সবগুলোকে বধ করবে।

আমি এই চললাম আগে আগে, তোমরাও এসে পড়ো...

কথা বলা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝাপিয়ে পড়ে বড় হাতিটির কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তার লাগাম এবং পিঠে বাঁধা আসনের রশি

কেটে দিলেন। হাতির চালক পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করে ফেললেন।

কিন্তু কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই হাতিটি বিশাল শুঁড় দিয়ে তাকে এমন আঘাত করল, তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন আর হাতিটি তাকে পায়ের নিচে পিঁষে মেরে ফেলল।

***

আবূ উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে এলেন তার ভাই হাকাম। তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন।

এরপর এলেন তার বড় ছেলে। পিতা ও চাচার মতো তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন।

এলেন দ্বিতীয় ছেলে। তিনিও পূর্ববর্তী পিতা, চাচা ও বড় ভাইদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

তৃতীয় ছেলে নেতৃত্বে এসে তিনিও অন্য সকলের মতোই পরিণতি বরণ করলেন।

এভাবেই আবূ উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রীর স্বপ্ন এবং তার দেওয়া ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা বাস্তবায়িত এবং প্রমাণিত হলো।

তাদের প্রত্যেকের জন্যই শাহাদাতের অমূল্য মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

***

মুসলিম বাহিনী ঐতিহাসিক এই 'পোল যুদ্ধে' তাদের প্রত্যাশিত বিজয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারলেন না...

তবে শত্রুদের অন্তরে তারা অবশ্যই ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ভীতি-আতঙ্কের কাঁপুনি...

এঁকে দিয়েছিলেন তাঁদের হৃদয়ে ভয়-আশঙ্কা ও ত্রাসের ছাপ...

পোল যুদ্ধের ঘটনা ছিল পরবর্তীর জন্য এক বিশাল, ভয়াবহ ও বিপদজনক সতর্কবার্তা...

কারণ, এরপরের ঘটনা মুসলিম ও পারস্যবাহিনীর মাঝে সংঘটিত উজ্জ্বল, আলোকদীপ্ত কাদেসিয়ার যুদ্ধ খুব বেশি দূরে ছিল না এই পোল যুদ্ধ থেকে।

তথ্যসূত্র :

১২. *তারীখে তাবারী* : ২য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা।
১৩. *তারীখে খলীফা ইবনে খাইয়্যাত* : ১ম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা।
১৪. *আস-সীরাতুল লিবনি হাইয়্যান* : ১ম খণ্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা।
১৫. *তারীখুল ইসলাম* : ১ম খণ্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা।
১৬. *মুজামুল বুলদান* : ২য় খণ্ড, ১৪০ এবং ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা।
১৭. *আল-ইসাবা* : ৪র্থ খণ্ড, ১৩০ অথবা আত্তারজামা ৭৩৮।
১৮. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা* : ৪র্থ খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা
১৯. *উসদুল গাবাহ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬০৫ পৃষ্ঠা।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

নিশ্চয় ফেরেশতা নাজিল হয়েছিল যুবাইরের ভাবভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

—বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন্তব্য

কে এই মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রবল প্রেম ও ভালোবাসার কারণে মক্কাতে তাঁর কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে তরবারি উঁচিয়ে মানুষের ভিড় সরিয়েছিলেন ....

আর এ কারণেই তিনি হয়েছিলেন ইসলামের সর্বপ্রথম তরবারি উত্তোলনকারী?

কে এই মহান দুঃসাহসী বীর, যাকে মিসরে মুসলিম বাহিনীর সাহায্যে পাঠিয়েছিলেন মহান খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তাকে গণনা করেছিলেন এক হাজার সৈনিকের সমতুল্য।

মিসরের সেই মুসলিম সেনাদলের কাছে প্রকৃতই তিনি প্রমাণিত হয়েছিলেন এক হাজার সৈনিকের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

কে এই মহান আত্মত্যাগী, যিনি ছিলেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী যুবক, সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগী...

সর্বশ্রেষ্ঠ ভদ্র...

এবং ইসলামের সর্বাধিক বরকতময় যুবক?

তিনিই হচ্ছেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ সহচর এবং বিশেষ দেহরক্ষী।

***

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন কুরাইশ বংশের উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন শাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশতালিকার পঞ্চম পিতা কুসাই ইবনে কিলাবের সঙ্গে মিলিত হয় তার বংশতালিকা।

তার মা আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সফিয়্যা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু।

তার ফুফু খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় স্ত্রী।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবুওয়াতের প্রায় পনেরো বছর পূর্বে, তবে এ পৃথিবী ছিল তার কাছে প্রায় আলোহীন আঁধার। কেননা, তিনি ছিলেন পিতৃহীন এতিম। কারণ, তার পিতা যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছিলেন। একইভাবে আরও পূর্বে নিহত হয়েছিলেন তার দাদাও।

***

এতিম শিশুপুত্রের লালন-পালনের দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেছিলেন তার মা সফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব।

তিনি তাকে লালন-পালন করলেন কঠোরতা, কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে রেখে।

তার মা নিজেই ছিলেন একজন দৃঢ়সংকল্পময়ী ও কঠোর ব্যক্তিত্বধারিণী।

তিনি তাকে ভীতি আর ঝুঁকির দিকে ঠেলতে থাকতেন।

যখনই দেখতেন ভয়ে বা দ্বিধায় পিছু হটছে অথবা ত্রুটি করছে অমনি তাকে ভীষণ প্রহার করা শুরু করতেন।

এমনকি ছেলের প্রতি তার কঠোরতা দেখে চাচা নওফাল ইবনে খুওয়াইলিদ তিরস্কার করে বলতেন, মমতাময়ী মা কখনো এভাবে শাসন করে না, এত নির্দয়ভাবে কেন প্রহার করো?

এর জবাবে হুংকার ছেড়ে তিনি বলতেন,

مَنْ قَالَ قَدْ اَغْضَبْتُهُ فَقَدْ كَذَبَ - وَاِنَّمَا اَضْرِبُه لِكَيْ يَلِبْ
وَيَهْزِمُ الْجَيْشَ وَيَأْتِيْ بِالسَّلَبْ -

'কে বলে এমন মিথ্যা যে, আমি তাকে গরুর মতো নির্দয় প্রহার করেছি, মায়ের মতো মমতামাখা শাসন করিনি?

মমতার কারণেই তো আমি তার ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছি।
চেয়েছি যেন অলস না হয়ে কর্মঠ হয়, বোকা নয় বিচক্ষণ হয়।

লুণ্ঠিত মাল সে ফিরিয়ে আনবে, শত্রুকে পরাজিত করবে—এমন শক্ত আর সাহসী বীরপুরুষ করেই আমি তাকে গড়ে তুলেছি।'

***

ইসলামের আলো যখন আরব উপদ্বীপকে আলোকিত করে তুলল, তাকে বুকে জড়িয়ে নেওয়ার জন্য যুবাইর ইবনুল আওয়াম প্রথম অগ্রণীদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন।

তিনি আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণের পরদিন পনেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

***

ইসলাম গ্রহণের অপরাধে এই তরুণকে কুরাইশের এমন এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল যা ছিল বড় বড় শক্ত পুরুষদের সংকল্প

টলিয়ে দেওয়ার মতো, অথচ তিনি সেসব নির্যাতন ভোগ করেও থেকেছেন অটল অবিচল।

তার চাচা নওফাল ইবনে খুওয়াইলিদ তার ওপর চালাতেন নানা রকম নির্যাতন, এমনকি নিজের এই ভাতিজাকে তিনি চাটাই ও মাদুরের মধ্যে প্যাঁচিয়ে তার একপাশে আগুন ধরিয়ে দিতেন। ধীরে ধীরে আগুন জ্বলে তার শরীর ঝলসে দিত এবং চোখে ও কানে ধোঁয়া ঢুকত। বিশেষত নাক দিয়ে ঢুকে ফুসফুসকে চরমভাবে আক্রান্ত করত। এমন অবস্থা হতো যে, দম বন্ধ হয়ে তিনি মরে যাবেন।

চাচা এভাবে ধীরগতিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করতেন, তীব্র ধোঁয়ায় কাশতে কাশতে যখন তার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠত, তখন তিনি বলতেন,

'আপন ধর্মে ফিরে এসো...'

তিনি জবাবে বলতেন,
'কস্মিনকালেও আমি ইসলাম ছাড়ব না।'

***

একেবারে শুরুতে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিমগণ যখন অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে হাবাশায় হিজরত করেন, তখন যুবাইর ইবনুল আওয়াম হিজরতকারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন।

সেখানে যাওয়ার পর তিনি এবং তার সঙ্গী হিজরতকারীগণ ন্যায়পরায়ণ, সৎ বাদশাহর আশ্রয়ে লাভ করেন আকীদা-বিশ্বাসের নিরাপত্তা এবং ধর্মপালনের স্বাধীনতা।

সেখানে তারা নির্ভয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতে থাকলেন।

এই শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে দিন কেটে যাচ্ছিল হিজরত করে আসা মুসলিমদের। এমন পরিস্থিতিতে নাজাশীকে সরিয়ে দিয়ে তার বংশের জনৈক ব্যক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার দাবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। সেই লোক ও তার দলবলের মুখোমুখি হওয়ার উদ্দেশ্যে নাজাশী বাদশাহ বেরিয়ে পড়লেন এবং নীল দরিয়া পার হয়ে গেলেন।

এতে তার রাজত্বে আশ্রয় নেওয়া মুসলিমরা চিন্তায় ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলেন।

হিজরতকারিণী উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন,

'আল্লাহর কসম! আমার মনে পড়ে না যে, ওই দিনের চেয়েও বেশি দুশ্চিন্তা আমাদের আর কখনো হয়েছে কি না। আমরা ভীষণ ভয় ও দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম এটা ভেবে যে, নাজাশী বাদশাহর ওপর যদি ওই লোকটি বিজয়ী হয়ে যায় এবং আমাদের সে মক্কায় কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেয়, আমাদের পরিণতি তখন কী হবে?'

রাসূলের সাহাবীগণ বলতে শুরু করলেন,

'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নীলনদ পাড়ি দিয়ে প্রকৃত খবর নিয়ে আসবে?'

যুবাইর ইবনুল আওয়াম—যিনি ছিলেন সবচেয়ে অল্পবয়সী—বললেন, 'আমি তৈরি।'

***

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন,

'সকলে মিলে যুবাইরের জন্য একটি মশক ফুলিয়ে তৈরি করলেন। যা নিয়ে তিনি ভীষণ স্রোত ও উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পেটের নিচে ফোলানো মশক নিয়ে সাঁতার কেটে কেটে নদীর অন্য তীরে পৌঁছে গেলেন। সেখান থেকে গেলেন রণাঙ্গনে।

অপরদিকে আমরা সকলে মিলে একত্র হয়ে আল্লাহর কাছে নাজাশীর বিজয় এবং তার শত্রুদের পরাজয় প্রার্থনা করছিলাম আর প্রকৃত খবর জানার জন্য অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম। তিনি বহুদূর থেকে কাপড় দিয়ে ইশারায় আমাদের ডেকে ডেকে বললেন,

'নাজাশী বিজয়ী হয়েছেন, শত্রুকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন।'

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন,

'আল্লাহর কসম! জীবনে আর কখনো আমরা এত খুশি এত আনন্দ পেয়েছে কি না জানি না।'

***

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে এলেন তখন তিনি নিজের তারুণ্যের অমিত শক্তি ও সাহস সম্পূর্ণ ব্যয় করলেন আল্লাহ ও রাসূলের জন্য।

মুশরিকরা একবার মক্কাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রচার করল,

'তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

এই কথা শোনামাত্রই সাহসী তরুণ খাপ থেকে একটানে তরবারি বের করে উঁচু করে ধরে মানুষের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে থাকলেন। যেতে যেতে মক্কার উঁচু অঞ্চলে পৌঁছে গেলেন। তাকে এভাবে খাপমুক্ত তলোয়ার উঁচিয়ে অস্থির ভঙ্গিতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,

'তোমার কী হলো যুবাইর? এত পেরেশান কেন?'

তিনি জবাব দিলেন,
'শুনলাম মুশরিকরা নাকি আপনাকে ধরে এনেছে?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি প্রীত হয়ে তার ও তার তলোয়ারের কল্যাণ কামনা করলেন। এর মধ্য দিয়ে তার তরবারি আখ্যা পেল ইসলামে উত্তোলিত সর্বপ্রথম তরবারির গৌরব।

***

আল্লাহ তাআলা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন তখন মুসলিমগণ মদীনায়

হিজরতের উদ্দেশ্যে দলে দলে বের হতে লাগলেন। একে অন্যকে সাহায্যের জন্য তাদের এভাবে 'দলে দলে বের হওয়া'।

সকলেরই আগ্রহ ছিল গোপনে গোপনে মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার, যেন কুরাইশের লোকজন কোনো বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণকারী তিনজন বিখ্যাত দিকপালের হিজরত ছিল ভিন্ন ধরনের। তারা মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন একদম একা একা এবং কুরাইশের একেবারে নাকের ডগার সামনে দিয়ে।

সেই তিনজনের একজন কাবার তাওয়াফ করতে করতে কুরাইশের লোকজনকে মক্কা ছাড়ার ঘোষণা শুনিয়ে দেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, বাপের ব্যাটা হলে আমাকে ঠেকাও।

সেই তিন বিখ্যাত দিকপাল হলেন,

এক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

দুই. রাসূলের চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

তিন. যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

***

বদর যুদ্ধের দিন মুসলিম সৈনিকদের কাছে ছিল শুধু দুইটি ঘোড়া, যার একটি ছিল যুবাইর ইবনুল আওয়ামের কাছে। সেদিন তিনি নিজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে মাথায় হলুদ পাগড়ি বেঁধে যুদ্ধ করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে যে ফেরেশতাদের দ্বারা এই যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন তাদের মাথাতেও হলুদ পাগড়ি বাঁধা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ نَزَلَتْ عَلَى سِيْمَا الزُّبَيْرِ

‘ফেরেশতাগণ নাজিল হয়েছিলেন যুবাইরের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।’

***

বদর যুদ্ধে যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমন রণকৌশল দেখিয়েছিলেন যা ছিল তার মতো দুর্দান্ত দুঃসাহসী যোদ্ধার জন্যই মানানসই। মুশরিক বাহিনীর বড় বড় কয়েকজন সরদারের মৃত্যু ঘটেছিল তারই হাতে।

পাঠক হতবাক হবেন যখন জানবেন, তার হাতে নিহতদের একজন ছিলেন তারই সেই চাচা নওফাল ইবনে খুওয়াইলিদ, যিনি মাদুরে প্যাঁচ দিয়ে তাকে নির্যাতন করতেন।

***

ওহুদ যুদ্ধের দিন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত করেছিলেন, এই যুদ্ধে জীবন উৎসর্গের শপথ করে সেই বাইআতের ভিত্তিতে মরণপণ করে লড়াই করেছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর অবস্থা যখন খুবই শোচনীয় হয়ে উঠল এবং চতুর্দিক থেকে তারা পরাজিত হতে থাকল, সেই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, জনৈক মুশরিক অশ্বারোহী এলোমেলো মুসলিম সৈনিকদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, নিষ্ঠুরতম উপায়ে তাদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে সকলকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তখন যুবাইর ইবনুল আওয়ামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন,

‘যুবাইর, ওই ব্যাটাকে ধরো...’

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটি কানে পড়ামাত্রই তিনি আহত সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মানুষের মাথার চেয়ে উঁচু একটি স্থানে চড়ে বসলেন এরপর সেই আক্রমণকারী অশ্বারোহীর ওপর লাফিয়ে পড়লেন। দুই হাতে লোকটির গলা জড়িয়ে ধরে টেনে তাকে

মাটিতে নামিয়ে ফেললেন, ওইভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেই পল্টি খেতে থাকলেন। এক সময় তাকে নিচে ফেলে তিনি ওর বুকের ওপর চড়ে বসলেন এবং তাকে হত্যা করে ফেললেন। এই দৃশ্য দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন, 'আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত।'

***

হুনাইনের যুদ্ধের দিন মুশরিক বাহিনীর সৈনিকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করে এগিয়ে যাচ্ছিল। যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একাই তরবারি আর বল্লম চালিয়ে তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।

কীভাবে ঘটেছিল তার বিবরণ হলো :

ঘেরাওকারী মুশরিক সৈনিকেরা এক সেনা অফিসারকে জানাল, আমরা যেভাবে প্রায় ঘেরাও করে ফেলেছি, তাতে বলা যায় আমরা সফল হবই। তবে আশঙ্কা হচ্ছে শুধু একজন মুসলিম সৈনিককে। যার কাঁধের ওপর থাকে বল্লম আর মাথায় থাকে হলুদ পাগড়ি বাঁধা। জানি না কে সেই সৈনিক। মাননীয় সেনা অফিসার, আমরা মুহাম্মাদকে ঘেরাও করে খতম করে ফেলব। আপনি শুধু পাগড়িওয়ালা ওই সৈনিকের হাত থেকে আমাদের বাঁচান।

সেনা অফিসারটি তাদের বিবরণ শুনে বললেন,

'আরে ওই হলুদ পাগড়িওয়ালা তো আর কেউ নয়, এটাই তো দুর্দান্ত সাহসী যুবাইর ইবনুল আওয়াম। লাত, উয্যার কসম! সে একাই তোমাদের পুরো দলের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একাই তোমাদের এই কাতার ছত্রভঙ্গ করে দেবে। অতএব সাবধান, তার সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।'

যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেনা অফিসারটির কথা মিথ্যা হতে দিলেন না...

মুহূর্তের মধ্যেই তিনি মুশরিক সৈনিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তলোয়ার আর বর্শার আঘাতে তাদের কাতার ভেঙে ফেললেন। অবস্থা বেগতিক দেখে সবাই জান নিয়ে পালিয়ে গেল।

***

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খোলা তরবারি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশার সম্পূর্ণ সময় ধরেই ছিল পূর্ণ প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত যুদ্ধ করেছেন, সেগুলোর কোনোটি থেকেই তিনি কখনোই পিছু হটেননি। আর সে কারণে তাকে সইতে হয়েছে কত-না আঘাত!

তার দেহের খোলা ও আবৃত প্রতিটা অঙ্গই ছিল রাসূলের সঙ্গে জিহাদের ময়দানে আঘাতপ্রাপ্ত।

***

আমরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরের যুগে যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাহস ও বীরত্বের কাহিনিগুলো খুঁজে দেখি, তাহলে দেখা যাবে যে, তার এই কাহিনিগুলোও পূর্বের চেয়ে কম আশ্চর্যের নয়।

এখানে পরবর্তী জীবনের শুধু একটি কাহিনি বলছি। মিসর বিজয়ের দিনে তার বিস্ময়কর সাহসের গল্প।

***

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাড়ে তিন হাজার মুসলিম সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে মিসর অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হলেন। মিসরের সীমানায় প্রবেশ করামাত্রই তিনি বুঝলেন তার সেনা সাহায্য জরুরি। সুতরাং তিনি খলীফা উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে সেনা সাহায্য পাঠানোর আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন।

খলীফা উমর নিজের আশপাশে খোঁজখবর করে মিসরের মুসলিম সৈনিকদের কাছে সাহায্য পাঠানোর জন্য যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেয়ে ভালো আর কাউকে পেলেন না। সে সময় যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এন্টার্কটিকা অভিযানে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে আব্দুল্লাহর বাবা, আপনি কি মিসরের গভর্নর হতে সম্মত?'

তিনি জবাব দিলেন,

'দায়িত্ব আমার প্রয়োজন নেই। তবে আমি মিসরে যাব জিহাদের উদ্দেশ্যে, মুসলিম বাহিনীর সহযোগী হিসাবে। সেখানে গিয়ে যদি দেখি আমর ইবনুল আস মিসর বিজয় করে ফেলেছেন, তাহলে আর আমি নিজেকে তার কাজের সঙ্গে জড়াব না; বরং সেখান থেকে চলে যাব কোনো সাগরকূলে। সেখানেই সীমান্ত পাহারায় লেগে যাব।

আর যদি দেখি তিনি জিহাদে ব্যস্ত আছেন, তাহলে সেখানে তার সঙ্গে জিহাদে লেগে যাব।'

***

খলীফা উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চার হাজার মুসলিম সৈনিক দিয়ে একটি সেনাদল গঠন করলেন। যুবাইর ইবনুল আওয়াম, মিকদাদ ইবনুস আসওয়াদ, উবাদা ইবনুল সামিত এবং মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ বিখ্যাত চার বীর যোদ্ধাকে ওই সেনাদলের নেতৃত্ব দান করলেন।

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমর ইবনুল আসের কাছে পত্রে লিখলেন,

'আপনার চাহিদামতো চার হাজার সেনা সাহায্য পাঠালাম। প্রতি হাজারের নেতৃত্বে রয়েছে এমন যোদ্ধা যারা প্রত্যেকেই এক হাজার সৈনিকের সমতুল্য।

***

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে পৌঁছলেন, দেখলেন তিনি মিসরের ফুসতাত নগরীর ব্যাবিলন দুর্গ অবরোধ করে রেখেছেন। সুতরাং তিনি ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ প্রাচীরের চারপাশ ঘুরে দেখলেন। এরপর তার সৈনিকদের স্থান নির্ধারণ করে দিলেন।

ব্যাবিলন দুর্গের অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। মুসলিম সৈনিকরা বলতে শুরু করল, দুর্গের মধ্যে নিশ্চয় মহামারি দেখা দিয়েছে।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আমরাই তো ওদের জন্য মহামারি হয়ে এসেছি। তির, তরবারি আর বর্শার আঘাতে মহামারির মতোই সব সাফ করে ফেলব।'

বিজয় যখন ক্রমেই বিলম্বিত হতে থাকল এবং মুসলিম বাহিনী ধীরে ধীরে ক্লান্ত ও বিষণ্ন হতে থাকল, তখন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘোষণা করলেন,

'আমি নিজেকে আল্লাহর জন্য কোরবানী করব এবং আশা করি এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে বিজয় দান করবেন।'

***

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি মজবুত সিঁড়ি (মই) বানালেন, দুর্গের একটি দেয়ালে সেটা ঝুলিয়ে তার সৈনিকদের নির্দেশ দিলেন, আমার তাকবীর ধ্বনি শোনার পর তোমরা একসঙ্গে তাকবীর দিয়ে আমার পিছে পিছে মই বেয়ে দেয়ালের ওপর উঠে আসবে।

সবকিছু সৈনিকদের বুঝিয়ে দিয়ে তরবারি খাপমুক্ত করে চোখের পলকে মই বেয়ে তিনি দুর্গের প্রাচীরের ওপর চড়ে বসলেন এবং উচ্চ আওয়াজে তাকবীর দিলেন,

আল্লাহু আকবার...
আল্লাহু আকবার...

এরপর একই তাকবীর ধ্বনি হাজার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো, যার গগনবিদারী আওয়াজ মুশরিকদের অন্তর প্রকম্পিত করে তুলল।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুর্গে লাফিয়ে পড়লেন।

ব্যাস, তার লাফিয়ে পড়া দেখেই সঙ্গের মুসলিম সৈনিকরা সকলেই একই পদ্ধতিতে লাফিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকে বিস্মিত, হতবাক ও অপ্রস্তুত রোমানদের কচুকাটা করতে লাগলেন। একই সঙ্গে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দিলেন। অমনি মুসলিম বাহিনীর সকল সৈনিক ভেতরে ঢুকে পড়লেন এবং শত্রুদের ওপর বজ্রপাতের মতো ফেটে পড়লেন। চরমভাবে তাদের গায়ে পরাজয়ের গ্লানি মেখে দিলেন। আল্লাহর সৈনিকেরা বিজয়ের হাসি হেসে স্লোগান দিলো, 'দুনিয়ার তাগুতেরা' 'নিপাত যাক, নিপাত যাক'।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৫৪৫ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ২৭৮৯।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৫৮০ পৃষ্ঠা।
৩. *সীরাতু ইবনি হিশাম*, ১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা।
৪. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা।
৫. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা।
৬. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা।
৭. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা।
৮. *দাইরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া*, ৮ম খণ্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা।
৯. *আল-আলাম*, ৩য় খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা।
১০. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।
১১. *আল-আওয়াইল*, ৪৬ পৃষ্ঠা।
১২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা।

সিমাক ইবনে খারাশা

'ডাকনাম আবু দুজানা'

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

বড় বড় প্রবীণ মুহাজির ও আনসার যোদ্ধাদের বাদ রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তরবারিটি তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে এখন উত্তাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় শহর মদীনা।

নবীজির সাহাবীরা যুদ্ধের বর্ম পরে সিংহের মতো কেউ আসছেন কেউ যাচ্ছেন...

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শাহাদাত লাভের ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা তাদের চোখেমুখে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বর্ম পরে আল্লাহ ও তাঁর শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসছেন।

তাঁর ওপর সকল মুসলিমের দৃষ্টি পড়ামাত্রই তাদের হৃদয়ে জ্বলে উঠল ইসলামী চেতনা ও দীনি জযবার জ্বলন্ত আগুন।

উত্তপ্ত হয়ে উঠল তাদের অন্তর সাহস ও সংকল্পে।

একদিকে রয়েছেন মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের তরতাজা তরুণ সন্তানেরা, তারাও ছুটে আসছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে, যাদের কারোরই বয়স পনেরো পার হয়নি।

এরা নিজেদের অল্পবয়সী শরীর রাসূলের সামনে টেনে, বুক ফুলিয়ে বড়দের মতো দেখানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন—এই আশা নিয়ে যে, তিনি পতাকাতলে ওদেরকে তাঁর যুদ্ধ করার এবং তাঁর কাছাকাছি থেকে শহীদ হওয়ার সুযোগ দেবেন।

***

মজলিসে সকলের উপস্থিতি পরিপূর্ণ হওয়ামাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তরবারিটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন,

مَنْ يَأْخُذُ سَيْفِيْ هذَا ؟

‘কে নেবে আমার এই তরবারি?’

ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো হাত তাঁর দিকে উঁচু হলো।

তার মানে সকলেই প্রিয় নবীর তরবারি লাভের প্রতিযোগিতায় সফল হতে চায়।

তারা সকলেই এই বিরল সৌভাগ্যের মালিক হতে চায়।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তরবারি কারও হাতেই না দিয়ে আবারও আরও একটু ব্যাখ্যা দিয়ে ঘোষণা করলেন,

‘আমার এই তরবারিটিকে এর হকসহ কে নিতে চাও?’

অনেকেই এই ঘোষণায় দাঁড়িয়ে পড়লেন, যাদের মাঝে উমর ইবনুল খাত্তাব এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাও ছিলেন, কিন্তু রাসূল তাদের কাউকেই তরবারিটি দিলেন না। তখন তাঁর সামনে দাঁড়ালেন সিমাক ইবনে খারাশা—যিনি সায়েদ গোত্রের বন্ধু এবং যার ডাকনাম আবু দুজানা। তিনি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার তরবারির হকটা কী?’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

‘এর হক এই যে, এটা দিয়ে তুমি লড়াই করতে থাকবে, হয় তুমি বিজয়ী হবে নয়তো শহীদ হবে।’

তিনি বললেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার তরবারিটি এর হকসহ আমি নিতে চাই।’

নবীজি এবার খুশি হয়ে তাকে তরবারিটি দিয়ে দিলেন।

***

উপস্থিত সকলেই কৌতূহলী হয়ে মাথা উঁচু করে করে আবু দুজানাকে দেখতে থাকলেন, যাকে নবীজি নিজের তরবারি দিয়ে ধন্য করলেন। অনেক প্রবীণ মুহাজির ও আনসার সাহাবী আগ্রহী হলেও অন্যদের বাদ দিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই প্রাধান্য দিলেন।

***

আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যোদ্ধা হিসাবে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অজ্ঞাত অথবা অখ্যাত কোনো মানুষ ছিলেন না।

তারা সকলেই স্বীকার করতেন যে, তিনি একজন দুঃসাহসী বীর, মৃত্যুর পরোয়া করেন না এমনই একজন বীরযোদ্ধা।

সকলেই তার লাল টুপির কথা জানত, যা তিনি যুদ্ধের সময় মাথায় পরতেন।

সকলে তার ওই বিশেষ টুপির নাম দিয়েছিল ‘যমটুপি।’

রণাঙ্গনে মল্লযুদ্ধের জন্য দুই কাতারের মধ্য দিয়ে তার দাম্ভিক চালে হেঁটে যাওয়া দেখে সাহাবীরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন, তা সত্ত্বেও তারা কেউ কেউ তাকে ঈর্ষা করতেন তাকে দেওয়া নবীজির তরবারির বৈশিষ্ট্যের কারণে।

আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই ব্যাপারটি কোনো সাহাবীর বর্ণনা থেকেই শোনা যাক, যিনি বিষয়টির বিবরণ দেওয়ার পাশাপাশি তার প্রতি নিজের ঈর্ষার কথাও খুলে বলবেন।

***

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'আমি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার তরবারিটি চাইলাম, আর তিনি সেটা আমাকে না দিয়ে আবু দুজানাকে দিলেন, এতে আমার মনে খুব কষ্ট হলো। আমি মনে মনে বললাম,

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন ফুফু সফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে। কুরাইশ বংশে উঁচু সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি আমি, তা সত্ত্বেও রাসূলের সামনে আমি আগে দাঁড়িয়ে তরবারিটি চাইলাম কিন্তু তিনি আমাকে না দিয়ে সেটা দিলেন আবু দুজানাকে!

আমি দেখব যে, সে এমন কী করে! কী তার বৈশিষ্ট্য?

রণাঙ্গনে আমি আবু দুজানাকে অনুসরণ করতে থাকলাম, তিনি যখন মুশরিক বাহিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, লাল টুপি মাথায় পরলেন। এটা দেখেই আনসারী সাহাবীরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বলাবলি করতে লাগলেন, আবু দুজানা মাথায় যমটুপি পরেছেন। এই বিশেষ টুপিটা মাথায় পরলে তারা এ রকমই বলতেন। এরপর রাসূলের তরবারিটি ডান হাতে নিয়ে সৈনিকদের কাতারগুলোর মধ্য দিয়ে দাম্ভিক চালে চলতে থাকলেন...

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এমন ভাবভঙ্গি দেখে মন্তব্য করলেন,

'এই দাম্ভিক চাল আল্লাহ ও রাসূলের কাছে ঘৃণিত। একমাত্র যুদ্ধের ময়দানে, দুশমনদের সামনে এটা পছন্দনীয়।'

এরপর আবু দুজানা এমন কবিতা বলতে বলতে সামনে যেতে লাগলেন, যা হৃদয়ে কাঁপন ধরায়, অন্তরে জ্বালিয়ে দেয় চেতনার আগুন।

মুশরিকদের কাতারের দিকে অগ্রসর হলেন, পায়চারি করতে করতে হুংকার দিতে সামনে বাড়তে থাকলেন। যাকে সামনে পেলেন তাকেই হত্যা করে জাহান্নামে পাঠালেন।

***

মুশরিক সেনাদলে একটি লোক ছিল, যার কাজ ছিল আহত মুসলিম সৈনিকদের খুঁজে খুঁজে একে একে সবাইকে মেরে ফেলা...

দেখলাম, আবু দুজানা সেই লোকটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন...
আবার লোকটিও আবু দুজানার দিকে অগ্রসর হচ্ছে...

আমি আল্লাহকে ডাকতে থাকলাম যেন ওই দু'জন মুখোমুখি হোক আর ওই কাফেরের মৃত্যু ঘটুক আবু দুজানার হাতে।

তারা মুখোমুখি হলো এবং এক পলকের মধ্যেই একে অন্যের ওপর তরবারির আঘাত করল। আবু দুজানা ঢাল দিয়ে শত্রুর আঘাত ঠেকালেন, তাতে তার ঢাল টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু আবু দুজানার তরবারি সোজা তাকে আঘাত করল, দেখলাম রক্তের স্রোতে তার দেহ ছটফট করতে থাকল।

আমি আবু দুজানাকে দেখেছি শত্রুদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য, রাসূলকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সৈনিকদের কাতারে ঝাঁপিয়ে পড়তে...

আমি দেখছিলাম তাকে, একবার নবীজির ডানে, একবার বামে, কখনো সামনে, কখনো পেছনে ছুটে ছুটে যাচ্ছেন।

***

আবু দুজানা দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি মুশরিক সৈনিকদের কাতারের মাঝে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছে। সৈন্যদের মাঝে সাহস ও শক্তি

সঞ্চার করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিরতরে খতম করে ফেলার জন্য তাদের উত্তেজিত করে তুলছে।

তিনি সেই লোকটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার মাথায় আঘাত করার উদ্দেশ্যে তরবারি উঁচু করলেন।

কিন্তু হঠাৎ দেখি তিনি তরবারি সরিয়ে নিলেন।

আমি তার কাছে গিয়ে এর কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন,

'আবু সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে সম্মানিত) যে মহিলা দলটিকে রণাঙ্গনে নিয়ে এসেছেন, ওইটা ছিল তাদেরই একজন।

আমি তরবারি সরিয়ে নিয়েছিলাম, কারণ একজন মহিলাকে হত্যা করে রাসূলের মুবারক তরবারির অমর্যাদা করতে পারি না। আমার হাতে প্রিয় নবীর তরবারিকে কলঙ্কিত হতে দেব না কিছুতেই।'

এবার আমি বুঝতে পারলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তরবারি সবচেয়ে যোগ্য মানুষটির হাতেই অর্পণ করেছেন।

আসলেই প্রকৃত বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।'

***

রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন ইহজগতে জীবিত ছিলেন, আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম ও মুসলিম জাতির ওপর শত্রুদের আক্রমণকে নবীজির দেওয়া সেই তরবারি দিয়ে প্রতিরোধ করেছেন।

যখন তিনি ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন তখন থেকে আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেকে এবং সেই তরবারিকে নবীজির খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আনুগত্যে নিয়োজিত করে দেন।

***

ইয়েমেনের হানীফ গোত্র যখন মুরতাদ হয়ে গেল এবং দলে দলে ইসলাম ধর্ম অস্বীকার করে আল্লাহর দীন থেকে বের হয়ে যেতে থাকল এবং অনুসারী হয়ে গেল মিথ্যা নবী মুসাইলামাতুল কায্যাবের। সে সময় আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই ভণ্ড নবী ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলেন এক বিশাল ইসলামী সেনাদল।

যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন বড় বড় নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরামকে। যাদের অগ্রভাগে ছিলেন প্রিয় নবীর বিশেষ দুআপ্রাপ্ত অর্থাৎ তার তরবারিপ্রাপ্ত সাহাবী আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

এই বিশাল সেনাদলের প্রধান সেনাপতি মনোনীত করেন 'আল্লাহর তরবারি' খ্যাত বিখ্যাত বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে।

***

আল্লাহর দুশমনদের ওপর মুসলিম সেনাদল ভয়াবহ ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর ভণ্ড মুসাইলামা ও তার দলবল সে আক্রমণের মুখে পাহাড়ের মতো অনড় ও অবিচল রয়ে গেল।

দুই দলের মাঝে ভয়াবহ লড়াই সংঘটিত হলো। যাতে উভয় দলের প্রচুর যোদ্ধার প্রাণ গেল। তাতে কোনো দলই দমল না; বরং নিজ নিজ দলের মানুষদের লাশ দেখে উভয় দলের সৈনিকদের যুদ্ধ-উন্মাদনা ও হিংস্রতা আরও বেড়ে গেল।

দীর্ঘ সময়ের তীব্র লড়াই ও চড়াই-উতরাইয়ের পর একসময় রণাঙ্গন চলে এল মুসলিম সেনাদলের পক্ষে। ময়দানের অবস্থার পরিবর্তন দেখে এবার ভণ্ড মুসাইলামা এবং তার হাজার হাজার অনুগত অনুসারী বাহিনী পালিয়ে আশ্রয় নেয় পাশ্ববর্তী এক সুরক্ষিত বাগানে—পরবর্তীকালে যার নাম হয় 'হাদীকাতুল মউত' বা মৃত্যুবাগান।

বাগানের সুদৃঢ় বন্ধ ফটককে আক্রমণ ঠেকানোর ঢাল আর চতুর্দিক বেষ্টনকারী মজবুত দেয়ালের আড়ালে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখল।

মুসলিম বাহিনীর সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা যখন অকার্যকর প্রমাণিত হলো। তারা হয়ে পড়ল নিরুপায় ও অক্ষম। তখন বারা ইবনে মালিক আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আত্মত্যাগের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এবং দ্রুত কার্যকরী এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী পন্থা আবিষ্কার করলেন। যার মাধ্যমে তিনি মুসলিম সৈনিকদের জন্য বাগানের ফটকগুলো খুলে দিতে সক্ষম হলেন। বাগানের ফটক খোলা পেয়ে রাসূলের সাহাবীরা বন্যার স্রোতের মতো প্রবল বেগে ভেতরে ঢুকে পড়লেন এবং ভেতরের শত্রুবাহিনীর ওপর মৃত্যুর বিভীষিকা হয়ে জেঁকে বসলেন।

মুসলিম সৈনিকেরা প্রায় সকলেই ভেতরে প্রবেশ করলেন ফটক দিয়ে আবার কিছুসংখ্যক সৈনিক ভেতরে ঢুকলেন বিশাল উঁচু প্রাচীরের ওপর দিয়ে।

আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন ওপর থেকে লাফিয়ে প্রবেশকারীদের একজন।

***

আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিশাল প্রাচীরের উঁচু থেকে বাগানের ভেতরে ঝাঁপ দিলেন। তিনি যখন মাটিতে পড়লেন তখন তার এক পায়ের গোছা ভেঙে গেছে। কিন্তু সেদিকে একটুও ভ্রুক্ষেপ করলেন না; বরং আল্লাহর রাসূলের দেওয়া সেই বিশেষ তরবারি হাতে নিয়ে সুস্থ পায়ে লাফিয়ে মানুষের ভিড় পার হয়ে পৌঁছে গেলেন মুসাইলামাতুল কায্যাবের কাছে। সর্বশক্তি দিয়ে সেই তরবারির আঘাত হানলেন ভণ্ড নবীর ওপর। একই সঙ্গে সেই মুহূর্তে মুসাইলামাকে বিদ্ধ করেছিল ওয়াহশী ইবনে হারবের ধারালো বর্শার আঘাত।

মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারের প্রাণহীন দেহ ধপাস করে পড়ে গেল তাদের দু'জনের মাঝখানে।

সেই মুহূর্তে ভণ্ড মুসাইলামার কয়েকজন সৈনিক একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক পা নিয়ে লড়াই করা এই দুর্দমনীয়, দুঃসাহসী মুজাহিদের ওপর, তাঁকে খতম করে ফেলার উদ্দেশ্যে।

একাই তিনি কয়েকজনের সঙ্গে লড়াই চালাতে থাকলেন। এক পায়ে লড়াই করতে করতে এক সময় তার পা নিস্তেজ হয়ে গেল।

তরবারি আর বর্শার অগণিত আঘাত তার গোটা শরীরকেও নিস্তেজ করে দিলো।

মাটিতে পড়ে গেল তার দেহ...

তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

***

কিন্তু নবীজির তরবারিপ্রাপ্ত শহীদ সাহাবী আবু দুজানা শেষবারের মতো তার দুই চোখ বন্ধ করলেন কেবল তখনই, যখন তিনি ওই দু'টি চোখে দেখতে পেলেন মুসলিম সৈনিকরা ইয়ামামার মাটিতে উড্ডীন করেছে ইসলামের কালেমাখচিত পতাকা।

তথ্যসূত্র :

১. *নিহায়াতুল আরব*, ১৭ শ খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা।
২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪র্থ খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা; ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-মুসতাদরাক*, ৩য় খণ্ড, ২৫৫ -২৫৬ পৃষ্ঠা।
৪. *কানযুল উম্মাল*, ১৩ শ খণ্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-মাআরিফ লিবনি কুতাইবা*, ২৭১ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-মাগাযী লিল ওয়াকিদী*, ৬০ পৃষ্ঠা এবং সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৮. *হায়াতুস সাহাবা*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৯. *আত-তাবারী*, ৩য় খণ্ড, ১৩৯৭ পৃষ্ঠা।
১০. *আসসীরাতুল হালবিয়্যা*, ২য় খণ্ড, ৪৯৭, ৫০১ পৃষ্ঠা।
১১. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা।
১২. *আল-মুহাব্বার*, ৭২ পৃষ্ঠা।
১৩. *আল-ইসাবা*, ৪র্থ খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ১৭৩।
১৪. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৪র্থ খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা।
১৫. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৪৫১ পৃষ্ঠা।
১৬. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, ৫৫৬ পৃষ্ঠা এবং সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

হে আল্লাহ, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে ক্ষমা করে দাও। দীনের পথে তার সকল প্রতিবন্ধকতার অপরাধ মাফ করে দাও।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের জীবন বীরত্ব ও সাহসের এক মহাকাব্য...
ক্ষুদ্র বংশপ্রীতি আর সাহসিকতা দ্বারা যার সূচনা...
বিশ্বজয়ী বিপ্লবী বিশ্বাস আর মানবতা দিয়ে যার শুভ সমাপ্তি...

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন মাখযূম গোত্রের সন্তান,

আর এই মাখযূম ছিল কুরাইশ বংশের শীর্ষস্থানীয় শাখা।

তার লালন-পালন ও বিকাশ-বর্ধন ঘটেছিল কুরাইশের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত, সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত এবং ঐশ্বর্যে সর্বাধিক প্রাচুর্যবান পরিবারে।

তার চাচা হিশাম ছিলেন জাহেলী যুগের বিখ্যাত ফিজার যুদ্ধের প্রধান কুরাইশী সেনাপতি।

তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আরবের লোকেরা সময় গণনা করত যেমনিভাবে অন্যসব বড় বড় ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা এটা করত।

তার শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে কুরাইশের লোকেরা তিনদিন পর্যন্ত মক্কার বাণিজ্যকেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছিল।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আরেক চাচা ফাকিহ ইবনে মুগীরা ছিলেন সময়ের অন্যতম সেরা সম্মানী ব্যক্তি। তার ছিল একটি বিখ্যাত মেহমানখানা। যেখানে বিনা অনুমতিতেই যেকোনো ব্যক্তি মেহমান হতে পারত।

তার পিতা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনবান ব্যক্তি।

তিনি ছিলেন নানা রকম সম্পদের মালিক। সোনা, রুপা, খেজুর ও নানা ফলের বাগান ছাড়াও তার ছিল বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসা। বাগান পরিচর্যা, ব্যবসা পরিচালনা এবং পরিবারের সকলের সেবা ইত্যাদি সকল কাজের জন্য ছিল তার অগণিত দাস-দাসী। তার মতো এত স্থাবর, অস্থাবর ধন-সম্পদের মালিক আর কেউই ছিল না।

এ কারণেই যে বছর কাবার গেলাফ পরাতেন তিনি একা, তো পরের বছর পরাতেন বংশের সকলে মিলে। এ কারণেই তাকে বলা হতো 'অনন্য'।

তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল 'রাইহানা কুরাইশ' বা কুরাইশের ফুল।

তার ব্যাপারেই আল-কুরআন মন্তব্য করেছে,

ذَرۡنِیۡ وَمَنۡ خَلَقۡتُ وَحِیۡدًا. وَّ جَعَلۡتُ لَهٗ مَالًا مَّمۡدُوۡدًا. وَّ بَنِیۡنَ شُهُوۡدًا. وَّ مَهَّدۡتُّ لَهٗ تَمۡهِیۡدًا.

'আমি যাকে অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি। এবং সদাসঙ্গী পুত্রবর্গ দিয়েছি। তাকে প্রচুর সচ্ছলতা দিয়েছি।' –সূরা আল-মুদ্দাসসির : (৭৪) ১১-১৪।

সীমাহীন দানশীলতার কারণে তার পিতা হাজীদের মেহমানদারির উদ্দেশ্যে অন্য কেউ চুলা জ্বালাক—এটা তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন আল্লাহর ঘরের এই সকল মেহমানের তিনি একাই আপ্যায়ন করবেন। অন্য কেউ এই সৌভাগ্য তার থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

তিনি দাবি করতেন কুরআন অবতরণের এবং নবুওয়াত লাভের জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি তিনি। তার এই দাবির কথাই আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে উল্লেখ করে বলেছেন,

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

'কাফেরেরা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোনো প্রধান ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হলো না?' –সূরা আয্-যুখরুখ : (৪৩) ৩১

সম্মান, সম্পদ ও ঐশ্বর্যে ঘেরা এমনই এক নেতৃস্থানীয় পরিবারে হিজরতের চৌত্রিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

***

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অনেক লম্বা...
বিশাল ও দীর্ঘদেহী...
গাম্ভীর্যপূর্ণ ও ভারিক্কি চেহারার মানুষ...
গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল শ্যামলা।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে ছিল তার চেহারার অনেক বেশি মিল। সে কারণে দুর্বল দৃষ্টির লোকেরা ওই দু'জনের মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলত।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঈমানের দাওয়াত প্রদান শুরু করেন, সে সময় খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ছিলেন প্রায় কুড়ি বছরের এক টগবগে তরুণ যুবক।

তিনি ওই দাওয়াতকে ঘৃণা করে তা থেকে দূরে সরে থাকলেন, কারণ তিনি দেখতে পেলেন এর মধ্যে রয়েছে এক নতুন নেতৃত্ব যা তার পারিবারিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করবে।

এতে দেখলেন এমন এক আধুনিক শীর্ষকর্তৃত্ব, যা তার পিতার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে উৎখাত করবে।

সে কারণে তিনি নিজে এবং তার ভাই উমারা ইবনুল ওয়ালীদ লেগে পড়লেন এর ঘোর বিরোধিতায়।

***

উমারা ইবনুল ওয়ালীদ মুশরিক বাহিনীর সঙ্গে বদরে যুদ্ধে অংশ নিয়ে মুসলিম মুজাহিদদের হাতে বন্দী হলেন।

তাকে মুক্ত করা নিয়ে অনেক কথা হলো। কারণ, তিনি এবং তার পিতা অনেক বেশি ধন-সম্পদের মালিক এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তার পরিবার খুব বেশি তৎপর। অতএব অন্যদের মতো সাধারণ কোনো মুক্তিপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

তাকে বন্দীকারী মুক্তপণ দাবি করল চার হাজার দিরহাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ জারি করে দিলেন,

'তার পিতার বড় লৌহবর্ম ও দামি তরবারি এবং হাতল ছাড়া অন্য কিছুই মুক্তপণ হিসাবে গৃহীত হবে না।'

মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী অবস্থায় আপন বিশ্বাসে অটল থাকাকালীন এভাবে দরকষাকষি চলতেই থাকে, চলতেই থাকে।

অবশেষে তিনি মুক্ত হয়ে পরিবারের কাছে যখন ফিরে গেলেন, গিয়েই তিনি সকলের সামনে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করলেন।

সকলেই হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,

‘তুমি যদি ইসলামই গ্রহণ করবে, তাহলে এত যে দেনদরবার করে আমরা তোমাকে মুক্ত করে আনলাম, এর আগেই তুমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলে না?’

জবাবে তিনি বললেন,

‘ওই সময় ইসলাম গ্রহণ করলে সবাই বলত, বন্দীদশায় ভয় পেয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, এ জন্যই মুক্তির অপেক্ষা করে এতদিন পর বুঝেশুনে ইসলাম কবুল করেছি।’

এভাবেই তিনি ইসলাম কবুল নিলেও তার ভাই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রয়ে গেলেন কুফরীর সেই তিমিরে।

***

তাই ওহুদ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী খালিদের হাতে তুলে দিলো ডানপার্শ্বস্থ সৈনিকদের নেতৃত্বের ভার।

ওই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তীব্র আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে মুশরিক বাহিনী ময়দান ছেড়ে পালায়। তাদের সঙ্গে পালাতে থাকেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদও।

পালাতে গিয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ দেখতে পান মুসলিম বাহিনীর পেছন দিকটি অরক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে পেছনের ওই পাহাড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চাশজন সৈনিককে পাহারায় নিয়োজিত করে পূর্বেই সতর্ক করে বলে দিয়েছিলেন, ‘কোনো অবস্থাতেই তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না।’

পাহারাদার সৈনিকরা মনে করলেন, রাসূলের ওই নির্দেশনা ছিল যুদ্ধ চলার সময়ের জন্য। যুদ্ধ তো শেষ। শত্রুরা পালিয়ে গেছে। সুতরাং আমীরের নিষেধ সত্ত্বেও তারা রাসূলের নিষেধের ভুল ব্যাখ্যা করে ওই স্থান ছেড়ে ময়দানে চলে যায়। সেই সুযোগে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তার বাহিনী নিয়ে অপ্রস্তুত, এলোমেলো মুজাহিদদের ওপর তুমুল আক্রমণ চালিয়ে হেরে যাওয়া যুদ্ধে নতুন করে বিজয়ী হয়ে যান।

আবু সুফিয়ান খুশিতে যেন বাতাসে উড়তে থাকেন। তিনি বলেন,

هذَا يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ ' وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

'আজ বদরে আমাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলাম। একবার পরাজয় তো অন্যবার জয়। এটাই তো যুদ্ধ।'

***

খন্দক যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী নিজেরাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মুসলিম বাহিনীর এক এক অংশের ওপর হঠাৎ আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিকল্পনা করে।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের ওপর দায়িত্ব পড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আক্রমণ পরিচালনার।

খালিদ তার দায়িত্বে প্রায় সফল হয়েই গিয়েছিলেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্ক প্রহরীদের এবং তাদের প্রধান উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সজাগ তৎপরতার কারণে সে পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়।

***

হুদাইবিয়া সন্ধির সময়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় পনেরোশো সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কার উদ্দেশে বের হন। খাপের মধ্যে তরবারি ছাড়া লড়াই করার মতো তির-ধনুক, বর্শা বা ঢাল ইত্যাদি কোনো অস্ত্রই তারা বহন করেননি।

কিন্তু মক্কার মুশরিকরা এতে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা দুইশো যোদ্ধার সঙ্গে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলের সাক্ষাতে পাঠাল। এই প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই তারা চায় মুহাম্মাদের খবরাখবর সম্পর্কে জানতে।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ কাছে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকালেন।

এরপর যোহরের নামাযের সময় হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সঙ্গে সালাতুল খউফ আদায় করলেন। এই সময় খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ একবার ভাবলেন রাসূলের ওপর আক্রমণ করবেন...

কিন্তু নামায এক পবিত্র আত্মিক গাম্ভীর্য...

আর মুসলিমদের মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা তার সামনে অন্তরায় হয়ে গেল।

তা ছাড়া তার অন্তরের ভেতরের একজন জাতযোদ্ধার আত্মসম্মান ওই নীতিবিরুদ্ধ আক্রমণ চালাতে অস্বীকৃতি জানাল।

তার প্রাণে এই বিশ্বাস জেগে ওঠে, বাহ্যদৃষ্টির বাইরে মুহাম্মাদের একটি গোপন আত্মার জগৎ আছে। আছে আত্মিক শক্তি ও শান্তি। যেখানে আমার মতো মানুষদের প্রবেশাধিকার নেই। সেই শক্তি ও শান্তির উৎস আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমাদের সেই জগতের সন্ধানী হতে হবে।

এটাই ছিল খালিদকে ইসলামের প্রতি নমনীয় করা প্রথম আবেগ।

এরপর বদর যুদ্ধের পরে ইসলাম গ্রহণকারী আরেক ভাই ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদের চিঠি আসে তার কাছে। যেখানে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে রাসূলের একটি কথার উল্লেখ ছিল। আর সেটাই হয়ে যায় তার অন্ধকার থেকে আলোর পথে, কুফরী থেকে ঈমানের পথে উত্তরণের কারণ।

***

চলুন শোনা যাক খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা থেকেই তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনি। তিনি বলেন,

‘আল্লাহ তাআলা যখন আমার কল্যাণ চাইলেন, আমার হৃদয়ে তিনি ইসলামের ভালোবাসা ঢুকিয়ে দিলেন। আমার মধ্যে শুভবুদ্ধি জেগে উঠল। আমি বললাম,

'আমি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে এই যে এত যুদ্ধ করলাম, যখনই আমি কোনো যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি আমি ভেবে দেখি যে, সেই যুদ্ধে আমার কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল না। অনর্থক যুদ্ধ করে এলাম। কেন আমি এই ফালতু যুদ্ধে নিজেকে জড়াচ্ছি? আমি কী চাই? কিছুই না। তাহলে কেন এই যুদ্ধ?

আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, খুব শিগগির মুহাম্মাদ আরব জাতির ওপর বিজয়ী হবে। কোনো শক্তিই তাঁকে দামিয়ে রাখতে পারবে না।'

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা অব্যাহত রেখে বলেন,

'আমার মনের মধ্যে যখন এই ভাবান্তর সক্রিয় ছিল সেই মুহূর্তে আমার ভাই আমার কাছে চিঠি লিখল। খুলে দেখলাম তাতে লেখা,

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম...

আম্মাবাদ, আজ পর্যন্ত আমার কাছে এক পরম আশ্চর্যজনক জিজ্ঞাসা, ভাই খালিদ তোমার এত এত জ্ঞানবুদ্ধি সত্ত্বেও কী করে তুমি ইসলামের বিরোধিতা করো?

অথচ ইসলামের সর্বজনীন কল্যাণের কথা আজ আর কারও কাছেই অস্পষ্ট নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তোমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন খালিদ কোথায়?

আমি বলেছি, একদিন আল্লাহ তাকে পৌঁছে দেবেন আপনার কাছে।

তিনি বলেছেন, খালিদের মতো মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। সে যদি নিজের শক্তি, সাহস ও রণদক্ষতাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষে কাজে লাগাতে পারত, তাহলে তার জন্য হতো সেটা অশেষ কল্যাণকর...

আর আমরাও তাকে অন্য সকলের চেয়ে অগ্রগণ্য করতাম।

অতএব হে আমার ভাই, অনেক সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছ, এবার সময় এসেছে প্রতিকার করে নাও।'

***

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের বর্ণনা অব্যাহত রয়েছে,

'আমার ভাইয়ের চিঠি যখন হাতে পেলাম, মদীনার উদ্দেশে রওনা করতে আমি উদ্গ্রীব হয়ে উঠলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটি বারবার আমার মনে আনন্দের দোলা দিচ্ছিল।

আমার মানসিক এই অবস্থার মধ্যে সেই রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক দুর্ভিক্ষকবলিত, বৃষ্টি ও ফসলহীন সংকীর্ণ অঞ্চলে আটকে আছি... এরপর আমি সেখান থেকে বের হলাম এবং পৌঁছে গেলাম এক সবুজ-শ্যামল ফসলে ভরা প্রশান্ত অঞ্চলে।

আমি বুঝলাম আমার জীবনেরই বাস্তব কাহিনি এই স্বপ্ন।

আমি রাসূলের কাছে যাওয়ার পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। চিন্তা করলাম কাকে সঙ্গে নিয়ে যাব?

সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছে গিয়ে বললাম,

'হে আবু ওয়াহাব, আমাদের করুণ অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদকে দেখো, আরবের সীমা অতিক্রম করে এখন অনারবের মধ্যেও তার বিজয়কেতন উড়তে শুরু করেছে। এখন যদি আমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যাই, তাহলে তাঁর মর্যাদা তো আমাদেরও...'

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া কঠোরভাবে আমার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলল,

'কুরাইশের প্রত্যেকটা মানুষও যদি তার কাছে চলে যায়, যদি আর কেউই বাদ না থাকে, তবুও আমি কিছুতেই তাঁর অনুসারী হব না।'

আমি ভেবে দেখলাম, এখানে কোনো কাজ হবে না। কারণ, এর পিতা আর ভাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সফওয়ান সেই হত্যার বদলা চায়। অতএব আমি তার কাছ থেকে সরে পড়লাম।'

***

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের ইসলাম গ্রহণের কাহিনি বলে চলেছেন,

'আমি সফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে রেখে দেখা করলাম আবু জাহালের পুত্র ইকরিমার সঙ্গে। আমি তাকেও সফওয়ানের মতো আগের সেই কথাগুলোই বললাম। ইকরিমাও আমাকে শুনিয়ে দিলো সফওয়ানের মতো অস্বীকৃতিমূলক সাফ কথা।

আমি তখন বললাম,
'এতক্ষণ যা বলেছি এগুলো ভুলে যাও।'

আমি বাড়ি চলে গেলাম। আমার বাহন প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলাম। ভাবলাম ততক্ষণে আমার বন্ধু উসমান ইবনে আবু তালহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার ইচ্ছার কথাটি জানাই। কিন্তু তখনই আমার মনে পড়ল, তার নিহত আত্মীয়দের কথা। তখন আবার মনে হলো, থাক, ওর সঙ্গে দেখা করার বা আলোচনার দরকার নেই। এরপর আবার ভাবলাম, ধ্যাৎ! দেখা করলে সমস্যা কোথায়? আমি তো এখনই চলে যাব।

আমি তার কাছে গিয়ে সকল বিষয় আলোচনা করলাম এবং আগের দু'জনকে যা যা বলেছিলাম প্রায় একই কথা তাকেও বললাম।

উসমান ইবনে তালহা আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। আমরা রাতের শেষ প্রহরে অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর আমাদের সাক্ষাৎ হলো আমর ইবনুল আসের সঙ্গে।

তিনি আমাদের দেখে বললেন,
‘মারহাবা! স্বাগতম তোমাদের দু’জনকে।’

আমরা বললাম,
‘তোমাকেও স্বাগতম।’

তিনি আমাদের কাছে জানতে চাইলেন,
‘তোমরা কোথায় যাচ্ছ?’

আমরা বললাম,
‘বরং এটা বলুন, আপনি কী উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন?’

তিনি বললেন,
‘আগে তোমাদের উদ্দেশ্যটা শুনি...’

আমরা বললাম,
‘আমাদের উদ্দেশ্য ইসলাম গ্রহণ করা, মুহাম্মাদের অনুসরণ করা।’

এবার তিনি বললেন,
‘একই উদ্দেশ্যে আমিও বের হয়েছি।’

সেখান থেকে আমরা একসঙ্গে মদীনায় পৌঁছলাম। আমার ভাই এসে দেখা করে বলল, তাড়াতাড়ি এসো, আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমার আসার সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন।

তিনি খুশি হয়ে তোমাদের অপেক্ষা করছেন।

আমি দ্রুতপায়ে তাঁর দিকে এগুতে থাকলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি মিষ্টি করে হাসতে থাকলেন। আমি সামনে এসে থামলাম এবং বিনয়ের সঙ্গে সালাম দিলাম। তিনি প্রসন্ন মুখে সালামের জবাব দিলেন।

আমি তখন বললাম,
‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল।’

তিনি বললেন,

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে হেদায়াত দান করেছেন। আমি সব সময়ই মনে করতাম, তোমার যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আছে এবং আশা করতাম তোমার বিবেক যেন তোমাকে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো ভুল পথে ঠেলে দিতে না পারে।’

***

সেদিন থেকেই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়ে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন।

ফেলে আসা দিনগুলোর ব্যাপারে অনুশোচনায় দগ্ধ ও ভীষণ লজ্জিত হতে থাকলেন। একবার তিনি প্রিয় নবীর কাছে মিনতি জানিয়ে বললেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো দেখেছেন আমি হক ও সত্যের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কত কত অন্যায়যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। দয়া করে আল্লাহর দরবারে আমার জন্য প্রার্থনা করুন, যেন আমার অতীতের সেই সব গুনাহ মাফ করে দেন।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবে বলেন,

إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَه

‘নিশ্চয় ইসলাম পূর্ববর্তী সকল পাপ মিটিয়ে দেয়, মুছে দেয়।’

এরপরও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের কাছে নিজের আশা ও দাবির কথাটি পুনর্ব্যক্ত করেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ كُلَّ مَا سَلَفَ مِنْهُ مِنْ صَدٍّ عَنْ سَبِيْلِكَ

‘হে আল্লাহ, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দাও। দীনের পথে তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সকল পাপ মার্জনা করে দাও।’

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এতে খুশি হয়ে যান এবং তার অন্তর শান্ত ও প্রশান্ত হয়ে যায়।

***

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলেন তখন তিনি নিজের চিরসবুজ চিরনবীন বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওনা করলেন।

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন বাহিনীর অগ্রভাগে...

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাখলেন ডান দিকের ব্যাটেলিয়ানে...

আর বামপাশের ব্যাটেলিয়ানে থাকলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু...

ইসলাম ধর্মে মাত্র কয়েক মাসের নবদীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই ঘটনার মাধ্যমে মক্কায় ফিরলেন একজন সেনানায়ক হিসাবে।

***

মক্কা বিজয়ের দিন নতুন মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও খালিদের হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দেওয়া ছিল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অনন্য দূরদর্শিতা। শ্রেষ্ঠনবী হিসাবে নবুওয়াতের দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিজয়ী ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতায় খালিদের থাকবে অনন্য ভূমিকা, দিগ্বিদিকে কুরআনী পতাকার সমুচ্চ প্রতিষ্ঠায় তার হবে বিশিষ্ট অবদান।

যখন নবীজির ওফাত হয়ে গেল, তিনি চলে গেলেন মহান প্রভুর সান্নিধ্যে এবং খিলাফতের শাসনভার অর্পিত হলো আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর, তখন তার শাসনামলে মুরতাদ ও ভণ্ড

নবীদের বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তবে তিনি প্রধানতম এবং সর্বাধিক কার্যকর অবদান রেখেছিলেন ওই যুদ্ধগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মুসাইলামাতুল কায্‌যাব ও তার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ইয়েমেনের মাটিতে ইয়ামামার যুদ্ধে।

***

মুসলিম বাহিনী যখন পারস্য বিজয়ের অভিযানে বের হলেন এই ময়দানে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছিলেন, তা ছিল একেবারেই নজিরবিহীন।

পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি সর্বমোট পনেরোটি ময়দানে লড়াই করেছেন...

কোনো ময়দানেই তার পরাজয় ঘটেনি। যুদ্ধ পরিকল্পনায় কোনো ত্রুটি ধরা পড়েনি। কোথায়ও তিনি হতাশ ও ব্যর্থ হননি।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ইয়ারমূকের যুদ্ধে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তি রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দানের ঈর্ষণীয় মর্যাদাও ছিল ক্ষণজন্মা এই বিখ্যাত বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দখলে।

***

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একের পর এক বিজয় অর্জন করতে থাকলেন। এতে মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে অনেকের মনোভাব জন্ম নিল যে, 'খালিদ থাকলেই বিজয় নিশ্চিত'। খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুমিনদের এই ত্রুটি শোধরানো জরুরি মনে করলেন। তিনি চাইলেন এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে যে, 'মুসলিম বাহিনীর বিজয় খালিদের বীরত্বের কারণে নয়, আল্লাহর সাহায্যের কারণে হয়'। খালিদকে তিনি লিখিত নির্দেশ পাঠালেন সেনাপতির দায়িত্ব ছেড়ে দিতে। এখানেই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রমাণ

করলেন তার শীর্ষ ঈমানী মর্যাদার। অসংখ্য বিজয়ের মহানায়ক, চলমান সেনাদলের প্রধান সেনাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে খলীফার নির্দেশের প্রতি তাৎক্ষণিক আনুগত্য প্রকাশ করলেন। নির্দ্বিধায় নিজের অধীনস্থ সেনাকে সেনাপতি মেনে তারই নেতৃত্বে সাধারণ সৈনিক হয়ে লড়াই অব্যাহত রাখলেন।

মহান আল্লাহ সুলাইমানের পিতা খালিদের প্রতি রহম করুন...

তিনি ছিলেন মানুষের মাঝে এক ভিন্নধর্মী, অনন্য সাধারণ আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ২২০১।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৩য় খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা।
৫. *ইবনুল খাইয়্যাত*, ৫১, ৫৬, ৭২ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-মাআরিফ*, ১১৫ পৃষ্ঠা।
৮. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা।
৯. *তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী*, ২য় খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।
১০. *আশহারু মাশাহীরিল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।
১১. *দাইরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া*, ৮ম খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা।
১২. *আল-আলাম*, ২য় খণ্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা।
১৩. *আসসীরাতুন নববিয়্যা লিবনি হিশাম*, ৪র্থ খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা।
১৪. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা।
১৫. *আল-মুহাব্বার*, ১৯০ পৃষ্ঠা।
১৬. *হায়াতুস সাহাবা*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১৭. *তারীখু ইবনি আসাকির*, ৫ম খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা।

আল-মুসান্না ইবনে হারেসা আশ-শাইবানী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চান, কে এই যোদ্ধা যার নাম-ধাম ও পরিচিতি জানতে পারলাম না, অথচ বারবার তার বিজয় অভিযানের খবর শুনতে পাচ্ছি? তাকে জানানো হলো, ইনি আল-মুসান্না ইবনে হারেসা আশ-শাইবানী। আপনি না চিনলেও তিনি খুব অখ্যাত ও অজ্ঞাত মানুষ নন।

–ওয়াল্লাদুল খলীল আল-ইমাদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার বিভিন্ন বাজারে যান আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লোকজনের কাছে। দাওয়াত পেশ করেন, আল্লাহর দীনপ্রচারের কাজে তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার আবেদন তুলে ধরেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক এবং আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা।

তাঁরা কয়েকজন সম্মানী ও ভালো মানুষ দেখতে পেলেন।

আবু বকর সিদ্দীক তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোন গোত্রের মানুষ?'

তারা জবাবে বললেন,

'শাইবান ইবনে সালাবা গোত্রের মানুষ আমরা।'

এ কথা শোনার পর আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ঝুঁকে বললেন,

'আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গিত, এরাই তাদের বংশের সবচেয়ে বেশি সম্মানিত মানুষ। ওই বংশে এদের চেয়ে সম্মানীত মানুষ আর কেউ নেই।'

সেখানে উপস্থিত ছিলেন আল-মুসান্না ইবনে হারেসা আশ-শাইবানী, মাফরূক ইবনে আমর এবং হানী ইবনে কুবাইসা।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের ডেকে বললেন,

'জানি না আপনারা আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারে কিছু শুনেছেন কি না, এই যে দেখুন তিনি এখানে উপস্থিত আছেন...'

রাসূলের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি এ কথা বললেন।

তারা বললেন,

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি তাঁর সম্পর্কে।'

তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ঘুরে বসলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসে পড়লেন আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পেছনে দাঁড়িয়ে চাদর দিয়ে তাঁর মাথার ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে কাছে বসা মাফরূক ইবনে আমর জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে কুরাইশী ভাই, আপনি কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকেন?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'আমি মানুষকে এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দাওয়াত দিই যে, এক অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি

আল্লাহর রাসূল। আমি এটাও বলে থাকি যে, আমাকে সমর্থন ও সহযোগিতা দাও যেন আমি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

মাফরূক ইবনে আমর আবার জিজ্ঞসা করলেন,

'হে কুরাইশী ভাই, আপনি আর কী আহ্বান জানান?'

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করলেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

'আপনি বলুন, এসো আমি তোমাদের ওইসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই, আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক কোরো না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করো, নিজ সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা কোরো না। আমি তোমাদের ও তাদের আহার দিই। নির্লজ্জলতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা কোরো না, কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বোঝো।' –সূরা আনআম : (০৬) ১৫১

মাফরূক বললেন,

'হে কুরাইশী ভাই, আপনি আরও কী আহ্বান জানান, বলুন আমরা শুনতে চাই। কারণ, আল্লাহর কসম! এটা কোনো মানুষের কথা নয়, যদি মানুষের কথা হতো, তাহলে অবশ্যই আমরা সেটা বুঝতে পারতাম।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন মহান আল্লাহর বাণী,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ إِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ করেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন—যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।' –সূরা নাহাল : (১৬) ৯০

এবার মাফরূক নবীজিকে বললেন,

'হে কুরাইশী ভাই, আল্লাহর কসম! তুমি সর্বোত্তম চারিত্রিক গুণাবলির প্রতি আহ্বান করে থাকো।'

এরপর মাফরূক মুসান্না ইবনে হারেসার দিকে মনোযোগী হলেন যেন তার মন্তব্য জানতে চান। তিনি বললেন, 'ইনি মুসান্না ইবনে হারেসা, আমাদের আমীর এবং সেনাপতি।'

তখন মুসান্না বললেন,

'আপনার সব কথা শুনলাম, খুবই ভালো লাগল, অতি চমৎকার কথা। তবে এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমরা এককভাবে কিছু করতে পারি না, অবশ্যই আমাদের কওমের সকলকে নিয়ে ভেবে দেখতে হবে।

তা ছাড়া আমরা যেখানে বাস করি পারস্যের ভূমিতে প্রবাহিত এক নদীর উজান মাটিতে। পারস্য সম্রাট কিসরা সেখানে বাস করার জন্য আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আমরা কোনো বিপ্লব ঘটাব না এবং কোনো বিপ্লবীকে আশ্রয় দেব না।

যতদূর সম্ভব আপনার আহূত এই মত ও পথ অথবা আপনার প্রচারিত ধর্মবিশ্বাসটাই কিসরা ও তার কওমের লোকদের প্রধান ভয়।

তাদের অবাধ্য হওয়ার এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো সাহস ও সামর্থ্য কোনোটাই আমাদের নেই।'

তারা যখন বিদায় নিতে চাইল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

'অল্প কিছুকাল অপেক্ষা করলেই তোমরা দেখবে আল্লাহ তাআলা গোটা পারস্য, তাদের সম্পদ ও নারীদের তোমাদের হাতে তুলে দেবেন...

তখন কি তোমরা মহান আল্লাহর গুণগান ও তাসবীহ বর্ণনা করবে?'

তারা অবাক হয়ে সমস্বরে বলে উঠলেন,

'অবশ্যই আমরা তা করব। কিন্তু হে কুরাইশী ভাই, এমনটা কি সত্যিই ঘটবে?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'হাঁ, অবশ্যই এটা ঘটবে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে।'

***

মুসান্না ইবনে হারেসা আপন কওমের কাছে ফিরে এলেন। কিন্তু প্রিয় নবীর মুখখানা তার স্মৃতি থেকে কিছুতেই ম্লান হলো না। বারবার তার কথাগুলো বাজতেই থাকল কানে...

তিনি খোঁজ রাখতে থাকলেন, স্মরণ করতে থাকলেন তাঁর সেই কথাটি...

'অল্প কিছুকাল অপেক্ষা করলেই তোমরা দেখবে মহান আল্লাহ পারস্য সাম্রাজ্য, তাদের সম্পদ এবং নারীদের তোমাদের হাতে তুলে দেবেন।'

এসব ভাবতে ভাবতেই তিনি মনে মনে বললেন,

'আমি কেন মুহাম্মাদের হাতে বাইআত গ্রহণ না করে দূরে সরে থাকছি, অথচ আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, তিনি সত্য এবং তাঁর দাওয়াত সত্য।'

হিজরতের নবম বর্ষে, মহান আল্লাহর অসীম মেহেরবানিতে মুসান্না ইবনে হারেসা আশ-শাইবানী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঈমানী কাফেলায় যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

শাইবান গোত্রের বিরাট একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দিলেন এবং তাঁর হাতে আনুগত্যের বাইআত গ্রহণ করলেন।

***

কিন্তু তার ইসলাম গ্রহণ করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন মহান প্রভুর সান্নিধ্যে।

এর সঙ্গে সঙ্গে আরবের লোকেরা দলে দলে ইসলাম ত্যাগ করতে শুরু করে দিলো, ঠিক যেভাবে তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তখন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। ইসলাম আঁকড়ে ধরে থাকা সঙ্গীদের নিয়ে তাদের মোকাবেলা করলেন।

মুসান্না ইবনে হারেসা আশ-শাইবানী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার কওমের লোকেরা ছিলেন মুরতাদ-ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর। তারা ছিলেন এই দুর্যোগসৃষ্টিকারী চরম ফেতনার শেকড় উৎপাটনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনকারী।

মুসান্না ইবনে হারেসা আশ-শাইবানী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রিদ্দাহ-এর যুদ্ধ শেষে বিজয়ীর বেশে বেরিয়ে এসে দেখলেন, এখনো তার নেতৃত্বে সুশৃঙ্খল আট হাজার যোদ্ধা রয়েছে, যারা কখনোই তার আদেশ লঙ্ঘন করে না।

অপরদিকে পারস্য দেশের ওপর মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়ে রাসূলের সেই কথাটি আজও তার কানে বাজে, এ জন্যই তিনি মনে মনে ভাবলেন,

‘এই সাহসী বাহিনীকে নিয়েই পারস্যের ওপর আক্রমণ করে ইরাক অঞ্চলকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করে ফেললে কেমন হয়?

সত্যবাদী নবী, যার সত্যতা আসমান থেকে সমর্থিত, তিনি কি প্রতিশ্রুতি দেননি যে, মহান আল্লাহ তাদের সাম্রাজ্য, সম্পদ ও নারীদের ওপর আমাদের কর্তৃত্ব দান করবেন?

তরবারি আর বর্শার যুদ্ধ ছাড়া কি কখনো কোনো দেশ ও সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়?’

এসব কথা ভেবেই তিনি নিজের এই যোদ্ধা কওমকে নিয়ে ইরাক অঞ্চলে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেললেন খলীফার অনুমতি ছাড়াই, যেন এটা নিয়ে খলীফাকে কোনো জটিলতায় পড়তে না হয়।

এই অভিযানে যদি তিনি বিজয়ী হন, তাহলে সেটা হবে মুসলিম জাতির জয়। আর যদি পরাজিত হন, তাহলে সেটা হবে একার পরাজয়।

***

মুসান্না ইবনে হারেসা আশ-শাইবানী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরাক অঞ্চলের ওপর আক্রমণ করে বসলেন, এতে হেমন্ত ঋতুতে যেভাবে গাছের সব পাতা ঝড়ে পড়ে ঠিক সেভাবেই তাদের ঘোড়ার খুরের নিচে শহরের পর শহর আর গ্রামের পর গ্রামের পতন হতে থাকল।

তার এই মহাবিজয়ের সংবাদগুলো আরব উপদ্বীপের কোনায় কোনায় উল্লাস ছড়িয়ে দিলো।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাছের লোকদের নিকট জানতে চাইলেন,

‘কে এই যোদ্ধা, যার ব্যাপারে কিছুই জানি না, অথচ তার বিজয়ের সংবাদ শুনতে পাচ্ছি?’

খলীফার এই জিজ্ঞাসার জবাব হয়ে ছুটতে ছুটতে মদীনায় এসে পড়লেন খোদ মুসান্না ইবনে হারেসা। তিনি নিজে খলীফার সঙ্গে দেখা করে ইরাক অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার খবর শোনালেন।

খলীফার কাছে তিনি সেসব শহর, গ্রাম ও দুর্গের সংখ্যা বর্ণনা করলেন, যেগুলোকে পারস্যদের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন করে তিনি ইসলামী শাসনের অধীনে এনেছেন। তিনি খলীফার কাছে ওইসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দিলেন। বললেন, সেখানের প্রচুর ফল-ফসল ও পর্যাপ্ত উৎপাদনের কথা।

খলীফাকে তিনি পারস্যবাসীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও জানালেন। তাদের ভেতরের অস্থিরতা-অসন্তোষ এবং রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার কথাও বলতে বাদ রাখলেন না।

এভাবে বলতে বলতে তিনি খলীফাকে পারস্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে অভিযান চালাতে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন।

তার কথা শুনে খলীফাও এই বিশাল ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। এবং এই কাজের জন্য সৈন্য সংগ্রহ শুরু করলেন, আর মুসান্না ইবনে হারেসাকে বানিয়ে দিলেন পারস্য অভিযানের এক বিখ্যাত সেনাপতি।

***

মুসান্না ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেশ কয়েকটি রণাঙ্গনে পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। যার মধ্যে সর্ববৃহৎ লড়াই ছিল বিখ্যাত ব্যাবিলন নগরের যুদ্ধ।

এই যুদ্ধের একটি বিশেষ কাহিনি আছে। পারস্য সম্রাট শাহারজান যুদ্ধ শুরুর সামান্য পূর্বে মুসলিম সেনাপতি মুসান্না ইবনে হারেসার নামে একটি চিঠি পাঠালেন। তিনি লিখেছিলেন,

'আমি তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পাঠালাম মুরগি আর শুয়োরপালের রাখালসহ নিম্নশ্রেণির একদল মানুষকে।

এই ধরনের নীচু শ্রেণির লোক দিয়েই আমি তোমার বিরুদ্ধে লড়ব... কারণ, এরচেয়ে উঁচু শ্রেণি দিয়ে লড়াই করার যোগ্যব্যক্তি তুমি নও।'

মুসান্না ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জবাব দিলেন,

'মুসলিম সেনাপতি মুসান্না ইবনে হারেসা আশ-শাইবানীর পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট শাহারজান এর উদ্দেশ্যে,

আমরা সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি তোমাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে তোমাদেরই গলার ফাঁস বানিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য মুরগি আর শুয়োরপালের রাখালদের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছেন।

রণাঙ্গনে দু'দল মুখোমুখি হলে দেখা যাবে কে কিসের যোগ্য।'

***

উভয় দল মুখোমুখি হলো, পারস্যের হাজার হাজার সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে প্রধান সেনাপতি হুরমুয এগিয়ে এলেন... তাদের অগ্রভাগে রয়েছে এক বিশাল বপুর হাতি, যাকে তারা শুধু বড় বড় যুদ্ধের জন্যই যত্ন করে রাখে।

এই প্রশিক্ষিত ভয়ংকর প্রাণী ডানে-বামে মুসলিম সৈনিকদের শক্ত ও বিশাল শুঁড় দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে দিলো। যা দেখে তারা ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং তাদের ঘোড়াগুলোও ছটফট করতে শুরু করে দিলো। এর ফলে মুসলিম সৈনিকদের শৃঙ্খলাই ভেঙে পড়ল।

***

মুসান্না ইবনে হারেসা বুঝতে পারলেন, যতক্ষণ এই ভয়ংকর শক্তিধর হাতির তাণ্ডব চলতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিজয় অর্জন করা অসম্ভব।

সুতরাং তিনি কয়েকজন দুর্দান্ত ও চৌকস সৈনিক বাছাই করে হাতির ব্যাপারে পরিকল্পনা তৈরি করে ফেললেন। প্রথমে হাতিকে ঘিরে থাকা সৈনিকদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। তারা হাতির পাশ থেকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকের মধ্যে তিনি নিজের বর্শা দিয়ে সরাসরি হাতিকে আঘাত করলেন। চমৎকার সফল

আঘাত। আবার উপর্যুপরি বেশ কয়েকটি আঘাত। ব্যাস, বিশাল হাতিটি ধপাস করে পড়ল মাটিতে। রক্তে লাল হয়ে গেল জমিন আর ছটফট করতে থাকল হাতি...

এবার মুসলিম সৈনিকদের 'আল্লাহু আকবার' আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্লোগানের গগনবিদারী আওয়াজে কেঁপে উঠল রণাঙ্গন। এরই সঙ্গে প্রবল স্রোতের বেগে মুসলিম সৈনিকেরা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদের কচুকাটা করতে থাকলেন।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মুরগি আর শুয়োরপালের রাখালেরা পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে গেল।

তাদের সেনাপতি হুরমুয নিজেও পলায়নের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

মুসান্না ইবনে হারেসা আশ-শাইবানী এভাবেই বিখ্যাত ব্যাবিলন নগরী জয় করে নিলেন।

এভাবেই ব্যাবিলন নগরীর সমুদয় সম্পদ গনিমত হিসাবে অর্জন করলেন এবং বন্দী করলেন এর অন্তর্গত সকল নারীকে। তিনি মহান আল্লাহর পবিত্রতার তাসবীহ পড়তে পড়তে বললেন,

'সত্যই বলেছিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম...
সঠিক বলেছিলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম...

আমরা লাভ করেছি পারস্য ভূমির কর্তৃত্ব, অর্জন করেছি তাদের সকল সম্পদ আর বন্দী করেছি সকল নারী।'

তথ্যসূত্র :

১. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩য় খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা; ৭ম খণ্ড, ১৬, ২৭, ৩৬, ৪৯, ১১৫ পৃষ্ঠা
২. *দালাইলুল নবুওওয়াহ*, ২৩৮ পৃষ্ঠা।
৩. *হায়াতুস সাহাবা*, ১৪১ পৃষ্ঠা।
৪. *আত-তারীখুল কাবীর*, ৫ম খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৭৭২০।
৬. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা।
৭. *উসদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-আলাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

আবু বাসীর উতবা ইবনে আসীদ

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

হায় আফসোস! যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলনকারী আছে। হায় যদি তার কিছু সঙ্গী থাকত!

—মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে দেড় হাজার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর পবিত্র ঘরের যিয়ারত ও উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন।

এই খবর শোনামাত্রই কুরাইশের লোকজন সংকল্পবদ্ধ হলো যে, যেকোনো মূল্যই হোক তাদের মক্কায় প্রবেশ ঠেকাতে হবে।

তবে তারা মনেপ্রাণে চাইল যে, এই বাধাপ্রদান রক্তারক্তির মাধ্যমে না হয়ে যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব হয়, তাহলে যেন সেভাবেই হয়।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে কিছুটা দূরে হুদাইবিয়া অঞ্চলে পৌঁছলেন এবং সেখানে যাত্রাবিরতি করলেন...

তাঁর ও কুরাইশের মাঝে দূত আসা-যাওয়া করতে থাকল, দীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনা চলল উভয় পক্ষে...

সবশেষে এলেন সুহাইল ইবনে আমর মুশরিকদের দূত হিসাবে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এই মর্মে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করলেন,

এক. এ বছর তাকে এখান থেকেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে।

দুই. আগামী বছর উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় তারা আসতে পারবেন দুই শর্তে।

ক. অস্ত্রমুক্ত হয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে হবে এবং
খ. তিনদিনের বেশি সেখানে অবস্থান করা যাবে না।

তিন. আগামী দশ বছর কুরাইশ ও মুসলিমদের মাঝে সন্ধিচুক্তি বলবৎ থাকবে।

এই চুক্তির মেয়াদের মধ্যে কোনো পক্ষই কোনো যুদ্ধে জড়াতে পারবে না।

মুসলিমদের কাছে বিষয়টি গুরুতর অবমাননাকর মনে হলো। ন্যাক্কারজনকভাবে আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ থেকে ফিরে আসা এবং কুরাইশের সঙ্গে অপমানজনক চুক্তি সম্পাদনে তারা ভীষণ লজ্জিত ও অপমান বোধ করল।

***

সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ের ওপর সবচেয়ে নিষ্ঠুর আঘাত করল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সুহাইল ইবনে আমরের নিম্নরূপ শর্তারোপ,

এক. কুরাইশের কোনো নারী বা পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি মদীনায় চলে যায়, তাহলে মুসলিমরা তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

দুই. কিন্তু মদীনা থেকে কেউ ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে এলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

এই ধরনের স্পষ্ট একচেটিয়া কুরাইশদের পক্ষপাতমূলক চুক্তি উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ক্রোধ উসকে দিলো। ফলে তিনি ছুটতে ছুটতে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গিয়ে বললেন,

– হে আবু বকর!

– হ্যাঁ উমর, বলো কী খবর?

– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহর রাসূল নন?

– অবশ্যই তিনি আল্লাহর রাসূল।

– আমরা কি মুসলিম নই?

– অবশ্যই মুসলিম।

– ওরা কি মুশরিক নয়?

– অবশ্যই মুশরিক।

– এসব যদি সত্যি হয়, তাহলে কিসের ভিত্তিতে এবং কী উদ্দেশ্যে দীন ইসলামের এত অবমাননা আমাদের সইতে হবে?

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত ধীর, শান্ত আওয়াজে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন,

– উমর, নবীর নির্দেশ মেনে নিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে না। তিনি 'আল্লাহর রাসূল' এ কথা আমি নিশ্চিতরূপে মানি।

উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,
'আমিও সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।'

এরপর উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চলে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। তাঁর কাছে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন,

– হে নাবিয়্যাল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন?

– অবশ্যই। প্রিয় নবীর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

– আমরা কি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী মুসলিম নই?

– অবশ্যই হ্যাঁ।

– ওরা কি লা-শরীক আল্লাহর সঙ্গে শিরককারী মুশরিক নয়?

– অবশ্যই ওরা তা-ই।

– তাহলে কেন, কিসের ভিত্তিতে, কী উদ্দেশ্যে সত্য দীনের এত অবমাননা আমাদের সইতে হবে?

উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অন্তর্জ্বালা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরে তাকে শান্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُه ... وَلَنْ اُخَالِفَ اَمْرَه ... وَلَنْ يُّضَيِّعَنِيَ اللّٰهُ اَبَدًا

'আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল, সুতরাং তাঁর হুকুমের বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর এটাও সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তাআলা কিছুতেই আমাকে পরাজিত করবেন না।'

উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'সেদিনের পর আমি অনেক দান-খয়রাত করেছি, নামায-রোযা করেছি এবং গোলাম আযাদ করেছি শুধু ওই কথাগুলোর ভয়ে—যা সেদিন না বুঝে বলেছিলাম। অবশেষে আমার অন্তরে আশা জেগেছে যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন।'

***

উভয় পক্ষের মাঝে চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে গেলেন।

কিন্তু মদীনায় ফিরে এসে তিনি স্থির হতে না-হতেই এইমাত্র সম্পাদিত চুক্তির অঙ্গীকার তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক নির্দয় ও নিষ্ঠুর

পরীক্ষার রূপ নিয়ে। যার মূলে ছিলেন আমাদের এই কাহিনির মহানায়ক আবু বাসীর উতবা ইবনে আসীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তাহলে চলুন তার থেকেই শোনা যাক সেই আকর্ষণীয় কাহিনি।

***

আবু বাসীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'আমি ছিলাম অসহায় দুর্বল মুমিনদের একজন। কারণ, মক্কায় আমাকে বিপদ-আপদে রক্ষা করা, আমাকে একটু আশ্রয় দেওয়া, সাহায্য করার মতো কোনো আত্মীয়-স্বজন, জাতিগোষ্ঠী কিছুই ছিল না।

কুরাইশের লোকেরা আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল নানা রকমের শাস্তি, আমার অপরাধ ছিল এই, আমি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবীকে আমার জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলাম।

মুসলিমরা যখন মদীনায় হিজরত করতে শুরু করলেন, কুরাইশের লোকেরা আমাকে তাদের কাছে আটকে রাখল। হিজরত করার সুযোগ তো দিলোই না উল্টো হিজরতকারীদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ ও রাগ মনের মধ্যে ছিল সেগুলোর সবটুকু ঝাল মেটাল আমার ওপর দিয়ে। এমনকি জ্বলন্ত অঙ্গার বিছিয়ে তার ওপর আমাকে শোয়াত, এপাশ-ওপাশ করিয়ে আমার শরীর ঝলসে দিত।

রাসূলের বিরুদ্ধে যখনই কোনো যুদ্ধে কুরাইশের লোকজন আহত বা নিহত হতো, এর ভয়ংকর প্রতিশোধ নিত তারা তাদের হাতে বন্দী আমি এবং আমার মতো অসহায় মুসলিমদের ওপর।

এর মধ্যে আমি কুরাইশের লোকদের এক অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাসূলের কাছে পালিয়ে চলে এলাম। হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। মদীনায় পালিয়ে আসার পর জানতে পারলাম, আল্লাহর রাসূল ও কুরাইশের মাঝে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।'

***

আবু বাসীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'সুযোগ পাওয়ামাত্রই আমি মদীনার উদ্দেশে ছুটতে শুরু করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং মুসলিম ভাইদের সঙ্গে বসবাসের আনন্দ-ভাবনা যেন আমাকে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

মদীনার মাটিতে আমার পায়ের স্পর্শ পড়ল এবং আমার দু'চোখ প্রিয় নবীর দর্শনসুখের সুরমায় সুসজ্জিত হলো। একই সঙ্গে সেখানে ঘটল আরও একটি ঘটনা। কুরাইশ আমের গোত্রের এক লোক ও তাদেরই এক গোলামকে মদীনায় পাঠাল একটি চিঠি দিয়ে। চিঠিতে তারা আমাকে ফেরত পাঠাতে বলেছে চুক্তির শর্ত মোতাবেক।'

***

আবু বাসীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, একবার মুক্তি পাওয়ার পর কুরাইশের সেই বন্দীদশার চরম আযাবের মধ্যে আবার আমাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

'হে আবু বাসীর, তুমি তো জানতে পেরেছ যে, আমরা কুরাইশকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমাদের দীন ইসলামের আইনে যা ভঙ্গ করা আমাদের জন্য অবৈধ।

আল্লাহ তাআলা তোমার এবং অন্য অসহায় মুসলিমদের জন্য কোনো চমৎকার উপায় বের করে দেবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং তুমি ওদের কাছে ফিরে যাও।'

আমি নিবেদন করলাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে আবার ওই আযাবের মধ্যে ফিরিয়ে দেবেন যেখানে ওরা আমাকে মেরে মেরে হয়তো আমার দীন থেকে সরিয়ে দেবে?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

‘আবু বাসীর তুমি যাও, আল্লাহ তাআলা তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের জন্য ভালো কোনো ব্যবস্থা করে দেবেন।’

***

আবু বাসীর বলেন,

‘আমি তখন কুরাইশের পাঠানো সেই লোক দু’টির সঙ্গে রওনা হলাম। যখন আমরা মদীনা থেকে সাত মাইল দূর যুল হুলাইফাতে পৌঁছলাম, সেখানে একটু বিশ্রামের জন্য বসলাম। আমি কুরাইশীকে জিজ্ঞাসা করলাম,

‘আমেরী বন্ধু, তোমার তরবারিটা কি খুব দামি আর ধারালো?

সে জবাব দিলো,

‘আরে হ্যাঁ, সে তো বটেই।’...

সে একেবারে তার তরবারির প্রশংসা আর নানান কাহিনির ডালি সাজিয়ে নিয়ে বসল। আমিও তার তালে তালে আমার মুগ্ধতা আর বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকলাম।

সে যখন দেখল আমি তার তরবারির প্রতি এত বেশি মুগ্ধ তখন সে গর্বিত মালিক হিসাবে নিজের তরবারিটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল,

‘তোমার ইচ্ছা হলে নেড়ে দেখতে পারো।’

তরবারিটা আমার হাতে এসে গেলে দ্রুত ভাবতে শুরু করলাম, মনে মনে বললাম,

‘এক মুশরিক আমাকে নিয়ে যাচ্ছে মুশরিকসমাজের কাছে, যারা আমার ধর্ম ও বিশ্বাসে বারবার বাধা সৃষ্টি করবে, আমাকে কঠিন কঠিন শাস্তি দেবে...

আল্লাহর কসম! এটা হতে পারে না, আমি এর কথা মানব না, এর সঙ্গে যাবও না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাকে এদের হাতে তুলে দিয়ে সব রকমের দায় ও দোষমুক্ত হয়েই গেছেন। তাহলে এখন আমার আর কোনোই সমস্যা নেই যদি একে খুন করে ফেলি।'

এবার আমি খাপ থেকে তরবারিটা বের করে ফেললাম, উঁচু করে ধরে তাকে হত্যা করে ফেললাম।

তার সঙ্গী গোলাম যখন মনিবের হত্যা দৃশ্য দেখল, আমার হাত থেকে বাঁচার জন্য ছুটে পালাতে শুরু করল। আমি তার পিছু নিলাম না, কারণ ওর সঙ্গে আমার কোনো দেন-দরবার নেই।

সে চলে গেল সোজা মদীনায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে হাজির হলো যখন তিনি ছিলেন মসজিদে বসা।

তাকে ফিরতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'এই লোকটি তো ভীষণ আতঙ্কিত, খুব ভয় পেয়েছে।'

সে যখন রাসূলের সামনে হাজির হলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
'এত কিসের ভয়? কী হয়েছে তোমার?'

সে বলল,
'তোমাদের বন্ধু লোকটি আমার মনিবকে হত্যা করে ফেলেছে।'

***

আবু বাসীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,
'লোকটি স্থান ত্যাগ করার আগেই আমি গিয়ে হাজির হলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে সেই রক্তভেজা তরবারিটি হাতে নিয়ে, যা দিয়ে কুরাইশীকে হত্যা করেছি।

আমি নিবেদন করলাম,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আপনার কর্তব্য সুসম্পন্ন করেছেন আর আল্লাহ তাআলাও আপনার কাজ করিয়েছেন আমাকে দিয়ে।'

নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেটা আবার কীভাবে?'

আমি বললাম,

'আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন, মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণ করে আসা আমাকে আপনি হাতে হাতে ওদের কাছে তুলে দিয়েছেন। আপনার দায়িত্ব শেষ। এরপর আমি নিজেকে এবং আমার দীনকে ওদের হাত থেকে থেকে রক্ষা করেছি এই ভয়ে যে, ওরা আমার দীনের মধ্যে বিঘ্ন ঘটাবে এবং আমাকে নিয়ে গিয়ে তামাশা বানাবে।'

রাসূল আমার কথা শুনে আশপাশে তাকিয়ে বললেন,

'হায় আফসোস, এমন যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলনকারী আছে...
যদি তার সঙ্গে কিছু মানুষ থাকত!'

তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার কথাটি আমার মনে খুব দাগ কাটল এবং আমি নিজেও খুব চাইতে থাকলাম যে কিছু মানুষ আমার সঙ্গে জুটে যাক।'

***

আবু বাসীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বক্তব্য অব্যাহত রেখে বলেন,

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে আমাকে তাঁর কাছে রেখে দেওয়া সম্ভব ছিল না চুক্তির শর্তের আলোকে।

একইভাবে একজন কুরাইশীকে হত্যার পর আমার পক্ষেও আর তাদের কাছে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

সুতরাং আমি চলতে থাকলাম। চলতে চলতে সাগরের তীরে 'ঈস' নামক স্থানে থেমে গেলাম। কুরাইশের লোকজন শামের বাণিজ্যে যাওয়া-আসার জন্য যে পথ ব্যবহার করে থাকে, এই 'ঈস' ঘাঁটি ছিল সেই পথেই অবস্থিত।

সেখানেই আমি অবস্থান গড়ে তুললাম।

এরপর মক্কায় আটকে থাকা অসহায় মুসলিমরা যখন আমার সম্পর্কে বলা রাসূলের এই কথাটি শুনতে পেল,

'হায় আফসোস, যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলনকারী আছে কিন্তু হায়...
যদি তার সঙ্গে কিছু মানুষ থাকত...'

ব্যাস, তারা একের পর এক এসে আমার ঘাঁটিতে যুক্ত হতে লাগল।
এমনকি একসময় এদের সংখ্যা হয়ে গেল প্রায় সত্তরজন।
আমরা কুরাইশের বাণিজ্য-কাফেলার পথ রোধ করতে শুরু করলাম।
কুরাইশের যাকেই আমরা পেতাম তাকেই হত্যা করে ফেলতাম।

আমাদের পাশ দিয়ে কুরাইশের কোনো কাফেলা গেলেই আমরা ধরে ফেলতাম।

এভাবে অল্পদিনেই আমাদের শক্তি, সামর্থ্য, মনোবল ও জনবল সবকিছুই বেড়ে গেল। আমরা হয়ে উঠলাম কুরাইশদের গলার কাঁটা। দুঃস্বপ্নের মতো আমাদের চিন্তায় তাদের আরামের ঘুম হারাম হয়ে গেল। কাফেলার মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের নিয়ে তাদের জীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ। আমাদের নিয়ে কোনো উপায়ই খুঁজে বের করতে পারল না।

নিরুপায় হয়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চিঠি লিখে রক্ত-সম্পর্কের দোহাই দিয়ে আবেদন জানাল, যেন তিনি আমাদের তাঁর কাছে ডেকে নেন, সঙ্গে সঙ্গে এটাও তারা ঘোষণা করে দিলো যে, চুক্তির এই সম্পর্কিত শর্তটি তারা প্রত্যাহার করে নিল।'

***

আবু বাসীরের এক সঙ্গী আবু জানদাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন,

'আমরা একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি পেলাম সেখানে তিনি আমাদের তাঁর কাছে ডেকে পাঠিয়েছেন। সে সময় আমাদের ভাই আবু বাসীর ছিলেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত।

আমি রাসূলের চিঠিখানা তার হাতে দিলাম, তিনি সেটা নিয়ে ভক্তি ভরে ঠোঁটের কাছে নিয়ে চুমু খেলেন এবং বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো... এই কথা বলতে বলতেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

সেখানেই আমরা তাকে দাফন করার পর সবাই চলে গেলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে...'

***

আল্লাহ তাআলা আপন সন্তুষ্টি দান করুন যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলনকারী আবু বাসীর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি...

তিনি জীবনযাপন করেছেন আল্লাহর রাস্তায় নির্যাতিত হয়ে...

মৃত্যুবরণ করেছেন দেশছাড়া ও নির্যাতিত হয়ে।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৫৩৯৭।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৪র্থ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ৫৫৯ পৃষ্ঠা।
৪. *সীরাতু ইবনি হিশাম*, ২য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা।
৫. *উয়ূনুল আসার*, ২য় খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।
৬. *আততাবারী*, ২য় খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা।
৭. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-কামিল লিবনি আসীর*, ২য় খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।
৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪র্থ খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা।
১০. *আল-মাগাযী*, ৩০৮ পৃষ্ঠা।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ছিলেন এমন যুবক যার মন পড়ে থাকত মসজিদে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর; কে এই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা?

তার পিতা, তিনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু।

তার মা, সম্ভ্রান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ এক আরব নারী যায়নাব বিনতে মাযউন।

আর তার বোন, হাফসা বিনতে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, উম্মাহাতুল মুমিনীনের অন্যতমা।

***

আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের জন্ম হয়েছে মক্কা মুকাররমায়। শৈশব থেকেই ইসলামের আলো পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার আলোকেই তার লালন-পালন হয়েছে। ইসলামের ছায়ায় ঘটেছে তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ও বর্ধন।

জাহেলিয়াতের কোনো অনৈতিকতায় তিনি কলুষিত হননি এবং মূর্তিপূজার কলঙ্ক তাকে স্পর্শই করেনি। পিতার সঙ্গে হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন সাবালক হওয়ারও পূর্বে।

বদর যুদ্ধের দিন তার বয়স ছিল বারো বছর কয়েক মাস। তিনি সেদিন সমবয়সী কতক বালক বন্ধুকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলেন যুদ্ধের অনুমতি পাওয়ার আশায়। রাসূল তাদের কতককে অনুমতি দিলেন আর কতককে বয়স অল্প বলে ফিরিয়ে দিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর পড়লেন সেই বালকদলে, নবীজি যাদের যুদ্ধের অনুমতি না দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন।

নিষ্পাপ ও নেককার এই বালকদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। কারণ, তারা বঞ্চিত হয়েছে তাদের হৃদয়ের লালিত স্বপ্ন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদের অসীম মর্যাদা থেকে।

***

ওহুদ যুদ্ধের দিন, সেদিন আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের বয়স হয়েছিল তেরো বছর কয়েক মাস। তিনি আবার সমবয়সী কয়েকজন বালক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলের কাছে এলেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি নিতে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে গভীর মনোযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। একজন একজন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কয়েকজনকে বাছাই করে অন্যদের ফিরিয়ে দিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবারও পড়লেন ফেরত পাঠানো দলে।

এই দলের বালকেরা এবারও কাঁদতে কাঁদতেই ফিরে এল। কারণ, বয়সের স্বল্পতা আবারও তাদের জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর স্বপ্ন পূরণের পথে অন্তরায় হয়ে গেল।

খন্দকের যুদ্ধের দিন, সেদিন আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের বয়স হয়েছিল পনেরো বছর। সেদিন তিনি একদল সমবয়সী বন্ধুকে নিয়ে তরবারিগুলো মাটির ওপর দিয়ে টেনে টেনে আবার পায়ের আঙুলের ওপর উঁচু হয়ে নিজেদের বড় প্রামাণের চেষ্টা করতে করতে এলেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিহাদের অনুমতি চাইলেন। এবার সহজেই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন তাদের সকলকে।

এবার তাদের আনন্দ আর দেখে কে? তাদের চোখেমুখে, দেহে ও মনে আনন্দের যেন বন্যা বয়ে গেল।

এরপর মুসলিম বাহিনী যত যুদ্ধ করেছে, সবগুলোতেই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার ছিল সরব উপস্থিতি।

মক্কা বিজয়ের বছর তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। এই সময় তার বয়স হয়েছিল কুড়ি বছর। ওই দিন যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি পড়েছে তার ওপর তখনই তিনি তার অনেক প্রশংসা করে বলেছেন,

'আব্দুল্লাহ নিশ্চয় এ রকম' এবং 'নিশ্চয় আব্দুল্লাহ ওই রকম...'

***

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ছিলেন 'আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে পূর্ণাঙ্গরূপে তাঁর ইবাদত-আনুগত্যের মধ্যে যৌবনকাল কাটানো' যুবসমাজের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এমনকি তার সম্পর্কে জানাশোনা লোকজন মন্তব্য করতেন,

'সর্বাধিক আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাসম্পন্ন কুরাইশী যুবক হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর।'

বিস্ময়কর নয়, কারণ তিনি ছিলেন এমন এক যুবক, সারাক্ষণ যার মন পড়ে থাকত মসজিদে। বিশ্রাম নিতে চাইলে মসজিদই হতো তার আরামের স্থান। ইবাদত করতে চাইলেও মসজিদই হতো ইবাদতখানা।

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন,

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম কেউ কোনো স্বপ্ন দেখলে রাসূলের কাছে তার বিবরণ দিতেন। সে সময় আমি অবিবাহিত যুবক। আমি ঘুমাতাম মসজিদে নববীতে।

এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দুইজন ফেরেশতা এসে আমাকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন জাহান্নামের কাছে। আমি দেখলাম আগুনের দুইটি শিখা। এরপর হঠাৎ আমি জাহান্নামের মধ্যে দেখতে পেলাম আমার পরিচিত কিছু মানুষজন। তাদের দেখেই আমি বলতে শুরু করলাম,

'আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।' 'আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই।'

এরপর অন্য এক ফেরেশতা এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন,

'আপনার কোনো সমস্যা নেই। আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

আমার বোন উম্মুল মুমিনীন হাফসার কাছে আমি এই স্বপ্নের কথা জানিয়েছিলাম। আর তিনি সেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান। তিনি তখন মন্তব্য করেন,

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ' لَوْ كَانَ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ ...

'আব্দুল্লাহ কতই-না চমৎকার মানুষ! সে যদি রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ত!'

নবীজির এই মন্তব্য শোনার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, এখন থেকে অল্প সময় ছাড়া রাতে আর ঘুমাবই না।

গভীর রাতে মানুষ যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিত, তিনি তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হয়ে নামায আদায় করতে থাকতেন।

এরপর বিছানায় যেতেন। পাখির মতো সামান্য সময় ঘুমাতেন। এরপর উঠে অযু করে আবার নামাযে দাঁড়াতেন।

এরপর আবার একটু খানি পাখির মতো সামান্য ঘুমাতেন। প্রতিরাতে এভাবে তিনি চার-পাঁচবার করে উঠতেন, নামায পড়তেন, আবার ঘুমাতেন, আবার... আবার...।

***

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার নেককার ও সৎকর্মশীল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেন বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।

উমরী তরুণ তাঁদের সেই সাক্ষ্যকে সত্যে পরিণত করেন এবং নিজের কর্ম দ্বারা তার বাস্তব রূপায়ন ঘটান।

সাহাবী হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

'আমরা প্রত্যেকেই দুনিয়ার ধন-দৌলত ও এর মোহে জড়িয়েছি, দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মেতেছি। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উমর কখনোই এগুলো স্পর্শ করেনি।'

***

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল এবং খেলাফতের দায়িত্ব এসে পড়ল উসমান যিননূরাইনের ওপর। তিনি চাইলেন, বিচার কাজের দায়িত্ব অর্পণ করবেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার ওপর। সে জন্যই তিনি তাকে বললেন,

'হে আব্দুল্লাহ, তুমি বিচার কাজ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করো। কারণ, আল্লাহর দীনের রীতিনীতি সম্পর্কে তুমিই সর্বাধিক বিজ্ঞ মুসলিম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহর আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী।'

তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন,

'আমি কিছুতেই বিচার কাজের এবং ইমামতের দায়িত্ব নিতে চাই না।'

তিনি বললেন,

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকালেই তোমার পিতা বিচার কাজ করেছেন, তোমার কী বাধা? কেন তুমি এই দায়িত্ব নিতে চাও না?'

তিনি বললেন,

'হ্যাঁ, এটা সত্য যে, আমার পিতা বিচার-মীমাংসা করতেন। তার সামনে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হলে তিনি রাসূলকে জিজ্ঞাসা করতেন আর রাসূলের সামনে জটিলতা সৃষ্টি হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন জিবরীলকে। এভাবে যেকোনো জটিলতারই সমাধান হয়ে যেত। কোনো সমস্যাই অমীমাংসিত থাকত না। কিন্তু আমার সামনে জিজ্ঞাসা করার মতো কে আছে? আমি জটিলতার সমাধান কোথায় পাব?'

এরপর খলীফাকে বললেন,

আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন এই কথাটি,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় চায়, সে আশ্রয়ের প্রকৃত স্থান থেকেই চায়।'

তিনি বললেন,

'হ্যাঁ, শুনেছি কথাটি।'

তখন তিনি বললেন,

اِنِّیْ اَعُوْذُ بِاللهِ اَنْ تَسْتَعْمِلَنِیْ عَلَی الْقَضَاءِ

'আমাকে বিচার কাজের দায়িত্ব দেবেন, আমি তা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই।'

এ কথা শুনে উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে নিষ্কৃতি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন,

'খবরদার, এসব কথা কাউকে বলবে না। কারণ, মুসলিম জাতির খুব প্রয়োজন এমন বিচারকের যিনি ইনসাফের সঙ্গে তাদের বিচার-মীমাংসা করবেন।'

***

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা শুধু কেবল আবেদ ও যাহেদই ছিলেন না, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন সৈনিক ও মুজাহিদ। মুসলিম সৈনিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সিরিয়া, ইরাক, বসরা ও পারস্যের যুদ্ধ করেছেন এবং আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে মিসর বিজয়-অভিযানেও শরীক হয়েছেন। বিজয়ের পর কিছুকাল মিসরে অবস্থানের সুবাদে তার থেকে মিসরী হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা চল্লিশের অধিক।

***

যখন আলী ইবনে আবু তালিব এবং মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার মাঝে খেলাফতকে কেন্দ্র করে ফেতনা ও অনৈক্য ছড়িয়ে পড়ল, তখন একদল মানুষ তাঁদের দু'জনের বাইরে ভিন্ন কাউকে খুঁজছিলেন খেলাফতের জন্য। সেই সময় কয়েকজন আহলে শূরা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার কাছে গিয়ে বললেন,

'আপনি হাত বাড়ান আমরা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করব, কারণ, আপনি আরবের সরদার এবং সরদারের পুত্র, আপনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং এক শ্রেষ্ঠ মানুষের সন্তান।'

তিনি বললেন,

'আমি শ্রেষ্ঠ মানুষও নই আবার শ্রেষ্ঠ মানুষের সন্তানও নই। আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী একজন সাধারণ মুমিন বান্দা, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং তাঁর কাছেই আশা করি।

আল্লাহর কসম! তোমরা মানুষের অতিপ্রশংসা করতে করতে তার সর্বনাশ করে তবেই ক্ষান্ত হও। তোমরা যদি আমার হাতে বাইআত নাও, তাহলে সিরিয়ার লোকদের সঙ্গে আমি কী করব?'

তারা বললেন,

'তারা স্বেচ্ছায় আপনার হাতে বাইআত নিলে তো ভালো, নইলে আপনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন যতক্ষণ তারা আপনার খেলাফত মেনে না নেবে।'

তিনি বললেন,

'আল্লাহর কসম! আমি চাই না যে একাধারে সত্তর বছর ধরে খেলাফতের দায়িত্ব আমার হাতে থাক আর আমার জন্য কোনো একজন মুসলিমের প্রাণ চলে যাক।'

***

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হৃদয় সারা জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম ও ভালোবাসায় আটকে ছিল। তাঁর আদর্শের পথ ধরে চলতেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করতেন। তাঁর মুখনিঃসৃত সকল কথা মুখস্থ করতেন এবং তাঁর জীবন-আদর্শকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতেন।

একবার তার সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা হতেই তিনি তাঁর বিচ্ছেদ-ব্যথায় ভীষণভাবে কাঁদতে থাকেন।

এতসব বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তার সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান গুণ ছিল তীব্র আল্লাহভীতি। কখনো কখনো কুরআনের তিলাওয়াতে তার দু'চোখ থেকে শ্রাবণের ধারায় অশ্রু ঝরতে থাকত।

যখনই তিনি তিলাওয়াত করতেন এই আয়াতটি,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

'মুমিনদের অন্তরগুলো কি আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?' –সূরা আল-হাদীদ : (৫৭) ১৬

কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়তেন।

একবার উবাইদুল্লাহ ইবনে উমাইরা তার সামনে কুরআনের নিচের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন,

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

'আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা-বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের ওপর অবস্থা-বর্ণনাকারী রূপে। সেদিন কামনা করবে সেসব লোক, যারা কাফের হয়েছিল এবং রাসূলের নাফরমানি করেছিল, যেন জমিনের সাথে মিশে যায়। কিন্তু গোপন করতে পারবে না আল্লাহর নিকট কোনো বিষয়।' –সূরা আন-নিসা : (০৪) ৪১-৪২

সেটা শুনে তিনি শুরু করলেন প্রচণ্ড কান্না। যেন অশ্রুর বন্যা বইতে থাকল, যাতে তার পোশাক ভিজে চুপসে গেল। কান্নার তীব্রতায় আশঙ্কা হলো যে, তার হৃদ্‌যন্ত্রের শিরা ছিঁড়ে যায় কি না। মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি তিলাওয়াতকারী ক্বারীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, দয়া করে সংক্ষেপ করুন এবং তার ওপর রহম করুন।

***

চেনাজানা অনেক তালিবুল ইলম তার অমূল্য বাণী ও দামি নসিহতের আশায় তার কাছে চিঠি লিখতেন। তাদের জবাবে তিনি এমন কিছু কথা লিখে পাঠাতেন, যা যুগ যুগ ধরে অমর হয়ে থাকার মতো।

জনৈক শিক্ষার্থী আবেদন জানাল, হে আব্দুর রহমানের পিতা, আমাকে দীনের সারাংশ লিখে পাঠান।

এর জবাবে তিনি লিখে পাঠালেন,

'ইলমে দীনের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। কিন্তু অল্প কয়েকটি বিষয় আঁকড়ে ধরতে পারলেই গোটা দীন তোমার আমলের মধ্যে থাকবে।

তুমি যদি মুসলিম জাতির অন্যায় রক্তপাত ঘটানো থেকে নিজেকে মুক্ত করে, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে নিজেকে হেফাজত করে, তাদের ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা থেকে জবানকে বিরত রেখে এবং মুসলিমদের জামাতকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর কাছে গিয়ে মিলিত হতে পারো, তবে এটাই করা উচিত।'

***

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা প্রধানতম জীবনাদর্শ বানিয়েছিলেন এতিম, মিসকিন, অসহায় গরিবদের প্রতি সদাচরণ ও তাদের খাদ্য-দ্রব্য দান। এ বিষয়ে প্রচুর বর্ণনা ও ঘটনা বর্ণিত আছে।

একটি ঘটনা, একবার তার মাছ খেতে ইচ্ছা হলো। তার স্ত্রী সফিয়া অনেক খোঁজখবর করে একটি মাছের ব্যবস্থা করলেন। খুবই চমৎকারভাবে রান্না করে তার সামনে পেশ করলেন।

তিনি খেতে বসলেন এমন সময় দরজায় একজন মিসকিনের আওয়াজ পেয়ে বললেন,

'এই মাছটা ওই মিসকিনকে দিয়ে দাও।'

তার স্ত্রী সফিয়া বললেন,
'আল্লাহর ওয়াস্তে অল্প একটু তো খেয়ে দেখুন।'

তিনি বললেন,
'মাছটা ওকে দিয়ে দাও।'

স্ত্রী বললেন,
'আমি এটার বদলে অন্য কিছু দিয়ে ওকে খুশি করে দিচ্ছি।'

ভিক্ষুককে গিয়ে বললেন,
'দেখুন উনি শখ করেছেন মাছটি খেতে।'

ভিক্ষুক,
'আমারও খুবই শখ হচ্ছে খেতে।'

স্ত্রী বললেন,
'তুমি খুশি মনে মাছের শখ ছেড়ে দিলে আমি একটি স্বর্ণমুদ্রা দেব। বলো তুমি মাছ নেবে, না স্বর্ণমুদ্রা?'

ভিক্ষুক স্বর্ণমুদ্রাকেই বেশি পছন্দ করল।

তিনি স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন,
'আমি ভিক্ষুককে তার কল্পনার চেয়ে বেশি, অনেক বেশি দিয়ে রাজি করিয়েছি।'

তিনি ভিক্ষুককে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন,
'তুমি কি ওদের কথায় রাজি হয়ে পূর্ণ সন্তুষ্টির সঙ্গে এর মূল্য গ্রহণ করেছ?'

ভিক্ষুক বলল,
'জি হুযুর।'

এবার তিনি স্ত্রীকে বললেন,
'সব ঝামেলা মিটমাট হয়ে যাক, এবার মাছটাও ওকে দিয়ে দাও। আমি খাব না।'

***

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার হালকা ও শীর্ণ দেহের কারণে কেউ কেউ তার স্ত্রীর সমালোচনা করে বলে,

‘তুমি কি এই হুযুরের প্রতি একটু দয়া করে তার খাওয়ার প্রতি বিশেষ খেয়াল করতে পারবে না?’

তিনি বলেন,

‘আচ্ছা, আমি কীভাবে এই শীর্ণদেহীর খাওয়ার প্রতি খেয়াল করব?

যখনই আমি তার খাবার তৈরি করি, তিনি নিজে না খেয়ে গরিব-মিসকিনদের ডেকে এনে সব খাবার দিয়ে দেন। এই কারণে আমি এখন রান্না করার পর প্রথমে ওইসব মিসকিনকে ডেকে এনে খেতে দিই—যারা তার মসজিদ থেকে ফেরার পথে বসে। ওদের খাওয়ানোর পর আমি বলি, ওরা যেন ওনার ফেরার পথে না বসে।

কিন্তু এর ফল কী হয়েছে?

তিনি মসজিদ থেকে ফিরে এসে বলেন, অমুক অমুক এর কাছে খাবার পাঠাও।

আমি তাকে বলি, আপনার চাহিদার আলোকে ওদের সবার কাছে আগেই খাবার পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি যতটা চান তার চেয়ে বেশি বেশি করেই পাঠিয়েছি। আপনি খেতে বসুন।

তিনি নিজে ওদের খাওয়াতে না পারার কারণে রাগ করে বলেন,

‘তার মানে তোমরা পরিকল্পনা করেছ, যেন রাতের খাওয়ার আমি না খাই, এ কথা বলে কোনো কিছু না খেয়েই তিনি উঠে পড়েন।’

***

এতসব কিছু সত্ত্বেও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের এবং নেকি অর্জনের সকল পন্থাই গ্রহণ করতেন। যেকোনো মাল বা সামান তার ভালো লাগলেই সেটা তিনি দান করে দিতেন আল্লাহর জন্য।

তার ক্রীতদাসদের অনেকেই তার এই নেক স্বভাবের বিষয়টি বুঝতে পেরে এর সুযোগ গ্রহণ করতে ভুলত না। যখনই কোনো ক্রীতদাস মুক্ত

হতে চাইত, ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি সর্বশক্তি নিয়োগ করত। নিয়মিত মসজিদে যাওয়া-আসা করত। তার এই অবস্থা দেখলেই তিনি খুবই পছন্দ করতেন এবং ওই দাসকে মুক্ত করে দিতেন। এতে সঙ্গীসাথিরা তাকে বলতেন,

'হে আব্দুর রহমানের পিতা, ওরা তো এই ইবাদত দেখিয়ে আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে।'

এর জবাবে তিনি বলতেন,

'কেউ আল্লাহর ইবাদত করে যদি আমাদের ধোঁকা দিতে চায়, আমরা আল্লাহর জন্য তার ধোঁকা খেতে রাজি।'

***

অনেক সময় তিনি দাসদের শুধু মুক্ত করেই ছেড়ে দিতেন না, প্রচুর অর্থ বা সম্পদ দিয়ে ওদের অভাবমুক্ত সুখী জীবনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দিতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার বর্ণিত একটি ঘটনা। তিনি বলেন,

'আমি একবার উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সঙ্গে মক্কায় গেলাম। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আমরা এক জায়গায় থাকলাম। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আমাদের কাছে নেমে এল এক মেষচালক রাখাল। ইবনে উমর একটুখানি তার আমানতদারি পরীক্ষা করতে চাইলেন। রাখাল বালকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন,

- তুমি কি ক্রীতদাস?

- হ্যাঁ।

- আমার কাছে একটি বকরি বেচে দাও। মালিক জানতে চাইলে বলে দিয়ো, নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে।

- তাহলে আল্লাহ কোথায় থাকল? ঈমান কোথায় গেল?

এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বললেন,

সত্যিই তো বলেছ! আল্লাহ কোথায় থাকল? ঈমান কোথায় গেল?

এরপর ওই বালককে মালিকের কাছ থেকে কিনে নিলেন মেষপালসহ। তারপর মেষপাল তাকে দিয়ে মুক্ত করে দিলেন।'

***

পরিশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ছিলেন একজন অকৃপণ দানবীর। অর্থ-সম্পদ কখনোই হাতে রেখে দিতেন না।

একবার ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি পরিমাণ অর্থ তিনি হাতে পেলেন। সেই মজলিস থেকে ওঠার পূর্বেই তিনি সমুদয় অর্থ দান করে দিলেন উপরন্তু কিছুটা ঋণ করেও দান করলেন।

হাতে পাওয়া নগদ অর্থ দান করা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কয়েকজন অভাবী মানুষ এলে উপস্থিত একজন থেকে ধার নিয়ে তিনি ওদের বিদায় করলেন।

***

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা প্রায় আশি বছরের দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এল তখন তিনি কয়েকজন সঙ্গীকে বললেন,

কখনোই দুনিয়ার কিছু হারানোর বেদনা আমার মধ্যে জাগেনি, তিনটি বিষয় ছাড়া,

এক. তীব্র গরমে রোযা রেখে তৃষ্ণার্ত হওয়া...
দুই. গভীর রাতে আল্লাহর জন্য ইবাদতে মগ্ন হওয়া...
তিন. 'আহলে ফেতনা' অনৈক্যপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

***

মহান সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাবকে আল্লাহ সন্তুষ্টি দান করুন।

জীবনকালে তিনি ছিলেন একজন আল্লাহভীরু, নেককার...

মৃত্যুকালেও তিনি ছিলেন একজন আবেদ ও নির্মোহ যাহেদ...

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৪৮৩৪।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা।
৩. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৯ম খণ্ড, ৪ পৃষ্ঠা।
৫. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা।
৬. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা।
৭. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা।
৮. *ইবনু খয়্যাত*, ২২তম খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।
৯. *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।
১০. *শাযারাতুয যাহাব*, ১ম খণ্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।
১১. *তাবাকাতুশ শারানী*, ৩২ পৃষ্ঠা।
১২. *তারীখুল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা।
১৩. *আল-আলাম*, ৪র্থ খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা।

তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদীকে গণ্য করা হতো এক হাজার যোদ্ধার মতো।

-ঐতিহাসিকদের অভিমত

নবম হিজরীতে আসাদ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল এল মদীনা মুনাওয়ারাতে, এদের নেতৃত্বে ছিলেন তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদী।

এই দল যখন মসজিদে নববীতে পৌঁছল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়াল, তখন তাদের মুখপাত্র বললেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তাঁর বান্দা এবং রাসূল এবং তিনিই আপনাকে পাঠিয়েছেন হক ও হেদায়েতের দীন দিয়ে।

আমরা স্বেচ্ছায় আপনার কাছে ছুটে এসেছি, আপনি কাউকেই আমাদের কাছে পাঠাননি।

সুতরাং আপনি আমাদের এই ইসলাম গ্রহণ স্বীকার করে নিন।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং অত্যন্ত সম্মানজনক মেহমানদারি ও আপ্যায়ন করলেন।

কিন্তু তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদের হৃদয় কিছুক্ষণের মধ্যে রাসূলের বিরুদ্ধে চলে গেল। তার অন্তরে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তাঁর বিরুদ্ধে।

তিনি রাসূলের বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকলেন। ছোট্ট অবস্থা থেকে কীভাবে শুরু হয়েছিল। একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে বড় হতে হতে জাযীরাতুল আরব আজ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর সামনে নত হয়েছে এবং তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।

এরপর তুলাইহার ভেতরের শয়তান ধীরে ধীরে তাকে উসকানি দিতে থাকে আর বড় বড় আশার মুলা ঝুলাতে থাকে।

শয়তান তাকে বলতে থাকে...
'কোন বিবেচনায় মুহাম্মাদ তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? সে তোমার চেয়ে বড় সাহিত্যিক, বাগ্মী, কবি ও জ্ঞানী নয়...

হৃদয়ের বিচারেও সে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, বীরত্বের বিবেচনায় তুমি শ্রেষ্ঠ আরব, তুমি আরবের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, এমনকি যুদ্ধের ময়দানে মানুষ তোমাকে গণ্য করে এক হাজার যোদ্ধার সমান।

তার জনসমর্থনও তোমার চেয়ে বেশি নয়। তুমি আসাদ গোত্রের মানুষ। যারা বীর ও যুদ্ধবাজ। যুদ্ধের ময়দানে রয়েছে যাদের প্রচুর বীরত্বের খ্যাতি। রয়েছে অনেক সোনালি ইতিহাস।'

প্রতিনিধিদল যখন নিজেদের ঠিকানায় ফিরে এল, তুলাইহা নিজ গোত্র আসাদের সামনে এই দাবি তুলে ধরলেন যে,

তিনি আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী।

তারা সকলেই তার দলভুক্ত ও অনুসারী হয়ে গেল—হয় তার প্রতি বিশ্বাসের কারণে অথবা সে নিজেদের গোত্রের মানুষ হিসাবে গোত্র-প্রীতির কারণে।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুলাইহা ও তার কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একদল সৈনিক পাঠালেন 'যিরার ইবনে আযওয়ার' এর নেতৃত্বে।

মুমিন সেনাদল আসাদ গোত্রের সীমানায় ঢুকে তাদের ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করলেন।

তুলাইহার শক্তি ও তার দলবল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, যদি যিরার সরাসরি তার মুখোমুখি না হতেন এবং তরবারি দিয়ে সরাসরি তাকে আঘাত না করতেন।

কিন্তু যে ঘটনা ঘটা উচিত ছিল না; যিরার ইবনে আযওয়ার সরাসরি তুলাইহার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তরবারির আঘাত করেছেন। যে আঘাত ফিরে এসেছে এবং তার কোনো ক্ষতিই সাধন করতে পারেনি।

এই সুযোগে তুলাইহা অনুসারীদের মাঝে প্রচার করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ নিজেই তার আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়ে তাকে অক্ষত রেখেছেন। আর তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারিও তার শরীরের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

এতে যারা তাকে ছেড়ে গিয়েছিল, তারাও আবার ভক্ত হয়ে গেল এবং বহু মানুষ নতুন করে তার অনুসারীদের দলে যোগ দিলো।

তুলাইহার শক্তি অনেক বাড়িয়ে দিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল এবং দলে দলে আরবদের ইরতিদাদ বা ইসলাম ত্যাগ করে বের হয়ে যাওয়া; ঠিক আল্লাহর দীনে দলে দলে প্রবেশের মতো।

***

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম জাহানের খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এগারোজন সেনাপতির হাতে এগারোটি পতাকা তুলে দিয়ে সবাইকে পাঠিয়ে দেন মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য।

তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ ও তার কওম বনূ আসাদের বিরুদ্ধে অভিযানের দায়িত্ব পড়ল খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের হাতে।

ফলে নজ্‌দ অঞ্চলে আসাদ গোত্রের আবাসস্থলের উদ্দেশে রওনা করলেন আল্লাহর তরবারি নামে খ্যাত বিখ্যাত বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

তিনি অগ্রবাহিনী হিসাবে পাঠালেন মুসলিম বাহিনীর বিখ্যাত দুই কমান্ডো সেনা উকাশা ইবনে মিহসান এবং সাবেত ইবনে সালামাকে তাদের ভেতরের খবর সংগ্রহ করে মুসলিম বাহিনীর কাছে সরবরাহ করার জন্য।

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তুলাইহা তাদের আটক করে নির্দয়ভাবে হত্যা করে ফেলে।

মুসলিম বাহিনী তাদের নিহত হওয়ার খবর পেয়ে ভীষণ দুঃখিত ও যারপরনাই মর্মাহত হলো। তারা দৃঢ় শপথ গ্রহণ করল যেকোনো মূল্যেই হোক তাদের বদলা নেবে।

***

উভয় দল মুখোমুখি হলো নজ্‌দের মাটিতে 'বুযাখা' জলাশয়ের পাশে...

উভয় দলই পরস্পরের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চালাল, শুরুতে উভয় দলের পাল্লাই ছিল সমানে সমান।

ফাযারা গোত্রের সরদার উয়াইনা ইবনে হিস্‌ন নিজ কওমকে সঙ্গে নিয়ে এসে ছিলেন তুলাইহার সাহায্যের জন্যে এবং মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে।

রণাঙ্গনে যখন মুসলিম বাহিনীর পাল্লা তাদের বিরুদ্ধে ভারী হতে শুরু করল তখন উয়াইনা তাকালেন তুলাইহার দিকে, দেখলেন তিনি বিশাল তাঁবুর মধ্যে ঢুকে সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে ঝিম ধরে বসে রয়েছেন।

অনুসারীদের বোঝালেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ওপর ওহী নাজিল হবে এবং ফেরেশতা-বাহিনী দিয়ে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন।

তুলাইহার অনুসারী বাহিনীর ওপর মুসলিম সৈনিকদের আক্রমণের তীব্রতা যখন বাড়তে থাকল, ফাযারা গোত্রের সরদার তুলাইহার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে তুলাইহা, তোমার কাছে কী ফেরেশতার আগমন হলো নাকি আরও দেরি হবে?'

তিনি বললেন,
'এখনো আসেনি। মনে হচ্ছে আরও দেরি হবে হে উয়াইনা।'

তিনি ফিরে গিয়ে আবার যুদ্ধ শুরু করলেন। তার ও তার কওমের ওপর আক্রমণের মাত্রা আগের চেয়েও বেড়ে গেলে তিনি আবার তুলাইহার কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আরে বাবা জিবরীল কি এল?'

তিনি বললেন,
'না।'

উয়াইনা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,
'তাহলে আর কখন আসবে শুনি?!
আমাদের পিঠ তো দেয়ালে ঠেকে গেছে...'
এরপর তিনি ফিরে এসে আবার তীব্র লড়াই করতে থাকলেন...।

তিনি আবার তুলইহার কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,
'কি, জিবরীল এল?'

তিনি জবাব দিলেন,
'হ্যাঁ।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
'কী ওহী নিয়ে এলেন তিনি?'

তিনি বললেন,

'জিবরীল আমার কাছে ওহীর বাণী নিয়ে এসে বললেন,

إِنَّ لَكَ يَوْمًا سَتَلْقَاهُ، لَيْسَ لَكَ أَوَّلُهُ، وَلٰكِنْ لَكَ أُخْرَاهُ .... ثُمَّ إِنَّ لَكَ بَعْدَ ذٰلِكَ حَدِيْثًا لَا تَنْسَاهُ.

'খুব শিগগির তুমি দেখা পাবে এমন একটি দিনের, যার প্রথমাংশ তোমার পক্ষে থাকবে না, তবে তার শেষাংশ হবে তোমারই জন্য, তবে এরপরে হবে এমন আলোচনা যা তুমি ভুলতেই পারবে না।'

এতে উয়াইনা ভীষণ বিরক্ত হয়ে তাকে বললেন,

'সর্বনাশা! সত্যিই তোর হবে এমন আলোচনা (পরাজয় আর দুর্গতি), যা তুই জীবনেও ভুলতে পারবি না।'

এরপর নিজের কওমের লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'হে ফাযারা গোত্রের লোকেরা, এটা একটা মহাভণ্ড ও প্রতারক।'

এ কথা বলেই তিনি নিজ দলীয় যোদ্ধাদের নিয়ে তুলাইহার পক্ষ ত্যাগ করে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। এতে মুসলিম সৈনিকরা আসাদ গোত্রকে চরমভাবে পরাজিত করল।

তুলাইহা সেখান থেকে পালিয়ে জীবন বাঁচালেন এবং শাম দেশে গাস্‌সানদের মাঝে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

***

তুলাইহার গাস্‌সানদের সঙ্গে বসবাস শুরু করার পরপরই তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর ব্যাপারে ভীষণ লজ্জিত হয়ে তিনি নিজেকে বলেন,

'কত বড় পোড়াকপাল তোর হে তুলাইহা!

কত বড় ভয়ংকর ব্যাপার হতো যদি যিরার ইবনে আযওয়ারের তরবারি তোর মাথার খুপড়ি উড়িয়ে দিত?

তখন তুই হতি একজন মুরতাদ ও মুশরিক হিসাবে নিহত ব্যক্তি...

তখন তোর পরিণতি হতো নিশ্চিত জাহান্নাম...

তোর কপাল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে হে তুলাইহা, যদি এক্ষুনি তুই আল্লাহর রাসূলের খলীফার নিকট গিয়ে মুসলিম হিসাবে আত্মসমর্পণ না করিস, যদি তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করিস...

তোর ব্যাপারে তাঁর যা ইচ্ছা ফয়সালা করুন...

কারণ, এটা হবে তোর জন্য জাহান্নামের এক মুহূর্তের আযাবের চেয়েও সহজতর...

হে তুলাইহা, তিনি যদি তোকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে তুই যিরার ইবনে আযওয়ারের তরবারির আঘাত থেকে বেঁচে যাওয়া জীবনকে মুসলিম জাতির হেফাজতে এবং আল্লাহর দীন রক্ষার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা কর।'

এরপর তিনি গেলেন পানির কাছে, ভালোভাবে গোসল করলেন এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন,

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَه وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক অদ্বিতীয়, লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর পছন্দনীয় ও মনোনীত বন্ধু।'

***

তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদী মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে দেখা করে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন।

উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে তিরস্কার করে বললেন,

‘আরে কপাল পোড়া! তুমি তো উকাশা ইবনে মিহসান এবং সাবেত ইবনে সালামাকে হত্যা করেছিলে, আমর মন কোনোদিনও তোমাকে দেখে খুশি হবে না।’

তুলাইহা এ কথা শুনে বললেন,

‘আমীরুল মুমিনীন, কেন আপনি এমন দু’জনকে নিয়ে চিন্তা করছেন যারা শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছেন আমার কারণে, আর আমি হতভাগা হয়েছি তাদের হত্যার কারণে। আমি মহান আল্লাহর কাছে আমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সকল প্রকার পাপের পথ পরিহার করে তাঁরই কাছে ফিরে আসছি...’

উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবার তাকে গ্রহণ করে নিলেন এবং একজন মুসলিম সদস্য হিসাবে তাকে মেনে নিলেন।

***

তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ নিজ জীবনের বিশাল পদচ্যুতি থেকে খাঁটি তওবা করে ইসলামের পথে ফিরে এলেন এবং আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করলেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অব্যাহত রাখবেন।

শপথ গ্রহণ করলেন এই মর্মে যে, শহীদি মৃত্যু লাভের আশায় জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেবেন।

আল্লাহ তাআলা তার এই নিয়তকে কবুল করে নিলেন।

***

একবার রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলিম বাহিনী সামুদ্রিক জাহাজে চড়ে রওনা হলেন। সৈনিকদের মাঝে তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদও ছিলেন। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরে তাদের জাহাজটি যখন বিশাল ঢেউ ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় রোমান বাহিনীর এক বিশাল যুদ্ধজাহাজ তারা খুব কাছাকাছি দেখতে পেল, যাতে ছিল মুসলিম

সৈনিকদের চেয়ে বেশি রোমান সৈনিক ও সমরাস্ত্র। শত্রুসৈন্যদের ওই জাহাজটি চেষ্টা করছিল মুসলিম সৈনিকদের জাহাজটিকে সমুদ্রের গভীরে ঠেলে দিতে।

তুলাইহা সঙ্গী চালকদের বললেন,

'আমাদের জাহাজটিকে ওদের কাছাকাছি নিয়ে চলো।'

সবাই বলল,

'তুলাইহা, ওদের সঙ্গে মোকাবেলার সামর্থ্য আমাদের নেই।'

তুলাইহা সবাইকে ধমক দিয়ে বললেন,

'হয় এই জাহাজটিকে ওদের জাহাজের কাছে নিয়ে চলো, না হয় এই তরবারি দিয়ে তোমাদের সবগুলোর গলা কেটে ফেলব।'

তারা দেখলেন,

'আর কোনো উপায় নেই। তুলাইহার কথা মানতেই হবে।'

দুইটি জাহাজ যখন এক বরাবর হয়ে গেল, তুলাইহা বললেন,

'তোমাদের কয়েকজন মিলে চ্যাংদোলা করে আমাকে ওই জাহাজের মধ্যে ছুঁড়ে মারো, ইনশাআল্লাহ, তোমাদের এমন কিছু দেখাব যা দেখলে তোমাদের প্রাণ জুড়াবে।'

অন্যরা তার নির্দেশমতো সেটাই করলেন। তাকে রোমানদের জাহাজের মধ্যে ছুঁড়ে মারলেন। কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই তিনি রোমান সৈনিকদের ওপর বজ্রপাতের মতো ফেটে পড়লেন। ডানে-বামে তীব্র বেগে তরবারি ঘোরাতে থাকলেন। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তার তরবারির আঘাতের সামনে ওরা যেন পাখির মতো উড়তে থাকল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বহু সৈনিক তরবারির আঘাতে জীবন দিলো। অনেকে তরবারির আঘাত থেকে জীবন বাঁচাতে গিয়ে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মরল। অবশিষ্ট সকলেই আত্মসমর্পণ করল।

***

কাদেসিয়া যুদ্ধের রাতে। সেনাপতি সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে পাঁচজন সৈনিক দিলেন।

আরও পাঁচজন সৈনিক দিলেন আমর ইবনে মা'দী কারাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে।

এবার দুই দলকে নির্দেশ দিলেন রাতের আঁধারে পারস্য বাহিনীর সেনাছাউনিতে ঢুকে তাদের তথ্য নিয়ে গোপনে চলে আসতে হবে।

উভয় দল পারস্য বাহিনীর সেনাছাউনির ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে ঢুকে পড়ল। কিন্তু শত্রুবাহিনীর বিশাল সৈন্যসংখ্যা, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, সমরাস্ত্র এবং সতর্কতা ও প্রস্তুতির অবস্থা দেখেই ভয়ে-আতঙ্কে এই দুই গুপ্তদলের সৈনিকদের জান বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেল।

আমর ইবনে মা'দী কারাব এবং তার পাঁচ সৈনিক সঙ্গী ফিরে এলেন, তুলাইহার সৈনিকরাও তাদের পিছে পিছে ফিরে এল।

কিন্তু তুলাইহা নিজে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে নির্ভীকভাবে নির্ভাবনায় এগিয়ে গেলেন এবং পুরো রাত শত্রু বাহিনীর সেনাছাউনির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়ালেন।

***

রাতের শেষ প্রহরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য নিয়ে যেমন এসেছিলেন, তেমনই চুপে চুপে ফিরে যেতে তার মন চাইল না। সেনাছাউনির সবচেয়ে বড় তাঁবুটির দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। দেখলেন সেটার সামনে এত সুন্দর একটি ঘোড়া বাঁধা রয়েছে যা তিনি জীবনে আর কখনো দেখেননি। তিনি তরবারি বের করে ঘোড়াটির রশি কেটে দিলেন এবং ওর পিঠে চড়ে তাঁবুর সারির মাঝ দিয়ে দৌড়াতে থাকলেন। পারস্য বাহিনীর এক যোদ্ধা তার পিছু নিল, কাছাকাছি পৌঁছার পর লোকটি নিজের বর্শা তাক করল ছুঁড়ে মারার জন্য। কিন্তু তুলাইহা হঠাৎ ঘুরে এক আঘাতেই লোকটির লাশ ফেলে দিলেন।

আরও একজন তাকে আঘাত করার জন্য এগিয়ে এল, তুলাইহা একেও আগেরজনের মতো এক আঘাতেই ধরাশায়ী করে দিলেন।

এবার তৃতীয় একজন লাফিয়ে পড়ল তুলাইহার সামনে। তিনি আক্রমণের জন্য লোকটির দিকে ঘোরামাত্রই পারস্য সৈনিক বুঝতে পারল তার মৃত্যু অনিবার্য। সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মসমর্পণ করল।

তুলাইহা তাকে নির্দেশ দিলেন আমার সামনে সামনে জোরে জোরে ঘোড়া চালাতে থাকো...

তারা দু'জন একই সঙ্গে দ্রুতগতিতে ঘোড়া চালাতে চালাতে মুসলিমদের ছাউনিতে পৌঁছে গেলেন...

তাদের দু'জনকে দেখামাত্রই মুসলিম সৈনিকগণ তাকবীর ও তাহলীল ধ্বনি দিতে শুরু করল।

***

মুসলিম সেনাপতি সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দোভাষীর মাধ্যমে বন্দী পারস্য সৈনিকটির কাছে তাদের সেনাবাহিনীর ব্যাপারে জানতে চাইলে উত্তরে বললেন,

'আমি সর্বপ্রথম আপনাদের এই সৈনিক সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, তারপর আপনাদের যা মনে চায় আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।'

তারা বললেন,
'ঠিক আছে, আগে তোমার কথাটাই বলো।'

সে বলল,
'কিশোর বয়স থেকে আজ পর্যন্ত আমি সরাসরি অনেক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। অনেক বীর দেখেছি, তাদের সঙ্গে অনেক মতবিনিময় করেছি।

কিন্তু এমন একজন বীর, সাহসী যোদ্ধার কথা আর কখনোই শুনিনি, যিনি সত্তর হাজার চৌকস সৈনিকের সেনাছাউনিতে ঢুকে পড়েন, যে

সকল যোদ্ধা সৈনিকের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত থাকে পাঁচ-ছয়জন করে খাদেম...

এই রকমের ভয়ংকর সজাগ সেনাছাউনিতে একা একজন সৈনিক ঢুকে পড়ার পর নিরাপদে ফেরার চিন্তা না করে তিনি প্রধান সেনাপতির তাঁবুতে হামলা করে তাঁবুর রশি ছিঁড়ে দিয়েছেন, প্রধান সেনাপতির ঘোড়াটাও ছিনিয়ে নিয়েছেন...

এই পর্যায়ে এক হাজার যোদ্ধা সৈনিকের সমপর্যায়ের একজন পারস্য বীর তাকে বাধা দিতে গেলে এক আঘাতেই তিনি তাকে খতম করে ফেলেন, একই পর্যায়ের দ্বিতীয় সৈনিক বাধা দিতে গেলে তাকেও তিনি হত্যা করেন।

এরপর তাকে ধরতে যাই আমি, আমার বিশ্বাস আমার সমপর্যায়ের সৈনিক আমার বাহিনীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই, আমার ইচ্ছা ছিল নিহত দুই সৈনিক হত্যার বদলা নেব। কেননা, ওরা দু'জনই ছিল আমার চাচাতো ভাই। কিন্তু বদলা নিতে গিয়ে চোখের সামনে যখন নিজের নিশ্চিত মৃত্যু দেখতে পেলাম, তখন তাড়াতাড়ি তার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।'

***

এখানে প্রদত্ত সামান্য বর্ণনাই কিন্তু তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অসম সাহস ও বীরত্বের সবটুকু নয়...

তার জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সম্পূর্ণও নয়...

কারণ, তিনি তো কুরআনী পতাকার নিচে অব্যাহত লড়াই চালিয়ে গেছেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘটিত 'নাহাওয়ানদা' রণাঙ্গনে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-কামিল লিবনি আসীর*, ১১ শ হিজরীর ঘটনাবলি অধ্যায়।
২. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৪২৯০।
৩. *মুজামুল বুলদান*, বুযাখা অধ্যায়।
৪. *তাহযীবু ইবনি আসাকির*, ৭ম খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা।
৫. *তারীখুল খমীস*, ২য় খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।
৬. *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা।
৮. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা।

উবাদা ইবনুস সামিত

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

যেখানে উবাদা ইবনুস সামিত এবং তার মতো মানুষজন থাকতে পারে না, আল্লাহ তাকে জঘন্য বানিয়ে দিন।

–উমর ইবনুল খাত্তাবের উক্তি

এবারের সাহাবী... একজন আনসারী, একজন আকাবী, একজন বদরী।

দুনিয়ার গৌরব ও উচ্চমর্যাদার আলামত এই তিনটি কীর্তিধন্য হলে আর কী প্রয়োজন?

আখেরাতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির এই সাক্ষীগুলো থাকলে আর কী চাই?

তার পিতা, যার নাম ছিল সামিত...

তার মাতা, যার নাম ছিল কুররাতুল আইন...

আর তিনি নিজে, মানুষ তাকে ডাকত উবাদা নামে।

মুসলিম সমাজে আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে উবাদা ইবনুস সামিতকে চেনে না?

তিনি সেই সকল পবিত্র ও নেক মানুষের অন্যতম যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাজির সাহাবী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, সর্বপ্রকারের সাহায্য করে ছিলেন।

তিনি সেই তেহাত্তর জনের অন্যতম যারা আকাবাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি সেই বদরী সাহাবীদের অন্যতম যাদের ব্যাপারে খোদ আল্লাহ তাআলা অবহিত করে বলেছেন,

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

'তোমাদের যা খুশি করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।'

এই তথ্যগুলোর সঙ্গে যদি এটাও যোগ করে নেন যে, নবীজির জীবদ্দশায় কুরআন-সংকলনকারী কমিটির পাঁচ সদস্যের তিনি ছিলেন পঞ্চম, তাহলেই তার কথা আপনি ঠিকমতো বলতে পারলেন...

এবং তাকে তার মর্যাদার শীর্ষচূড়ায় উন্নীত করতে পারলেন।

***

উবাদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবন কাটিয়েছেন তিনটি ধারায়—মুজাহিদ, আবিদ ও মুআল্লিম।

রণাঙ্গনগুলোতে তিনি ছিলেন সিংহ-শার্দূলের ন্যায় দুর্দান্ত, দুঃসাহসী বীর মুজাহিদ।

রাতের নির্জন শান্ত প্রহরে ছিলেন দুনিয়ার সকল সংশ্রবত্যাগী মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ আবিদ।

শান্তির সময়ে মুসলিম জাতিকে মুআল্লিম হয়ে শেখাতেন আল্লাহর কিতাব আর বোঝাতেন আল্লাহর দীন।

মহান আল্লাহ যখন মুসলিম জাতির হাতে শাম অঞ্চলগুলোর বিজয় দান করলেন তখন তারা চাইলেন ওই অঞ্চলের দুর্গগুলো জয় করার মতো মানুষের হৃদয় ও মনগুলোও জয় করতে।

সুতরাং দামেস্কের গভর্নর খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে চিঠিতে লিখলেন,

'শাম অঞ্চলে মুসলিমদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, তাদের এখন কুরআন শেখানো এবং দীন বোঝানো দরকার...

অতএব হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে এমন কিছু মানুষ পাঠিয়ে সাহায্য করুন যারা এই এলাকার লোকদের কুরআন শিক্ষা দেবেন।'

তখন খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই পাঁচজনকে ডেকে পাঠালেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআন সংকলন করেছিলেন। তারা হলেন,

উবাদা ইবনুস সামিত,
মুআয ইবনে জাবাল,
উবাই ইবনে কাআব,
আবু আইয়ূব আনসারী ও
আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাঈন,

আল্লাহ তাদের উম্মতে মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

তারা যখন সকলেই আমীরুল মুমিনীনের সামনে হাজির হলেন, তিনি তাদের বললেন,

'আমাদের শামের ভায়েরা আমার কাছে এমন কয়েকজন মানুষ পাঠানোর আবেদন করেছেন, যারা তাদের কুরআনের শিক্ষা দেবেন এবং হালাল-হারামের জ্ঞান দান করবেন। অতএব আপনাদের ভেতর থেকে তিনজনকে বাছাই করে আমাকে সাহায্য করুন। ইচ্ছা হলে লটারি করে নিন।'

তারা বললেন,

'আমীরুল মুমিনীন, আমরা লটারি করতে চাই না। কেননা, আবু আইয়ূব আল-আনসারীর অনেক বয়স হয়ে গেছে আর উবাই ইবনে কাআব অসুস্থ, অবশিষ্ট থাকলাম আমরাই তিনজন।'

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের তিনজনকেই শাম অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন।

উবাদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে গেলেন হেমস নগরীতে...

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গেলেন দামেস্কে...

মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রইলেন ফিলিস্তীনে...

***

উবাদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আকাবার রাতে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে ছিল সকল অবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করব...

যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব...

আল্লাহর বিধান পালনের বেলায় তিরস্কারকারীর পরোয়া করব না।

এরই ফলে তিনি যখন শামের গভর্নর মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কার্যক্রম দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, তখন নিজেই তিনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে আপত্তির কথা প্রকাশ করলেন।

কিন্তু মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার মত গ্রহণ করলেন না। নিজের মতটিই তাকে মেনে নিতে বললেন। এতে উবাদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাগ করে বললেন,

وَاللهِ لَا أَسْكُنُ مَعَكَ فِيْ أَرْضٍ وَاحِدَةٍ

'আল্লাহর কসম! আমি তোমার সঙ্গে এক এলাকায় থাকব না।'

তিনি মদীনায় পুনরায় ফিরে এলেন।

যখন তিনি খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি জানতে চাইলেন, আপনি ফিরে এলেন কেন হে উবাদা?

তিনি খলীফাকে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে তার মতবিরোধের বিষয়টি জানালেন।

বিস্তারিত শোনার পর খলীফা তাকে বললেন,

ঠিক আছে, আপনি আবার সেখানে যান। যে অঞ্চলে আপনি এবং আপনার মতো মানুষজন থাকতে পারেন না, আল্লাহ তাআলা সেখানের বরকত তুলে নেন এবং সেই জমিনকে শ্রীহীন করে দেন।

এরপর তিনি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে চিঠি লিখে জানালেন,

لَا اِمْرَةَ لَكَ عَلٰى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ' وَاِنَّمَا هُوَ اَمِيْرُ نَفْسِه

'আপনি উবাদার আমীর নন, তার আমীর তিনি নিজেই।'

***

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মিসর গেলেন সেটাকে স্বাধীন করার জন্য। তখন মিসর ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীন। আমর ইবনুল আস একের পর এক শহর, নগর, গ্রাম জয় করতে করতে শেষ পর্যন্ত ব্যাবিলন দুর্গের কাছে এসে আটকে গেলেন। বর্তমান কায়রোর কাছাকাছি নীলনদের কূলে অবস্থিত এই দুর্গটি জয় করা তার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে গেল।

কষ্টসাধ্য হওয়ার কারণ ছিল, রোমানরা এর চারদিক বিশাল বড় খাল খনন করে রেখেছিল। আর দুর্গের দিকে যাওয়ার পথগুলোতে লোহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পেরেক গেঁথে রেখেছিল। যেন মানুষ বা ঘোড়া ওই পথে আগাতে গেলেই বাধাগ্রস্ত হয়।

আবার দুর্গটিকে তারা বোঝাই করে রেখেছিল সৈনিক আর যুদ্ধ-সরঞ্জাম দিয়ে। এখানে এনে রেখেছিল মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর ও রাজবংশের বড় বড় ব্যক্তিত্ব। যাদের মধ্যে ছিল শীর্ষস্থানীয় মিসরের শাসক ও পাদরি মুকাওকাস।

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুর্গ অবরোধ করলেন এই আশায় যে, ভেতরের সকলে এই অবরোধের কারণে সংকুচিত হয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

কিন্তু অবরোধের পরপরই নীলনদ প্লাবিত হয়ে গেল ব্যাপক বন্যার পানিতে...

ফলে রোমানরা বন্যা প্রতিরোধের সব বাঁধ ভেঙে দিলো এবং পানির রাস্তা পার হওয়ার জন্য তৈরিকৃত সকল পোল নষ্ট করে দিলো।

চতুর্দিক থেকে বন্যার পানি মুসলিমদের ঘিরে ফেলল। তাদের ডুবে মরার আশঙ্কা তৈরি হলো।

তখন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন।

খলীফা অতিদ্রুত তাদের সাহায্যের জন্য চার হাজার মুসলিম সৈন্য প্রস্তুত করলেন। প্রতি হাজার সৈনিকের আমীর বানালেন এমন একজন সেনানায়ককে যিনি একাই এক হাজার সৈন্যের বরাবর। সেই চারজন সেনাপতি হলেন উবাদা ইবনুস সামিত, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ এবং মাসলামা ইবনুল মুখাল্লাদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।

***

মুকাওকাস মুসলিম সৈনিকদের কাছে সাহায্য পৌঁছার খবর পেলেন। তখন তিনি আলোচনার উদ্দেশ্যে বাছাই করা সেরা লোকদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠালেন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে। তিনি তাদের জোরালো নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা মুসলিম বাহিনীর অবস্থা ভালোভাবে জেনে এসে তাদের জীবনযাপন প্রণালির একটি নিখুঁত চিত্র আমাকে জানাবে।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা তিন দিন মুসলিম বাহিনীর মেহমান হিসাবে কাটালেন। ফিরে আসার পর মুকাওকাস জানতে চাইলেন,

বলো কী দেখলে আর শুনলে?

তারা বললেন,

'আল্লাহর কসম তারা এমন এক জাতি যাদের কাছে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই বেশি লোভনীয়...

তাদের কাছে অহংকারের চেয়ে বিনয় বেশি পছন্দনীয়...

অতি সাধারণের মতো তারা নির্দ্বিধায় মাটির ওপর বসে পড়ে এবং দুই পা উঁচু করে খেতে বসে।

তাদের সেনাপতি একজন সাধারণ সৈনিকের মতোই, বোঝা যায় না কে নেতা আর কে সাধারণ অনুসারী, কে উচ্চমর্যাদার আর কে তাদের মধ্যে নিম্নমর্যাদার।

যখন নামাযের একামত দেওয়া হয়, তারা কেউই অলসতা করে না। পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে অযু করে তাদের রবের প্রতি বিনীত ও বিনম্র হয়ে নামায আদায় করে।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে সব কথা শোনার পর মুকাওকাস বললেন,

وَاللهِ لَوْ اَنَّ هؤُلَاءِ اِسْتَقْبَلُوْا الْجِبَالَ لَاَزَالُوْهَا ... وَلَوْ نَازَلُوْا الْجِنَّ لَأَبَادُوْهَا

'আল্লাহর কসম! এমন জাতি যদি পাহাড়ের সামনে দাঁড়ায় তবে পাহাড়কেও সরিয়ে দিতে পারবে, আর এরা যদি অদৃশ্য জিনজাতির সঙ্গেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তাহলে জিনের অস্তিত্বও ধ্বংস করে দেবে।'

***

প্রতিনিধিদলের সদস্যদের বর্ণিত অবস্থাগুলো মনে হয় মুকাওকাসের স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা হলো। তাই তিনি মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে লিখিত পত্রে অনুরোধ জানালেন,

'দয়া করে আমাদের কাছে আপনাদের কিছু প্রতিনিধি পাঠান আলোচনার জন্যে।'

মুসলিম সেনাপতি তার দশজন সৈনিক পাঠালেন, যাদের আমীর বানালেন উবাদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে।

***

উবাদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন দীর্ঘদেহী এক বিশাল মানুষ, ঘন চুল-দাড়িওয়ালা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তার দিকে তাকালেই ভয় লাগত।

তিনি যখন মুকাওকাসের সামনে গেলেন, তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বে তিনি প্রভাবিত হয়ে উঠলেন। এমনকি তার মনের মধ্যে খুব ভয় ঢুকে গেল।

তিনি প্রতিনিধিদলের লোকজনকে বললেন,

'আপনারা আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য এই লোকটিকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকুন।'

এর জবাবে তারা বললেন,

'তিনিই আমাদের এই দলের আমীর, আমাদের সেনাপতি আমর ইবনুল আস নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন তার সামনে অগ্রসর না হই এবং তার কোনো হুকুম অমান্য না করি।

তখন মুকাওকাস উবাদা ইবনুস সামিতকে বললেন,

'আসুন, একটু নরম করে কথা বলুন। আপনাকে দেখেই আমার ভয় লাগছে।'

উবাদা ইবনুস সামিত তাকে বললেন,

'আমাকে দেখেই ভয় পাচ্ছেন, তাহলে আমার অন্য সঙ্গীদের দেখলে কী হবে? এই সেনাদলে হাজার খানেক মানুষ আছেন যারা আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর বেশি ভয়ংকর।'

মুকাওকাস জিজ্ঞাসা করলেন,

'আপনারা কী উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়ে এখানে এসেছেন? আমাদের কাছে আপনারা কী চান?'

উবাদা ইবনুস সামিত বললেন,

'আল্লাহর কসম! আমরা বের হয়েছি শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে।

আমাদের নবী আমাদের থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, এ পৃথিবীতে আমাদের কারও আকাঙ্ক্ষা যেন জীবনধারণ উপযোগী সামান্য খাবার এবং শরীর ঢাকার উপযোগী পোশাক ছাড়া আর কিছু না হয়। কেননা, দুনিয়ার সুখ প্রকৃতপক্ষে কোনো সুখ নয়, প্রকৃত সুখ হলো আখেরাতের সুখ।'

মুকাওকাস বললেন,

'গভীর মনোযোগ দিয়ে আমি আপনার কথা শুনলাম। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার কসম করে বলছি, আপনারা একের পর বিজয় অভিযানের মাধ্যমে যতদূর পৌঁছেছেন তার কারণ শুধু সেটাই যা আপনি বললেন। যত জাতিকে যুদ্ধ করে আপনারা পরাজিত করেছেন, আপনাদের জয় এবং তাদের পরাজয়ের কারণ একই জায়গায়—দুনিয়ার প্রতি তাদের মোহ আর আপনাদের ঘৃণা...

তবে বিশাল শক্তিধর রোম সাম্রাজ্য আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যে বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে তার কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। আমরা খুব ভালোভাবে জানি যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেতার কোনো শক্তি আপনাদের নেই। কেননা, সংখ্যায় আপনারা খুবই নগণ্য এবং আপনারা গরিব ও অভাবী।

আমরা খুশি হব আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেক সৈন্যের জন্য বরাদ্দ দুই দিনার, সেনাপতির জন্য একশো দিনার আর আপনাদের খলীফার জন্য এক হাজার দিনার গ্রহণ করে এখান থেকে ফিরে গেলে। নতুবা আপনাদের পড়তে হবে এমন বিপদে যা থেকে বাঁচার কোনো ক্ষমতা নেই আপনাদের।

***

উবাদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ কথার তাকে বললেন,

'আপনি আমাদের রোমান বাহিনীর বিশাল সংখ্যার যে ভয় দেখালেন, সেটা আমাদের লক্ষ্যপূরণে বাধা দিতে পারবে না। কেননা, আমরা একেবারেই নিশ্চিত যে দুই বিজয়ের কোনো একটি আমাদের অর্জিত হবেই। আমরা আপনাদের ওপর বিজয়ী হলে আমাদের লাভ হবে দুনিয়ার বিশাল গনিমত আর আপনারা জয়ী হলে আমরা পাব আখেরাতের গনিমত...

মনে রাখবেন, আমাদের মাঝে এমন একজন মানুষও নেই যিনি প্রত্যেক নামাযের পর শহীদ হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন না। প্রতিটা সৈনিকই প্রত্যেক নামাযের পর প্রার্থনা করেন, যেন তাকে ব্যর্থ হয়ে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে না হয়... আর আমরা সকলেই স্ত্রী-সন্তানদের শেষ বিদায় জানিয়ে আল্লাহর হাওয়ালা করেই এসেছি।'

এরপর তিনি মুকাওকাসের সামনে তুলে ধরলেন তিন বিকল্প,

এক. হয় ইসলাম কবুল করুন।
দুই. নয়তো কর দিয়ে জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ নাগরিকত্ব গ্রহণ করুন।
তিন. নয়তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

তারা প্রথম দুই বিকল্প প্রত্যাখ্যান করলেন আর তাই তৃতীয় বিকল্প যুদ্ধই অনিবার্য হয়ে উঠল।

***

এবার মুসলিম বাহিনী সংকল্প করলেন, যেকোনো মূল্যেই হোক তারা দুর্গে ঢুকবেন...

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'মহান আল্লাহর জন্য আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ করে দিলাম।' এ কথা বলেই তিনি রশির তৈরি মই হাতে নিলেন দুর্গের দেয়ালের ওপর চড়ার জন্যে। তিনি সৈনিক ভাইদের বললেন,

‘আমার তাকবীর শোনার সঙ্গে সঙ্গে একই আওয়াজে তাকবীরের জবাব দেবেন।’

অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুঃসাহসী যোদ্ধা দুর্গ প্রাচীরের মাথায় চড়ে বসলেন, হাতে তার নাঙ্গা তলোয়ার আর মুখে চিৎকার করে বললেন ‘আল্লাহু আকবার’। এই বিশাল আওয়াজের তাকবীর ধ্বনি মুশরিকদের হৃদয়ে ভূমিকম্পের মতো কাঁপন ধরিয়ে দিলো।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রাচীরের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নিচে মাটিতে পড়লেন। তাকে দেখে আরও একদল মুসলিম সৈনিকও দুর্গের ভেতরে লাফিয়ে পড়লেন।

দুর্গের ভেতরে লাফিয়ে পড়া ছোট্ট এই মুসলিম সৈনিকদলটি সামনে পাওয়া রোমান সৈনিকদের কচুকাটা করে ফেললেন। এরপর দুর্গের সব ফটক খুলে দেওয়া হলে অপেক্ষারত রাসূলের সাহাবায়ে কেরাম বন্যার পানির মতো প্রবল বেগে ভেতরে ঢুকে পড়লেন যাদের শীর্ষে ছিলেন উবাদাহ ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

দুই পক্ষের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সেই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৈনিকদেরই বিজয় দান করলেন। এরই মধ্য দিয়ে কুরআনী শাসনের দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল পৃথিবীর মুক্তা খ্যাত দেশ, সবুজ-শ্যামল ফসলে ভরা, নীলনদের দেশ মিসর।

তথ্যসূত্র :

১. *তাবাকাতে ইবনে সাআদ*, ৩য় খণ্ড, ৫৪৬, ৬২১ পৃষ্ঠা।
২. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসাবাহ*, ২য় খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৪৪৯৭।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৫ম খণ্ড, ১১১ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা।
৬. *আননুজূমুয যাহিরা*, ১ম খণ্ড, ৪ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী।
৭. *মুখতাসারু তারিখি দিমাশ্ক*, ১১ শ খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা।
৮. *তারীখু খলীফা*, ১২৯, ১৩৫, ১৪৫ পৃষ্ঠা।
৯. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা।

ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

ইয়াযীদ ছিলেন আবু সুফিয়ানের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাকে বলা হতো শ্রেষ্ঠ ইয়াযীদ।

এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বংশীয় কুরাইশী যুবক, মাতা-পিতার হিসাবে শ্রেষ্ঠ সম্মানী...

জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায়, সম্মান ও মর্যাদায় তিনি এক পূর্ণাঙ্গ কুরাইশী তরুণ...

যে কারণে কওমের লোকেরা তাকে উপাধি দিয়েছিল 'ইয়াযীদ আল-খাইর'—শ্রেষ্ঠ ইয়াযীদ।

যে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত দান করা হয়, সে সময় এই ইয়াযীদ আল-খাইর অথবা ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান ছিলেন উঠতি বয়সী এক তরুণ... তার গভীর জ্ঞানবুদ্ধি ও চৌকস দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শোভনীয় হতো যদি তিনি ইসলামের দিকে ধাবিত হতেন এবং ওই ধর্মের পথেই পরিচালিত হতেন যেমন হয়েছিলেন তার বোন উম্মুল মুমিনীন রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা।

কিন্তু কুরাইশী তরুণ পিতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের শীর্য মর্যাদা ও নেতৃত্বের প্রতি সর্বদা সমীহ প্রকাশ করে চলেছেন। যার ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন কেবল পিতার ইসলাম গ্রহণের পর। আর এটা ছিল মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে।

***

ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়েছিলেন। কেননা, তার মধ্যে মানবতা ও সভ্য মানুষের লক্ষণ পাওয়া যেত। তা ছাড়া তিনি আশা করতেন, তার দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণ সাধিত হবে।

হুনাইন যুদ্ধের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি সম্মান প্রকাশে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেন। তাকে একশো উট দান করেন এবং চল্লিশ উকিয়া রুপা তাকে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। পরে বেলাল হাবশী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেটা ওজন করে তার হাতে সমর্পণ করেন।

***

খিলাফতের দায়িত্ব যখন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে সমর্পিত হলো, তার কাছে এই উমাউই তরুণ যোদ্ধার তীব্র সহনশীলতা, সত্য সংকল্প, জ্ঞানবুদ্ধির বিচক্ষণতা এবং ঈমান ও বিশ্বাসের গভীরতা গোপন রইল না। তাই তিনি চাইলেন এই অনন্য শক্তি ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে ইসলাম ও মুসলিম জাতির সেবায় কাজে লাগাবেন।

কিন্তু খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কুরাইশী যুবকের ব্যাপারে নেতৃত্বের অহংকার ও প্রতারণার আশঙ্কা করতেন। ভয় পেতেন রাষ্ট্রীয় পদের খামখেয়ালি অপব্যবহারের।

এ কারণে তিনি তাকে ডেকে বললেন,

'হে ইয়াযীদ, তুমি একজন যুবক, তোমার ভালো কাজকর্ম দিয়েই মানুষ তোমাকে মনে রাখবে। আমি তোমাকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে

চাই, দেখতে চাই তুমি কেমন? তোমাকে কোনো শাসনভার দিলে সেটা হবে কেমন?...

ফলাফল ভালো হলে তোমার উন্নতি হবে, খারাপ হলে তোমার দায়িত্ব ছিনিয়ে নেব।

হে ইয়াযীদ, আল্লাহর ভয় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করো। কারণ, তিনি তোমার অন্তরকেও সে রকমই দেখেন যেমন দেখেন তোমার বাহিরটাকে।

যখন তোমার সৈনিকদের কাছে আসবে, তাদের সঙ্গে ভালোভাবে মিলেমিশে থাকবে। তাদের সঙ্গে ভালোর সূচনা তুমি নিজেই করবে, ভালো প্রতিশ্রুতি তাদের দেবে...

তাদের যখনই উপদেশ দেবে তা হতে হবে সংক্ষিপ্ত। কেননা, কথা বেশি হয়ে গেলে একটা অন্যটাকে ভুলিয়ে দেয়...

নিজের ভুলত্রুটি সংশোধন করে নিজেকে শুদ্ধ বানাও, দেখবে অন্যরা তোমার সঙ্গে পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে।

সকল নামায সময়মতো আদায় করো রুকু, সেজদা পূর্ণ করে, খুশু-খুযু ঠিক রেখে।'

***

'তোমার কাছে যদি শত্রুদলের প্রতিনিধি আসে, তাহলে তাদের আপ্যায়ন করবে। তোমার কাছে তাদের অবস্থানের সময়সূচি সংক্ষিপ্ত করে দেবে... যেন তোমার সেনাছাউনি সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জেনেই তাদের চলে যেতে হয়। তাদের কাছে তোমার কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রদর্শন কোরো না, এতে তারা তোমার দুর্বলতা দেখে নেবে এবং তোমার জ্ঞানবুদ্ধির দৌড় ধরে ফেলবে।

যেখানে সৈন্যসংখ্যা বেশি, সেনাছাউনির সেই স্থানেই তাদের অবস্থান করাবে। তাদের সঙ্গে আলোচনার সূচনা যেন তোমার পক্ষ থেকে না হয়। তাদের সকল কথার পর্যবেক্ষণ তুমি নিজেই করবে। তোমার

গোপন বিষয় প্রকাশ করবে না, সেটা করলে তোমার গোপনীয়তা বিনষ্ট হয়ে যাবে।'

***

এরপর তিনি ইয়াযীদকে বললেন,

'যখন কারও কাছে পরামর্শ চাইবে, সত্য ও সঠিক কথা বলবে, তাহলে সঠিক পরামর্শ পাবে। পরামর্শদাতার কাছে তোমার কোনো তথ্য গোপন করবে না। যদি সে রকম করো, তাহলে তোমার নিজের ক্ষতির জন্য তুমি নিজেই দায়ী হবে।

সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে রাতের বেলা আলাপ করবে, দেখবে মনের মধ্যে লুকানো নানান কথা ও গোপন খবর বেরিয়ে আসবে...

তোমার দেহরক্ষী ও প্রহরীদের সংখ্যা বেশি রাখবে এবং তাদের ছড়িয়ে দেবে সেনাবাহিনীর মধ্যে, তাদের কর্মক্ষেত্রে বারবার এমন আকস্মিকভাবে গিয়ে হাজির হবে যেন তোমার ব্যাপারে আগে থেকে তাদের কিছুই জানা না থাকে...

এই প্রক্রিয়ায় যাকে দেখবে নিজের কাজে অসতর্ক তাকে সুন্দরভাবে শিখিয়ে ও বুঝিয়ে দেবে, প্রয়োজন হলে তাকে হালকা শাস্তি দেবে...

রাতের প্রহরাকে তাদের মাঝে পালাক্রমে ভাগ করে দিয়ো, রাতের প্রথম ভাগকে শেষ ভাগের তুলনায় দীর্ঘ কোরো, কেননা এটা দিনের পর পর হওয়ার কারণে শেষ ভাগের তুলানায় একটু সহজ।

শাস্তিযোগ্য কাউকে শাস্তি দিতে ভয় পেয়ো না, বিলম্বও কোরো না, তাড়াহুড়াও কোরো না...

তুমি তোমার সেনাসদস্যদের ব্যাপারে কখনো গাফেল ও অসতর্ক হোয়ো না, তাহলে তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তাদের ত্রুটি খুঁজো না, তাতে তাদের মানহানি ঘটবে। তাদের গোপনীয় বিষয় মানুষের সামনে প্রকাশ কোরো না, তাদের বাহ্যিক ও প্রকাশ্য ব্যাপারগুলোতেই তৃপ্ত থেকো...

আড্ডাবাজদের সঙ্গে মেলামেশা কোরো না, মেলামেশা করবে সত্যপন্থী ও নেক মানুষের সঙ্গে। সততা ও সাহস নিয়ে সকল মানুষের মুখোমুখি হোয়ো, ভীরু ও ভিতু হয়ে নয়, তাহলে মানুষও ভীরু হয়ে যাবে।'

***

এরপর তিনি বললেন,

'এটুকুই ছিল আমার কাছে তোমার জন্য হৃদয়-নিংড়ানো উপদেশ। আর শেষ পরামর্শ হিসাবে আমি তোমাকে খুব জোরালোভাবে বলছি, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলো। তুমি জানো ইসলামে কত বিশাল তাঁর মর্যাদা। খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন,

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ وَأَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحُ

'প্রত্যেক উম্মতের একজন আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত মানুষ থাকে, আমার উম্মতের সেই মানুষটি হলো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।'

সুতরাং সর্বদা মনে রেখো ইসলাম গ্রহণে তাঁর অগ্রগামিতা ও এই অনন্য মর্যাদার কথা।

আর দ্বিতীয় যার সঙ্গে তোমাকে সম্পর্ক গড়তে বলব, তিনি মুআয ইবনে জাবাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কতগুলো জিহাদে তিনি শরীক হয়েছেন, তা তোমার জানা আছে।

তুমি কখনোই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না এদের পরামর্শ ছাড়া। তারা দু'জন কখনোই তোমাকে সৎ পরামর্শ দিতে, তোমার কল্যাণ নিশ্চিত করতে ত্রুটি করবেন না।'

ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আবেদন করলেন,

'হে রাসূলের খলীফা, আপনি দয়া করে তাদের দু'জনের কাছেও আমার কথাটি একটু বলে দিন যেভাবে আমাকে বললেন তাদের কথা।'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,
'অবশ্যই আমি সেটা বলতে ভুলব না।'

ইয়াযীদ তখন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন,
'আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর রহম করুন এবং এর জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।'

***

খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সংকল্প করলেন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শাম দেশে সেনাদল পাঠাবেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি সকল এলাকা থেকে মুসলিম জনসাধারণকে ডেকে পাঠালেন এবং শক্তিশালী সেনাদল গঠন করলেন বিভিন্ন প্রকার মানুষ দিয়ে। সেনাদলকে ভাগ করলেন চার ভাগে এবং একটি সেনাদলের নেতৃত্বভার তুলে দিলেন ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের হাতে।

***

নবগঠিত এই সেনাদল বিদায়ের মুহূর্তে খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বের হয়ে এলেন মুসলিম সেনাদল আর তার তরুণ সেনাপতিকে বিদায় জানাতে। সেনাপতির পাশে পাশে তিনি পায়ে হেঁটে চলতে থাকলেন। খলীফার সামনে এভাবে ঘোড়ায় চড়ে সেনাপতি ইয়াযীদ খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাই তিনি খলীফাকে বললেন,

'হে রাসূলের খলীফা, আপনি পায়ে হেঁটে চলছেন আর আমি ঘোড়ায় চড়ে থাকব এটা হতেই পারে না।' এ কথা বলেই তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়তে চাইলেন। এবং খলীফার উদ্দেশ্যে বললেন, 'হয়তো আমি নেমে পড়ি, না হয় আপনি চড়ে বসুন।'

এ কথা শুনে খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আমারও চড়ার দরকার নেই আর তোমাকেও নামতে হবে না।

আমি তো এই কয়েক কদম চলে এর মাধ্যমে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সওয়াব অর্জন করতে চাই।'

এরপর তিনি ইয়াযীদকে উপদেশ দিয়ে বললেন,

'তোমরা তো নতুন নতুন এলাকায় যাচ্ছ, নানা রকমের খাবার তোমাদের সামনে আসবে, খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলবে আর শেষে বলবে 'আলহামদুলিল্লাহ'।

দাম্ভিকতা থেকে সাবধান থেকো,

কখনোই কোনো নারী, ছোট্ট শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা কোরো না...

কোনো ফলদার গাছ কেটো না এবং বসবাসের ঘরবাড়ি নষ্ট কোরো না...

বিনা কারণে উট ও বকরিকে হত্যা কোরো না—খাওয়ার জন্যে জবাই করা ছাড়া...

খেজুর বাগান জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে বা অন্য উপায়ে নষ্ট কোরো না...

কারও প্রতি হিংসা করবে না, বিদ্বেষ পোষণ করবে না...

ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না।'

***

মুসলিম সৈনিকগণ যখন ইয়ারমূকে পৌঁছলেন, তখন তারা রোমান সেনাপতির কাছে খবর পাঠালেন যে, আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি কথা বলতে রাজি হলেন।

ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সাহাবীকে নিয়ে তার কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, রোমান সেনাপতি নিজের ও বড় বড় সেনা অফিসারদের জন্য রেশমের বিশাল বিশাল তাঁবু আর জাঁকজমকপূর্ণ শামিয়ানা টাঙিয়েছেন।

তারা সেখানে পৌঁছার পর ইয়াযীদ এবং সঙ্গীরা ভেতরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। তারা সেনাপতিকে বললেন,

‘রেশমের ব্যবহার পুরুষের জন্য আমরা বৈধ মনে করি না। অতএব আপনি বের হয়ে আসুন।’

অগত্যা তিনি নিজেই বের হয়ে এসে আলাপ-আলোচনা করলেন, কিন্তু তাদের এই আলোচনায় কোনো লাভ হলো না।

***

এরপর ইয়ারমূকের রণাঙ্গনে মুখোমুখি হলো দুই দল,

ঈমানের অস্ত্রে বলীয়ান একটি ক্ষুদ্র বাহিনী একদিকে...
কুফরী আর পাপের ভারে ভারাক্রান্ত একটি বৃহৎ বাহিনী অন্যদিকে।

এমন সময় আবু সুফিয়ান—যিনি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ—ছেলে ইয়াযীদের কাছে গিয়ে বললেন,

‘হে আমার বেটা, তোমার এখন উচিত তাকওয়া ও সবরকে আঁকড়ে ধরা। এই মুহূর্তে প্রত্যেক মুসলিমকে মৃত্যু চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আর তুমি এবং তোমার মতো অন্য সেনা অফিসাররা আছ আরও বেশি মৃত্যু-ঝুঁকিতে।

অতএব হে আমার ছেলে, আল্লাহকে স্মরণ করো, নিজের সম্মান বজায় রেখো, যুদ্ধের মধ্যে সওয়াব অর্জনে এবং ধৈর্যধারণে অন্য কেউ যেন তোমার চেয়ে বেশি আগ্রহী না হতে পারে। এবং কেউ যেন ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে তোমার চেয়ে বেশি সাহস দেখাতে না পারে।’

পিতার উপদেশ শুনে ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

‘হে পিতা, আমি অবশ্যই সব কথা মেনে চলব ইনশাআল্লাহ।’

এরপর তিনি তার বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে রোমান বাহিনীর ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, টিকতে না পেরে রোমান বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হলো।

ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধ্যে যখনই শান্ত ভাব তৈরি হচ্ছিল তখনই তিনি শুরাহবীল ইবনে হাসানার কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছিলেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন।'

এরপর তিনি আবার বলে যাচ্ছিলেন,

'কোথায় আল্লাহর কাছে জীবন বিক্রয়কারী দল, প্রভুর সন্তুষ্টির বিনিময়ে?'

'কোথায় তারা, যারা আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে উদ্গ্রীব?'

এভাবে প্রতিবার যখন তিনি শুরাহবীলের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন, নতুন করে তার মধ্যে তীব্র চেতনা ও আবেগ জেগে উঠছিল। তিনি আবার নতুন উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। এভাবেই শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ ইসলামী ইতিহাসের সর্ববৃহৎ মীমাংসাকারী যুদ্ধে তার দলকে বিজয় দান করেন...

কেননা, এই যুদ্ধের পর শাম দেশে আর কেউ কখনো রোমানদের পক্ষে দাঁড়ায়নি।

***

বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিজয়ধারা চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে। এভাবেই শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে ওঠেন বিখ্যাত সেই চার সেনাপতির একজন— যাদের হাতে আল্লাহ তাআলা দান করেছিলেন দামেস্কের স্বাধীনতা।

এরপর এই উমাউই তরুণ তার জিহাদ অব্যাহত রাখেন। অবশেষে তিনি মুসলিম জাতির পক্ষে জয় করেন বৈরুত, সায়দা এবং এগুলোর সংলগ্ন লেবাননের অন্যান্য গ্রাম।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৬৪৯ পৃষ্ঠা।
২. *উসদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৬৫৬ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৯২৬৫।
৪. *তাহযীবুল কামাল*, ৩২ তম খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।
৫. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১১ শ খণ্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩য় খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।
৭. *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।
৮. *নাসাবু কুরাইশ*, ১২৪, ১২৫ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী।
৯. *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ৯ম খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা।

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

এটা হচ্ছে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব—কুরাইশের শ্রেষ্ঠ দানবীর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয়তা রক্ষাকারী কুরাইশী।

–মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কুরাইশী নেতা আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম খবর পেলেন, রবীআ রাজবংশে 'নুতাইলা' নামের একটি বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী মেয়ে আছে...

তিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। বিয়ে, বাসর হয়ে গেল। একটি সুন্দর সুশ্রী ফুটফুটে ছেলের জন্ম হলো। ছেলেটিকে পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন। তার নাম রাখলেন 'আব্বাস'।

মক্কার অবিসংবাদিত নেতার এহেন চরম আনন্দের সময় মাত্র দু'টি বছর পার হতে না-হতেই তার পরিবারে নেমে এল এক নতুন আনন্দের জোয়ার...

তার ছেলে আব্দুল্লাহর ঘরে জন্ম নিল আব্বাসের মতোই ফুটফুটে সুন্দর মুখশ্রীর এক পুত্রসন্তান। এই হৃদয়কাড়া সুন্দর ছেলেটাকে দেখেই তিনি কেঁদে ফেললেন, তার চোখ দু'টো থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে থাকল...

তার মনে হলো, আহা! আজকের এই মহাখুশির শুভলগ্নে যদি শিশুটির বাবা বেঁচে থাকত!

পরে তিনি ছেলেটির নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ'।

***

মুহাম্মাদ এবং আব্বাস দু'জন একই সঙ্গে আব্দুল মুত্তালিবের স্নেহের ছত্রছায়ায় বড় হতে থাকলেন। তারা দু'জন নিজেদের দুই ভাই হিসাবেই জানতেন। তারা যে চাচা-ভাতিজা এটা তারা কেউই জানতেন না। একসঙ্গেই তারা চলাফেরা করতেন, একই পাত্রে খাওয়া-দাওয়া করতেন, খেলাধুলাও তারা একই সঙ্গে করতেন।

আব্বাসের বয়স যখন দশ বছর হলো, তার পিতা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যু হয়ে গেল। গোটা মক্কা সেই বেদনায় কেঁপে উঠল। মক্কাবাসী সকলেই তাকে হারিয়ে অস্থির হয়ে গেল।

কিন্তু দুই কিশোর বালক আব্বাস ও মুহাম্মাদ সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত ও অস্থির হয়ে গেলেন। কেননা, তাকে হারানোর কারণেই তারা এতিম হওয়ার কষ্ট ও জ্বালা বুঝতে পারলেন।

***

আব্দুল মুত্তালিবের দায়িত্বগুলো যখন তার ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছিল, তখন কুরাইশের লোকেরা হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব দিলেন তার ছেলে আব্বাসকে—যদিও তার বয়স ছিল অল্প। কেননা, তারা অল্পবয়সী এই ছেলের মধ্যে দেখেছিলেন আভিজাত্যের নিশানা। দেখেছিলেন ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সম্ভাবনা।

***

বালক আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ধীরে ধীরে বড় হতে থাকলেন। একসময় তারা পুরাপুরি নওজোয়ান হয়ে

গেলেন, তাদের বয়সের পার্থক্য মুছে গেল। অনেকেই তাদের যমজ ভেবে ভুল করতে থাকল...

আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণের পর একবার জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন,

'আপনিই বড় নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?'

এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন,

'তিনি আমার চেয়ে বড়, কিন্তু আমার বয়স তার চেয়ে দুই বছর বেশি।'

***

বয়স যখন চল্লিশের মাথায়, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে রিসালাতের মর্যাদায় ভূষিত করলেন। হিদায়েত ও হকের দীন দিয়ে তাকে বিশ্বনবী ও শ্রেষ্ঠনবী মনোনীত করলেন। হুকুম দিলেন নিকটাত্মীয়দের সাবধান ও সতর্ক করতে...

তাঁর কাছে আব্বাসের চেয়ে বেশি নিকটতম আর কে আছে?!'

তিনি তাঁর খেলার সঙ্গী, সবচেয়ে প্রিয় বাল্যবন্ধু, অন্তরঙ্গ সুহৃদ আবার তাঁর পিতার আপন ভাই—চাচা।

কিন্তু আব্বাস, যিনি পিতার সূত্রে কওমের নেতৃত্ব এবং হাজীদের পানি পান করানোর মতো আকর্ষণীয় পদ পেয়েছেন, কওমের কাছে অবহেলিত হয়ে যেতে পছন্দ করলেন না। তার আগ্রহ হলো কওমের মধ্যে তার নেতৃত্ব বহাল থাকুক... সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দিলেন না ঠিকই...

তবে তিনি মনে মনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাই ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই ভাবতে থাকলেন। তাঁর ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন। তাঁর যেকোনো কষ্ট ও বিপদ হলে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতেন এবং সকল প্রকারের সহযোগিতা দান করতেন।

একটি উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আকাবার রাতে আনসার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিরকের ওপর বহাল থাকা চাচা আব্বাস।

এমনকি সেখানে প্রথম কথাও তিনিই বলেছিলেন। বলেছিলেন,

'হে খাযরাজের বন্ধুরা, মুহাম্মাদ আমাদের কাছে কত আদর ও মর্যাদার মানুষ তা তোমরা জানো। আমাদের কওমের যারা আমাদের বাপ-দাদার আদর্শের ওপর চলছে তাদের নির্যাতন থেকে আমরা তাকে আগলে রেখেছি। তিনি নিজেই তার কওমের গৌরব, মক্কা নগরীর প্রভাব ও দাপট তিনি নিজেই। কিন্তু তিনি সবকিছু ছেড়ে তোমাদের কাছে গিয়ে তোমাদের আশ্রয়ে থাকতে চান।

তোমাদের যদি মনে হয় তোমরা আপন প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারবে, তাহলে তো ভালো। তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে।

আর যদি তোমাদের মনে হয় যে, তোমাদের কাছে যাওয়ার পর তোমরা তার সাহায্য ত্যাগ করে তাকে নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দেবে, তাহলে এখন থেকেই তাকে ছেড়ে দাও। কারণ, তিনি তার কওম ও তার শহরের গৌরব এবং দাপট।'

আনসারীরা তাকে বললেন,

'হে আবুল ফযল, আমরা আপনার কথা শুনলাম।'

এরপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য আমাদের যা ইচ্ছা বাইআত গ্রহণ করুন।'

বাইআত সম্পন্ন হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের অন্ধকারে চাচা আব্বাসের সঙ্গে মক্কায় ফিরে এলেন।

***

কুরাইশের লোকজন যখন বদর যুদ্ধের সংকল্প করল, ভাতিজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ আব্বাসের ভালো লাগল না।

কিন্তু কওমের নেতৃত্ব তাকে বাধ্য করল সে যুদ্ধে অংশ নিতে এবং তাকে বাধ্য করল সেই বারোজনের একজন হতে যারা যুদ্ধের দিনগুলোতে মুশরিক সৈনিকদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেছিল।

***

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আব্বাসের আগের সেই সব সাহায্য-সহযোগিতার কথা মনে রেখেছিলেন। সে জন্যই তিনি সাহাবীদের বলেছিলেন,

'যে আবুল বাখতারী ইবনে হিশামকে সামনে পাবে তাকে যেন হত্যা না করে এবং যে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে সামনে পাবে তাকেও যেন হত্যা না করে। কারণ, এরা দু'জনই বাধ্য হয়ে এসেছে।'

***

বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর নবীর পক্ষে বিজয় নির্ধারণ করলেন, মুশরিকদের অনেকেই নিহত হলো, আবার অনেকেই বন্দী হলো... আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দীদের একজন...

তাকে যিনি বন্দী করেছিলেন তিনি ছিলেন একেবারে হালকা-পাতলা শীর্ণদেহের মানুষ, নাম আবু য়ুসর... অথচ আব্বাস ছিলেন শক্তিশালী উটের মতো বিশালদেহী।

আব্বাস যখন মক্কায় ফিরে এসেছিলেন, তার ছেলেরা তার বন্দী হওয়ার বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চান,

'আবু য়ুসর কীভাবে আপনাকে বন্দী করল? অথচ আপনি চাইলে তো তাকে আপনার আস্তিনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলতে পারতেন।'

তিনি এর জবাবে বললেন,

'আল্লাহর কসম! সে যখন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাকে আমার চোখে হাতির চেয়েও বিশাল মনে হয়েছিল...

সে যখন তার ছোট্ট হাড্ডিসার হাত দিয়ে আমার বাহু চেপে ধরল, আমার মনে হলো যে আমার নখের মাথা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাবে...

এরপর সে আমার হাত প্যাঁচিয়ে পেছনে নিয়ে গেল...
তারপর অন্য হাতটাও একত্র করে রশি দিয়ে বাঁধল...

আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম কিন্তু তাকে বাধা দেওয়া বা ঠেকানোর কোনো ক্ষমতা আমার ছিল না।'

***

আব্বাস বন্দীশিবিরে প্রথম রাত কাটালেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি। রাতে তিনি গভীর কষ্টে কাঁদতে থাকলেন বিরামহীন ভাবে। তার কান্নার আওয়াজ শোনামাত্রই রাসূল অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর চেহারায় কষ্টের চিহ্ন ফুটে উঠল। তা দেখে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিসে আপনার কষ্ট হচ্ছে?'

তিনি বললেন,
'আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের কান্নায়...'

তখন একজন সাহাবী গিয়ে দেখলেন তার রশি খুব শক্ত করে বাঁধা হয়েছে, তিনি রশিটা ঢিল করে দিলেন। এতে আব্বাস থেমে গেলেন...

তার হঠাৎ থেমে যাওয়াতে রাসূলুল্লাহ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,

'ব্যাপার কী! আব্বাসের কান্না থেমে গেল কেন?'

সেই সাহাবী বললেন,
'আমি তার রশি ঢিলা করে দিয়েছি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন,
'তাহলে যাও সকল বন্দীর রশিই ঢিলা করে দাও।'

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নেওয়া শুরু করলেন, তাঁর চাচাকে যখন সামনে আনা হলো তখন চাচা আব্বাস তার কাছে ওযর আপত্তি করে মিনতি করে বললেন, আমার কাছে কোনো অর্থকড়ি নেই।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

'তাহলে সেই মাল কোথায় গেল যা তুমি তোমার স্ত্রী উম্মুল ফযলকে দিয়ে বলেছিলে, আমি যুদ্ধে মারা গেলে এই সম্পদ থেকে ফযলকে এত, আব্দুল্লাহকে এত আর উবাইদুল্লাহকে এত করে দিয়ে দেবে?'

এ কথা শুনে আব্বাস একেবারে 'থ' মেরে গেলেন। কারণ, এ কথা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাঁকে জানাননি।

***

ওহুদ যুদ্ধের দিন... আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব মুশরিকদের সঙ্গে রাসূলের বিরুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি জানান। বরং তিনি রাসূলের কাছে এই মর্মে খবর পাঠিয়ে দেন যে, মুশরিকরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই সংবাদের বিরাট প্রভাব ছিল রাসূল এবং সাহাবীদের ওপর। তারা শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের বয়স কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে। তাঁর চাচা আব্বাস তখনো শিরকের অন্ধকারেই থেকে গেছেন।

একদিনের কথা, আব্বাস তার স্ত্রী উম্মুল ফযলের সঙ্গে বসে রাসূলের উন্নত চারিত্রিক গুণাগুণ আর মহত্তম স্বভাবের আলোচনা করছিলেন। তারা দু'জনই রাসূলের সেই অর্থ সম্পর্কে জেনে যাওয়ার কথা আলোচনা

করছিলেন, যে অর্থ তিনি সারা জগতের মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে স্ত্রীর কাছে জমা রেখে দিয়েছিলেন।

হঠাৎ তিনি স্ত্রীকে বললেন,

'এই ফযলের মা, আমাদের কী হয়েছে, আমরা কেন ইসলাম গ্রহণ করছি না?'

এই কথা শুনে ফযলের মা খুব খুশি হলেন। যেন তিনি স্বামীর মুখ থেকে এ কথাটিই শোনার অপেক্ষায় ছিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই আব্বাস দু'টি বাহন প্রস্তুত করে ফেললেন নিজের ও স্ত্রীর জন্য। এরপর একসঙ্গে মদীনায় রওনা করলেন আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরতের নিয়তে।

***

আব্বাস এবং তার স্ত্রী যখন জাহফা পর্যন্ত পৌঁছলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন রাসূল এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা বিজয়ের জন্য আসছেন...

হঠাৎ এভাবে তাদের দু'জনকে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বেশ অবাক হলেন...

এটা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম চাচাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'চাচা, কী উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন?'

তিনি বললেন,

'আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আগ্রহ আমাদের বের করে এনেছে।'

এরপর তিনি এবং তার স্ত্রী কালেমা পড়ে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করলেন দীর্ঘকাল নাফরমানি করে পালিয়ে বেড়ানোর পর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই মাত্র চাচার মুখে শুনতে পেলেন,

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।’

তাঁর দুই চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়ল। তিনি বললেন,

‘হে চাচা, আপনার হিজরতটাই সর্বশেষ হিজরত, যেমনিভাবে আমার নবুওয়াত সর্বশেষ নবুওয়াত।’

***

সেই মুহূর্ত থেকে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৃঢ়সংকল্প করলেন যে, যত সওয়াবের ও কল্যাণের কাজ এ যাবৎ তার ছুটে গেছে, এখন থেকেই তিনি সেই সকল বিষয়ের ক্ষতিপূরণ করবেন। সে জন্যই তিনি নিজের জান ও মাল লাগিয়ে দিলেন আল্লাহর আনুগত্যে আর রাসূলের সন্তুষ্টির কাজে।

হুনাইনের যুদ্ধের দিন, যখন মুসলিম বাহিনী পরাজিত হচ্ছিল এবং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একা অরক্ষিত রেখে পালিয়েছিল, তিনি তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন হিংস্র সিংহের মতো।

ডান হাতে তরবারি আর বাম হাতে রাসূলের খচ্চরের লাগাম ধরে সামান্য কয়েকজন সাহাবীসহ রাসূলের ওপর আসা মুশরিকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই আল্লাহ তাআলা সাহায্য এবং বিজয় দান করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবূক যুদ্ধের জন্য সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন এবং অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর রাস্তায় দান ও খরচের জন্য আহ্বান জানান। সেই আহ্বানে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের কাছে এসে বস্তাভরা অর্থকড়ি সব ঢেলে দিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ওফাত হয়ে গেল এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হলো তাঁর দুই খলীফা আবু বকর সিদ্দীক

ও উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার ওপর, আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হলেন তাদের মহান উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী।

তারা দু'জনও তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে থাকেন তার মর্যাদার স্বীকৃতি এবং রাসূলের প্রতি বিশ্বস্ততাস্বরূপ।

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনামলে যখন মুসলিম জাতির ওপর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দিলো। পশুর ওলান দুধশূন্য হয়ে পড়ল আর বৃষ্টির অভাবে ব্যাপক ফল ও ফসলের হানি ঘটল। আসমানকে মনে হচ্ছিল যেন তামা দিয়ে তৈরি।

খলীফা উমর মুসলিমদের সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টি-প্রার্থনার নামায এস্তেসকা আদায় করলেন...

কিন্তু বৃষ্টির কোনো নামগন্ধ নেই...
তিনি কয়েকবার করেও কোনো ফল পেলেন না...

তখন তিনি একদল সাহাবীকে বললেন,

'আগামীকাল এমন একজনকে নিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনা করব যে, আশা করি তার বরকতে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি দেবেন ইনশাআল্লাহ।

পরদিন ভোরে তিনি গেলেন আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে। তখন তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তার কাছে আবেদন করলেন,

'চাচা, আমাদের সঙ্গে চলুন, আপনার হাতের উসিলায় ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের বৃষ্টি দেবেন।'

***

আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিশাল মুসলিম জামাত নিয়ে বের হলেন বিনয়, বিনম্র ও বিগলিত হৃদয়ে। তার সামনে ছিলেন আলী ইবনে আবু তালেব, ডানে হাসান এবং বাম দিকে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম, আর পেছনে বিশাল মুসলিম জামাত... দুই রাকাত নামায পড়লেন।

এরপর উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অশ্রুভেজা চোখে রাসূলের চাচার দুই হাত ধরলেন।

তিনি বললেন,

হে রাসূলুল্লাহর চাচা, দুআ করুন।

আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসমানের দিকে দুই হাত উঁচু করে ধরলেন, আল্লাহর ভয়ে তার দু'চোখ থেকে ঝরে পড়ছিল অঝোর ধারার অশ্রু...

তিনি ভালো ভালো দুআ, খাঁটি আশার বাণীসহ অনেক দুআ-প্রার্থনা করলেন...

আর সকল মুমিন তার দুআয় কেঁদেকেটে আমীন আমীন বললেন...

দুআ শেষ হতে না-হতেই...

গভীর কালো অন্ধকারে আকাশ ছেয়ে গেল, মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে এল।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতির ওপর থেকে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ সরিয়ে দিলেন। বৃষ্টির পানি দিয়ে আল্লাহ মানুষকে শীতল করে দিলেন এমন ব্যক্তির হাতে—যিনি ছিলেন হাজীদের সাকি।

তথ্যসূত্র :

১. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা।
২. *হায়াতুস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ২য় খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা; ৪র্থ খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা ও ২৩১ পৃষ্ঠা; ৭ম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা।
৪. *সীরাতু ইবনি হিশাম*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৫. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৪৫০৭।
৬. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৫ম খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-জারাহ ওয়াত তাদীল*, ১৩ শ খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা।
৯. *আত-তারীখুল কাবীর*, ৪র্থ খণ্ড, ০২ পৃষ্ঠা।
১০. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ১ম খণ্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা।
১১. *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, ০৫ পৃষ্ঠা। সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১২. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা।
১৩. *তাহযীবুল কামাল*, ৯ম খণ্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা।
১৪. *তাযরীদু আসমাইস সাহাবা*, ৩১৭ পৃষ্ঠা।
১৫. *তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী*, ২য় খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা।
১৬. *শাযারাতুয যাহাব*, ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।
১৭. *আল-মাআরিফ*, ৭১ ও ৭৪ পৃষ্ঠা।
১৮. *নিকাতুল উময়ান*, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

আনাস ইবনুন্ নযর আন-নাজ্জারী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

আনাস ইবনে নযর সম্পর্কে একটি হাদীস এসেছে, কুরআনের আয়াতও নাজিল হয়েছে।

আপনি কি সেই নক্ষত্র দেখেছেন, যা ইসলামের আকাশে সামান্য সময় আলো ছড়াতে না-ছড়াতেই মৃত্যুর হাতছানি তাকে অদৃশ্য করে দেয়, তীব্র ঝলমলে আলো বিকিরণ করতে করতেই তা হারিয়ে যায়।

তার লালন-পালন ও বিকাশ ঘটেছিল এমন এক আরব পরিবারে, যা ছিল বংশমর্যাদায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ...

পিতা-মাতার বিচারে সবচেয়ে মর্যাদাশীল...
জাহেলী যুগে সর্বাধিক আরব্য নীতি পালনকারী...
ইসলামী যুগে আল্লাহ ও রাসূলের পথে সর্বাধিক কল্যাণকামী...

তিনিই হলেন প্রিয় ও শহীদ সাহাবী আনাস ইবনে নযর আন-নাজ্জারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

***

আনাস ইবনে নযর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, তার সম্পর্কে নবীজির জবানে হাদীস

উচ্চারিত হয়েছে, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের দুই বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন...

তার সম্পর্কে কুরআন নাজিল হয়েছে। যা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত মুমিনরা তিলাওয়াত করতে থাকবেন, রাত-দিনের বিভিন্ন প্রহরে ইবাদতকারীরা নামাযের মধ্যে পড়তে থাকবেন...

এত বড় গৌরবের পর আরও কি কোনো গৌরব থাকতে পারে—যার প্রতি আগ্রহীরা মাথা উঁচু করে তাকাবে...

অথবা কৌতূহলীদের হৃদয় সেদিকে ধাবিত হবে...

এই সম্মান ও মর্যাদার পর আরও কি কোনো মর্যাদা আছে যা অর্জনে সচেষ্ট হবে মর্যাদাবান ব্যক্তিরা?

আনাস ইবনে নযর সম্পর্কিত হাদীসের রয়েছে একটি চমৎকার কাহিনি। তার বিষয়ে অবতীর্ণ কুরআনী আয়াতের ব্যাপারেও রয়েছে একটি অপূর্ব ঘটনা।

***

হাদীসটির কাহিনি,

'আনাস ইবনে নযর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এক বোন ছিলেন, যিনি আরব-নারীদের মাঝে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য এবং কওমের নারী-সমাজের কাছেও ছিলেন উঁচু মর্যাদার অধিকারিণী।

নাম তার নযরের মেয়ে রুবাইয়্যি' (রুবাইয়্যি' বিনতে নযর), ডাকনাম উম্মে হারেসা।

এই উম্মে হারেসার একটি পুত্রসন্তান ছিল, উজ্জ্বল তারুণ্যদীপ্ত সদ্য নওজোয়ান ছেলেটির জ্ঞান-বুদ্ধি কেবলই পূর্ণতা পেতে চলেছে...

সমাজেও মিশতে শুরু করেছে...

স্বভাব-চরিত্রে ইসলামী রং লেগেছে...

বদর যুদ্ধের অল্প কয়েকদিন পূর্বে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পড়লে তিনি তার দিকে কোমল ও স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

– 'হে হারেসা, কীভাবে প্রভাত যাপন করলে?'

– 'আল্লাহর প্রতি খাঁটি বিশ্বাসী মুমিন হিসাবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'হারেসা, ভেবে দেখো, তুমি কী বলছ, সব কথারই কিন্তু হাকীকত থাকে।'

জবাবে হারেসা বললেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَقَدْ عَزَفَتْ نَفْسِيْ عَنِ الدُّنْيَا... فَأَسْهَرْتُ لَيْلِيْ بِالْقِيَامِ ... وَاَظْمَأْتُ نَهَارِيْ بِالصِّيَامِ ...

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার হৃদয় দুনিয়ার লোভ ও মোহমুক্ত,
আমি রাতের নিদ্রাকে দূর করে দিয়েছি নামাযের কিয়াম দ্বারা...
আমার দিনকে তৃষ্ণার্ত বানিয়েছি রোযার সংযম দ্বারা...

যেন আমি জাহান্নামীদের দেখতে পাই তারা কীভাবে আগুনের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে, পুড়ছে আর কীভাবে চিৎকার করে বাঁচার জন্যে আর্তনাদ করছে।'

এরপর তিনি মিনতি করে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, দুআ করুন যেন আমি শহীদ হতে পারি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে দিলেন।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ওই সদ্য তরুণ নওজোয়ানের সাক্ষাৎ হওয়ার অল্প কদিন পরই ঘটল ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের ঘটনা...

জিহাদের ডাকে সর্বপ্রথম সাড়া দিলেন হারেসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু...

ইসলামের প্রথম সেই জিহাদে প্রথম শহীদ হলেন তিনিই।

সন্তান হারিয়ে বৃদ্ধা অসহায় মা ভীষণ অস্থির হলেন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন,
'আমার হারেসা যদি জান্নাতে থাকে, তাকে হারানোর ব্যথায় আমি কাঁদব না, শোক প্রকাশ করব না...

আর যদি সে জাহান্নামে থাকে, তাহলে যতদিন যন্ত্রণা সহ্য করার মতো অন্তর থাকবে এবং অশ্রু ঝরানোর মতো চোখ থাকবে, ততদিন আমি শুধু কাঁদতেই থাকব, কাঁদতেই থাকব।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,
'হে হারেসার মা, জান্নাত তো একটি নয়, অনেক...

তোমার ছেলে হারেসা রয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদার জান্নাত জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চশ্রেণিতে...'

সন্তান হারানো গাম্ভীর্যপূর্ণ বৃদ্ধা মা এ কথা শুনে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন, বারবার চোখের পানি মুছতে থাকলেন...

অন্তরের জ্বালা বারবার গোপন করতে থাকলেন...
মানুষের সমবেদনা ও সান্ত্বনা গ্রহণ করতে থাকলেন...

***

নাজ্জারী বংশের ভদ্রমহিলা যখন তীব্র কষ্টের তিক্ততা ভোগ করছিলেন, যখন তিনি অস্থির ও অস্থিতিশীল মনোভাবের কষ্টে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় একদল মদীনাবাসীর সঙ্গে একটি মেয়ে এসে তাকে বিরক্ত করল এবং খেপিয়ে তুলল।

রেগে গিয়ে তিনি মেয়েটির গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন, যাতে তার দাঁত ভেঙে গেল।

এতে তিনি খুব লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন...

তার ভাই আনাস ইবনে নযর মেয়েটির পরিবারের কাছে ক্ষতিপূরণ হিসাবে 'ফিদয়া' বা অর্থদণ্ড দেওয়ার প্রস্তাব করলেন—যেটাকে স্পষ্ট ভাষায় তারা প্রত্যাখ্যান করলেন...

তখন নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন, তারা এদেরও ফিরিয়ে দিলেন এবং জিদ ধরে জানালেন যে, রাসূলের কাছে এর বিচার চাইবেন।

যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলেন, তিনি ইসলামের সাম্যনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'কিসাস' (দাঁতের বদলে দাঁত ভাঙা)-এর রায় দিলেন।

এ কথা শুনে তার ভাই শোকে যেন পাথর হয়ে গেলেন, আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে উঠলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, উম্মে হারেসার দাঁত ভাঙা হবে?

আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, এটা হতে পারে না, তার দাঁত ভাঙা যাবে না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'হে আনাস, এটা স্বয়ং আল্লাহর ফয়সালা।'

আনাস ইবনে নযর কিছু একটা বলতে যাবেন, তার পূর্বে মেয়েটির কঠোর ও জেদি পরিবারের লোকদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল তারা এখন রেশমের চেয়েও বেশি কোমল এবং তুলার চেয়েও বেশি নরম...

হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন, যেন কোনো গোপন শক্তি তাদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সে কারণেই তারা রাসূলের কাছে এগিয়ে এসে বললেন,

'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাঁর দাঁত ভাঙা যাবে না...

ভাঙা যাবে না...
আমরা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি হে আল্লাহর রাসূল...
আমরা বিচারের দাবি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি হে শ্রেষ্ঠ নবী...’

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস ইবনে নযর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে মুগ্ধ ও কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

‘আল্লাহর এমন অনেক প্রিয় বান্দা আছে, যারা আল্লাহর কসম করলে আল্লাহ সেটা পূরণ করে দেন।’

***

এ ছিল আনাস ইবনে নযর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবান মুবারক থেকে নিঃসৃত হাদীসখানার প্রেক্ষাপট।

আর কুরআনের সেই আয়াত যা তার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেটার রয়েছে একটি ভিন্ন রকম অবস্থা...

বিষয় এই যে, তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি কঠিন এক সমস্যার কারণে, যার সমাধানের সাধ্য তার ছিল না।

ইসলামের সর্বপ্রথম সেই জিহাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শরীক হতে না পারাতে তার মনে বিরাট কষ্ট বোধ হতে থাকল।

বিষয়টি তাকে ব্যথিত ও চিন্তিত করে তুলল, নিজেকে তিনি ধিক্কার দিয়ে বললেন,

‘ছি ছি আনাস!
তুমি রাসূলুল্লাহর প্রথম যুদ্ধেই অনুপস্থিত থাকবে?

কোনো নিশ্চয়তা আছে কি, জীবনে আবার তুমি রাসূলের সঙ্গে এমন জিহাদে অংশ নিতে পারবে—যা আখেরাতের সঞ্চয় ও প্রতিদানের হিসাবে বদর যুদ্ধের বরাবর হবে?

আল্লাহর কসম, যদি মহান প্রভু আমাকে কোনো যুদ্ধে মুশরিকদের মুখোমুখি করে দেন, তাহলে সেদিন আমি দেখিয়ে দেব...'

আনাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরপর আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু কোনো এক ভয়ে তিনি নীরব হয়ে গেলেন।

***

আনাস ইবনে নযর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুশরিকদের মুখোমুখি হওয়ার যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, তারপর অল্প কিছুদিন যেতে না-যেতেই সংঘটিত হলো ওহুদ যুদ্ধ...

ওহুদ ছিল মুসলিম জাতির জন্য ভয়াবহতম এক যুদ্ধ, এতে আল্লাহ তাআলা খাঁটি মুমিনদের চিনিয়ে দিয়েছেন।

এই যুদ্ধের ময়দানে তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন কারা শাহাদাত-প্রত্যাশী বীর সাহসী এবং ফেরদাউস জান্নাতের অতিথি।

এই যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানা রকম শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে হয়।

তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়...
গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়...
তাঁর চেহারা মুবারক আঘাতপ্রাপ্ত ও রক্তাক্ত হয়...
তাঁর ঠোঁট মুবারক কেটে যায়...
তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েন...
মিথ্যাবাদীরা প্রচার করে দেয় যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে...

আর বেশির ভাগ মুসলিম মুজাহিদ সেই মিথ্যা প্রচার বিশ্বাস করে বসে...

সেই সময়ে, আনাস ইবনে নযর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মনে করলেন, আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার পূরণের এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

তিনি রণাঙ্গনের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন, মুসলিম মুজাহিদদের দিকেও তাকিয়ে দেখলেন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেলে সরে পড়েছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুশরিকদের পর্যবেক্ষণ করলেন—তারা রাসূলকে হত্যার উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর জ্বালানো নূরকে তরবারির ধারের আগায় নিভিয়ে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি তখন বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ওযর পেশ করছি রণাঙ্গন ছেড়ে পলায়নকারী মুসলিম মুজাহিদদের কর্মকাণ্ড থেকে।

আমার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি আক্রমণকারী মুশরিকদের থেকে।'

তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কাছাকাছি অস্থির ও চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,

'উমর আল্লাহর রাসূল কোথায়, কেমন আছেন?'

তিনি জবাব দিলেন,
'আমার মনে হয় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।'

তখন আনাস ইবনে নযর রাযিয়াল্লাহু তাআলা বললেন,
'যদি মুহাম্মাদ মরে যান, আল্লাহ তো নিঃসন্দেহে চিরঞ্জীব, তিনি কখনোই মরবেন না...

তিনি শক্ত হাতে তরবারি ধরলেন...
তারবারির খাপ ভেঙে ফেললেন...
রণাঙ্গনের মাঝখানে ঢুকে পড়লেন নির্ভীক, নিঃশঙ্কচিত্তে।

তিনি যখন মুশরিক যোদ্ধাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ছুটে যাচ্ছেন, সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কাছাকাছি দেখে কাছে গিয়ে বললেন,

اَلْجَنَّةُ يَا سَعْدُ الْجَنَّةُ ... وَرَبِّ النَّضْرِ! إِنِّيْ أَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ أُحُدٍ ...

'হে সাআদ, জান্নাত খুব কাছে, খুব কাছে, আমার পিতা নযরের প্রভুর কসম! আমি ওহুদ পাহাড়ের পেছন থেকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি।'

এরপর কোনো দিকে না তাকিয়ে তিনি নির্ভীকভাবে সামনে যেতে লাগলেন।

সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'আমার ইচ্ছা হলো তার পিছ পিছ গিয়ে তার পথে চলে তা-ই করি, যা তিনি করছেন...

কিন্তু তার মতো সেই সংকল্প তো আমি গ্রহণ করতে পারলাম না, তার মতো কোনো কাজই আমি করতে পারলাম না।'

***

যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল। দেখা গেল আনাস ইবনে নযর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হয়ে ওহুদের প্রান্তরে পড়ে আছেন...

তার শরীরে তরবারির আঘাত...

বর্শার আঘাত...

তিরের জখম...

সব মিলিয়ে প্রায় নব্বইটি আঘাত তার শরীরজুড়ে...

মুশরিকরা তার লাশ এমনভাবে বিকৃত করে যে, তাকে চেনার কোনো উপায় ছিল না...

ফলে কেউই তাকে চিনতে পারেনি তার বোন উম্মে হারেসা ছাড়া...

আর তিনিও তাকে শনাক্ত করেছিলেন দৈহিক গঠন দ্বারা, চেহারা দেখে নয়।

***

মহান আল্লাহ আনাস ইবনে নযর আন-নাজ্জারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এক বিরল সম্মানে ভূষিত করেন। তার সম্পর্কে কুরআনের

আয়াত নাজিল করেন—যা রাত-দিনের বিভিন্ন প্রহরে মুসলিম জাতি তিলাওয়াত করেন...

এবং পৃথিবী ধ্বংসের আগ পর্যন্ত তিলাওয়াত চলতেই থাকবে...

আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে নাজিল করেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।' –সূরা আল-আহযাব : (৩৩) ২৩

তথ্যসূত্র :

১. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।

রাফি ইবনে উমাইর আততাঈ
(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)
(মরুর দস্যু)

রাফি ইবনে উমাইর মরুর বালুকণা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ, আর মরুর পথঘাট বিষয়েও সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

মরুর বিখ্যাত ঘাতক ও মরুর দস্যু রাফি ইবনে উমাইর আত-তাঈর খবর জানেন কি?

রাফির সামনে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু তিনি সেদিকে তাকিয়ে দেখেননি এবং কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপও করেননি...

কারণ, তিনি তখন আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে লুটপাট নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, মশগুল ছিলেন দামি দামি উটের পাল ছিনতাইয়ের কাজে...

পাঠক! আপনি ভাববেন না যে, রাফি কোনো গোত্রের সরদার ছিলেন অথবা তার কোনো যুদ্ধের বাহিনী ছিল অথবা তাকে সাহায্য করার মতো কোনো গোষ্ঠী ছিল।

রাফি ওসবের কিছুই ছিলেন না, ওসবের কাছাকাছিও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মরুর সন্তান—এক বেদুইন। নিজেকেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন নিজের সেনাবাহিনী রূপে।

তিনি আরবের বিভিন্ন পরিবারের ওপর লুটপাট ও হামলা চালাতেন একদম একা...

তাদের দামি দামি সম্পদ ছিনতাই করে নিরাপদে একগাদা সম্পদ হাতে ফিরে আসতেন।

***

পাঠক! আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, ওইসব অঞ্চলে—যেখানে রাফি লুটতরাজ চালাত—এমন কোনো সাহসী, বীর-বাহাদূর কি একটাও ছিল না, যে ওই ঘাতককে প্রতিরোধ করে নিজেদের দামি দামি উটগুলো রক্ষা করতে পারে? কেউ কি ছিল না, যে তাকে দমন করতে পারে?

অবশ্যই মরুর সন্তান অর্থাৎ বেদুইনদের মাঝে এমন অনেকেই ছিল যারা রাফির চেয়ে সাহস, বীরত্ব ও ঝুঁকি গ্রহণে কোনো অংশে কম ছিল না...

কিন্তু সমস্যা ছিল অন্যখানে, তারা কেউই মরুর রহস্য সম্পর্কে রাফির মতো জ্ঞানী ছিল না এবং মরুভূমির গভীর প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর মতো ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তাদের কারোরই ছিল না।

অবশেষে আরব জাতির মাঝে তার পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, তিনিই মরুর বালুকণা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ এবং মরুভূমির পথঘাট সম্পর্কে সর্বাধিক দক্ষ।

***

রাফি যখন কোনো কওমের ওপর লুটতরাজ চালানোর সিদ্ধান্ত নিতেন তখন অনেকগুলো উটপাখির ডিম একত্র করে পানি ভরে ফেলতেন। এরপর সেগুলো মরুভূমির পেটের মধ্যে এতদূর দূরত্বে রেখে আসতেন যেখানে কখনোই কোনো মানুষের পা পড়বে না।

এরপর ইচ্ছামতো কোনো অঞ্চলে লুটপাট করে তাদের উটের পাল নিয়ে বিপজ্জনক ও গভীর মরুভূমির দিকে যেতে শুরু করতেন, যেখানের গোপন রহস্য তিনি কাউকে জানাননি।

মরুভূমির বিপজ্জনক সীমানায় যখন ঢুকে পড়তেন... উটপালের মালিক ও রাখাল যারা লুটকারীকে তাড়া করে এতদূর এসেছিলেন, এখান থেকেই ফিরে যেতেন তৃষ্ণার্ত হয়ে অথবা পথ ভুলে মরে যাওয়ার ভয়ে।

***

হিজরতের নবম বর্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ছোট একটি বাহিনীর আমীর বানিয়ে তাঈ অঞ্চলে পাঠালেন। তাকে নির্দেশ দিলেন ওই অঞ্চলের ইসলাম গ্রহণকারী আরবদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানাতে এবং সে উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে শামে রওনা হতে।

আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে যেন তারা শত্রুদের সঙ্গে মিলিত না হয়।

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর মধ্যে ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বড় বড় সাহাবী।

তারা যেতে যেতে যখন তাঈ অঞ্চলের পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন তারা রাস্তা হারিয়ে ফেললেন এবং উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে ঘুরে জীবননাশের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়লেন...

তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'এই বিপজ্জনক মরুভূমিতে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ রাহবারের ব্যবস্থা করে দাও।'

তাকে বলা হলো,

'একমাত্র রাফি ইবনে উমাইর আত-তাঈ হতে পারে আপনাদের উপযুক্ত পথপ্রদর্শক। কারণ, এই বিপজ্জনক ও সর্বনাশা মরুভূমি ও এর পথঘাট সম্পর্কে সে-ই সবচেয়ে বড় বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও দক্ষ...'

এ কথা শোনার পর তারা রাফিকে ডেকে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চুক্তি করে নিলেন।

***

রাফি ইবনে উমাইর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্বাচিত কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে কাটালেন কয়েকটি দিন ও রাত। এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের তার প্রতি যে আদেশ ছিল তা পালন করেছেন।

এর মধ্য দিয়ে রাফি তাদের শ্রেষ্ঠ চরিত্র, উন্নত স্বভাব আর সর্বোচ্চ আদর্শ রীতিনীতির দেখা পেয়েছেন, যেগুলো তার অন্তরের মধ্যে তাদের ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত করে দিয়েছে...

তিনি দেখেছেন এই মানুষগুলো রাতভর ইবাদতে মশগুল থাকে, আর দিনভর ঘোড়ার পিঠে জিহাদে।

দুনিয়ার কোনো সুখ, সম্পদের প্রতি নেই এদের আগ্রহ, এরা আল্লাহর কাছে চান শুধু পরকালের সুখ-শান্তি আর শুভ পরিণতি।

এই দলকে নিয়ে তার অন্তরের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল, রাফি নিজেই বর্ণনা দিয়ে বলেন,

‘এই দলের সঙ্গে থাকাকালীন আমি তাদের সকলের কথাই চিন্তা করতাম, বিশেষত আবু বকরের দিকে আমি সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতাম। তার সঙ্গীরা প্রত্যেকেই ভালো। তা সত্ত্বেও তার প্রতিই আমার বেশি মনোযোগ ছিল...

যেখান থেকে আমরা বের হয়েছিলাম কাজ শেষে আবার যখন সেই বাড়িঘরের কাছে ফিরে এলাম এবং আমাদের ছেড়ে তাদের চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এল।

আমি অনুভব করলাম যে, তারা চলে যাবেন ঠিকই, তবে আমার হৃদয়টাকে সঙ্গী বানিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি আবু বকরের কাছে ছুটে গিয়ে বললাম,

‘হে আমার ক্ষণিকের পথিক বন্ধু, আমি বারবার লক্ষ করেছি। আপনাদের সকল সঙ্গীর মধ্যে আমি আপনাকে বাছাই করেছি। দয়া করে আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা মুখস্থ করলে আপনাদের মতো হতে পারব এবং আপনাদের দলভুক্ত হতে পারব।

তিনি আমাকে বললেন,
‘তুমি কি তোমার পাঁচ আঙুল ধরে গণনা করতে পারো?’

আমি বললাম,
‘হ্যাঁ।’

তিনি বললেন,
‘তাহলে গণনা করো,

এক. তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।
দুই. তুমি নামায কায়েম করবে...
তিন. যদি তোমার সম্পদ থাকে, তাহলে যাকাত দেবে...
চার. রমযান মাসে রোযা রাখবে...
পাঁচ. সামর্থ্য থাকলে হজ করবে...’

এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
‘মুখস্থ হয়েছে?’

আমি বললাম,
‘হ্যাঁ, হয়েছে। আপনি একবার শুনুন।

এক. আমি সাক্ষ্য দেব যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল...
দুই. নামায, সেটা আমি কখনোই ছাড়ব না...
তিন. যাকাত, আমার সম্পদ থাকলে আদায় করব...
চার. রমযানের রোযা, আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন রাখব...
পাঁচ. হজ, আমার সামর্থ্য হলে পালন করব ইনশাআল্লাহ।’

সেদিন থেকে মরুদস্যু রাফি ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজ জীবনের কালো অধ্যায় গুটিয়ে ফেললেন, আর শুরু করলেন কুরআনের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়... ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত এক আলোকিত জীবনের নতুন অধ্যায়।

***

এগুলো ছিল রাফি ইবনে উমাইরের জাহেলী যুগের বর্ণনা...

এবার হবে তার ইসলাম গ্রহণের পরের কিছু আলোচনা...

খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চার অংশে বিভক্ত এক সেনাদল পাঠালেন শাম দেশে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এই দল ছুটে চলতে থাকল এলাকার পর এলাকা জয় করতে করতে আর আল্লাহর বান্দাদের দীন ইসলামের পথপ্রদর্শন করতে করতে।

যেই জমিনেই তাদের পা পড়েছে, সেখানে তারা আযানের সুউচ্চ ধ্বনি ছড়িয়ে দিয়েছেন চারিদিকে, যেন মানুষ জানতে পারে যে, কায়সারদের (রোমান সম্রাট) পূজা করার দিন শেষ, এখন থেকে আল্লাহর জমিনে ইবাদত চলবে একমাত্র আল্লাহর... শেষ পর্যন্ত এই দল দামেস্কের উচ্চভূমি পর্যন্ত পৌঁছে গেল এরপর সেখান থেকে রওনা করল সিরিয়ার মধ্যভূমিতে অবস্থিত হিমস নগরীর উদ্দেশে।

***

রোমান বাহিনী প্রথমে মুসলিম বাহিনীকে কোনো গণনাতেই ধরেনি। কিন্তু পরে যখন দেখল যে, ওই সেনাদল একের পর এক তাদের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে... তখন তাদের টনক নড়ল এবং অ্যান্টার্কটিকায় তাদের বিশাল সেনাসমাবেশ ঘটাল। কনস্ট্যান্টিনোপল সাম্রাজ্যে সকল

প্রান্ত থেকে তারা সেনা সাহায্য তলব করল। এভাবে সেখানে আড়াই লক্ষ যোদ্ধা সমবেত করা হলো...

এবার সেই শক্তিশালী ও বিশাল বাহিনীকে ঠেলে দেওয়া হলো মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি। তারা এবার রোমানদের হারানো অঞ্চলগুলো একে একে পুনরুদ্ধার করতে থাকল। এবার এই বাহিনী মুসলিম সেনাদলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মতো হুমকি হয়ে গেল।

মুসলিম বাহিনী অবিলম্বে শোচনীয় অবস্থার বিবরণ জানিয়ে মদীনায় দূত পাঠাল এবং খলীফার কাছে দ্রুত সাহায্য পাঠানোর জন্য আর্তনাদ করতে থাকল।

***

সেই সময় খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন ইরাকে, এক বিশাল বিজয়ী বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে সেখানে অবস্থান করছিলেন। খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জরুরিভিত্তিতে পাঠানো দূতের মাধ্যমে তাকে নির্দেশ পাঠালেন,

'শাম দেশে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরিত মুসলিম বাহিনী ভয়াবহ দুর্যোগের মুখোমুখি উপনীত। ধ্বংসের মুখোমুখি এই দলকে সাহায্যের জন্য পত্রপাঠ রওনা করবে...'

খলীফার আদেশে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। রাফি ইবনে উমাইর আত-তাঈ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুসহ দশ হাজার দুর্দান্ত মুসলিম সৈনিককে নিয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন শাম দেশে বিপদগ্রস্ত সৈনিকদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে।

***

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে তখন দু'টি বড় বড় চ্যালেঞ্জ।

এক. এই বিশাল বাহিনী নিয়ে দ্রুততম সময়ে শাম দেশে-সিরিয়াতে পৌঁছা।

দুই. এমন কোনো পথ দিয়ে যাওয়া, যে পথে রোমান বাহিনীর সামনাসামনি না হতে হয়। যেন বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়।

এই দু'টি চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়ে তিনি সঙ্গীদের ডেকে পরামর্শে বসলেন। তিনি বললেন,

'কে আছে আমাকে ওই রকম পথ দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

রাফি ইবনে উমাইর আত-তাঈ বললেন,

'মাননীয় আমীর, আমি পারব আপনাকে রোমানদের মুখোমুখি না করে দ্রুততম সময়ে শামে নিয়ে যেতে।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

'কীভাবে নিয়ে যাবে?'

রাফি বললেন,

'কোনো লোকালয়ের পথ না ধরে আমরা যাব সম্পূর্ণ মরুভূমির ভেতর দিয়ে। শুরু করব কারাকির থেকে, সিওয়া ও আরাক পার হয়ে তাদমুর মরুতে গিয়ে শেষ করব।

'তাদমুর' পৌঁছলেই সিরিয়ার মধ্যবর্তী হিমসের পেছন দিকে পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকেই আপনি মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

এতে রোমান বাহিনী আমাদের দেখে চমকে উঠবে। বুঝেই উঠতে পারবে না যে, আমরা কি আসমান থেকে নামলাম নাকি মাটি ভেদ করে উঠলাম।'

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

'আমরা উট, ঘোড়া ও মানুষ মিলিয়ে বিশ হাজারের বেশি। এই বিশাল বাহিনীর পানির ব্যবস্থা হবে কোত্থেকে বিপজ্জনক মরুভূমিতে?'

রাফি ইবনে উমাইর আত-তাঈ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, 'আল্লাহ যতক্ষণ আছেন আমাদের সঙ্গে, এ দায়িত্ব আমার।'

***

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নেতৃস্থানীয় সেনা অফিসারদের কাছে পরামর্শ চাইলে তারা বললেন,

'মাননীয় সেনাপতি, মরুভূমির পথে যাবেন না। কেননা, কারাকির থেকে সফর শুরু করে সিওয়া অতিক্রম করতে সময় লাগবে কমপক্ষে পাঁচ দিন...

তা ছাড়া এটা এমন বিপজ্জনক মরুভূমি, যেখানে পানির একটি কাতরাও পাওয়া যাবে না, চলার মতো কোনো পথও নেই...

এই বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করা একা কোনো আরোহীর পক্ষেই প্রায় অসম্ভব, সেখানে এত বিশাল বাহিনী নিয়ে এই পথ পাড়ি দেওয়ার চিন্তা আত্মহত্যার শামিল। অতএব আমাদের পরামর্শ হলো, এই মরুভূমির পথ ধরে আপনি নিজের ও এই বাহিনীর জীবন ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেবেন না।'

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ বললেন,

'হে মুসলিম জাতি, পরস্পর মতপার্থক্য করা যেন তোমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য না হয় এবং তোমাদের বিশ্বাস যেন দুর্বল না হয়... মনে রেখো আল্লাহর সাহায্য আসে নিয়তের স্তর বুঝে...

সওয়াব ও প্রতিদান আসে কষ্টের পরিমাণ হিসাবে...

মুসলিম যতক্ষণ আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী থাকে ততক্ষণ তার অন্য কোনো কিছুর পরোয়া করা উচিত নয়।

তা ছাড়া রাফি ইবনে উমাইর আমাদের সঙ্গে আছে। আর এখানে আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে মরুর পথঘাট ও গতিবিধি সম্পর্কে তার দক্ষতার কথা না জানে!'

এরপর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ সিদ্ধান্ত জানিয়ে বললেন,

'আল্লাহর কসম! এই মরুভূমির পথ ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। কারণ, আমি খলীফার নির্দেশ দ্রুততম সময়ের মধ্যে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আরও সংকল্প করেছি যে, মুসলিম বাহিনীকে রোমান বাহিনীর থাবা থেকে উদ্ধার করব।'

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনা অফিসারগণ তার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বললেন,

'আল্লাহ তাআলা আপনাকে বীরত্ব, সাহস ও অভিজ্ঞতা দান করেছেন, অতএব আপনার কাছে যেটা ভালো লাগে সেটাই করুন।'

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ বললেন,

'জাযাকুমুল্লাহু খইরান—আল্লাহ আপনাদের কল্যাণ করুন।'

এরপর তিনি রাফিকে বললেন,

'তোমার করণীয় যা আছে শুরু করে দাও।'

রাফি বললেন,

মাননীয় সেনাপতি, আমার জন্য বড়, মোটা ও বয়স্ক কুড়িটা উটনীর ব্যবস্থা করুন।

দেওয়া হলো তাকে বিশটা উষ্ট্রী...

সেগুলোকে তিনি তৃষ্ণার্ত বানালেন। খুব তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যাওয়ার পর সেগুলোকে নিয়ে গেলেন পানির কাছে, পেটভরে পানি খেয়ে নিল।

এরপর সকল উটনীর ঠোঁট কেটে দিলেন এবং রশি দিয়ে মুখ বেঁধে দিলেন, যেন জাবর কাটতে না পারে। এরপর সব উটনীর পিঠে যতটা সম্ভব পানির বোঝা চাপিয়ে দিলেন। ফলে বিশটা উটনীর পেটভর্তি পানির সঙ্গে পিঠভর্তি পানিও যুক্ত হয়ে গেল।

***

প্রস্তুত সেনাদল এবার চলতে শুরু করল। দ্রুতগতিতে অবিরাম চলতে থাকল।

যখনই তারা যাত্রাবিরতি করছিলেন, রাফি ইবনে উমাইর চারটি উটনী জবাই করছিলেন। সেই চার উটনীর পাকস্থলী থেকে পানি নিয়ে দুধ মিশিয়ে সব ঘোড়াকে পান করান। আর সৈনিকদের খাওয়ান সেই জবাইকৃত চার উটনীর পিঠের পানি।

***

সেনাদল যখন সফরের পাঁচ স্তর অতিক্রম করলেন এবং সকল পানি শেষ হয়ে গেল এবং রাফি বাধ্য হলেন সেনাদলকে পানির উৎসের সন্ধান জানাতে, সেই সময় আল্লাহর ইচ্ছায় রাফি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চোখ মারাত্মক রোগাক্রান্ত হয়ে ফুলে গেল, তিনি প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তার কাছে এসে বললেন,

'রাফি, একি অবস্থা... আমরা সব উটনী জবাই করে খেয়ে ফেলেছি, সব পানিও শেষ করে ফেলেছি, এখন আমাদের কী হবে? সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটা মানুষ পিপাসায় মরতে বসেছে...'

রাফি বললেন,

'চারদিকে তাকিয়ে দেখুন, দুই স্তনের মতো আকৃতির দু'টি পাহাড় দেখতে পাওয়া যায় কি না?'

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন,

'হ্যাঁ, রাফি... ওইতো আছে, ওইখানে দেখা যাচ্ছে।'

রাফি বললেন,

'আর কোনো চিন্তা নেই...

ওই দুই পাহাড়ের মাঝে একটি 'আওসাজ' গাছ আছে। বেগুন গাছের মতো কাঁটাযুক্ত। সেই গাছ খুঁজে বের করুন।'

সবাই মিলে খুঁজলেন কিন্তু কেউ আওসাজ গাছটি খুঁজে বের করতে পারলেন না।

রাফি রাগ হয়ে বললেন,

'আরে বোকার দল, গাছটি এখানেই আছে। যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতেই হবে। যদি বের করতে না পারো, তাহলে তোমরাও মরবে আমাকেও সাথে করে নিয়ে যাবে।'

এরপর তারা শুরু করলেন চিরুনি অভিযান। ব্যাস, কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেলেন আওসাজ গাছের সন্ধান। দেখলেন গাছটি উপড়ে ফেলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে এখনো তার শেকড় মাটিতে আছে আর গাছটি কাত হয়ে পড়ে আছে। সকলে সমস্বরে চিৎকার করে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন।

রাফি বললেন,

'ওই গাছের গোড়ায় মাটি খনন করো।' সবাই মিলে খনন করল...

তার নিচ থেকে স্বচ্ছ-নির্মল, সুমিষ্ট পানির ঝরনাধারা বেরিয়ে এল।

সকলেই তীব্র খুশিতে তাকবীর ও তাহলীল ধ্বনি দিতে থাকল।

রাফিকে সকলেই ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাতে থাকলেন। রাফি তাদের বললেন,

'সকল প্রশংসা আল্লাহর... আমার পিতার সঙ্গে ত্রিশ বছর পূর্বে এই স্থান দিয়ে গিয়েছিলাম, এরপর আজ পর্যন্ত আর একবারও এই পথ মাড়াইনি।'

***

সেনাদল যাত্রা অব্যাহত রাখল। তারা দামেস্কের উর্বর ও মনোরম মরূদ্যান 'গুতা'-এর উঁচু উঁচু টিলার কাছে পৌঁছে গেল। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের একটি পতাকা তুলে দিলেন রাফি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে। তাকে নির্দেশ দিলেন পতাকাটি সেখানে গেঁড়ে দিতে। তিনি গেঁড়ে দিলেন। ওটার নাম 'আল-উকাব'।

এরপর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাহিনী চারদলীয় মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলো—যারা এতদিন তার আগমনের অপেক্ষা করছিল।

তারা ইয়ারমূকের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, যেখানে মহান আল্লাহ মুশরিক দলের নাক কেটে লাঞ্ছিত করে দিয়েছেন আর ইসলামের পতাকা সমুন্নত করে দিয়েছেন।

আর এটা ছিল ইতিহাসের সর্ববৃহৎ মীমাংসাকারী যুদ্ধের একটি।

***

পরিশেষে... আপনি জানেন কি, রাফি ইবনে উমাইর অল্প কিছুকাল পূর্বে যার উপাধি ছিল 'মরুর দস্যু' তিনিই হয়ে গেছেন 'রাফি আল-খাইর'—শ্রেষ্ঠ রাফি?

আপনি জানেন কি, এই উপাধিতে তাকে ভূষিত করার কারণ, দরিদ্রদের প্রতি তার সীমাহীন দান ও অনুগ্রহ?

তিনি চেষ্টা করেন, তিন মসজিদের লোকদের নিজের ঘাম ঝরানো উপার্জনের অর্থ দিয়ে খাবার খাওয়াতে। আর তিনি নিজে একটিমাত্র পোশাকে থাকেন সন্তুষ্ট।

সেই এক পোশাকেই থাকেন বাড়িতে...
সেই পোশাকেই যান মসজিদে...

প্রিয় পাঠক, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই...

কারণ, রাফি ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিছু সময়ের জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদরাসায়।

তার হৃদয়ে সে সময় জ্বলে উঠেছিল ঈমানের একঝলক অগ্নিশিখা।

তথ্যসূত্র :

১. *আসসীরাতুন নববিয়্যা লিবনি হিশাম*, ৪র্থ খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা।
২. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।
৩. *আততাবাকাতুল কুবরা লিবনি সাআদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-মুহাব্বার লিল বাগদাদী*, ১৯০ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ২৫৩৮।
৬. *আল-জারাহ ওয়াত তাদীল*, ২০ শ খণ্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা।
৭. *তারীখু ইবনে আসাকির*, ৫ম খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা।

উসমান ইবনে মাযউন

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

ইবনে মাযউন আল্লাহর আশ্রয়কে অগ্রগণ্য করেছেন অন্য সকল আশ্রয়ের ওপর।

জাহেলী যুগের আরবরা মনে করত জীবনের প্রকৃত সুখ রয়েছে মদের গ্লাসে—যাতে চুমুক দিয়ে পানকারীরা নেশায় মাতাল হয়ে ওঠে।

আর আকর্ষণীয় গায়িকার মধ্যে, মুগ্ধ দর্শক-শ্রোতারা যার অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করে...

এবং উত্তম তাজি ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধের মধ্যে, যেখানে যোদ্ধারা হারাম রক্তপাত ও সম্পদ ছিনতাইকে হালাল বানিয়ে ইচ্ছেমতো খুন আর লুট করতে পারে।

কিন্তু জাহেলী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান আরব উসমান ইবনে মাযউন মনে করতেন ওইসব ফালতু ব্যাপারগুলোর চেয়ে জীবনের আরও অনেক উন্নত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে। আছে বড় বড় লক্ষ্যবস্তু।

এই বিশ্বাসের কারণে তিনি মদকে নিজের জীবনে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন, ফলে এর স্বাদ কেমন এটাই তার জানা ছিল না...

মদপান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

‘সর্বনাশের কথা!...

আমি কি এমন জিনিস পান করব যা আমার বুদ্ধি-বিবেক সুপ্ত করে দেবে...

আমার চেয়ে নিম্নশ্রেণির লোকদেরকে আমার ওপর হাসাবে...

আমাকে বাধ্য করবে অপছন্দনীয় লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে...

আল্লাহর কসম! যতদিন আমার জীবন থাকবে এই রকম বাজে জিনিসের স্বাদ কখনোই গ্রহণ করব না।’

***

জাযীরাতুল আরব যখন ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য-সঠিক ও হেদায়েতের দীন দিয়ে পাঠালেন, উসমান ইবনে মাযউন ছিলেন দীন ইসলাম গ্রহণে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণকারীদের অন্যতম।

তার পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা মাত্র বারোজন।

***

উসমান ইবনে মাযউনের ইসলাম গ্রহণের পেছনে রয়েছে একটি কাহিনি, যা বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা। তিনি বলেন,

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে নিজ বাড়ির আঙিনায় বসেছিলেন এমন সময় তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন উসমান ইবনে মাযউন—রাসূলের দিকে ফিরে না তাকিয়ে, কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি চলে যাচ্ছিলেন আপন মনে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন,

‘হে সায়েবের পিতা, দু’-চারটা কথা বলার জন্য কি আমার কাছে একটু বসা যায় না?’

তিনি বললেন,

'কেন নয়, অবশ্যই।' এ কথা বলেই তিনি সামনে বসে পড়লেন...

যখন তিনি রাসূলের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁকে দেখলেন আকাশের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকালেন এবং কিছুক্ষণ সেখানেই দৃষ্টিকে স্থির করে রাখলেন...

এরপর ধীরে ধীরে দৃষ্টিকে একটু একটু করে জমিনের দিকে নামাতে থাকলেন এবং জমিনে দৃষ্টিকে স্থির করলেন...

এরপর পাশে বসা উসমান ইবনে মাযউন থেকে একটু একটু করে দূরে সরতে থাকলেন এবং সেই স্থানে পৌঁছলেন যেখানে দৃষ্টিকে স্থির করেছিলেন...

তিনি মাথা নাড়াতে থাকলেন যেন তাঁকে যা বলা হয়েছে তিনি তা বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছেন...

ঘটনার প্রতিটি ব্যাপার উসমান ইবনে মাযউনকে হতবাক করে দিলো। তিনি বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে রাসূলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এরপর মনে হলো যে, রাসূলকে যা বলা হয়েছে তার সবকিছু তিনি মুখস্থ করে নিয়েছেন, তখন তিনি একটু একটু করে আকাশের দিকে দৃষ্টি ওঠাতে থাকলেন, যেন দৃষ্টি দিয়ে কারও অনুসরণ করলেন...

এরপর দৃষ্টিকে ঝুলিয়ে রাখলেন তার সঙ্গে যিনি আকাশে লুকিয়ে গেলেন।

যেন তাকে মন ভরে দেখে বিদায় জানালেন।

এতক্ষণ পর তিনি উসমান ইবনে মাযউনের দিকে ঘুরে বসে তার দিকে ফিরে তাকালেন।

***

তখন উসমান ইবনে মাযউন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে গভীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। পরে বললেন,

'হে মুহাম্মাদ! ইতিপূর্বে আমি বহুবার আপনার সঙ্গে বসেছি কিন্তু আজ আপনাকে যা করতে দেখলাম আর কখনো এমন দেখিনি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,
'উসমান, তুমি কি খেয়াল করে দেখেছ সবকিছু?'

বললেন,
'হ্যাঁ, সবকিছু খেয়াল করেছি।'

তখন রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'এইমাত্র আমি যখন বসে ছিলাম আমার কাছে আল্লাহর পাঠানো দূত জিবরীল এসেছিলেন।'

উসমান ভীষণ চমকে উঠে বললেন,
'আল্লাহর পাঠানো দূত?'

রাসূল বললেন,
হ্যাঁ।

উসমান জিজ্ঞাসা করলেন,
'তিনি কী বললেন আপনাকে?'

তিনি জবাব দিলেন, তিনি আমাকে বলেছেন,

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করেত আদেশ করেন এবং অশ্লীলতা, খারাপ কাজ ও অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন—যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।' –সূরা আন নাহল : (১৬) ৯০

উসমান বললেন,
'ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন!!

অশ্লীলতা, খারাপ কাজ ও অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন!!

বাহ! কী চমৎকার বিষয় নিয়ে এসেছেন, সকল কল্যাণের নির্যাসের আদেশ দিয়েছেন, আর সকল মন্দের শেকড় থেকেই বাধা দিয়েছেন!'

***

উসমান বলেন, তাঁর কথাগুলো শোনামাত্রই আমার অন্তরের মধ্যে ঈমান ও বিশ্বাস স্থির হয়ে গেল। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে নিজের জীবন এবং সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় ও আপন হয়ে গেলেন।

তখন আমি ইসলাম কবুল করলাম এবং রব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমার সঙ্গে আরও ইসলাম গ্রহণ করল আমার ছেলে সায়েব এবং আমার দুই ভাই কুদামা ও আব্দুল্লাহ।

***

কুরাইশের লোকজন একেবারে শুরুতে ইসলাম গ্রহণকারীদের ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়নি...

শুরুর দিকে তারা মুহাম্মাদকে পাশ দিয়ে যেতে দেখলে শুধু ঠাট্টা করে বলত,

'হাশেমী এক যুবকের সঙ্গে নাকি আসমানের যোগাযোগ হয়, তার ওপর নাকি আসমান থেকে ওহী নাজিল হয়।'

এরপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেবদেবীদের সমালোচনা শুরু করলেন, যেসব দেবদেবীর তারা পূজা করত আল্লাহকে বাদ দিয়ে। এবং তাদের পূর্বপুরুষ যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের জাহান্নামী হওয়ার কথা যখন আলোচনা করেছেন...

তখন থেকেই তারা প্রচণ্ড খেপে যায় ইসলাম আর ইসলাম গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে তখন থেকেই তারা হিংসা ও শত্রুতার আগুন প্রজ্বলিত করে তোলে।

ফলে প্রত্যেকটা গোত্র তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী আছে এবং তাদের ওপর নানা রকম নিষ্ঠুর ও অমানবিক নির্যাতন চালাতে থাকে। চাবুক মেরে তাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে...

আগুন দিয়ে তাদের শরীর ঝলসে দেয়...

মক্কার গনগনে উত্তপ্ত বালুর মধ্যে তাদের ফেলে রাখে, তাদের নতুন দীন থেকে বাপ-দাদার ধর্মে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চোখে সাহাবীদের দুর্গতি ও দুর্দশা দেখে দুঃখে তার কলিজা ফেটে যায়। তাদের কষ্ট দেখে তাঁর অন্তরে আগুন জ্বলতে থাকে।

তিনি কিছুই করতে পারেন না, তাদের শুধু এই সান্ত্বনাবাণীটুকু শোনানো ছাড়া,

'ধৈর্য... ধৈর্য, একটুখানি ধৈর্য ধরে থাকো, জান্নাত তোমাদের নিশ্চিত ঠিকানা।'

এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে হাবাশায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করলেন, একদল মুমিন অনুমতি পেয়েই সেখানে রওনা করলেন স্বদেশ, স্বজন সবকিছুর মায়া ছেড়ে।

নিজেদের দীনকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় পাড়ি জমালেন হাবাশায়।

হিজরতকারীদের তালিকার শীর্ষে ছিলেন উসমান ইবনে মাযউন, তার ছেলে এবং দুই ভাই।

***

ইসলাম গ্রহণকারীরা মক্কা ছেড়ে হিজরত করে চলে যাওয়ার পর বেশি দিন পার হয়নি, এরই মধ্যে তাদের কাছে একটি মিথ্যা খবর প্রচার হয়ে গেল যে, বেশির ভাগ কুরাইশী ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ বিধানের প্রতি ঈমান এনেছে। হিজরতকারী অনেকেই এই সংবাদ শুনে মক্কায় ফিরে এলেন। তারা জানতে পারলেন না যে, ভাগ্য তাদের জন্য কত রকমের যন্ত্রণা গোপন করে রেখেছে।

মক্কায় যারা ফিরে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

তাদের পা মক্কার মাটি স্পর্শ করামাত্রই কুরাইশের লোকেরা তাদের অভ্যর্থনা জানাল সেই রকমের নির্যাতন দিয়ে যা দিয়ে বিদায় জানিয়েছিল...

তাদের ওপর চাপিয়ে দিলো সেই কষ্ট ও জুলুম, যা ছিল অসহনীয়।

নিরুপায় হয়ে উসমান ইবনে মাযউন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের পিতা, শীর্ষ কুরাইশী নেতা, বনূ মাখযূমের সরদার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কারণ তাদের দু'জনের মাঝে বেশ পুরনো কিছু সম্পর্কের বন্ধন ছিল।

***

উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার আশ্রয়ে জীবন কাটাতে লাগলেন এবং তার আশ্রয়ে চরম শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে সময় পার করতে থাকলেন। কিন্তু এই নিরাপত্তায় থাকার ব্যাপারটি তার কাছে ভালো লাগছিল না।

তার নিরাপদ জীবনকে দুর্বিষহ করে দিচ্ছিল এই বিষয়টি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কুরাইশের নির্যাতন ভোগ করছেন, তার অন্য দীনি ভাইয়েরা জুলম সহ্য করছেন...

যার কারণে তিনি নিজেকে স্বার্থপর, কাপুরুষ ও দুর্বল ঈমানওয়ালা বলে অভিযুক্ত করছিলেন...

আর বিবেক-দংশনের ছাইচাপা আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছিলেন।

***

দেখা যাক উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই মানসিক সংকট বর্ণনা করতে গিয়ে কী বলেন। তিনি বর্ণনা করেন,

আমি যখন রাসূলের সাহাবায়ে কেরামকে নানান নির্যাতন ভোগ করতে দেখলাম অথচ আমি তখন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার আশ্রয়ে বেশ নিরাপদে সময় কাটাচ্ছিলাম। আমি নিজেকে বললাম,

'ধিক্কার তোমাকে হে ইবনে মাযউন...

একজন মুশরিকের আশ্রয়ে তুমি নিরাপদে জীবন কাটাচ্ছ, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং তাঁর সাহাবীরা আল্লাহর জন্য নানা রকম বিপদাপদ ও কষ্ট ভোগ করছেন, যার কিছুই তোমাকে ভোগ করতে হচ্ছে না।

এতে বোঝা যাচ্ছে তোমার মনের মধ্যে বড় ধরনের সমস্যা আছে এবং তোমার ঈমানের মধ্যে বিপজ্জনক দুর্বলতা আছে।'

আমি ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম,

'হে আবদে শামসের বাবা, আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদানের যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা পরিপূর্ণরূপে পালন করেছেন, আপনার আশ্রয়ে আমি লাভ করেছি শান্তি ও নিরাপত্তা...

আমি চাই আপনার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
'কেন ভাতিজা? আমার কওমের কেউ কি তোমাকে কষ্ট দিয়েছে?'

আমি বললাম,

‘না, কিন্তু আমি আল্লাহর আশ্রয়কে অগ্রগণ্য করছি অন্য সকল আশ্রয়ের ওপর। আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর আশ্রয় নিতে চাই না।’

তিনি বললেন,

‘এটা যদি অনিবার্য হয়, তাহলে আমার সঙ্গে চলো মসজিদে। কুরাইশের লোকদের সামনে আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দাও। যেমনিভাবে ঘোষণা দিয়ে তাদের সামনে তুমি আমার আশ্রয়ে এসেছিলে।’

আমরা একসঙ্গে মসজিদে হাজির হলাম। সেখানে ওয়ালীদ ঘোষণা করলেন,

‘হে আমার কওম, এটা উসমান ইবনে মাযউন, আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দিতে এসেছে।’

আমি বললাম,

‘তিনি ঠিক বলেছেন, তিনি যথার্থ দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি উত্তম আশ্রয়দাতা। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর আশ্রয় গ্রহণ করব না। এ জন্য তার আশ্রয় ফিরিয়ে দিলাম।’

***

উসমান ইবনে মাযউন বলেন,

সেখান থেকে বের হয়ে গেলাম, কুরাইশের একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, মজলিসের মধ্যমণি ছিলেন কবি লাবীদ। তিনি উপস্থিত লোকদের তার কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলেন।

লাবীদ বলেন,

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ

‘আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছুই বাতিল-মিথ্যা।’

আমি বললাম,

‘সত্য কথা।’

তিনি আবার বললেন,

وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ

'সকল নেয়ামতই একদিন অপসৃত হবে।'

আমি বললাম,
'মিথ্যা কথা, জান্নাতের নেয়ামত কখনো ফুরাবে না, অপসৃত হবে না।'

আমার এই কথা শুনে লাবীদ রাগে ও ক্ষোভে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। তিনি বললেন,

'হে কুরাইশী ভাইয়েরা, আপনাদের কবিতা শোনাতে বসে আজ পর্যন্ত আমাকে কষ্ট পেতে হয়নি। আজ কেন এমন ঘটনা ঘটল?'

উপস্থিত শ্রোতাদের একজন বলল,
'এই লোক আমাদের নির্বোধ লোকদের একজন, এরা আমাদের দেবদেবীদের পূজা ত্যাগ করেছে। আমাদের ধর্ম ছেড়েছে। তার কথায় কষ্ট নেবেন না।'

এবার আমি আমাদের সম্পর্কে এবং আমাদের দীন সম্পর্কে খারাপ মন্তব্যকারী লোকটির দিকে এগিয়ে গেলাম। তার কথার প্রতিবাদ জানালাম। এতে লোকটি খুব জোরে আমাকে একটি চড় মারল। তাতে আমার এক চোখে ভীষণ জ্বালাপোড়া শুরু হলো আর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। ওই চোখ দিয়ে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সেখানেই ছিলেন, তিনি আমাকে বললেন,
'ভাতিজা, তোমার চোখে এই আঘাত লাগা উচিত হলো না।'

আমি বললাম,
'বরং আল্লাহ তাআলার জন্য আমার ভালো চোখটিরও আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া উচিত।'

তিনি বললেন,

'ভাতিজা আমার আশ্রয়ে ফিরে এসো, যদি তোমার ইচ্ছা হয়।'

আমি বললাম,

'আমি আল্লাহর আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোনো আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই না।'

***

সেদিন থেকে উসমান ইবনে মাযউনের ওপর কুরাইশের নিপীড়ন ও নির্যাতনের তীব্রতা ও মাত্রা বেড়ে গেল। তিনি এবং তার সঙ্গীরা কুরাইশের জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়ে উঠলেন। যা তাকে বাধ্য করল মদীনায় হিজরতকারীদের তালিকায় নাম লেখাতে।

মদীনায় যাওয়ার পর তিনি, তার পুত্র এবং ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারা সেই বদর প্রান্তরে নিজেদের সাহস ও বীরত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটান। আল্লাহ ও রাসূলের হক আদায় করেন। এবং অন্য মুসলিম মুজাহিদদের সঙ্গে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন।

***

এর অল্প কদিন পরেই উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অসুস্থ হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন।

তার মৃত্যুর সংবাদ পেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে চলে আসেন ব্যথাভরা মনে...

উসমানের উজ্জ্বল ও পবিত্র কপাল থেকে কাপড় সরিয়ে দেন এবং সেখানে চুমু দেন।

আবারও তার দিকে ঝুঁকে দ্বিতীয় দফা চুমু খেলেন...

তৃতীয় বার ঝুঁকলেন এবং তৃতীয়বারও চুমু খেলেন...

তাঁর উজ্জ্বল চেহারার ওপর গড়িয়ে পড়ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অশ্রুর ফোঁটা। তাঁর কান্নায় কেঁদে উঠলেন উপস্থিত সকল মুসলিম।

***

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক বিখ্যাত সাহাবী উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি...

তার অবস্থান ও ঠিকানা হোক ইল্লিইয়্যীন-এর সর্বোচ্চ স্তরে...

তিনি আল্লাহর আশ্রয়কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন অন্য সকল আশ্রয়ের ওপর...

তথ্যসূত্র :

১. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা।
৫. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ১ম খণ্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।
৬. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা।
৭. *মাজমুউয যাওয়াইদ*, ৭ম খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।
৮. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

কাআব ইবনে মালিক

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

রাসূলের কবি এবং সেই সত্যবাদী তিন আনসারের একজন যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করেছিলেন, আর তাদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাজিল করেছেন।

আজকের কাহিনি, কঠিন এক বাস্তব কাহিনি...

গভীর এক বাস্তবতার কাহিনি...

চূড়ান্ত সত্য, গভীর বাস্তবতা ও উত্তেজনাপূর্ণ এই কাহিনি...

প্রিয় পাঠক! আমার ইচ্ছা ছিল আমি নিজেই এটা বর্ণনা করব...

সেই ইচ্ছা নিয়ে যখন শুরু করলাম, দেখলাম এ কাহিনির চমৎকার সূক্ষ্ম বাঁক, অপূর্ব, আকর্ষণীয় চিত্রগুলো...

উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনাপূর্ণ আবেগগুলো আপনার কাছে তুলে ধরতে অক্ষম আমার বর্ণনা।

সুতরাং আমি ভালো মনে করলাম, যার কাহিনি তার ওপরই বর্ণনার ভার ছেড়ে দিই।

কারণ, বর্ণনা প্রদানে তিনি হবেন আমার চেয়ে উন্নত, তার হৃদয়ের আবেদন অনুভূতি ব্যক্ত করতে তিনিই হবেন অধিক সক্ষম, তার বিবেকের দংশন ও অনুভূতির সূক্ষ্ম চিত্র অঙ্কনের জন্য তিনিই সর্বাধিক যোগ্য।

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবি কাআব ইবনে মালিকের দিকে কান লাগিয়ে রাখুন, তিনি নিজের কাহিনি বর্ণনা করছেন।

***

কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

একমাত্র তাবূক যুদ্ধ ছাড়া সবগুলো যুদ্ধেই আমি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী হয়েছি।

এই যুদ্ধে যখন আমি পিছে পড়ে গেলাম, তখন যুদ্ধে যাওয়ার উপযোগী সার্বিক সক্ষমতা ও সহজতম অবস্থা আমার ছিল।

রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধে যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন, তখন যুদ্ধের বিষয় প্রকাশ না করে গোপন রাখতেন, যেদিক যাবেন ইঙ্গিত করতেন অন্যদিকে। একমাত্র এই যুদ্ধে হয়েছিল ব্যতিক্রম।

সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধের বিষয় গোপন না করার কারণ ছিল এই যে, গরম ছিল তীব্র, আর সফর ছিল অনেক দূরের... বাগানের খেজুর পেকে টস টস করছিল। বাগানের শীতল ছায়া আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল...

***

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলেন এবং অন্য মুসলিমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

আমিও বাজারে যাওয়া শুরু করলাম তাদের সঙ্গে প্রস্তুতি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে...

কিন্তু প্রতিবারই আমি কিছুই কেনাকাটা না করে খালি খালি ফিরে আসতে থাকলাম। মনে মনে ভাবলাম,

'আমি ইচ্ছা করলে যেকোনো মুহূর্তে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম...

আমি এভাবেই ‘প্রস্তুতি নেব’ ‘নিচ্ছি’... করতেই থাকলাম আর সকল মুসলিম তাদের প্রস্তুতি শেষ করে ফেলল। আমার কোনো প্রস্তুতিই নেওয়া হয়নি।

আমার যখন এই অবস্থা তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদের নিয়ে রওনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, আমার ইচ্ছা হলো তাদের পিছে পিছে গিয়ে তাদের ধরে ফেলি—হায়! আমি যদি সেটা করতাম, আমি কিছুই করতে পারলাম না। আমার ভাগ্যে ওগুলো ছিল না।

কিন্তু এর অল্প পরেই আমার মধ্যে ভীষণ অনুশোচনা শুরু হয়ে গেল নিজের কৃতকর্মের ওপর। আমার দুশ্চিন্তা ও ব্যথা আরও বেশি বেড়ে গেল যখন রাস্তায় বের হয়ে দেখতে পেলাম, মুনাফেকীর অভিযোগে অভিযুক্ত যারা এবং যারা অপারগ, এই শ্রেণির মানুষ ছাড়া আর কেউই এখন মদীনাতে নেই।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা মনে করেননি তাবূক পৌঁছার আগ পর্যন্ত। সেখানে পৌঁছার পর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন,

‘কাআব ইবনে মালিকের কী হলো?’

সালামা গোত্রের একজন বললেন,
‘চটকদার পোশাক আর আত্মগর্ব তাকে আটকে রেখেছে।’

এ কথা শুনে মুআয ইবনে জাবাল আপত্তি করে বললেন,

‘তুমি খুবই বাজে কথা বলেছ! ওয়াল্লাহি ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যতটা জানি তিনি ভালো মানুষ, খারাপ কিছুই তার ব্যাপারে আমাদের জানা নেই।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে নীরব হয়ে রইলেন। কোনো কথাই বললেন না।

এরপর আমি খবর জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার উদ্দেশে ফিরে আসছেন, এতে সারা দুনিয়ার দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করল আমার মাথায়। নানা রকমের মিথ্যা বলার কথা আমার মাথায় আসতে থাকল, মনে মনে ভাবলাম,

'কী বলে, কোন ওযর দেখিয়ে আমি তার অসন্তোষ থেকে নিজেকে মুক্ত করব?'

এ ব্যাপারে আমার পরিবারের জ্ঞানীগুণীদের কাছে পরামর্শ চাইলাম কিন্তু তাদের কাছে কিছুই পেলাম না।

আমাকে যখন বলা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে কাছে এসে গেছেন... তখন সব আজেবাজে চিন্তা আমার মাথা থেকে দূরে সরে গেল...

আমার মধ্যে নিশ্চিত বিশ্বাস এসে গেল যে, কোনো মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমি কিছুতেই তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পারব না...

অতএব আমি দৃঢ়সংকল্প করে নিলাম—আমি সত্য কথাই বলব, যা হয় হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছে গেলেন। সফর থেকে ফিরলে তিনি প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়তেন। যথারীতি এবারও সেটাই করলেন।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু'রাকাত শেষ করে ঘুরে বসলেন, তখন আমার মতো যারা এই যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে তারা এসে নিজেদের ওযর পেশ করে তাঁর কাছে হলফ করছেন...

তাদের সংখ্যা ছিল আশির একটু বেশি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মুখের কথা, জাহেরী অবস্থা মেনে নিলেন, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন আর তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন।

এই পর্যায়ে আমি তাঁর সামনে গিয়ে সালাম দিলাম, তিনি ক্রুদ্ধ মানুষের মতো করে মুচকি হাসি দিলেন। তারপর বললেন,

'আসুন।'

তাঁর কাছে গিয়ে আমি সামনে বসে পড়লাম

তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'হে কাআব, তুমি কেন জিহাদ থেকে পিছে পড়লে?
তুমি কি বাহন ক্রয় করেছিলে না?'

আমি বললাম,
'আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে বসতাম, তাহলে অবশ্যই তার অসন্তোষ থেকে বাঁচার মতো ওযর পেশ করতে পারতাম।

কারণ, ভালো যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের যোগ্যতা আমার আছে, আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু নিশ্চিতরূপে জানি যে, যদি আমি আজ মিথ্যা বলে আপনাকে খুশি করে দিই, তাহলে অবশ্যই কাল আল্লাহ আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেবেন...

আর যদি সত্য কথা বলি, যাতে আপনি এখন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু পরে আমি আশা করি আল্লাহর ক্ষমা ওই সত্যের মধ্যেই পাব।

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর শপথ, আমি যা করেছি তাতে আমার কোনো ওযর-অপারগতা ছিল না।

ইতিপূর্বে আমি আর কখনো এত সামর্থ্যবান ছিলাম না, আর কখনো যুদ্ধে যাওয়া আমার জন্য এত সহজ ছিল না। তার পরও আমার যুদ্ধে যাওয়া হয়নি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'হ্যাঁ, এই লোকটি সত্য কথা বলেছে।'

এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,
'ঠিক আছে যাও, আল্লাহর ফয়সালা আসার অপেক্ষা করতে থাকো।'

তখন আমি উঠে পড়লাম এবং মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলাম।

***

কাআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আমার কওমের কিছু লোক আমার পিছে পিছে এসে বলল, আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে তুমি কোনো অপরাধ করেছ বলে আমাদের জানা নেই, তাহলে কেন তুমি অন্যদের মতো রাসূলের কাছে ওযর পেশ করতে পারলে না...

এভাবে তারা আমাকে তিরস্কার করতে থাকল, যার ফলে আমার মনে হতে লাগল যে, আমি আবার রাসূলের কাছে ফিরে গিয়ে আমার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিই... কিন্তু আমি একটু পরে তাদের জিজ্ঞাসা করলাম,
'আমার মতো আরও কেউ কি এমন বলেছে?'

তারা বলল,
'হ্যাঁ, আরও দু'জন তোমার মতো বলেছে, তাদেরও তোমার মতোই জবাব দেওয়া হয়েছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,
'সেই দু'জন কারা?'

তারা বলল, 'মুরারা ইবনে রাবী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া। তারা দু'জনই বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছেন, দু'জনই নেক মানুষ।'

আমি বললাম,

'আমি ওই দু'জনকে অনুসরণ করব। তারপর চলে গেলাম।'

***

কাআব ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

এরপর আমরা তিনজন, যারা যুদ্ধে যাইনি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সঙ্গে সকলকে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন।

তখন সকলেই আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগল। সকলের আচরণ পাল্টে গেল। আমাদের পরিচিত জগৎটা আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল...

এভাবেই পঞ্চাশটি রাত কেটে গেল।

আমার অন্য দুই সঙ্গী মনমরা হয়ে ঘরে বসে কান্নাকাটি করতে থাকলেন।

আমি ছিলাম তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী এবং শারীরিক দিক থেকে সামর্থ্যবান। যার ফলে আমার বাইরে যাতায়াত চালু ছিল। আমি মসজিদের জামাতে শরীক হতাম, বাজারে ঘোরাঘুরি করতাম, কিন্তু কেউই আমার সঙ্গে কথা বলত না।

আমি যথারীতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসা-যাওয়া করতাম। তিনি নামাযের পরে মজলিসে বসে থাকলে আমি কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিতাম আর মনে মনে খেয়াল করতাম তিনি কি আমার সালামের জবাব দিলেন? তাঁর কি ঠোঁট একটু নড়ল?

আমার খুব ইচ্ছা হতো তাঁর কাছাকাছি দাঁড়ানোর, যেন গোপন চাহনিতে তাকে দেখতে পারি।

আমি যখন নামায শুরু করতাম তিনি আমার দিকে তাকাতেন, আমি তাকালেই তিনি চোখ ঘুরিয়ে নিতেন।

যখন মানুষের উপেক্ষার ধারাবাহিকতা দীর্ঘ হতে থাকল, আমার সংকট যাতনা তীব্র হয়ে গেল... তখন আবু কাতাদার বাগানের দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকলাম। সে ছিল আমার চাচাতো ভাই এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

আমি তাকে সালাম দিলাম... আশ্চর্য সে আমার সালামের জবাব দিলো না! আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

'আবু কাতাদাহ, তোমাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আমি আল্লাহ ও রাসূলকে ভালোবাসি?'

সে নীরব থাকল। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তবুও সে কথা বলল না। আমি আবার বললাম, তখন সে বলল,

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।'

এ কথা শুনে আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম।

***

এরপর ঘটল এমন এক অঘটন যা ছিল অকল্পনীয়।

'আমি মদীনার বাজারের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, আমার সঙ্গে কেউ কোনো কথা বলে না... হঠাৎ দেখলাম সিরীয় অনারব, অমুসলিম এক 'নাবাতী' বলছে,

'কেউ কি কাআব ইবনে মালিককে দেখিয়ে দেবে?'

বাজারের লোকজন আমাকে দেখিয়ে দিলো।

ওই নাবাতী সোজা আমার কাছে এসে গাস্‌সান বাদশাহর একটি চিঠি দিলো।

দেখলাম সেখানে লেখা,

'জানতে পারলাম আপনার প্রতি আপনাদের নবী অসন্তুষ্ট, আমাদের সঙ্গে হাত মেলান আমরা সকল প্রকার সহযোগিতা দেব।'

এই চিঠি পড়ার পর আমি বললাম,
'এই পরীক্ষাতেও পড়তে হলো?....'

এরপর চিঠিটা এক জ্বলন্ত চুলার মধ্যে ফেলে দিলাম, আর সেটা পুড়ে গেল।

***

কাআব ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'পঞ্চাশ রাতের চল্লিশ রাত যখন পার হয়ে গেল... রাসূলের পাঠানো এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললেন,

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে হুকুম করেছেন, স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকতে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,
'আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দেব, না কী করব?'

তিনি বললেন,
'তালাক নয়, শুধু দূরে থাকতে হবে তার থেকে।'

আমার অন্য দুই সঙ্গীর কাছেও একই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

আমার স্ত্রীকে বললাম,
'তোমার অভিভাবকের কাছে গিয়ে থাকো, যতক্ষণ এ বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালা না আসে।'

তিনি চলে গেলেন তার পরিবারের কাছে।

হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, হিলাল একেবারে চলাফেরায় অক্ষম মানুষ, তার সেবা করার কেউ নেই। আমি তার সেবার জন্য থাকতে পারব কি?'

রাসূল অনুমতি দিয়ে বললেন,

'থাকতে পারো অসুবিধা নেই। তবে তাকে কাছে আসতে দেবে না।'

তিনি বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি সেই যে বাড়ি ঢুকেছেন সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত শুধু কান্নাকাটি করেই যাচ্ছেন।'

তখন আমার পরিবারের কিছু লোক আমাকে বললেন,

'তুমি যদি তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইতে, তিনি নিশ্চয় অনুমতি দিতেন যেমন হিলাল ইবনে উমাইয়াকে অনুমতি দিয়েছেন।'

আমি বললাম,

'কিছুতেই আমি তা করব না। আমি একজন যুবক মানুষ, কে জানে রাসূল কীই-বা বলেন!'

***

কাআব ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

এরপর আরও দশ রাত অপেক্ষা করলাম, আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়ে গেল।

সর্বশেষ অর্থাৎ পঞ্চাশতম রাতের ফজর নামায আমার বাড়ির আঙিনায় যখন আদায় করলাম, বিশাল পৃথিবী আমার কাছে সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে আমিও ভীষণ সংকুচিত হয়ে পড়েছিলাম।

একটি পাহাড়ের ওপর থেকে উচ্চ আওয়াজে এক চিৎকার ভেসে এল,

'হে কাআব ইবনে মালিক, সুসংবাদ নাও...

হে কাআব ইবনে মালিক, সুসংবাদ নাও...

এই আওয়াজ আমার কানে পড়ামাত্রই আল্লাহর জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম...

আমি বুঝে গেলাম যে, সংকট কেটে প্রশস্ততা এসে গেছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সংবাদ সাহাবীদের কাছে ঘোষণা করেছেন।

সবাই আমাকে সুসংবাদ শোনানোর জন্য ছুটতে থাকল। সর্বপ্রথম এলেন একজন অশ্বারোহী। তিনি অন্য দুই সঙ্গীর কাছেও গেলেন।

আমার কাছে যখন ওই ব্যক্তি এলেন, যার আওয়াজ আমি শুনেছিলাম, খুশিতে আমি আমার গায়ের চাদর দু'টি তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম, ওই চাদর দু'টি ছাড়া সে সময় আমার আর কোনো পোশাক ছিল না।

আমি দু'টি চাদর ধার করে পরলাম এবং ছুটতে ছুটতে চলে গেলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে।

মুসলিম ভাইয়েরা দলে দলে আমার তওবা কবুল হওয়ার উপলক্ষে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। তারা বললেন, অভিনন্দন তোমাকে হে ইবনে মালিক, আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করলাম...

দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন আর তাঁকে ঘিরে চারপাশে বসা সাহাবায়ে কেরাম, তাঁর চেহারা মুবারক পূর্ণিমার চাঁদের মতো আলোকিত হয়ে আছে।

আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি আনন্দে ঝলমলে চেহারায় বললেন,

'হে কাআব, সুসংবাদ গ্রহণ করো জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনের।'

আমি বললাম,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে?'

তিনি বললেন,
'বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে।'

আমি বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তওবা করেছি যে, আমার সকল সম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য দান করে দিলাম।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'হে কাআব, কিছু সম্পদ তোমার জন্য রেখে দাও, সেটাই উত্তম।'

আমি বললাম,

'খাইবারের সম্পদ রেখে বাকি সব দান করে দিলাম।'

আমি আবার বললাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ... আল্লাহ তাআলা আমাকে সত্যের কারণে নাজাত দান করেছেন, সুতরাং আমার আরও একটি তওবা হলো—যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আমি সত্য কথা বলব। সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না।

***

আল্লাহ তাআলা রাসূলের কবি কাআব ইবনে মালিক আল-আনসারীর প্রতি আপন সন্তুষ্টি দান করুন...

তিনি ইসলামের প্রতি সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করেছেন অস্ত্র দিয়ে এবং কাব্য দিয়ে...

আল্লাহ তাআলা তার এবং অন্য দুই সঙ্গী সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাজিল করেছেন, যা দিনে ও রাতে তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত চলতে থাকবে।

তথ্যসূত্র :—

১. *তারীখু ইবনি আসাকির*, ১৪ শ খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা।
২. *উসদুল গাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা।
৩. *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৮ম খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা।
৫. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা।
৮. *শাযারাতুয যাহাব*, ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।
৯. *খিযানাতুল আদব*, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা।
১০. *আনসাবুল আশরাফ*, ১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা।

তামীম আদ-দারী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

তামীম আদ-দারী ছিলেন রাসূলের যুগে কুরআন সংকলনকারী পাঁচ সদস্যের অন্যতম।

লাখাম আল-কাহতানিয়া গোত্র বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর ভাগ্যবতী ইয়েমেন ত্যাগ করে নতুন করে আবাস গড়ে তোলে শাম দেশে...

ওই গোত্রের একদল আবাস গড়ল মরুর ঘূর্ণায়মান ও বালুময় টিলাবেষ্টিত প্রান্তরে, আর অন্যদল বসত গড়ল বাইতুল মুকাদ্দাসে।

একটা সময় পর্যন্ত এদের বলা হতো 'বাইত লাখাম' (লাখাম পরিবার)।

ধীরে ধীরে 'লাখাম' শব্দের বিকৃতি ঘটিয়ে বলা হয়, 'বাইত লাহাম' (পরে বেতেল হেম)।

বাইতুল মুকাদ্দাসে আবাস গড়ে তোলা লাখাম গোত্রীয়রা ধীরে ধীরে সংযোগ গড়ে তোলে প্রতিবেশী রোমানদের সঙ্গে। এ কারণেই তাদের মধ্যে অনেকেই ওই রোমানদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে, আবার অন্যরা হয়ে যায় মুশতারি নক্ষত্রের পূজারি। শাম দেশের উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত উকাইসির দেবী-মন্দিরে এরা তীর্থযাত্রা করত।

তামীম ইবনে আউস ইবনে খারিজা আদ-দারী আল-লাখমী ছিলেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এবং তিনি খ্রিষ্টধর্মে সাধনা, পড়াশোনা ও গবেষণা করে অনেক উন্নতি করেছিলেন... শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে পড়েছিলেন বেতেল হেমের প্রধান পাদরি।

***

কোনো একদিনের ঘটনা, পাদরি তামীম দারীর খুব প্রয়োজন দেখা দেয় পার্শ্ববর্তী গ্রামে যাওয়ার। তিনি তার মোটা কালো পশমি পাদরির কোট পরে কোমর বেল্ট বেঁধে নেন। গলায় বাঁধেন রুপালি টাই। এরপর মাথায় পরেন তার ছোট্ট টুপি। তারপর ওই গ্রামের উদ্দেশে রওনা করেন...

এরপর যখন রাত গভীর হলো, তখন এমন এক ঘটনা ঘটল যা তিনি সারা জীবনেও ভুলতে পারেননি। চলুন যাই তামীম দারীর কাছে, দেখি তিনি তার জীবনের অবিস্মরণীয় সেই ঘটনার বিবরণে কী বলেন।

***

তামীম আদদারী বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন নবী ও রাসূল হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তখন আমি মাতৃভূমি ইয়েমেনের বসবাস ত্যাগ করে শাম দেশে চলে এসেছি।

সেই সময় আমি একদিন বিশেষ প্রয়োজনে পাশের গ্রামের উদ্দেশে বের হলাম। এক গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়ি ঢালের কাছে পৌঁছতেই রাত ঘনিয়ে এল।

একাকী এই নির্জন অন্ধকারে আমার কেমন যেন শঙ্কা বোধ হতে থাকল। মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গেল।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে আরবরা জিনজাতির কাছে আশ্রয় চেয়ে যে কথাটি বলে থাকে, আমার সেটা মনে পড়ে গেল। তাই আমি চিৎকার দিয়ে বললাম,

'আজ রাতে আমি এই উপত্যকার প্রধান জিনের আশ্রয় গ্রহণ করলাম।'

এরপর আমি শোয়ার জন্য বিছানায় গেলাম, হঠাৎ একটি কথা শুনতে পেলাম, কে বলছে তাকে দেখতে পেলাম না। যা হোক আমাকে লক্ষ্য করে বলা কথাটি ছিল এরূপ,

'আল্লাহর কাছে পানাহ চাও এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করো, আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণকারীকে জিনরা কোনো কিছু করতে পারে না।'

আমি ওই অদৃশ্য আওয়াজকে লক্ষ্য করে বললাম,

'আমি আল্লাহর নামে কসম করে আপনাকে বলছি, আপনি কি সত্য বলছেন?'

তিনি বললেন,

'আখেরী নবী এবং উম্মী নবীর আবির্ভাব ঘটেছে, আমরা তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর অনুসারী হয়েছি। জিনজাতির চক্রান্তের দিন শেষ হয়েছে, আসমানের আলোচনা শুনতে গেলে এখন তাদের উদ্দেশ্যে উল্কাপিণ্ড ছুঁড়ে মারা হয়। অতএব তুমি রাব্বুল আলামীনের রাসূলের কাছে যাও এবং ইসলাম গ্রহণ করো।'

তামীম আদদারী বলেন,

'আমার মন থেকে ভয় ও অস্থিরতা অনেকখানি কেটে গেল। রাতটি কাটালাম সেই অদৃশ্য কণ্ঠের কথাটি ভেবে ও চিন্তা করে...

আমি স্মরণ করতে থাকলাম সেই কথাগুলো যা পড়েছিলাম তাওরাত, ইঞ্জিলে শেষ নবীর আগমন বিষয়ে।'

তামীম বলেন,

'সকালে আমি আইয়ূব গির্জায় চলে গেলাম। সেখানে থাকতেন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ পাদরি—যার জ্ঞান-গবেষণা ও বুদ্ধি-শুদ্ধির ব্যাপারে ছিল আমার যথেষ্ট আস্থা। তাকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনালাম এবং বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলাম।'

সব কথা শুনে তিনি মন্তব্য করে বললেন,

'অদৃশ্য সেই কণ্ঠের কথা একদম সত্য। কেননা, এই নবীর আবির্ভাব ঘটবে মক্কার জমিন থেকে। তিনি হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। সুতরাং তুমি খুব তাড়াতাড়ি তার কাছে চলে যাও। চেষ্টা করো যেন তোমাকে কেউ পিছে ফেলতে না পারে।'

***

তামীম পাদরির পোশাক খুলে ফেললেন। তার ভাই হিন্দকে সঙ্গে নিয়ে বেতেল হেম থেকে মদীনার পথ পাড়ি দিতে শুরু করলেন। রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাঁর সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে তাঁরই সান্নিধ্যে দুই ভাই বসবাস করবেন—এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে তারা দ্রুত পথ চলতে থাকলেন।

দুই ভাই যখন মদীনায় পৌঁছে গেলেন, তাদের বাহন দু'টি মসজিদে নববীর পাশেই থামিয়ে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গিয়ে ইসলামী রীতিতে সালাম দিলেন এবং তাঁর সম্মুখে তাওহীদের কালেমা উচ্চারণ করলেন। তারা উভয়ে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করলেন।

এই সময় তামীম আদ-দারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আপনার দীনকে বিজয়ী করবেন বিশ্বব্যাপী, আপনার নেতৃত্বের পতাকা ছড়িয়ে দেবেন দিগ্‌দিগন্তে...

আমি আমার স্বদেশ ও স্বজন সবকিছু ফেলে রেখে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। এসেছি একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিবেদিত হয়ে। অতএব আপনি আমাকে আমার গ্রাম জিবরীনের কর্তৃত্ব দান করুন, যখন আল্লাহ মুসলিমদের হাতে বিজয় দেবেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস তাদের শাসনাধীন করবেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'ঠিক আছে, জিবরীন তোমার।'

তামীম বললেন,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা আমাকে লিখিত দিন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই মর্মে একটি লিখিত ঘোষণা দিয়ে দিলেন।

***

এরপর সময়ের চাকা ঘুরতে থাকে। দিনের পর দিন, মাস ও বছর পার হয়ে যায়। মুসলিম সৈনিকদল আল্লাহর প্রশস্ত জমিনের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে একের পর এক অভিযান চালাতে থাকে। ছুটে চলতে থাকে তাদের অশ্ববাহিনীর অগ্রযাত্রা। এই অশ্ববাহিনীর পদতলে একের পর এক পতন ঘটতে থাকে শিরকের দুর্গগুলোর।

রাসূলুল্লাহর শহর মদীনাতে একের পর এক আসতেই থাকে মুজাহিদ বাহিনীর বিজয়ের সুসংবাদ। পনেরো হিজরী পর্যন্ত অবস্থা ছিল এ রকম যে, একটি বিজয় সংবাদের আমেজ ফুরাতে না-ফুরাতেই এসে যেত নতুন বিজয়-সংবাদ।

এই ধারাবাহিকতায় একদিন সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পাঠানো দূত এসে খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জেরুজালেমবাসীর আত্মসমর্পণের সুসংবাদ শোনালেন।

তিনি আরও জানালেন যে, ওই অঞ্চলের সকল মানুষের একান্ত আগ্রহ, খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্বয়ং উপস্থিতিতে বাইতুল মুকাদ্দাস সমর্পণ চুক্তি সম্পাদিত হোক। তাদের ঐকান্তিক কামনা তৃতীয় হারাম এবং প্রথম কিবলার এই নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান খলীফার উপস্থিতি ঘটুক।

খলীফা উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বাধীন ফিলিস্তীনে আগমন করলেন এবং জনগণের আগ্রহের প্রতি সম্মান দেখিয়ে নিজেই বাইতুল মুকাদ্দাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের চুক্তি সম্পাদন করলেন। আল-কুদ্‌স এর শীর্ষচূড়ায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা হলো। আর লাখাম গোত্রের আবাসভূমি 'রুবুউল জাউলান'-এ আযানের সুমধুর সুরের গুঞ্জন ধ্বনিত হলো।

আর তখন লাখাম গোত্রীয় তরুণ তামীম আদ-দারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,

'আমীরুল মুমিনীন, এই তো আল্লাহ তাআলা মুসলিম মুজাহিদদের হাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজয় দান করেছেন। আর এই দেখুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গ্রাম জিবরীনের কর্তৃত্ব আমাকে দিয়ে গেছেন লিখিতরূপে। সুতরাং রাসূলের আদেশ কার্যকর করুন।'

একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন,
'তোমার পক্ষে কি সাক্ষী দেওয়ার কেউ আছে?'

খলীফা উমর বললেন,
'আমি, আমি আছি সাক্ষী দেওয়ার জন্য।'

খলীফা প্রিয় নবীর সেই দানপত্রের নির্দেশ কার্যকর করলেন তামীম দারীর পক্ষে।

***

তামীম আদ-দারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন থেকেই তিনি প্রিয় নবীর মসজিদ মসজিদে নববীকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন। অতি সামান্য প্রয়োজন ছাড়া তিনি কখনোই মসজিদ ছাড়তেন না।

সবকিছু ছেড়ে তিনি কুরআন নিয়ে পড়ে থাকতেন। দিন ও রাত সারাক্ষণ এর তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। এমনকি প্রতি সাত দিনে তিনি একবার করে কুরআন খতম করতেন।

তিনি নিজের জীবনকে আল্লাহর কুরআনের খেদমতে উৎসর্গ করেন।

তিনি ছিলেন রাসূলের যুগে কুরআন সংকলনকারী পাঁচজন সদস্যের অন্যতম।

***

তামীম আদ-দারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইবাদত করতে করতে ইবাদতের মজা ও স্বাদ পেয়ে যান। অনুভব করেন নামাযের অনন্য স্বাদ।

দুনিয়ার অন্য কোনো স্বাদের সঙ্গেই এর কোনো তুলনা খুঁজে পেতেন না।

রাতে তাহাজ্জুদের প্রাণজুড়ানো মজা তিনি খুব উপভোগ করতেন...

তাই তিনি মনপ্রাণ দিয়ে শারীরিক প্রস্তুতি নিয়ে তাহাজ্জুদের প্রতি আত্মনিয়োগ করতেন। এবং কোনোভাবেই এই আমল ছুটতে দিতেন না।

যখন রাত গভীর হতো এবং মানুষ বিছানায় নিজেদের দেহ এলিয়ে দিত। তিনি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠতেন। সুন্দরভাবে অযু করতেন। তার হাজার দিরহাম দিয়ে কেনা চমৎকার রাজকীয় পোশাক জোড়া পরতেন। পূর্ণাঙ্গ সাজসজ্জা গ্রহণ করে সকল বাদশাহর বাদশাহ, রাজাধিরাজ মহান শাহেনশাহ আল্লাহর সামনে দাঁড়াতেন একান্ত নির্জনে তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্যের মজা উপভোগ করতেন।

সারা রাত তাহাজ্জুদে কুরআনের আয়াত নিয়ে পড়ে থাকতেন।

যখনই জান্নাতের আলোচনাসমৃদ্ধ আয়াত পড়তেন, আগ্রহের আতিশয্যে যেন উড়ে যেতেন জান্নাতে।

যখনই জাহান্নামের আলোচনার আয়াত পড়তেন, অস্থির হয়ে উঠতেন যেন জাহান্নামের অগ্নিশিখা তার শরীরের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

একরাতে তিনি পড়লেন মহান আল্লাহর বাণী,

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

'যারা মন্দ উপার্জন করেছে, তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের ওইসব মানুষের মতো বানাব, যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে? তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে? তাদের দাবি কতই-না মন্দ।' –সূরা জাসিয়া : (৪৫) ২১

এই আয়াত তিলাওয়াত করে আল্লাহর আযাবের ভয়ে তার শরীরে কাঁপন শুরু হয়ে গেল।

এই এক আয়াত পড়তে পড়তেই প্রভাত হয়ে গেল।

যতবারই আয়াতটি পুনরাবৃত্তি করেছেন ততবারই কিয়ামতের ভয়ংকর আযাবের কথা স্মরণ করে তার কান্না তীব্র হয়েছে।

রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে তীব্র আসক্ত এই সাহাবী এক রাতে উঠতে পারলেন না। ঘুম ভাঙল না। তিনি নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে নিজেকে এমন শস্তি দিলেন যে, পূর্ণ এক বছর রাতে ঘুমানো বন্ধ করে দিলেন।

***

তামীম আদ-দারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনাতেই বাস করতে থাকলেন। এরপর যখন মজলুম খলীফা উসমান যিননূরাইন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হয়ে গেলেন, রাসূলের জামাতা, তাঁর খলীফা ও প্রিয় সাহাবীর শোকে তিনি নিজের এলাকা শাম দেশে ফিরে চলে গেলেন।

***

আল্লাহ তাআলা আপন সন্তুষ্টি দান করুন আবেদ, সাজেদ এবং জাউলান অঞ্চলে সমাহিত তামীম আদ-দারীর প্রতি...

তার কবরকে জান্নাতী নূরে আলোকিত করুন...
জান্নাতের উঁচু মর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা।
২. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৭৩৭ পৃষ্ঠা।
৩. *আততাবাকাত*, ২য় খণ্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়*, ৫ম খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা। অথবা *আত্তারজামা*, ৮৩৭ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা।
৭. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১১ শ খণ্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা।
৮. *তাহযীবু ইবনি আসাকির*, ৩য় খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা।
৯. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা।
১০. *আল-আলাম*, ২য় খণ্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।

আল-আলা ইবনুল হাযরামী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও ভয়ংকর মরুপ্রান্তরে বিরূপ প্রকৃতি ও পরিবেশে বিজয়ী সেনাপতি।

বিষণ্ন ও বেদনার্ত মদীনা শহর সেই রাতে তার আঘাত নিয়েই কিছুটা ঘুমাল...

সে তো হারিয়েছে তার সবচেয়ে বেশি আপনজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে—যাঁকে তার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি।

মদীনা শহর কিছুটা ঘুমালেও খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সে রাতে একেবারেই নিদ্রার স্বাদ নিতে পারলেন না।

যেন তার বিছানায় কাঁটা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে...

অথবা যেন তার দু'চোখে জ্বলন্ত কয়লার সুরমা ডলে দেওয়া হয়েছে।

খলীফার হৃদয় কীভাবে শান্ত হবে?!

সিংহভাগ আরব আল্লাহর দীন ইসলাম থেকে দলে দলে বেরিয়ে গেছে, ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছে।

কীভাবে তার চোখের পাতা মিলিত হবে?!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশাল ইসলামী সালতানাত—যা দীর্ঘ তেইশ বছরের সংগ্রাম-সাধনায় গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে ধারাবাহিক দুঃখ-কষ্ট আর বেদনার পথ মাড়িয়ে তিলে তিলে। শেষ পর্যন্ত গোটা আরব উপদ্বীপ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভূমি সেই সালতানাতে শামিল হয়েছিল, অথচ আজ প্রিয় নবীর রক্ত, ঘাম আর অশ্রুভেজা সেই সালতানাত সংকুচিত হতে বসেছে?

সেই ইসলামী সালতানাত আজ সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে ছোট্ট এক ত্রিভুজ আকৃতির মধ্যে, যার মাথা ইসলামী সালতানাতের রাজধানী মদীনা মুনাওয়ারাতে...

আর অন্য দুই বাহু বিস্তীর্ণ রয়েছে মক্কা আর তায়েফের মাঝে।

***

খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঈমানের ওপর টিকে থাকা অল্পসংখ্যক লোকদের ভেতর থেকেই গড়ে তুললেন দশটি সেনাদল...

আর এই দশটি দলের জন্য বাছাই করলেন এমন বিরল দশজন সেনাপতি যাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট ছিলেন ইন্তেকালের সময়।

এদের তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

সেই রাতে যে বিষয়টি খলীফাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত করে তুলেছিল, তা হলো অন্য যে একাদশ সেনাদলটিকে বাহরাইন ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ আরবে মুরতাদবিরোধী অভিযানের জন্য পাঠাবেন সেই দলের সেনাপতি নির্বাচন।

এই দলের বিশেষ গুরুত্বের কারণ এটা ছিল নানান বিপদ-আশঙ্কায় ঘেরা...

এই দলের পথটিও ছিল বিপদসংকুল ও কণ্টকাকীর্ণ।

***

সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিছানায় ছটফট করে এপাশ-ওপাশ করছিলেন, অবশেষে রাতের শান্ত-নীরব পরিবেশ ভেঙে দিলেন বিলাল ইবনে রাবাহ তার সুললিত কণ্ঠে আযান-ধ্বনি দিয়ে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিনের আযান শুনে সিদ্দীকের দুই চক্ষু প্লাবিত হলো একই সঙ্গে সেই মুহূর্তে তার মাথায় একটি চিন্তা জ্বলে উঠল, যা তার সামনে কাঙ্ক্ষিত সেনাপতি নির্বাচনের পথ আলোকিত ও সহজ করে দিলো।

তার চেহারা থেকে চিন্তার ভাব কেটে গেল এবং সিদ্ধান্তের স্বস্তি সেখানে ঝলমলিয়ে উঠল।

সন্তুষ্টি ও স্বস্তির স্পষ্ট ভাব ফুটে উঠল তার চোখেমুখে।

ফজরের নামায আদায়ের পর তিনি দোয়াত-কলম আনিয়ে লিখলেন,

'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা আবু বকরের পক্ষ থেকে আলা ইবনুল হাযরামীর প্রতি সরকারি ফরমান, খলীফার পক্ষ থেকে তাকে বাহরাইন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে মুরতাদবিরোধী অভিযানে পাঠানোর সময় লিখিত।

তিনি তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন প্রকাশ্যে ও গোপনে যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলেন।

তিনি আরও আদেশ দিচ্ছেন, যেন আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকেন।

এবং যারা আল্লাহর দীন ইসলাম ত্যাগ করে শয়তানের অনুসরণের পথ ধরেছে, তাদের ফেরানোর ব্যাপারে সর্বোচ্চ সাধনা করতে।'

আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বাহরাইনে মুরতাদবিরোধী যুদ্ধের জন্য প্রেরিত সেনাদলের সেনাপতি নির্বাচন করায় বড় বড় সেনা অফিসাররা অনেক স্বস্তি লাভ করলেন।

কারণ, তিনি নবীজির দীর্ঘ সোহবত ও সান্নিধ্য লাভকারী একজন প্রবীণ সাহাবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিল তার সুদৃঢ় বন্ধন। তিনি একজন ওহী লেখক, রাসূলের বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব।

উপরন্তু তিনিই বাহরাইনের মাটিতে ইসলাম এনেছিলেন একফোঁটা রক্ত না ঝরিয়েই, একজন মানুষকেও আহত না করে...

এটা ছিল সেই সময়ে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'মুনযির ইবনে সাওয়া'র কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান্-সংবলিত চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

তিনি অবিরত তাকে কোমল ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন...

তার সামনে ইসলাম পেশ করার ক্ষেত্রে কৌশল ব্যবহার করতে থাকেন...

শেষ পর্যন্ত তিনি এবং তার কওম ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেন।

এর ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই তার রাষ্ট্রক্ষমতায় বহাল রাখেন...

আর আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাকে নির্দেশ প্রদান করেন ধনীদের থেকে যাকাত উসূল করে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে।

আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার এই দায়িত্বে বহাল ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত।

রাসূলের ওফাতের একই মাসের মধ্যে বাদশাহ মুনযির ইবনে সাওয়া-এরও ইন্তেকাল হয়ে যায়। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।

***

আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার সেনাদলের সামনে বাহরাইন যাওয়ার জন্য 'দাহনা' মরুভূমি ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ ছিল না।

ওই মরুভূমি সে সময়ও ছিল যেমন ভয়ংকর, আজও সেটা রয়ে গেছে একই রকম ভয়ংকর। বর্তমানে সেই মরুভূমি পরিচিত 'আর-রুবইল খালী' নামে।

বরকতময় মুমিন সেনাদল ভয়ংকর সেই মরুপ্রান্তর পাড়ি দিতে নেমে পড়লেন।

এটা শুধু পথ পাড়ি দেওয়া নয়,

এটা ছিল ঘুর্ণিবায়ুর সঙ্গে এক ভয়ংকর যুদ্ধ...

দুর্বিনীত, অবাধ্য বালুময় প্রান্তরের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ যুদ্ধ...

যেখানে পানি নেই, গাছপালা নেই, জীবন নেই এমন এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির মধ্যে বেঁচে থাকার এক ভয়ংকর যুদ্ধ।

***

সেনাদল ভয়ংকর সেই দাহনা মরুভূমি চলতে চলতে ঘটল এমন এক ঘটনা যা কেউ ধারণাও করতে পারেনি...

কোনো কল্পনাকারীর কল্পনাতেও আসেনি...

এক ভয়াবহ অন্ধকার রাতে...

প্রভাতের আলো ফোটার অপেক্ষায়...

এবং বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সেনাদল যাত্রাবিরতি করল...

কেননা, ওই রকম ভয়াবহ অন্ধকার রাতে চলার সাধ্য তাদের ছিল না। এখানে হারিয়ে যাওয়ার তীব্র ভয় ছিল, কারণ এখানে কোনো পথিকের পায়ের চিহ্ন ছিল না।

এ পথে যদি কোনো পথিক কখনো চলেও থাকে আর তার পদচিহ্ন পড়েও থাকে, তবুও ভয়ংকর ঘূর্ণিবায়ু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে চিহ্ন মুছে দিয়েছে।

উটের পিঠ থেকে নেমে তারা স্থির হতে না-হতেই... হঠাৎ একটি উট অজ্ঞাত কারণে আতঙ্কিত হয়ে উঠল...

অন্ধকার ও বিস্তীর্ণ সেই ভয়াবহ মরু প্রান্তরে পাগলের মতো এলোমেলো দৌড়াতে লাগল।

সেটার শঙ্কিত আচরণ অন্য সব উটকেও উসকে দিলো।

সবগুলো উট দলধরে ওই পাগলা উটের পেছনে দৌড়াতে থাকল। যেন এদের ঘাড়ে হাজার খানেক ভূত সওয়ার হয়েছে... অথবা হাজার খানেক বিচ্ছু এদের দংশন করেছে।

মরুভূমিতে চলাচলে অভ্যস্ত কয়েকজন শক্ত-সমর্থ সৈনিক আপ্রাণ চেষ্টা করলেন ওই উত্তেজিত উন্মাদ উটগুলোকে ঠেকাতে অথবা ওইগুলোর পিছে পিছে যেতে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দেখলেন যে, সেগুলো কোথায় হারিয়ে গেল, তাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যেও পড়ছে না।

যেন এই মরুভূমি ওদের গিলে খেয়েছে।

মাত্র অল্প কয়েকটি মুহূর্তের ব্যবধান, সেনাদল মৃত্যুপুরীর মতো এই বিপজ্জনক মরুভূমিতে নিজেদের অবস্থা দেখল,

পানি নেই...
পাথেয় নেই...
বাহন নেই...

তার মানে জীবনের, বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই...

***

প্রিয় পাঠক! তখন কত বড় বিপদ তাদের ঘিরে ধরেছে একটু কল্পনা করুন।

একটু খানি ভেবে দেখুন কত বড় দুর্ঘটনায় তারা আটকে পড়েছেন।

আপনার কল্পনার ডানায় ভর করে একটু চিন্তা করে দেখুন, ওই বিপন্ন মানুষগুলোর হৃদয়ের গভীরে জীবন ও মৃত্যুর কী পরিমাণ দ্বন্দ্ব আর সংঘাত চলছিল।

তারা পরিপূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, মৃত্যু তাদের অবধারিত...

আর এই ভয়ংকর মরুভূমি শিগগিরই তাদেরকে নিজের পেটের মধ্যে গিলে ফেলবে। যেভাবে অথই সাগর সবকিছু দু'হাত ভরে তার পেটের মধ্যে টেনে নেয়।

এবং তারা সকলেই হয়ে যাবেন এই ভয়ংকর মরুভূমির চির অনুদ্ঘাটিত এক রহস্য।

তারা জীবনের আশা ছেড়ে একে অন্যকে অন্তিম অসিয়ত করতে লাগলেন।

তারা নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, এই বিপদসংকুল মরুভূমি থেকে তারা কেউই নিরাপদে ফিরে যেতে পারবেন না।

কিন্তু জীবনের চিরন্তন নিয়ম সর্বদা একই রকম হয় না।

***

সেনাদলের চরম হতাশার এই রকম মুহূর্তে...

ঐশী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত সেনাপতি মুহাম্মাদী মাদরাসার এক বিরল শিক্ষার্থী সেনাদলের সামনে এগিয়ে এসে আত্মবিশ্বাসী ও প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন,

‘এ কেমন ভয়, আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তার সাগরে আপনারা হাবুডুবু খাচ্ছেন!

তারা একসুরে জবাব দিলেন,
‘কী আশ্চর্য, আপনি আমাদের তিরস্কার করছেন?

অথচ আমরা জানি না যে, আগামী সকাল পর্যন্ত আমরা কেউ বাঁচব কি না, ভাগ্য যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে আর আমরা কোনোরকমে প্রভাতের দেখা পেয়েও যাই, তাহলেও সূর্য মধ্য গগনে ওঠার আগেই তৃষ্ণায় আমাদের জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিয়ে যাবে।’

তিনি বললেন,
‘আমি পূর্ণ আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছি, কিছুতেই আপনাদের কোনোপ্রকারের ক্ষতি হতেই পারে না।

কেননা, আপনারা আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পিত...
তাঁরই প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসে দীপ্ত...
তাঁরই পথে আপনারা তাঁরই জন্যে ঘর থেকে বেরিয়েছেন...
তাঁরই দীনকে সাহায্যের দায়িত্ব আপনারা কাঁধে তুলে নিয়েছেন...

সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে সংকট মুক্তির ও সাহায্য প্রেরণের সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

আল্লাহর কসম! আপনারা কিছুতেই আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবেন না...

কিছুতেই কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত হবেন না...

আর নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য আপনাদের ধারণার চেয়েও বেশি নিকটে রয়েছে।’

***

শীতল মিষ্টি পানির পরশ যেভাবে তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তির শুষ্ক দেহ ও মনকে সজীব, সতেজ ও প্রফুল্ল করে তোলে, ঈমানদীপ্ত সেনাপতির ঈমান

ও ইয়াকীনের শীতল ও মিষ্টি কথাগুলোও একইভাবে সৈনিকদের দেহ-মনকে ফুরফুরে ও সতেজ করে তুলল।

তাদের অন্তর ও হৃদয়গুলো শান্ত ও প্রশান্ত হয়ে উঠল...

তাদের চোখজুড়ে রাজ্যের ঘুম নেমে এল।

যখন সুবহি সাদিকের আলো দিগন্তে বিস্তৃত হলো, তারা সকলে তায়াম্মুম করলেন এবং আপন প্রভুর সম্মুখে বিনীত ও বিগলিত হৃদয়ে নামাযে দাঁড়ালেন।

নামায শেষ হলে আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘুরে বসলেন এবং আকাশের দিকে দু'হাত উঁচু করে আশাভরা হৃদয়ে, অশ্রুভেজা নয়নে, মিনতিভরা বুকে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন।

সৈনিকরাও বিগলিত হৃদয়ে তার দুআয় শরীক হয়ে তার বুকের আশা আর মুখের ভাষায় আমীন আমীন বলতে থাকলেন।

মহান প্রভুর দরবারে এই মুনাজাত শেষ হতে না-হতেই দূর থেকেই তাদের চোখে ঝলসে উঠল পানির ঝরনা।

প্রভাতের উজ্জ্বল স্বচ্ছ আলো পানির উপরিভাগের রুপালি রঙের চাকচিক্যকে আকর্ষণীয় করে তুলছিল।

সেনাদল প্রথমে এটাকে মনে করল মরীচিকা, কেননা মরুভূমিতে মানুষ এভাবেই মরীচিকাকে পানি ভেবে ধোঁকা খায়।

তারা যখন সেখানে গিয়ে সত্যি পানির সন্ধান পেয়ে গেল...

তখন তো আনন্দে তারা 'তাকবীর' ও 'তাহলীল' এর স্লোগান দিতে থাকল।

পান করল, হাতমুখ ভেজালো এবং সেখানেই তারা আল্লাহ তাআলার আরও সাহায্য পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করতে থাকল।

সেদিনের দুপুর হতে না-হতেই তারা দেখলেন বহুদূর থেকে আবছা ছায়ার মতো কিছু একটা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

তারা দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন...

তারা নিশ্চিত হলেন ছায়াগুলো ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে এবং এদিকেই আসছে।

আরও কিছু সময় তাকিয়ে থাকার পর...

তারা নিশ্চিত হলেন যে, ওগুলো তাদেরই উটপাল, দৌড়ে দৌড়ে তাদের দিকে আসছে। মনে হচ্ছে কেউ ওগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে।

মহান আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার আশা বুকে নিয়ে আর নগদ সাহায্যপ্রাপ্তির আনন্দাশ্রুতে সিক্ত চোখে তারা তাকিয়ে দেখলেন তাদের উটের পাল যেভাবে দলবেঁধে হারিয়ে গিয়েছিল সেভাবেই আবার ফিরে এসেছে।

যথারীতি সকল হাওদাসহ...
সকল সামানসহ...
খানা, পানি ও পাথেয়সহ...

সবগুলো উট ফিরে এসেছে।

আল-আলা ইবনুল হাযরামী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

বাহরাইনে মুরতাদবিরোধী যুদ্ধে

শাহাদাত পিপাসু দুঃসাহসী বীর যোদ্ধাগণ ফিরে পাওয়া উটগুলোর পিঠে চড়ে বসলেন।

আরব উপদ্বীপের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত দাহনা মরুপ্রান্তরের সঙ্গে তারা আবার নতুন করে শুরু করলেন দীর্ঘ সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁরই পথে এর উত্তপ্ত বালুকাপ্রান্তরকে পরাভূত করে দিলেন...

বিপদসংকুল মরুপ্রান্তরকে মাড়িয়ে চলে গেলেন...

তার ক্ষতিকর ও ভয়ংকর জনশূন্যতাকেই তারা আতঙ্কিত করে দিলেন।

তারা মরুভূমির বিরুদ্ধে যত অভিযোগ করেছিলেন এখন মরুভূমিকে তাদের পদাঘাতের বিরুদ্ধে আরও বেশি অভিযোগ করতে বাধ্য করে দিলেন।

যখনই তারা কোনো কষ্ট ও ক্লান্তির মুখোমুখি হতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরল মেধাবী সেনাপতি সামনে এসে দাঁড়াতেন এবং তাদের

অন্তরে ঢেলে দিতেন নিজের প্রাণশক্তি, যার মাধ্যম তারা হয়ে উঠতেন সুদৃঢ় ও সংকল্পময়ী।

তাদের শোনাতেন আত্মপ্রত্যয় আর দৃঢ়তার কথা, যা তাদের সাহসী আর উদ্যোগী বানিয়ে দিত।

দাহনা মরুভূমিতে তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার কথা স্মরণ করাতেন, যাতে তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের শক্তি আরও বেড়ে যায়।

ঈমান ও বিশ্বাসদীপ্ত সেনাবাহিনী রাত-দিন অবিরাম কষ্ট ও ক্লান্তি সহ্য করে করে অবশেষে বাহরাইনে পৌঁছে গেলেন।

এবং তার উপকণ্ঠে সেনাশিবিরও স্থাপন করলেন...

***

ঐশী প্রেরণায় দীপ্ত সেনাপতি একমুহূর্ত বিলম্ব না করে বাহরাইনের সর্বত্র তার গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে দিলেন, যেন শত্রুবাহিনীর সকল খবর জানতে পারেন এবং যেন তাদের সামগ্রিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হতে পারেন।

গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হওয়ামাত্রই সেখানের একদল দুষ্ট মতলববাজ বলতে শুরু করে,

'মুহাম্মাদ যদি নবী হতো, তাহলে সে মরত না।'

তাদের এ কথা শুনে বাহরাইনের সব লোক ইসলাম ছেড়ে মুরতাদ হয়ে গেছে।

হাতাম ইবনে যুবাইআকে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে মুরতাদদের নেতা।

তাদের মধ্যে কেউই আর ইসলাম ধর্মে অবশিষ্ট থাকেনি একটিমাত্র গ্রামবাসী ছাড়া...

সেই গ্রামটি হলো 'জুওয়াসা।'

এই ঈমানদার গ্রামটির বিষয় এই যে, সেখানে আছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। যার নাম 'আল-জারূদ ইবনুল মুআল্লা'...

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যথাসাধ্য তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন...

তারপর ফিরে এসেছিলেন আপন কওমের কাছে এবং দীনের দাওয়াত প্রদান ও তাদের মাঝে বিশ্বজনীন ইসলামের শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

তিনি যখন দেখলেন তার কওমের লোকেরা মুরতাদদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাদের সবাইকে তিনি ডাকলেন এবং বললেন,

'আমি আপনাদের সকলের কাছে একটি প্রশ্ন করতে চাই, জানা থাকলে উত্তর দেবেন,

তারা সবাই বললেন,
'বলুন, আপনার প্রশ্ন কী?'

তিনি বললেন,
'আপনারা কি জানেন যে, মুহাম্মাদ ছাড়াও এ পৃথিবীতে আল্লাহ অনেক নবী পাঠিয়েছিলেন?'

তারা বললেন,
'হ্যাঁ, অবশ্যই জানি।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
'সেই সকল নবী এখন কোথায়?'

সকলে বললেন,
'মারা গেছে।'

তিনি বললেন,
'যেমনিভাবে সকল নবী মারা গেছেন একইভাবে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদও মারা গেছেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ চিরঞ্জীব কখনোই তাঁর মৃত্যু হবে না।'

তারা সকলে বলে উঠলেন,

'আপনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী, আপনিই আমাদের নেতা। আপনি সত্য কথাই বলেছেন।'

এরপর কওমের সকলের বিরুদ্ধে তারা ইসলামের ওপর অটল রয়ে গেলেন।

***

তখন তাদের মুরতাদ নেতা হাতাম ইবনে যুবাইআ নিজের দলবল দিয়ে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখল। কঠোর অবরোধের মধ্যে খাদ্য-পানির সরবরাহ বন্ধ করে দিলো।

এভাবে তাদেরকে ফেলে রাখল, যেন তারা ক্ষুধা-পিপাসায় মরে যায়। যুদ্ধ বা রক্তপাতের প্রয়োজনই দেখা না দেয়।

কিন্তু এই কঠোর অবরোধ তাদেরকে ঈমান থেকে একটুও টালাতে পারল না।

তাদের এক কবি দূর থেকে খলীফা আবু বকরের কাছে সাহায্য চেয়ে কবিতা লেখেন,

اَلَا اَبْلِغْ اَبَا بَكْرٍ شَكَاةً - وَفِتْيَانَ الْمَدِيْنَةِ اَجْمَعِيْنَا

فَهَلْ لَكُمْ اِلى قَوْمٍ كِرَامٍ - قُعُوْدٍ فِيْ جُوَاثَ مُحَصَّرِيْنَا

تَوَكَّلْنَا عَلَى الرَّحْمٰنِ اِنَّا - وَجَدْنَا الصَّبْرَ لِلْمُتَوَكِّلِيْنَا

'আছে কি কেউ খলীফা আবু বকরের কাছে আর মদীনার সকল যুবক ভাইয়ের কাছে এই অভিযোগ পৌঁছে দেওয়ার মতো। তোমরা কি

জুওয়াসাতে অবরুদ্ধ এক সম্মানী কওমের প্রতি একটু সাহায্যের হাত বাড়াতে পারো? আমরা দয়ালু আল্লাহর ওপর ভরসা করে আছি। আর ভরসাকারীদের জন্য ধৈর্যই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ।'

***

আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাহরাইনে পৌঁছামাত্রই এক ছদ্মবেশী দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন ঈমানদার গ্রাম জুওয়াসাতে। তাকে নির্দেশ দিয়েছেন মুমিনদের নেতা জারূদ ইবনুল মুআল্লাকে জানিয়ে দিতে যে, মুসলিম সৈনিকরা এসে গেছে এবং তিনি যেন নিজের ও কওমের সকলের মনোবল ধরে রাখেন।

আর মুসলিম সৈনিকরা যখন শত্রুদের ওপর আক্রমণের সময় নির্ধারণ করবে, সেই সময়ের জন্য সকলেই যেন প্রস্তুত থাকেন।

***

আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বুঝতে পারলেন যে, হাতাম ইবনে যুবাইআ এবং তার মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ্য তার নেই। কেননা, সংখ্যায় তারা অনেক বেশি আর তার সৈনিক সংখ্যা সামান্য।

তাদের শক্তি বেশি আর তার দুর্বলতা...

তাদের অস্ত্র, বাহন ও যুদ্ধের সরঞ্জাম পর্যাপ্ত, পক্ষান্তরে তার সবকিছুতেই ঘাটতি,

অতএব তিনি বুদ্ধি, কৌশল ও সতর্কতার সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

আর সে কারণেই আত্মরক্ষার জন্য সেনাদলের চতুর্দিকে পরিখা খনন করালেন।

একই কাজ করল মুরতাদ বাহিনীর নেতা হাতামও, কেননা মুসলিমদের নিয়ে তার ভয়, তাকে নিয়ে মুসলিমদের ভয়ের চেয়ে কম নয়।

অভিজ্ঞ মুসলিম সেনাপতি খুব ধীরগতিতে এগুতে থাকলেন। তাড়াহুড়া করলেন না মোটেও।

সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করলেন।

উভয় দল পুরো এক মাস ধরে দিনের বেলা হালকা হালকা যুদ্ধ চালানোর পর আবার যার যার পরিখার ভেতরে ফিরে যেতে থাকল।

এই সময়ে আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শত্রুদের দিকে কান পেতে রাখতেন আর চোখ লাগিয়ে চেয়ে থাকতেন।

পূর্ণ সজাগ থাকতেন শত্রুদের খন্দকগুলোর আড়ালে যা কিছু ঘটছে সে দিকে।

সেই সময়ের অপেক্ষায়, যা তাকে সুযোগ এনে দেবে শত্রুদের কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে আকস্মিক আক্রমণের।

***

হঠাৎ একরাতে, সম্মুখ সারির মুসলিম সেনারা এবং তাদের গোয়েন্দারা শুনতে পেল শত্রুশিবিরে হইচই, চিৎকার ও ঝামেলা হচ্ছে।

এবং দূর থেকেই তারা কিছু অস্বাভাবিক আন্দোলন দেখতে পেলেন।

সেনাপতি আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সৈনিকদের বললেন,

'শত্রুশিবির থেকে খবর নিয়ে আসতে পারবে কে?'

আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফ বললেন,
'মাননীয় আমীর, আমি পারব।'

সেনাপতি তাকে এই কাজের অনুমতি দিয়ে, সতর্ক করে, উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন।

***

আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফ অন্ধকারে লুকিয়ে খালের দিকে এগিয়ে গেলেন। দ্রুত ও সতর্ক হয়ে খাল পার হয়ে গেলেন।

যখন সেনাছাউনির ভেতরে ঢুকে পড়লেন, শত্রুরা তাকে বন্দী করে ফেলল।

তখন আব্দুল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন, আবজার ও আবজার...

যে আবজারের নাম ধরে তিনি তার কাছে সাহায্য চাচ্ছিলেন, তিনি হাতামের সেনাবাহিনীতে একজন নামকরা উচ্চক্ষমতার সেনা অফিসার। তিনি ছিলেন ইজিল বংশীয় আর আব্দুল্লাহর মাও ছিলেন সেই একই বংশের।

আবজার সেখানে আসার পর বন্দী আব্দুল্লাহর বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বংশ-পরিচয় দেওয়ার পর বললেন,

আপনারা আমার মায়ের বংশীয় হিসাবে আমার মামা।

এ কথা শুনে আবজার তাকে ভাগনে স্বীকার করে আশ্রয় দিলেন এবং তার খবরাখবর জানতে চাইলেন।

আব্দুল্লাহ বললেন,
'মামা আমি রাস্তা ভুলে আপনার সৈনিকদের মধ্যে এসে পড়ায় ওরা আমাকে বন্দী করে ফেলেছে।'

আবজার বললেন,
'আমি ভাবলাম কত খারাপ ভাগনে তুমি, যে মামার সৈনিকদের হাতে বন্দী হয়েছে।'

আব্দুল্লাহ বললেন,
'মামা, ওসব কথা এখন থাক, আমাকে খেতে দিন, খিদেয় মরে যাচ্ছি।'

আবজার তাকে খেতে দিলেন।

সেই খাবার নিয়ে আব্দুল্লাহ বসে পড়লেন, কিন্তু একটু একটু করে থেমে থেমে সময় নিয়ে খেতে লাগলেন, যেন তাদের অবস্থা জানা যায় এবং গোপন খবর অবগত হওয়া যায়।

খবরাখবর জানার ইচ্ছা যখন পূরণ হয়ে গেল, তখন তিনি আবজারকে বললেন,

'আমাকে কিছু পাথেয়, একটি সওয়ারি এবং একজন রাহবার দিন যেন আমার কওমের শিবিরে পৌঁছুতে পারি।'

তিনি পাথেয়, একটি বাহন এবং একজন লোক সঙ্গে দিয়ে তাকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে বললেন।

তিনি যখন মুসলিম সেনাশিবিরে পৌঁছলেন, সেনাপতি ইবনুল হাযরামীকে বললেন,

শত্রুরা একটি বিশেষ উৎসবে মেতেছে...

সর্বত্র মদের পেয়ালা ছড়িয়ে রেখেছে...

এবং মদের নেশায় সকলেই মাতাল হয়ে পড়েছে...

মাতাল হয়ে কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ ঝিম মেরে বসে আছে...

কেউ কেউ হইচই করছে, নেশায় বুঁদ হয়ে এরা জানেও না যে কে কী করছে।

তারা কেউ এটাও বুঝতে পারেনি যে তাদের ইজিল বংশীয় বন্দী ছিল শত্রুপক্ষের লোক।

***

সেনাপতি ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই খবর শোনার পর এক মুহূর্ত সময়ও আকারণ নষ্ট হতে দিলেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মুমিন দলের সরদার জারূদের কাছে লোক মারফত নির্দেশ পাঠালেন, এক্ষুনি পেছন থেকে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে...

আর তিনি নিজের সৈনিকদের নিয়ে অন্ধকারের তিরের মতো এগিয়ে গেলেন সামনের দিক দিয়ে...

সুরক্ষিত খালবেষ্টিত সেনাদলের ওপর চতুর্দিক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন...

শত্রুদের গর্দানে তরবারি চালিয়ে দিলেন কোনো মায়া-দয়া ছাড়া...

মুরতাদ বাহিনী ও তার সেনাপতি হাতামের সামনে রণাঙ্গনের তির, তরবারি, বর্শার ঝনঝনানি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

প্রধান সেনাপতি হাতামের কথা কী আর বলব! মুসলিম বাহিনী যখন তার শিবিরে নেমে আসে ভয়াবহ বজ্রপাতের মতো, সে সময় তিনি ছিলেন ঘুমে বিভোর।

মুসলিমদের অস্ত্রের ঝনঝনানি আর তাকবীর ধ্বনিতে ঘুম থেকে তিনি হুড়মুড় করে উঠলেন।

আতঙ্কিত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন।

কিন্তু তাড়াহুড়ার কারণে পা-দানি খুলে পড়ল, ফলে তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন,

'আমি সেনাপতি হাতাম, কে আছ এখানে, আমার পা-দানিটা ঠিক করে দাও।'

এক মুসলিম সৈনিক এগিয়ে গিয়ে বললেন,
'মাননীয় আমীর, পা একটু উঁচু করুন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।'

তিনি যখন পা উঁচু করলেন সৈনিক এক কোপে পা কেটে ফেললেন..

তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, রক্তে ভিজে গেল তার আশপাশ। ব্যথায় কলিজা ছিঁড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো।

সে সময় যে-ই তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তাকেই মিনতি করে বলছিলেন, 'আমাকে মেরে ফেলুন, এই কষ্ট থেকে বাঁচান।'

কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এবং পরাজিত বাহিনীর ছুটে পালানোর সময় তাকে পদদলিত করে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি মিনতি করতে থাকলেন।

অবশেষে এক মুসলিম সৈনিক কোনো কিছু না জেনেই তাকে মেরে ফেলল।

আর তার মুরতাদ বাহিনী, ভয়াবহ ও লাঞ্ছনাকর উপায়ে পরাজিত হলো।

একদল নিজেদের খনন করা গর্তে পড়ে মরল, গর্তগুলোই যাদের কবর হয়ে গেল।

আরেক দল মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হলো।

তবে বিশাল বাহিনীর সিংহভাগ সৈনিক অবস্থা বেগতিক দেখে সাগরের কূলে নোঙর করে রাখা জাহাজে গিয়ে আত্মরক্ষা করল এবং পালিয়ে গেল দারীন দ্বীপে।

আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাহরাইনকে মুরতাদদের হাত থেকে মুক্ত করলেন এবং আবার তাকে ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত করলেন...

কিন্তু প্রিয় পাঠক, আপনাদের কি বিশ্বাস হয় যে, এত কাছে দারীন দ্বীপে পালিয়ে যাওয়া মুরতাদরা যতদিন নিরাপদে থাকবে, খাবে দাবে, ফুর্তি করবে, সেনাপতি আলা ইবনুল হাযরামীর মতো একজন বীর মুজাহিদের পক্ষে চুপচাপ বসে থাকা অথবা চোখ বন্ধ করে রাখা আদৌ সম্ভব হবে?

আল-আলা ইবনুল হাযরামী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

সাগরের যুদ্ধে

পলাতক মুরতাদরা নিজেদের দারীন দ্বীপে লুকিয়ে রাখল...

তারা নিজেদের সুরক্ষিত করল সাগরকে ঘিরে রাখা বিশাল বিশাল ঢেউ দ্বারা...

তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার লাগাম ঢিলা করে দিলো। প্রতিরক্ষার চিন্তা ছেড়ে দিলো।

চিন্তামুক্ত শান্তির বিছানায় হাত-পা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

কোনো সতর্কতা ও কৌশল অবলম্বনের চিন্তা তারা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল।

কেননা, তারা নিশ্চিত ছিল যে, মরুর পেটে লালিত মুসলিম সৈনিকেরা কোনো সাগরযানে চড়ার সাহস করবে না।

সাগড়ের পিঠে সওয়ার হওয়ার অভিজ্ঞতাও তাদের নেই।

উপরন্তু নৌকা, জাহাজ বা কোনো সাগরের যানবাহনও তাদের নেই।

***

কিন্তু আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মনে মনে এমন এক বিপজ্জনক পরিকল্পনা এঁকে রেখে ছিলেন, যা ইতিপূর্বে কোনো সেনাপতি ভাবতে পারেননি...

কোনো মুসলিমের অন্তরে কখনো যার কল্পনাও আসেনি।

তিনি দারীন দ্বীপে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং পানির দেয়ালকে ঢাল বানিয়ে আত্মরক্ষাকারী মুরতাদদের উচ্ছেদ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন...

***

আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অজ্ঞাত ছিলেন না যে, তার বাহিনীর সৈনিকেরা মরুর সন্তান, যারা সাগরকে ভীষণ ভয় পায় এবং সাগরপথের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

তাকে স্মরণ করানোর প্রয়োজন ছিল না যে, একজন সৈনিককে পার করার মতো কোনো নৌযানও তার কাছে নেই।

তাহলে বিশাল বাহিনী পারাপারের জন্য নৌবহরের প্রয়োজনীয়তার কী হবে?

নৌযান থেকে কূলে নামার সাঁকোর প্রয়োজনই-বা মিটবে কী দিয়ে?

এই সকল অনিবার্য প্রয়োজনীয় সামান নেই, তা ভালোভাবেই জানা ছিল আলা ইবনুল হাযরামীর...

এ ছাড়া তার এটাও জানা ছিল যে, দারীন দ্বীপ বাহরাইন উপকূল থেকে যেকোনো জাহাজে গেলেও দূরত্ব কমপক্ষে এক দিন এক রাতের।

এই সকল প্রতিকূলতার কথা জানা সত্ত্বেও...

সংকল্প গ্রহণের পর তিনি আর এক মুহূর্তও দ্বিধা করলেন না।

***

আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ভূখণ্ডটি সম্পর্কে মনে মনে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করলেন, সেখানের যুদ্ধ

পরিকল্পনা ইত্যাদি সকল বিষয় শেষ করার পর তিনি সৈনিকদের সমবেত করে তাদের সামনে দাঁড়ালেন...

প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগান করলেন, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদি দরূদ ও সালামের পর তার সংকল্পের কথা, দারীন দ্বীপে পলাতক পানিবেষ্টিত ওই ভূখণ্ডে আশ্রিত মুরতাদদের বিরুদ্ধে সাগর পাড়ি দিয়ে আক্রমণের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন।

এরপর প্রতিক্রিয় বোঝার জন্য তিনি বড় বড় সেনা অফিসারদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, দেখলেন শত শত প্রশ্ন তাদের ঠোঁটের মাথায় অপেক্ষা করছে, যেকোনো মুহূর্তে সেগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

তিনি সৈনিকদের কাউকেই কথার সুযোগ দিতে চান না, সে জন্যই তাদের মুখে তালা লাগিয়ে দিলেন এই আশঙ্কায় যে, তারা এমন কোনো কথা বলে ফেলবে যা সকলের মধ্যে সন্দেহ ছড়িয়ে দেবে, যা সাহসে ভাঙন ধরাবে। তালা লাগালেন মানে তিনি নিজের কথা অব্যাহত রাখলেন, বললেন,

‘কেউ এ প্রশ্ন করবেন না, কীভাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব?

আল্লাহ তাআলা আপনাদের মরুভূমিতে তাঁর অসীম ক্ষমতার যে নিদর্শন দেখিয়েছেন, তা চিন্তা করলে আপনারা নিশ্চিত হবেন তাঁর সেই ক্ষমতা সম্পর্কে, যা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে সাগরে।

আপনারা এ প্রশ্ন করবেন না যে, কীভাবে আমরা সেখানে যাব?

আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে আছেন...

তিনি কি দাহনা মরুর বুকে আপনাদের মিষ্টি পানির পুকুর দেননি?

ধ্বংস থেকে তিনি আপনাদের রক্ষা করেছেন, পিপাসা থেকে পরিতৃপ্ত করেছেন।

তিনি কি অন্তহীন মরুর বুকে হারিয়ে যাওয়া দুষ্ট পাগলা উটপাল ফিরিয়ে দেননি?

আপনারা নিজ চোখে চেয়ে দেখেছেন, যেন ফেরেশতার দল নিজেদের পাখা দিয়ে বেষ্টন করে সেগুলোকে আপনাদের কাছে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন।

আপনাদের সামান্য খাদ্য বা এক ঢোক পানিও হারিয়ে যায়নি।
ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিশ্চিত মৃত্যুসম্ভাবনা থেকে তিনি রক্ষা করেছেন...
চরম ক্ষুধার সময় তিনি আহার দান করেছেন...
চরম আশঙ্কার মধ্যে তিনি চিন্তামুক্ত ও নিরাপদ করেছেন...
ধ্বংসের চরম মুহূর্তে তিনি আপনাদের রক্ষা করেছেন...

নিঃসন্দেহে যেই আল্লাহ মরুর বুকে আপনাদের বিগলিত হৃদয়ের আশাভরা ও আস্থাশীল প্রার্থনা কবুল করেছেন, তিনিই আপন অনুগ্রহে সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আপনাদের নিষ্ঠাপূর্ণ, খাঁটি দুআও কবুল করবেন।'

এরপর তিনি এই বলে কথা শেষ করলেন,

'সবাই নিজেদের প্রস্তুত করুন...
আল্লাহর এবং নিজেদের দুশমনদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যান...
উট আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসুন...
আল্লাহর নামে তাঁরই ভরসায়...
উপসাগরের পানি পার হয়ে যান।'

তারা একবাক্যে সবাই বলে উঠলেন,
'হ্যাঁ... হ্যাঁ...
আমরা তা-ই করব যা আপনি বলবেন, হে মহান সেনাপতি...

আল্লাহর কসম! দাহনার ঘটনার পর আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাই না। আর কোনো কিছুরই পরোয়া করি না।'

***

দুঃসাহসী, দুর্বিনীত মুসলিম বাহিনী ঘোড়া আর উটনীগুলোর পিঠে চড়ে সাগর কূলের দিকে এগিয়ে গেলেন...

যখন মুজাহিদদের উট ও ঘোড়ার পা পানিতে ডুবে গেল, ঈমানদীপ্ত, পবিত্র আত্মার, সতর্ক মুত্তাকী সেনাপতি আসমানের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে নির্দেশ দিলেন,

আপনারা আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন...

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا صَمَدُ يَا قَوِيُّ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ...

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ...

عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَبِقُدْرَتِكَ اسْتَعَنَّا ...

وَبِطَوْلِكَ اعْتَصَمْنَا ...

'হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু, হে সর্বেসর্বা, হে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান, হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকর্তা, তুমি ছাড়া মাবুদ হওয়ার যোগ্য কেউ নেই, তুমি এক, নেই তোমার কোনো শরীক...

একমাত্র তোমার ওপরই ভরসা করি, সাহায্য চাই শুধু তোমারই শক্তির...

আঁকড়ে ধরে থাকি একমাত্র তোমার বেপরোয়া শক্তি ও ক্ষমতাকে....'

কথা শেষ করে তিনি প্রথমে নিজে পানির ওপর ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে সৈনিকদেরকে তাকে অনুসরণ করে চলার হুকুম দিলেন... সকলেই তার অনুসরণ করলেন।

উপসাগরে তখন চলছিল শান্ত ও ভাটির কাল।

অসংখ্য ঘোড়া আর উটপালে চড়ে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী সাগরের পানির ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলেন এমনভাবে যেন তারা সামান্য পানিতে ভেজা। সমতল বালুর ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছেন।

***

সৈনিকরা যখন দারীন দ্বীপের কূলে পৌঁছলেন, তারা দ্বীপের মাটিতে শিকারের ওপর সিংহের লাফিয়ে পড়ার মতো করে লাফিয়ে পড়লেন...

তরবারিগুলো খাপমুক্ত করলেন....

আল্লাহর দুশমনদের মাথা কাটতে কাটতে এগুতে থাকলেন।

মুরতাদরা নিজেদের এবং আশপাশের কথা ভুলে গেল। ভয়ংকর আকস্মিকতার আতঙ্কে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল আর ওইসব মুজাহিদের কর্মকাণ্ডে দিশেহারা হয়ে গেল।

তারা বুঝে উঠতে পারল না যে, এতগুলো মানুষ কোত্থেকে কীভাবে হাজির হলো!

তারা কি আকাশ থেকে নেমে এল, নাকি মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল?

কেননা, এ কথা তাদের নিছক কল্পনা করারও সাধ্য ছিল না যে, এতগুলো মানুষ সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে এসেছে।

***

এক দিন এক রাতের মধ্যেই আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে দ্বীপের এক এক ইঞ্চি মাটি মুরতাদ থেকে পাক-পবিত্র করলেন।

দারীন দ্বীপটিকে এ কূল থেকে ওই কূল পর্যন্ত চষে ফেললেন, যেন সামান্যতম নাপাকিও থেকে না যায়।

কীভাবে করলেন? যোদ্ধা পুরুষদের হত্যা করলেন, নারী ও শিশুদের করলেন বন্দী। সকল সম্পদ ও পশু জমা করলেন।

এরপর সৈনিকদের মাঝে সকল গনিমত নিয়ম হিসাবে ভাগ করে দিলেন। তাতে জনপ্রতি ভাগে পড়ল প্রায় দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রার সমপরিমাণ।

সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় তারা একজন মানুষও হারাননি। একটি ঘোড়া বা উটও নয়। হারিয়েছিল শুধু একটি ঘোড়ার খাবার কিছু তাজা

ঘাস। সেনাপতি আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজে গিয়ে সেই ঘাস ফিরিয়ে এনে দেন।

***

মুমিন সেনাদল চলার পথে একজন হিজরতকারী খ্রিষ্টান পাদরির সাক্ষাৎ পেয়েছিল। সেই পাদরি আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে অনুমতি চেয়ে বলেছিলেন, আমি আপনাদের সঙ্গী হতে চাই। যেন দস্যু বা হিংস্র প্রাণী থেকে নিরাপদ থাকতে পারি। সেনাপতি অনুমতি দিয়েছিলেন তাকে।

সফল ও বিজয়ী এই সেনাদলের সফর যখন শেষ হলো সীমাহীন কষ্ট, সাধনা ও বিজয়ের মধ্য দিয়ে...

এবং এই সফরের মাঝে যেসব ভয়াবহ ঘটনা ঘটল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব গায়েবী সাহায্য, দয়া ও অনুগ্রহ এল।

সেগুলো দেখে পাদরির শীতল অনুভূতি কেঁপে উঠল, আর জেগে উঠল তার নিদ্রিত ঈমান।

সুতরাং তিনি সেনাপতি ও সৈনিকদের সামনে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দিলেন।

তিনি যখন নিজ কওমের কাছে ফিরে এলেন, তখন তার কওমের লোকেরা বলল,

'ছি ছি, কেন তুমি নিজ ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে? কী এমন ঘটেছিল? কী কারণে ইসলাম গ্রহণ করলে?'

তিনি বললেন,

'তিনটি জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়ার পর আমার মনে হলো, এই প্রমাণগুলো আল্লাহ আমাকে দেখানোর পরও যদি আমি ইসলাম গ্রহণ না করি, তাহলে তিনি হয়তো আমার চেহারা বিকৃত করে দেবেন।'

তারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সেগুলো?'

তিনি বললেন,

'এক. সকালে আমি তাদের যে দুআ শুনেছি...

দুই. যে ভয়ংকর মরুভূমিতে গাছ ও পানির নামগন্ধ নেই, সেখানে তাদের জন্য স্বচ্ছ নির্মল মিষ্টি পানির ব্যবস্থা হতে দেখেছি।

তিন. সাগরের পানি তাদের জন্য সমতল ভূমির মতো হয়ে গেছে।

তারা যদি হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হতো, তাহলে ফেরেশতা বাহিনী কখনোই তাদের সাহায্য করত না।

আমি নিশ্চিত তারা সত্যের ওপর আছে।'

***

আল্লাহ তাআলা আলা ইবনুল হাযরামীর চেহারা উজ্জ্বল করুন...

তিনি সারা জীবন অস্ত্র দিয়েও জিহাদ করেছেন...

আবার জবান দিয়েও জিহাদ করেছেন।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করতে সাগরের বুকে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়া সেনাপতি হিসাবে তার নাম ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লেখা থাকবে অনন্তকাল।

তথ্যসূত্র :

১. *আত-তাহযীব*, ২য় খণ্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা।
২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫৯, ৩২৭ এবং ৭ম খণ্ড, ৮৩, ১২০, ১৩০ পৃষ্ঠা।
৩. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা।
৪. *উসদুল গাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।
৫. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, ৫৫৯ পৃষ্ঠা।
৬. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৮ম খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-মাআরিফ*, ২৮৩ পৃষ্ঠা।
৮. *তারীখুল খুলাফা*, ১১৬, ১২৭ পৃষ্ঠা।
৯. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।
১০. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৬৯৪ পৃষ্ঠা।
১১. *আল-ইসাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৫৬৪২।
১২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।
১৩. *আল-আলাম*, ৫ম খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

মুগীরা ইবনে শু'বা

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

আরবের পণ্ডিত চারজন—মুআবিয়া ধৈর্য ও সহনশীলতায়, আমর ইবনুল আস জটিলতায়, মুগীরা উপস্থিতবুদ্ধিতে, যিয়াদ ইবনে আবীহ ছোট-বড় সব বিষয়ের জন্য।

-শা'বী

কারা সেই মরুর সন্তান, যারা বিস্তীর্ণ মরুর গাছ, ঘাস ও পানিশূন্য বিজন প্রান্তর মাত্র একটি উটে পর্যায়ক্রমে তিনজন চড়ে পাড়ি দিয়েছেন, অবশেষে হেদায়েতের বাণী নিয়ে পৌঁছে গেছেন পারস্য দেশে?...

পারস্যবাসী যদি তাদের হেদায়েতের আহ্বান কবুল করতে অস্বীকার করে, তাহলে তারা হয়ে যাবেন সংগ্রামী মুজাহিদ।

কারা ওইসব লোক, পারস্যের গোয়েন্দারা যাদের পিছু নিয়েছিল?

তাদের শরীরে মোটা কাপড় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি...

তাদের হাতে হালকা অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই পায়নি...

তাদের নিচে কিছুই পায়নি ঘোড়া ছাড়া, দিগ্‌দিগন্তের জিহাদী সফর যেগুলোকে দুর্বল ও শীর্ণ করে দিয়েছে, রসদস্বল্পতা যাদের কাবু করে দিয়েছে।

তারা গৌরবময় বীর, বাহাদুর...

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারা বিশিষ্ট সাহাবী।

তারা সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে আরব উপদ্বীপের ভূখণ্ড থেকে বেরিয়েছেন এবং এসে পৌঁছেছেন পারস্য সম্রাট কিসরা ও তার কওমের কাছে হক ও হেদায়েতের দাওয়াত নিয়ে...

যদি তারা সেটা কবুল করতে অস্বীকার করে, তাহলে তরবারিই করবে পরের ফয়সালা।

***

মুসলিম সেনাবাহিনী সিংহপুরুষ সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে কাদেসিয়ার কাছে শিবির স্থাপন করলেন, দুশমনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। এ বাহিনী ত্রিশ হাজারের বেশি নয়...

পক্ষান্তরে পারস্য বাহিনীর সেনাসংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার।

মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধসরঞ্জাম খুবই অল্প, সামান্য। পক্ষান্তরে পারস্য বাহিনীর যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম সীমার বাইরে ও গণনার ঊর্ধ্বে...

এ সত্ত্বেও পারস্য বাহিনী ভীষণ ভয় পাচ্ছিল মুসলিম বাহিনীকে, তারা তীব্র আতঙ্কিত বোধ করছিল মুসলিম সৈনিকদের নিয়ে।

বিচিত্র নয়, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম তো এসেছেন তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের আমানত পালন করতে, তারা এসেছেন শহীদি মৃত্যু হাসিল করতে। ফলে তাদের কোনো সৈনিকই এটা ভাবেন না যে, কোন কাতে তার মৃত্যু হবে? ডানে হোক বা বাঁয়ে—তাদের কোনো পরোয়া নেই।

পক্ষান্তরে পারস্য সেনাদল, সংখ্যায় অগণিত এবং সকল প্রকার অস্ত্র ও সরঞ্জামসমৃদ্ধ হলেও তারা জানেই না যে, কোন উদ্দেশ্যে তারা যুদ্ধ করতে এসেছে, কোন ব্যাপারটা তারা প্রতিরোধ করতে চায়।

সে কারণে সেনাপতি তাদের নিদিষ্ট সীমার মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আটকে রাখে, যেন কেউ পালিয়ে যেতে না পারে।

***

পারস্য সেনাপতি ভালোভাবে জানতেন যে, প্রতিপক্ষ মুসলিম সৈনিকেরা মৃত্যুকে ভয় তো পায়ই না, বরং উল্টো তারা শাহাদাত লাভের আশায় মৃত্যুর জন্য ভীষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে তার পূর্বের অভিজ্ঞতা আছে।

আর নিজের সৈনিকদের অবস্থা তিনি আরও ভালো করেই জানেন যে, ওরা কত ভিতু। ওরা একাধিক বার মুসলিম সৈনিকদের আক্রমণের সামনে তাকে একা ফেলে পালিয়েছে।

এসব বিবেচনা করে পারস্য সেনাপতি মুসলিম সেনাপতি সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আবেদন জানালেন, তার বাহিনী থেকে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর জন্য। তিনি সেই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলাপ করতে চান, তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চান।

***

সেনাপতি সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দশজনকে বাছাই করলেন, তাদের মধ্যে পারস্য সম্রাট কিসরার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচন করলেন মুগীরা ইবনে শু‘বা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে।

পাঠক, জানতে চেয়ো না যে, কী কারণে মুগীরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বাছাই করা হলো...

তিনি ছিলেন আরবের হাতেগোনা কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির একজন। এমনকি তাকে বলা হতো, ‘মুগীরাতুর রায়’ অর্থাৎ চমৎকার রায় ও ফয়সালাদাতা মুগীরা। বিখ্যাত তাবেঈ শা‘বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

আরবের পণ্ডিত চারজন,

মুআবিয়া ধৈর্য ও সহনশীলতার জন্য...

আমর ইবনুল আস জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য...

মুগীরা উপস্থিতবুদ্ধির জন্য...

যিয়াদ ইবনে আবীহ ছোট-বড় সব ব্যাপারের জন্য...

সেনাপতি সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুগীরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নির্বাচন করে মোটেও ভুল করেননি, কেননা, পারস্য সম্রাটের দরবারে উপস্থিতবুদ্ধির প্রয়োজন হবে বেশি, অন্য বিষয়ের তুলনায়।

***

নির্বাচিত সৈনিক প্রতিনিধিরা নির্ধারিত সময়ে কিসরার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন, পারস্যের জনসাধারণ যুবক-বৃদ্ধ, নারী-শিশু সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল তাদের দেখার জন্য।

তারা শুনেছে যে, এই যোদ্ধারা শত্রুর বিরুদ্ধে ভয়ংকর দুর্ধর্ষ আর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত কোমল। শুনেছে এদের নেতা ও জনতার সাম্য এবং রাসূলের প্রতি তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাসের কথা—যেগুলো তাদের রাস্তায় বের হয়ে স্বচক্ষে তাদেরকে দেখার জন্য আগ্রহী করে তুলেছে।

তারা যখন আগন্তুকদের দেখল... একেবারে অবাক হয়ে গেল, তাদের দৃষ্টি আটকে রইল মুসলিম মুজাহিদদের পাতলা দেহ, খসখসে মোটা চাদর আর একেবারে সাধারণ জুতার প্রতি...

উৎসুক পারস্য জনতার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে রাখছিল তাদের দুর্বল ঘোড়াগুলো, যারা তাদের পা দিয়ে জোরে জোরে জমিনে আঘাত করছিল, তাদের হাতের চাবুকগুলো, তাদের তরবারি ও ঢালগুলো।

তারা যখন সম্রাটের দরবারে হাজির হলেন, দেখতে পেলেন তার দরবারকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সোনালি কুশন ও

তাকিয়া দিয়ে মজলিস সাজানো হয়েছে। গুটিদার গালিচা বিছিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে। মূল্যবান মণিমুক্তা, ইয়াকূত পাথর ছাড়াও নানা প্রকার সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার উপকরণ দিয়ে সাজানো হয়েছে গর্বিত এক সম্রাটের আসর।

আর সম্রাট নিজে, তিনি বসেছেন একটি সোনার তৈরি সিংহাসনে।
মুজাহিদ প্রতিনিধিদল ভেতরে প্রবেশ-মুহূর্তে দারোয়ান তাদের বলল,
'আপনাদের অস্ত্রগুলো দরজার কাছে রেখে যান।'

তারা জবাব দিলেন,
'দেখুন, আমরা এখানে স্বেচ্ছায় আসিনি, আমন্ত্রণ করে আমাদের আনা হয়েছে... হয়তো আমাদের মতো করেই ভেতরে যেতে দেবেন, নইলে আমরা ফিরে চলে যাব।'

এ কথা শুনে তাদের অস্ত্রসহ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলো।

***

মজলিসে তারা সকলেই আসন গ্রহণ করার পর পারস্য সম্রাট কিসরা তীর্যক ভঙ্গিতে তাদের দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষ করতে শুরু করলেন...

তিনি তাদের পোশাকের কথা জানতে চাইলেন, এর নাম কী?...
আবার তাদের চাদর সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, এর দাম কত?...
তাদের জুতার ব্যাপারে বললেন, কী দিয়ে তৈরি?...

এরপর জিজ্ঞাসা করলেন,
'আপনাদের এই অঞ্চলে আসার উদ্দেশ্য কী?'

তাঁদের মধ্য থেকে একজন উঠে বললেন,

إِنَّ اللهَ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَمِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدَالَةِ الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلَنَا بِدِيْنِهِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ ...

فَمَنْ قَبِلَ ذٰلِكَ قَبِلْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُ، وَمَنْ أَبٰى ... قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا حَتّٰى نُفْضِيَ إِلٰى مَوْعُوْدِ اللهِ.

'আল্লাহ তাআলা আমাদের পাঠিয়েছেন যেন তাঁর বান্দাদেরকে অন্যদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক লা শরীক আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করতে পারি। যেন তাদের দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে পারি। এবং সকল বাতিল মতবাদের বে-ইনসাফী ও জুলম থেকে মুক্ত করে তাদের ইসলামের পরিপূর্ণ সাম্যনীতির কাছে পৌছে দিতে পারি। তিনি আমাদেরকে তাঁর মনোনীত দীন দিয়ে তাঁর সৃষ্টির কাছে পাঠিয়েছেন, যেন তাদের ওই দীনের দিকে আহ্বান জানাই।

যে ওই দীন কবুল করে নেবে আমরা তাদের স্বাগত জানাব এবং কোনো যুদ্ধ না করে আমরা ফিরে যাব। আর ওই দীনকে যে অস্বীকার করবে তার বিরুদ্ধে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতেই থাকব যতক্ষণ আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিষয় না আসবে।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
'আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিষয়টা কী?'

সেই সৈনিক জবাব দিলেন,
'প্রতিশ্রুত বিষয় মানে যুদ্ধে নিহত হলে 'জান্নাত' আর নিরাপদে বিজয়ী হয়ে ফিরলে 'গনিমত'।

সম্রাট বললেন,
'আমরা আপনাদের কথা শুনলাম, আপনারা কি যুদ্ধের ব্যাপারটিকে একটু পিছিয়ে দেবেন, যেন আমরাও ভেবে দেখতে পারি এবং আপনারা চিন্তা করতে পারেন।'

মুসলিম সৈনিক বললেন,
'হ্যাঁ, হতে পারে সেটা, কিন্তু আপনি কতটুকু সময় চান? এক দিন নাকি দুই দিন?'

সম্রাট বললেন,

'না না, এক দিন দু'দিন নয়, আরও বেশি সময় দরকার যেন আমাদের বুদ্ধিজীবী এবং নেতৃস্থানীয়দের কাছে চিঠিপত্র লিখে তাদের মতামত নিতে পারি।'

মুসলিম সৈনিক বললেন,

'আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের সময় শত্রুদের জন্য তিন দিনের বেশি অবকাশ দেওয়ার বিধান রাখেননি। অতএব আপনি নিজের ও কওমের ব্যাপারে ভেবে দেখুন এবং তিন বিকল্পের একটি বেছে নিন।'

সম্রাট জানতে চাইলেন,

'সেই বিকল্প তিনটি কী?'

মুসলিম সৈনিক বললেন,

'আমাদের রাসূল আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন প্রতিবেশী জাতির মাধ্যমে দাওয়াতের সূচনা করি এবং তাদের সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করি...

হয়তো তারা আমাদের দীন গ্রহণ করে নেবে, যা সকল কল্যাণকে কল্যাণ মনে করে এবং সকল প্রকার মন্দকে মন্দ বলেই স্বীকার করে...

অথবা দুইটি বিকল্পের সহজতম ব্যবস্থাটি গ্রহণ করবেন। সেটি হচ্ছে জিযিয়া (ইসলামী রাষ্ট্রকর্তৃক অমুসলিম নাগরিকদের ওপর আরোপিত নিরাপত্তা কর। এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিমদের মতোই তাদের জান, মাল, ইজ্জতের নিরাপত্তা দিতে বাধ্য)।

যদি তারা জিযিয়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো পথ রইল না।'

এ কথা শুনে পারস্য সম্রাট রাগে ফেটে পড়লেন এবং হুংকার ছেড়ে বললেন,

'পৃথিবীতে তোমাদের মতো এত ক্ষুদ্র, পরস্পর শত্রুতা ও কলহপূর্ণ এবং নিকৃষ্ট ও হতভাগা জাতি আর আছে বলে আমার জানা নেই।

এতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসন করার দায়িত্ব আমরা দিয়ে রেখেছিলাম আমাদের আঞ্চলিক এক করদ রাজ্যের গভর্নরের ওপর...

তোমাদের অতিক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট ভেবে আমরা যুদ্ধ করতে চাইনি...

তোমাদের সংখ্যা যদি আজ একটু বেড়ে গিয়ে থাকেও, খবরদার তাতে ধোঁকায় পড়ে যেয়ো না...

যদি অভাব, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য তোমাদের এখানে আসার জন্য প্ররোচিত করে থাকে, তাহলে আমরা তোমাদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করব যতদিন পর্যন্ত তোমাদের জমিনে ফসল উৎপাদন না হবে। আমরা তোমাদের নেতাদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করে দেব এবং এমন শাসক নিয়োগ দেব, যে তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবে।'

সম্রাট তার বক্তব্য অব্যাহত রেখে বলেন,

'আমাদের দেশে তোমাদের ঢুকে পড়ার দৃষ্টান্ত সেই মাছির মতো, যে মধু দেখে বলে উঠল, আমাকে যে মধুর কাছে পৌঁছে দেবে তাকে দেব দুই দিরহাম। এরপর যখন মধুর চাক ভেঙে তার মাথার উপর পড়ল এবং সে মধুর মধ্যে ডুবে মরতে লাগল, তখন সে বাঁচার উপায় খুঁজে ব্যর্থ হয়ে বলতে লাগল, আমাকে যে বাঁচাবে তাকে দেব চার দিরহাম।'

এরপর তিনি রেগে হুংকার ছেড়ে বললেন,

'সূর্যের কসম খেয়ে বলছি, আগামীকাল তোদের সবগুলোকে কচুকাটা করব।'

***

এমন সময় মুগীরা ইবনে শুবা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন,

'মহামান্য সম্রাট!... যারা আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন তারা নিতান্তই ভদ্রমানুষ—যারা ভদ্রমানুষের কাছে লজ্জায় অনেক কথা লুকিয়ে রাখে। তাদের যত বিষয় দিয়ে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে, সব কথা তারা বলেননি, তারা সেটাই সঠিক করেছেন...

তারা যা করেছেন সেটাই তাদের জন্য শোভনীয়।

আপনি চাইলে তাদের সামনেই আমি তাদের আরো কিছু কথা বলতে পারি।

'আপনি আমাদের শুধু খারাপ সময়ের খারাপ অবস্থার কথাই বলেছেন, যা ছিল আমাদের অতীতের কথা, আমাদের বর্তমানের কথা আপনি একটিও বলেননি। কেননা, সেটা আপনার জানাই নেই। এ কারণে আপনার বক্তব্য পূর্ণ বাস্তবের চিত্র নয়।

আমাদের যে ক্ষুধা ও খাদ্যের অভাবের কথা আপনি বলেছেন, তো সেই অতীতে আমাদের ক্ষুধার কোনো তুলনাই ছিল না। ক্ষুধার কারণে আমরা গুবরেপোকা, বিচ্ছু, সাপ ধরে ধরে খেতাম, আমরা মনে করতাম ওগুলোও খাওয়ার উপযুক্ত।

আমাদের বাড়িঘর ছিল জমিনের পৃষ্ঠ, আর আমাদের পোশাক ছিল উট আর ভেড়ার পশম দিয়ে বুনানো।

আমাদের ধর্ম ছিল একে অন্যকে খুন করা, পরস্পর জুলুম করা। আমরা অনেকেই মেয়েসন্তানকে জীবন্ত দাফন করে ফেলতাম এই আশঙ্কায় যে, সে আমার খাদ্য নষ্ট করে ফেলবে।

আমরা পাথরের পূজা করতাম, আবার দেবীমূর্তির চেয়ে ভালো দেবী পেলে তারই পূজা শুরু করতাম আর আগেরটা ফেলে দিতাম।

এই ছিল আমাদের অতীতের অবস্থা। এরপর আল্লাহ আমাদের কাছে আমাদেরই চেনাজানা একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ পাঠালেন...

আমাদের মাঝে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের মানুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ, সর্বোত্তম পরিবারের মানুষ। নিজে তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী এবং সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।

তিনি আমাদের একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান জানালেন। তিনি অনেক ভালো ভালো কথা বললেন, আমরা বললাম তার বিরুদ্ধে।

তিনি সত্য কথা বললেন কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলাম। তাঁর লোকসংখ্যা বাড়তে থাকল আর আমাদের হ্রাস পেতে থাকল...

তিনি যত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সবই বাস্তবে ঘটে গেছে...

এক সময় মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরে তাঁকে সমর্থন দেওয়ার এবং তাঁকে অনুসরণ করার প্রেরণা ঢেলে দিলেন, তখন তিনিই হয়ে গেলেন আমাদের এবং মহান প্রতিপালকের মাঝে মধ্যস্থতাকারী...

এরপর তিনি আমাদের যা কিছু বলেছেন সেটা মূলত আল্লাহর কথাই বলেছেন... আমাদের যত কিছুর আদেশ করেছেন মূলত সেগুলো আল্লাহরই আদেশ।

তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, এই দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের অনুসারী হবে তারা তোমাদের মতোই সকল পুরস্কার পাবে এবং তোমাদের মতোই তাদের ওপরও সকল বিধান প্রযোজ্য হবে।

যারা তোমাদের অনুসারী হতে অস্বীকার করবে, তাদের জিযিয়া প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ করবে, তখন তাদের তোমাদের মতোই পরিপূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করবে। আর যারা এই চুক্তি করতে অস্বীকার করবে, তাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করবে...

অতএব আপনি চাইলে জিযিয়া প্রদানের চুক্তি করতে পারেন। ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসাবে জিযিয়া প্রদান করবেন। যদি সেটা না চান, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকবে না।

অথবা ইসলাম গ্রহণ করুন, নিজে বাঁচুন এবং পরিবারকে বাঁচতে দিন।'

পারস্য সম্রাট ভীষণ রেগে বলে উঠলেন,
'দূত হত্যা নিষিদ্ধ না হলে আমি তোমাদের সবগুলোকে হত্যা করে ফেলতাম।'...

এরপর দারোয়ানকে বললেন,

'এক ঝুড়ি মাটি এনে এদের সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তির মাথায় চাপিয়ে দাও। এরপর জীবজন্তুর মতো এদের তাড়িয়ে নিয়ে যাও। একেবারে মাদায়েনের বাইরে তাড়িয়ে দেবে।'

এরপর জিজ্ঞাসা করলেন,

'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানী কে?'

আসেম ইবনে আমর অন্যদের এই কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন 'আমি'।

তখন তিনি তার মাথায় মাটির ঝুড়ি চাপিয়ে দিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন,

'তোমাদের সেনাপতিকে গিয়ে বলো, আগামীকাল রুস্তমকে পাঠাব, কাদেসিয়ার গর্তে সে তোমাদের সবগুলোকে পুঁতে রাখবে।'

***

বেশি সময়ের দরকার ছিল না, অল্প একটু পরেই হয়ে গেল সেই 'আগামীকাল।'

সেই 'আগামীকাল' সূর্য ডোবার আগেই পরাজিত পারস্য বাহিনীর সৈনিকরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখল, মুসলিম সৈনিকদের বর্শার মাথায় শোভা পাচ্ছে তাদের বিখ্যাত সেনাপতি রুস্তমের কর্তিত মস্তক।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৮১৭৯।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা।
৪. *সীরাতু ইবনি হিশাম*, ১ম খণ্ড ৩১৩ পৃষ্ঠা।
৫. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩য় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, ৩৭-৪৩ এবং ৮ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা।
৭. *আত-তাবারী*, ৫ম খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা।
৮. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১ম খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা।

আমর ইবনুল জামূহের দুই পুত্র
মুআয এবং মুআউওয়ায
(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)

ওই দুই ভাইয়ের মাঝে অবস্থান করে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, তা আর কোনো দুইজনের মাঝে অবস্থান করে পাইনি—রাসূলের কথা আলাদা।

—আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

যে সময় কিশোর বালক মুআয ইবনে আমর ইবনুল জামূহ সমবয়সী একদল খেলার সাথির সঙ্গে সবুজ ঘাস, শীতল ছায়া ও পানির মাঝে খেলাধুলা আর আনন্দ-ফুর্তি করে বেড়াচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ তাদের সামনে এসে দেখা দিলেন মক্কার তরুণ দাঈ মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি কোমলভাবে হৃদ্যতার সঙ্গে বাচ্চাদের অভিবাদন জানালেন। ভালোবাসা ও স্নেহের পরশ মিশিয়ে বললেন,

‘কিগো সোনামণিরা, আমি তোমাদের মজার মজার কথা শোনাব, একটু কি বসবে আমার কাছে?

আমার কথা তোমাদের যদি মজা লাগে, তাহলে সবটুকু শোনাব... আর যদি মজা না পাও, তাহলে বন্ধ করে দেব, কেমন?’

এই প্রস্তাবে ছোট্ট কিশোর বালকের দল একে অন্যের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, যা দেখে বোঝা যায় তারা খুব রাজি, এতে তারা অনেক খুশি। তারপরও তারা মুখ ফুটে বললেন,

'অবশ্যই শুনব।'

বালকেরা তাকে ঘিরে বসল, যেভাবে মালার চমৎকার দানাগুলো সুন্দর গলায় শৃঙ্খলার সঙ্গে ঘিরে বসে থাকে। মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের দিকে মিষ্টি হাসিমুখ করে তাকালেন...

তাদের সম্বোধন করলেন মিষ্টি আলোকিত বর্ণনায়।
তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুললেন...
ঈমানের মিষ্টতাকে তাদের হৃদয়ে সাজিয়ে দিলেন...
কুফর এবং মূর্তিপূজাকে ঘৃণ্য বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করলেন...

তার বক্তব্য শেষ করতে না-করতেই মুআয ইবনে আমর ইবনুল জামূহের চেহারা ঈমানের আলোতে ঝলমলিয়ে উঠল... এরপর তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আমি যদি এই দীন গ্রহণ করতে চাই, তাহলে কী করতে হবে?'

তিনি জবাব দিলেন,
'ওই জলাশয়ের কাছে গিয়ে পানি দিয়ে নিজেকে পবিত্র করবে, তারপর সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং তিনিই সর্বশেষ রাসূল।

এরপর সেই মহান সত্তার দিকে মনোনিবেশ করবে যিনি আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন, তারপর দুই রাকাত নামায আদায় করবে...'

মুআয বলে উঠলেন,
'তার মানে এই দীনের প্রথম কথা হচ্ছে অযুর দ্বারা শরীরকে পবিত্র করা এবং তার পরে নামাযের মাধ্যমে আত্মাকে পবিত্র করা।'

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুগ্ধতা নিয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন,

'কী দারুণ হে মুআয! তুমি কত দ্রুত বুঝে গেছ!'

এরপর মুআয পানির কাছে গিয়ে পবিত্র হয়ে এলেন, কালেমা শাহাদাত পাঠ করে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন...

তার দুই ভাই মুআউওয়ায এবং খাল্লাদ তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখামাত্রই ইসলাম কবুল করে নিলেন, তার মতোই সব কাজ করলেন, আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

***

মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আমর ইবনুল জামূহ তখন খুবই বৃদ্ধ বয়সী।

তার একটি ব্যক্তিগত দেবীমূর্তি ছিল, নাম—মানাত। সেটা তিনি তৈরী করিয়েছিলেন অনেক দামি কাঠ দিয়ে। সেই দেবীমূর্তিটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সেখানে আগরবাতি জ্বালানো, আতর-চন্দন মাখানো সবকিছুই তিনি করতেন।

অন্য সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে তিনি নিজের দেবীকে নিয়ে গর্ব ও প্রতিযোগিতা করতেন...

দেবীর চরণে বিভিন্ন প্রকার সেবার মান্নত করতেন...

সকাল-সন্ধ্যায় দেবীমাতা মানাতের প্রণাম করতেন...

সর্বদা তাকে উত্তম সুগন্ধি দিয়ে সুবাসিত করে রাখতেন...

তার উদ্দেশে উন্নতমানের জীব বলি দিতেন।

মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভেবে দেখলেন যে, তাঁর পিতার ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা নেই যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেবীকে তাঁর জীবন থেকে উৎখাত করা না যাবে।

তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, তার বৃদ্ধ বাবা দেবীমাতার সমালোচনায় একটি কথাও শুনতে পারবেন না, এত দীর্ঘ যুগ যুগ ধরে দেবীর পদসেবার পর এখন কারোর সমালোচনায় অথবা যুক্তিতে তিনি মূর্তিপূজা বর্জন করবেন সেটাও অসম্ভব ব্যাপার।

সুতরাং সমবয়সী বন্ধু ও ভাইদের সহযোগিতায় তাকে বোঝানোর পথ না ধরে ধরেন ভিন্ন একটি পথ।

***

একরাতে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজে এবং তার দুই ভাই মুআউওয়ায ও খাল্লাদ এবং তাদের সালামা গোত্রীয় সমবয়সী বন্ধুরা মিলে মানাতের মন্দির ঘরে হাজির হলেন এবং দেবীকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন বাড়ির পেছনের একটি গর্তের কাছে, যেখানে নোংরা-আবর্জনা ফেলা হতো। ওই নোংরা-আবর্জনার গভীরে দেবীকে ছুঁড়ে মেরে যার যার মতো ফিরে এলেন। যার যার মতো ঘুমিয়ে গেলেন। যেন কিছুই হয়নি...

সকালে অভ্যাসমতো বুড়া তার মন্দির ঘরে গিয়ে দেখলেন তার দেবী নেই...

রাগে তো তার ফেটে পড়ার দশা, তিনি হন্যে হয়ে তাকে খুঁজতে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত দেবী মানাতকে গর্তের আবর্জনার মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখলেন।

তিনি তাকে সেখান থেকে বের করে আনলেন। পবিত্র পানিতে ধুয়ে দামি আতর মেখে তাকে সুবাসিত করলেন। এবং আবার তাকে মন্দির ঘরে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

***

মুআয এবং তার সঙ্গীরা একই কাজ করলেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার, আর বুড়া প্রতিবার তাকে গর্ত থেকে তুলে এনে, ধুয়ে আতর-চন্দন মেখে সুবাসিত করে রাখতে লাগলেন।

চতুর্থ বার বুড়া একটু বিরক্ত হলেন। ঘুমানোর আগে দেবীর কাছে গিয়ে নাঙ্গা তরবারি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন,

'হে মানাত, সত্যিই যদি তুমি মাবুদ হয়ে থাকো, তাহলে নিজেকে ওইসব পাপী ও দুষ্ট থেকে রক্ষা করো, যারা তোমার প্রতি অন্যায় ও মন্দ আচরণ করছে, তোমার ওপর জুলুম করছে।

এই তরবারি তোমাকে দিয়ে গেলাম। এটা দিয়ে তোমার যা খুশি কোরো।'

যখন সকাল হলো, তিনি আবারও দেবীকে সেই একই গর্তের মধ্যে দেখতে পেলেন। এবার আরও বেশি খারাপ অবস্থা, মরা কুকুরের বাচ্চার সঙ্গে তাকে রশি দিয়ে বেঁধে পায়খানা-পেশাবের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি এবার আর দেবীকে নোংরা থেকে উঠালেন না, যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে রেখে এলেন, এরপর ঘোষণা করলেন,

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ...

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল...'

***

মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার ভাইয়েরা পিতার ইসলাম গ্রহণে খুব খুশি হলেন; তার ঈমানে তারা খুবই আনন্দ পেলেন।

প্রত্যেক সদস্যের ইসলামের অনুগত হয়ে যাওয়ার কারণে এই মুমিন পরিবার পরিণত হয়ে গেল ইয়াসরিবের একটি ইসলামী দুর্গে।

প্রতিটি সদস্য আলোকিত হয়ে উঠল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের আলোয়।

***

মুআয ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণের অল্প কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে চলে এলেন।

মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার ভাইয়েরা তাঁর কাছে ছুটে এলেন যেভাবে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ঠাণ্ডা পানির কাছে ছুটে যায়।

তাঁর সঙ্গ আঁকড়ে ধরে থাকলেন, যেভাবে একমাত্র সন্তান মায়ের পিছ ধরে থাকে।

প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদের অনুসরণ করে থাকে ঠিক সেভাবেই তারা রাসূলের অনুসরণ করতে থাকলেন।

ফলে তারা থাকতেন তাঁর সঙ্গে যখন সকাল হতো...
আবার তখনো তাঁর সঙ্গে থাকতেন যখন সন্ধ্যা হতো...

যখনই তিনি সাহাবীদের উপদেশ দিতে বসতেন, তারাও বসে যেতেন সেখানে। উপদেশ শুনতেন এবং দীনের শিক্ষা অর্জন করতেন।

শেষ পর্যন্ত মুআয এবং তার ভাইয়েরা হয়ে গেলেন ইয়াসরিবের 'তরুণ ফুল'। এবং ইসলাম ও মুসলিমদের হৃদয়ের প্রশান্তি।

***

এরপর নেককার ছোট বালকদের দিন দ্রুতগতিতে কেটে যেতে লাগল...

এরই মধ্যে বদরের যুদ্ধ ঘটে গেল...

সে যুদ্ধে মুআয এবং তার ভাই মুআউয়ায রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার রয়েছে বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য অবদান। ইতিহাস যাকে সোনালি পাতায় আলোকিত করে রেখেছে।

এ ব্যাপারে বিখ্যাত সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর থেকে কান পেতে শুনতে হবে।

তাঁর কাছ থেকে দুই ভাইয়ের বিষয়ে কিছু শুনি...

কারণ, তিনি ওই দু'জনের এমন কিছু কর্মকাণ্ড দেখেছেন যা তাঁকে মুগ্ধ ও হতবাক করেছে...

***

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'বদর যুদ্ধের দিন আমি যখন মুজাহিদদের কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি আমার পাশে তাকিয়ে দেখলাম, দেখি আমার ডানে ও বামে আনসারী ভাইদের অল্পবয়সী দুইটি কিশোর বালক।

একজন আমাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকল...

আমি তার কাছে গিয়ে বললাম,
'বেটা তুমি কি ইশারায় আমাকেই ডেকেছ?'

সে বলল, 'হ্যাঁ।'

আমি বললাম,
'কেন ডাকলে বেটা? কী চাও?'

– চাচা, আপনি কি আবু জাহালকে চেনেন?

– হ্যাঁ, চিনি।

– আমাকে একটু দেখিয়ে দিন।

– তাকে তোমার কী প্রয়োজন বেটা?

– শুনেছি সে নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে...

আল্লাহর কসম তাকে দেখামাত্রই আমি তার ওপর আক্রমণ করব এবং আমি আক্রমণ চালিয়েই যাব যতক্ষণ আমাদের মধ্যে কেউ একজন না মরবে। যার মরণ আগে নির্ধারিত সে-ই মরবে। সেটা আমি হই বা সে...

আমি মুগ্ধ হয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে তার দিকে তাকালাম, জিজ্ঞাসা করলাম,

– তুমি কে?

– মুআয ইবনে আমর ইবনুল জামূহ।

এরপর আমি কাতারে সোজা করে নিলাম নিজেকে। তখন অন্যজন আমার কাছে এসে ইশারা করল। আমি তার দিকে ঝুঁকলাম, সেও তার ভাইয়ের মতোই কথাবার্তা বলল।

আমি জানতে চাইলাম,
'তুমি কে?'

সে বলল,
'আমার নাম মুআউওয়ায ইবনে আমর ইবনুল জামূহ।'

আমি আবার জানতে চাইলাম,
'আমার ডানে দাঁড়ানো ওটা কে?'

সে বলল,
'আমার ভাই মুআয।'

'ওই দুই ভাইয়ের মাঝে অবস্থান করে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, আর কখনো কোনো দু'জনের মাঝে অবস্থান করে সেই আনন্দ পাইনি। রাসূলের কথা আলাদা।'

***

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আবু জাহালকে দেখতে পেলাম কুরাইশের লোকদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে।

আমি তাদের দু'জনকেই ডেকে বললাম,
'হে ভাতিজাদ্বয়...
তোমরা কি ওই লোকটিকে দেখতে পাচ্ছ, যে কুরাইশীদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে?

তারা দু'জনেই বলল,
'হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি।'

আমি বললাম,
'ওইটাই আবু জাহাল, যার কথা তোমরা জানতে চেয়েছিলে।'

***

মুআয ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'আমি যখনই আবু জাহালকে ভালোভাবে চিনে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্দেশ্য করে রওনা করলাম।

মুশরিকরা তাকে ঘিরে ধরে রেখেছিল চারপাশ দিয়ে, যেন সে লোকারণ্যের মাঝে নিরাপদ থাকে।

একজন মুসলিম সৈনিক, যিনি আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, তিনি বললেন,
'খবরদার হে বালক, আবু জাহালের কাছে যেয়ো না...
তার কাছে যাওয়া মানে তোমার ওপর কঠিন বিপদ নেমে আসা...'

আল্লাহর কসম! তার ওই সাবধান বাণী আমার দৃঢ়তা ও সংকল্পকে শুধু বৃদ্ধিই করল।

আমি তার দিকে ধাবিত হলাম। যখন আমি সুযোগ পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং একই সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে তরবারির আঘাত করলাম—যা তার পায়ের গোছাকে শরীর থেকে আলাদা করে মাটিতে ফেলে দিলো। আমার ভাই মুআউওয়াযও আমার অনুসরণ করে।

যখন সে আবু জাহালের ওপর চড়ে বসল, তখন সে উপুড় হয়ে তার গলায় ছুরি চালাতে থাকল।

পক্ষান্তরে মুশরিকদের বর্শাগুলো তাকে আবু জাহালের ওপর আক্রমণ থেকে ঠেকানোর চেষ্টা করল, চতুর্দিক থেকে তাদের বর্শার আক্রমণ

তাকে নিস্তেজ করে দিলো। তিনি শহীদ হয়ে আবু জাহালের পাশেই পড়ে রইলেন।

আর আমি, আবু জাহালের পুত্র ইকরিমা আমার কাঁধের ওপর তরবারির আঘাত চালাল, যা আমার বাম হাতকে কাঁধ থেকে আলাদা করে দিলো।

কিন্তু হাতটি বাম পাঁজরের চামড়ার সঙ্গে ঝুলে থাকল।

আমি সারাদিন যুদ্ধ করতে থাকলাম, আমার কাটা ও ঝুলন্ত হাতটি ঝুলতে থাকল।

এক সময় ঝুলন্ত হাতটি আমার জন্য সমস্যার কারণ হয়ে গেল এবং আমার যুদ্ধ চালানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগল...

তখন আমি মাটির ওপর হাতের তালু রেখে পা দিয়ে পাড়া দিয়ে ধরলাম এবং টানতে টানতে ছিঁড়ে ফেললাম। পরে সেই ছেঁড়া হাতটা মাটিতে পড়ে রইল।

***

যুদ্ধ থেমে গেলে একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবু জাহালের মৃত্যুর সুসংবাদ শোনালে তিনি সুসংবাদদাতাকে বললেন,

‘মহান আল্লাহর প্রশংসা যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি কি আবু জাহালের মৃত্যু নিশ্চিত করে দিয়েছেন?’

সুসংবাদদাতা বললেন,
‘হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে।...’

তখন নবীজি বললেন,
‘আল্লাহু আকবার... আল্লাহু আকবার...

আলহামদুলিল্লাহ, যিনি তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন।’

এরপর...

মুআয ইবনে আমর ইবনুল জামূহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক হাত দিয়েই ইসলামের জন্য সংগ্রাম করতে থাকেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে...

এবং আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার যুগেও...

উসমান ইবনে আফ্‌ফান যিননূরাইন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনামলে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রভুর ডাকে সাড়া দেন...

ডান হাতটি তার সঙ্গে চলে যায়...

আর বাম হাতটি...
তিনি আশা করতেন, তার আগেই জান্নাতুন নাঈমে পৌঁছে গেছে।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৮০৫১।
২. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা মুআয।
৩. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৮১৬৩, মুআউয়ায।
৪. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা, মুআউয়ায।
৫. *আল-আলাম*, ৮ম খণ্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা।
৬. *ইবনে হিশাম*, ২য় খণ্ড, ১০৬ ও ২৮৭ পৃষ্ঠা।
৭. *ফাতহুল বারী*, ৭ম খণ্ড, ২৯৫, ৩২৭ পৃষ্ঠা।

মুসআব ইবনে উমাইর

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)

ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম ইসলামের সুসংবাদবাহী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হকের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন তাঁর কাছে ছুটে এলেন সেসব মানুষ যাদের হৃদয়গুলোকে আল্লাহ ঈমানের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন...

আর দূরে সরে রইলেন সেই সব লোক যাদের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলা চিরস্থায়ী কুফর ও অবাধ্যতার সিল মেরে দিয়েছেন।

যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর চিরন্তন দীনের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর পরিচালিত করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন টগবগে যুবক, মসৃণ ত্বক, সুন্দর ও চমৎকার ললাট, স্বাস্থ্যবান, সচ্ছল জীবনের অধিকারী যুবক...

যার নাম মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

***

একদিন এই সতেজ তরুণ দারুল আরকামে গিয়ে হাজির হলেন, তার পোশাক থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছিল, তার চেহারায় ধন-ঐশ্বর্যের ছাপ প্রকাশ পাচ্ছিল...

তার দামি পোশাক জোড়া বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, বিপুল বিত্তের মাঝে তার বসবাস।

***

শান্ত কোমল যুবক গিয়ে হালকা করে দরজার কড়া নাড়ালেন, দরজা খুলে দেওয়া হলো...

তিনি লজ্জা ও আড়ষ্টতার সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলেন, কোমল ও শান্ত সুরে উপস্থিত সকলকে সালাম দিয়ে সবার পেছনে বসে পড়লেন।

উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তার ওপর আটকে রইল, তারা তাদের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

কারণ, তারা কত কামনা করেছেন যে এই যুবক এবং এর মতো আরও যারা আছে, আল্লাহ যেন এদের হেদায়েত দান করেন এবং এমন সুন্দর সতেজ তরুণদের যেন কবরের আযাব ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন।

***

রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সকলকে জান্নাতের সুসংবাদ শোনাচ্ছিলেন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক করছিলেন। যখন জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করছিলেন তখন সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়গুলো জাহান্নাম এবং তার ভয়ংকর আযাবের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল...

আবার যখন জান্নাতের সুসংবাদের কথা বলছিলেন তখন জান্নাত ও তার নায-নেয়ামতের জন্য তাদের অন্তরগুলো যেন আনন্দে উড়ছিল।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনার মাঝে মাঝে সাহাবায়ে কেরামকে শোনাচ্ছিলেন কিছু কিছু কুরআনের আয়াত—যাতে তাদের অন্তরে শান্তি আর হৃদয়ে প্রশান্তি নেমে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা মহান আল্লাহর কাছে জান্নাতের নেয়ামত আর জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির প্রার্থনা করছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই আলোচনা শেষ করলেন, কুরাইশী যুবক তাঁর কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন, তাঁর নিকটবর্তী হলেন আর পড়ে নিলেন কালেমায়ে শাহাদাত 'আশহাদু আল্লা... ইলা...হা ইল্লাল্লা...হু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ...'

এরপর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় তাঁর আনুগত্যের শপথ নিলেন।

***

তরুণ মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সকল মানুষের কাছে লুকিয়ে রাখলেন। কারণ, তিনি চাইতেন না যে, তার দরদি মা ধর্মত্যাগের সংবাদ শুনে ব্যথিত হোক। কেননা, তিনি জানতেন মায়ের জিদের কথা, জানতেন কুফরীর ওপর তার একগুঁয়েমির কথা।

তিনি এটাও চাইতেন না যে, কুরাইশের লোকেরা তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জেনে যাক। কারণ, তিনি জানতেন তাদের দেবদেবীকে ত্যাগ করার কথা যারা মনে মনে ভেবেছে তাদের প্রত্যেকের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানোর দৃঢ়সংকল্প তারা করে রেখেছে। বিশেষত সে মানুষটি যদি হয় তার মতো কুরাইশের উচ্চমর্যাদার কেউ এবং সে সম্পৃক্ত হয় তাদের কোনো বড় বিলাসী ব্যক্তির সঙ্গে।

***

তরুণ যুবক মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গোপনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসা-যাওয়া করতে থাকলেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকলেন তার নসিহত থেকে।

শেষ পর্যন্ত উসমান ইবনে তালহা তাকে একবার দেখে ফেলল নামাযরত, আর সে-ই এই খবর সবার মাঝে প্রচার করে দিলো।

সেই দিন থেকে শুরু হলো মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরীক্ষা। সেই দিন থেকেই তার পিতামাতা বাপ-দাদার ধর্মে ফিরিয়ে আনতে অক্ষম হওয়ার পর থেকে তাকে পরিত্যাগ করে এবং তার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক ইত্যাদি সকল খরচ বন্ধ করে দেয়। এ কারণেই তিনি হয়ে পড়েন তীব্র অভাবগ্রস্ত এবং ভয়ংকর বিপদগ্রস্ত।

কুরাইশের লোকজন তার পিছে লেগে গেল, তারা তাকে বন্দী করে রাখল, তার কারাবাস দীর্ঘ করল। তাকে পরাভূত করে রাখল দীর্ঘদিন। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এসব করে তাকে তারা দীন ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব! তরুণ যে ঈমানের স্বাদ পেয়ে গেছে।

***

কুরাইশের নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় মুসলিমরা যখন হাবাশায় হিজরত করলেন তখন এই কুরাইশী তরুণ হিজরতকারীদের দলভুক্ত হয়ে গেলেন।

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দীন রক্ষার স্বার্থে হাবাশায় হিজরত করে চলে গেলেন, পেছনে ফেলে রেখে গেলেন শৈশবের চারণক্ষেত্র, যৌবনের আবাস আর বংশীয় আত্মগরিমা...

ওইসব কিছুর বদলে পেলেন দারিদ্র্যের কষ্টমাখা এবং প্রবাসের একাকী বন্ধুহীন জীবন।

কিন্তু ওই সকল কষ্টই আল্লাহ এবং রাসূলের সন্তুষ্টির পাশে তার কাছে সহজ ও সহনীয় মনে হতে থাকে।

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন প্রথম হিজরত থেকে ফিরে এলেন মানুষ তাকে চিনতেই পারছিলেন না।

সতেজ প্রাণবন্ত, গোঁফওয়ালা সেই তরুণ আজ আর নেই, দারিদ্র্যের কশাঘাত তাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে।

যার পোশাক থাকত সর্বদা ঝলমলে, আজ তা একেবারেই জীর্ণশীর্ণ...

যার চেহারা ও ত্বক থাকত সর্বদা সতেজ, আজ সেই ত্বক ও চেহারা খসখসে, অমসৃণ...

চেহারায় ভাঁজ পড়ে সংকুচিত হয়ে গেছে, অথচ এক সময় এই চেহারা ও ত্বক হতো নরম তুলতুলে মসৃণ ও উজ্জ্বল, ঝলমলে।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আসতে দেখলেন, তখন তার গায়ে ছিল একটি ভেড়ার চামড়া, আর কোমরে ছিল বেল্ট বাঁধা, তাকে দেখে নবীজি সাহাবীদের বললেন,

أُنْظُرُوْا إِلى هذَا الْفَتى الَّذِىْ قَدْ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ ... لَقَدْ رَأَيْتُه بَيْنَ أَبَوَيْنِ يَغْدُوَانِه بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ... فَدَعَاهُ حُبُّ اللهِ وَرَسُوْلِه إِلى مَا تَرَوْنَ.

‘তোমরা এই যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখো, যার হৃদয়কে মহান আল্লাহ আলোকিত করে দিয়েছেন। তাকে আমি দেখেছি যখন সে পিতামাতার সঙ্গে ছিল, সে সময় সর্বশ্রেষ্ঠ ও দামি খাদ্য ও শরাবের ব্যবস্থা তার জন্য করা হতো। আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা আজ তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছ।’

***

মুসলিম জাতির জন্য পৃথিবী আরও একবার সংকুচিত হয়ে গেল। তাদের আরও একবার কুরাইশের নজিরবিহীন নির্যাতনের শিকার হতে হলো। বাধ্য হয়ে তারা দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরত করলেন...

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও হিজরতকারীদের সঙ্গে শরীক হলেন।

কিন্তু হিজরত করে হাবশায় চলে যাওয়ার পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে পারলেন না। যার ফলে তিনি মক্কায় ফিরে কুরাইশের নির্যাতন সহ্য করতেও প্রস্তুত হয়ে

গেলেন, কিন্তু রাসূলকে ছেড়ে দূরে থাকার কষ্ট তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না।

তিনি ছায়ার মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন। তাঁর আদর্শ ও চরিত্র-মাধুরীর শিক্ষা নিলেন যথাসাধ্য। ফলে তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হয়ে উঠলেন অন্যতম সেরা কুরআনের হাফেয...

ইসলামী শরীয়তের অন্যতম সেরা বোদ্ধা...

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক হাদীস সংগ্রহকারীদের অন্যতম।

***

এরপর প্রথম আকাবার বাইআত সংঘটিত হলো। বাইআতকারীরা মদীনায় নিজেদের কওমের কাছে ফিরে গেলেন এবং কওমের লোকদের সত্য ও হেদায়েতের দীনের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকলেন...

কিন্তু অল্পদিনেই তারা অনুভব করলেন যে, তাদের একজন শিক্ষক প্রয়োজন—যিনি কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞাত হবেন এবং ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে হবেন বেশি অভিজ্ঞ।

ফলে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন পেশ করলেন, তাদের দীন শেখানোর জন্য একজন যোগ্য শিক্ষক পাঠাতে।

এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদের কাছে পাঠালেন মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে।

ফলে ভূপৃষ্ঠে তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম সুসংবাদবাহী।

***

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনায় অবতরণ করলেন, মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করতে এবং ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানের শিক্ষা প্রদান করতে শুরু করলেন।

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী, কখনো নীরব বসে থাকতেন না। ছিলেন কর্মঠ, উদ্যমী—অলসতা কখনোই করতেন না।

ফলে তার প্রচেষ্টায় প্রচুর মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেন...

অবশেষে অবস্থা এই হলো যে, ইয়াসরিবের প্রতিটি ঘরে ঘরে কমপক্ষে একজন মুসলিম পুরুষ বা একজন মুসলিম নারীর উপস্থিতি অবশ্যই পাওয়া যেত।

এমনকি তার নামে লেখা হয় এই বিরল সম্মানের কথা যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পূর্বে সর্বপ্রথম সেখানে জুমার জামাত কায়েম করেন তিনিই।

***

যখন হজের মৌসুম এল, মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সত্তরজন মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় রওনা করলেন। তারা সবাই আকাবাতে রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং বিখ্যাত আকাবার বাইআত সম্পন্ন করলেন।

বাইআত গ্রহণকারীরা হজের পর মদীনায় ফেরত চলে গেলেন আর মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কায় থেকে গেলেন ততদিন পর্যন্ত যতদিন না আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন।

তিনি নিজে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাই ছিলেন মদীনার প্রথম হিজরতকারী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরে কুরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত পাকা করলেন এবং সৈনিকদের বিভিন্ন দল ও উপদলে ভাগ করলেন। মুহাজির দলের আমীর বানালেন আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে...

আর আনসার দলের আমীর বানালেন সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে...

সেনাদলের ডান পাশের নেতৃত্ব তুলে দিলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে...

আর বাম পাশের সেনানেতৃত্ব দিলেন মিকদাদ আল-কিন্দী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে...

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদা পতাকা দিলেন মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে। তিনি নিজের পবিত্র দুই হাতে পতাকাটি তাকে সমর্পণ করলেন। মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেটা গ্রহণ করলেন সম্মানের সঙ্গে, আনন্দ প্রকাশ করে। আর সেটা হাতে নিয়ে মাথা উঁচু করে সেনাদলের আগে আগে চলতে লাগলেন। পতাকার মর্যাদা রক্ষা করে বীরপুরুষের মতো এগিয়ে গেলেন।

বদর যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ভাই আবু উযাইরকে এক আনসারীর হাতে বন্দী দেখতে পেলেন, বন্দী ভাই চাচ্ছিলেন তাকে ভাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হোক।

তার এ কথা শুনে মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনসারীকে বললেন,

'ওকে শক্ত করে বেঁধে রাখো।

কেননা, ওর মা বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের মালকিন, যত অর্থই লাগুক তার মা তাকে মুক্ত করিয়ে নেবে।'

তখন বন্দী আবু উযাইর তার ভাই মুসআবকে আক্ষেপ করে বললেন,

'এই কি তোমার নিজের ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা?'

মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'তুমি আমার ভাই কী করে? তুমি নও, তোমাকে গ্রেফতারকারী মুসলিম আমার ভাই। তুমি একজন মুশরিক, কোনো মুসলিমের ভাই হওয়ার যোগ্য তুমি নও।'

***

ওহুদ যুদ্ধের দিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পতাকা সমর্পণ করলেন মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে, যেমন করেছিলেন বদর যুদ্ধের দিন... মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পতাকা উঁচু করে ধরে রাসূলের আগে আগে যাচ্ছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর ওপর কুরাইশের আক্রমণের পাল্লা ভারী হয়ে উঠল। এমনকি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকেও দূরে সরে পড়েন, কিন্তু সেই কঠিন মুহূর্তেও মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের পাশে দৃঢ়পদে অবস্থান গ্রহণ করেন, একচুল পরিমাণ এদিক সেদিক করেন না।

আর তখন তার সামনে এসে পড়ে দুর্বৃত্ত মুশরিক সৈনিক ইবনে কামিআ। মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তরবারি দিয়ে চরম আঘাত করে। তার পতাকা ধরে রাখা হাত কেটে মাটিতে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পতাকাটিও মাটিতে পড়ে যায়।

তিনি অন্য হাত দিয়ে পতাকাটি উঁচু করে ধরেন...

দুর্বৃত্ত ইবনে কামিআ আবারও ফিরে এসে দ্রুত আক্রমণ চালায়, দ্বিতীয় হাতটিও কেটে পড়ে যায়, সঙ্গে পতাকাটিও মাটিতে পড়ে যায়। এবার কেটে পড়া দুই হাতের বাহু একত্র করে তিনি ইসলামের পতাকা উঁচু করে রাখেন।

দুরাচারী ইবনে কামিআ আবারও তার কাছে ফিরে এসে তৃতীয় আক্রমণ চালায়, এবার তরবারি নয় বর্শা ছুঁড়ে মারে তার বুকে। তিনি

শহীদ হয়ে মাটিতে পড়ে যান, তার ভাই আবুর রউম এসে ইসলামের পতাকা উঁচু করে ধরেন এবং এভাবেই পতাকা উঁচু করে মদীনায় ফিরে যান।

কুরাইশ বাহিনী বিজয়ী হয়ে ময়দান থেকে বের হয়। মুসলিম বাহিনী শহীদদের লাশ দাফনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আর তখনই দেখা গেল দুই হাত কাটা মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লাশ পড়ে আছে।

***

মুসলিম বাহিনী শহীদদের লাশ দাফন করতে চাইলেন...

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য তারা ছোট্ট একটি কাফন ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেলেন না। সেটা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা আলগা হয়ে যায়, আর পা ঢাকলে মাথা আলগা হয়ে যায়।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, মাথার দিকটা কাপড় দিয়ে আর পায়ের দিকটা কোমল ঘাস-পাতা দিয়ে ঢাকতে।

এরপর তিনি কাফনে আবৃত মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করলেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, আর কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে, তারা তাদের সংকল্প মোটেও পরিবর্তন করেনি।' –সূরা আহযাব : (৩৩) ২৩

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা।
২. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা।
৩. *সীরাতু ইবনে হিশাম*, ১ম খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা; ২য় খণ্ড, ৪৮১, ১১০, ১২৩, ১৫২, ২৯৯, ৩০০, ৩৩৬ পৃষ্ঠা।
৪. *আত-তাবাকাতুল কুবরা লিবনি সাআদ*, ৩য় খণ্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা।
৫. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৪২১ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৮০০২।

আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

'আত্মত্যাগের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল এক ঝুঁকি গ্রহণকারী সেনাপতি'

আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক চিরজীবন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন, সবশেষে ইয়ামামার মুরতাদবিরোধী যুদ্ধে শহীদ হয়ে মহান প্রভুর দরবারে চলে গেছেন।'

—ইবনে আব্দুল বার্‌র

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর মুমিন সঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম যত কষ্ট পেয়েছেন ইহুদী জাতির থেকে, তত কষ্ট আর কখনো কারও থেকে পাননি।

আর ইহুদীদের মধ্যে কাআব ইবনে আশরাফ এবং সালাম ইবনে আবুল হুকাইক ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক এবং আল্লাহর দীন ইসলামের জন্য সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক।

সকল দুষ্কৃতকারীর পাপ ও দুষ্কর্ম একত্র করলে যা হতো, এই দুইজনের পাপ ও দুষ্কর্ম ছিল তার চেয়ে বেশি... এই দুইজনের শয়তানী ও মন্দ স্বভাব ভাগ করলে সকল দুষ্টু ও মন্দ লোকের জন্য যথেষ্ট হতো...

তারা দু'জন নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছিল আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা...

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করাকে তারা বানিয়ে নিয়েছিল নিজেদের নেশা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও সঙ্গে কোনো চুক্তি করলেই এরা দু'জন সেই ব্যক্তির কাছে গিয়ে হাজির হতো। অনবরত তাকে উসকানি দিত চুক্তি ভঙ্গের জন্য। অবিরাম তাকে ফুসলাত সন্ধি বাতিলের জন্য।

ইসলামের কোনো একজন শত্রুকেও একটু শান্ত ও নিষ্ক্রিয় বসে থাকতে দেখলেই এরা দু'জন ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাকে শত্রুতায় উদ্বুদ্ধ করে তুলত।

***

ওই দুই দুষ্কৃতকারীর প্রথমজন কাআব ইবনে আশরাফ ছিল কবি। সে মুসলিমদের পবিত্র, কলঙ্কমুক্ত স্ত্রী-কন্যাদের বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়াত; তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, মনগড়া দুর্নাম রাটিয়ে বেড়াত...

আর দ্বিতীয়জন সালাম ইবনে আবুল হুকাইক ছিল গোলযোগ সৃষ্টিকারী। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করত। তাদের ইসলামবিরোধী মুশরিকদের চেতনা ও পরিকল্পনায় উৎসাহ দিত। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গাদ্দারি করার নীলনকশা প্রস্তুত করত।

এমনকি সে বিশাল বড় এক পাথর ছুঁড়ে রাসূলকে প্রায় হত্যা করেই ফেলত, যদি না জিবরীল আলাইহিস সালাম তার একটু আগেই প্রিয় নবীকে বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন।

ফলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, পাপের জীবাণু নির্মূল করা সম্ভব নয় ওই দুই দুষ্কৃতকারীকে নির্মূল করা ছাড়া...

আর মানুষের জান-মাল-ইজ্জত নিরাপদ করা সম্ভব নয় ওই দুই পাপীকে হত্যা করা ছাড়া।

***

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী আলাইহিস সালামকে যা দ্বারা ব্যাপক সাহায্য করেছিলেন তা হলো মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্র দু'টির প্রিয় নবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং তাঁর প্রতি ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতা।

আনসারীদের এই গোত্র দু'টি কল্যাণকর কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করত এবং কল্যাণকর কাজেই লিপ্ত থাকত। নেক কাজে তারা সব সময় একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে থাকতে চাইত এবং সর্বদা নেক কাজ করত...

উভয়েই তারা সুকীর্তি ও গৌরবময় কাজে নিজেদের অন্যের চেয়ে এগিয়ে রাখতে চেষ্টা করত।

আউস গোত্রের লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজ করলেই খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বলে উঠত,

'হতেই পারে না, ওদের এই ভালো কাজের দ্বারা আমাদের ওপরে উঠতে দেব না, এই কল্যাণের দ্বারা ওদের কিছুতেই আমাদের চেয়ে এগিয়ে যেতে দেব না...'

এরপর তারা অবিরাম সুযোগের সন্ধানে লেগে থাকত, শেষ পর্যন্ত আউসের মতো কখনো কখনো তাদের চেয়ে বেশি কোনো ভালো কাজ করে তবেই তারা ক্ষান্ত হতো।

একইভাবে ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণে যদি খাযরাজের লোকেরা কিছু করত, তাহলে আউসের লোকেরাও একই কথা বলত এবং একই রকম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করত...

তাদের এই প্রতিযোগিতায় মুসলিম জাতির কল্যাণ এবং ইসলামের উপকার হতে থাকে।...

আল্লাহ তাআলা আউস গোত্রকে বিশেষ এক সম্মানে ভূষিত করলেন, তাদের একদল যুবকের হাতে আল্লাহর দুশমন কাআব ইবনে আশরাফের হত্যা-ঘটনা ঘটিয়ে দিলেন। এতে খাযরাজের লোকেরা বলতে শুরু করল,

'এই নেক কাজের দ্বারা তাদের কিছুতেই প্রাধান্য পেতে দেব না, এর দ্বারা তাদের আমাদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে যেতে দেব না...

তারা যখন ইসলামের দুই ঝগড়াটে শত্রুর একজন কাআব ইবনে আশরাফকে হত্যা করেছে, ইসলামের দ্বিতীয় শত্রু সালাম ইবনে আবুল হুকাইক তো এখনো জীবিত...

আল্লাহ চাইলে এবং তাঁর সাহায্য পেলে এটাকে হত্যার সৌভাগ্য আমরাই অর্জন করব।'

***

খাযরাজের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন, যেন তাদের পাঁচ যুবক-প্রতিনিধির জন্য আল্লাহর দুশমন সালাম ইবনে আবুল হুকাইককে হত্যার অনুমতি প্রদান করেন।

তিনি তাদের অনুমতি দিলেন...

এবং তাদের একজনকে দলের আমীর বানালেন, যার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি দলের প্রত্যেক সদস্যকে নির্দেশ দিলেন, যেন কেউ কোনো নারী ও শিশুকে হত্যা না করে এবং কোনোরূপ কষ্টও তাদের না দেয়।

খাযরাজ গোত্রের পাঁচ সদস্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় জানিয়ে আত্মত্যাগের ইতিহাসে সর্বাধিক দুঃসাহসী ও বিপজ্জনক হিসাবে পরিচিত অভিযান বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তারা রওনা হলেন।

চলুন দেখি দলের আমীর উত্তেজনাপূর্ণ এই ঘটনার কী বিবরণ তুলে ধরেন...

***

আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুমতি দেওয়ামাত্রই আমরা মধ্য হিজাযের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম—যেখানে এক দুর্গে বাস করত সালাম ইবনে আবুল হুকাইক এবং তার কওমের লোকেরা...

আমরা দুর্গটির কাছাকাছি যখন পৌঁছলাম, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা নিজ নিজ অবস্থানে অপেক্ষায় থাকলাম। দুর্গের লোকেরা একে একে মাঠ থেকে তাদের গবাদি পশু নিয়ে দুর্গে ফিরতে লাগল।

তখন আমি সঙ্গীদের বললাম,

'তোমরা যার যার জায়গায় থাকো, আমি দুর্গের ফটকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, হয়তো প্রবেশকারীদের সঙ্গে আমি ঢুকে পড়তে পারব।

আমি ফেরৎ যাত্রীদের মধ্যে ঢুকে এমনভাবে হাঁটতে থাকলাম যেন আমি তাদেরই একজন। কেউই আমাকে বুঝতে পারল না...

ফটকের কাছাকাছি আসামাত্রই আমি ছদ্মবেশ ধারণ করলাম মুখে কাপড় পেঁচিয়ে, যেন ফটকের প্রহরী আমাকে চিনতে না পারে। আমি এমনভাবে বসলাম যেন আমি পেশাব-পায়খানা কিছু একটা করছি...

যখন সব লোকের ভেতরে ঢোকা শেষ হয়ে গেল, আমি ছাড়া আর কেউই বাকি রইল না, তখন ফটকের প্রহরী আমার উদ্দেশ্যে আওয়াজ দিয়ে বলল,

'ওই আল্লাহর বান্দা, ভেতরে ঢুকতে চাইলে ঢোকো তাড়াতাড়ি, আমি তো ফটক বন্ধ করব...'

আমি ভেতরে ঢুকে সামান্য একটু দূরে গিয়েই অন্ধকারে লুকিয়ে থাকলাম।

প্রহরী যখন নিশ্চিত হলো যে, এখন আর কেউ বাইরে নেই, তখন ফটক বন্ধ করে দিলো এবং সবগুলো চাবির ছড়া দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে তার বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল।

আমি আরও কিছু সময় লুকিয়ে থাকলাম এবং দুর্গটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম, পথঘাট ভালোভাবে দেখে নিলাম। দুর্গের চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘোরালাম সালাম ইবনে আবুল হুকাইক এর চিলেকোঠা চেনার জন্য এবং সেখানে যাওয়ার পথঘাট বোঝার জন্য...

অল্প সময়ের মধ্যেই আমি লোকটির অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেলাম, বাতির হালকা আলোর মাঝ দিয়ে দেখতে পেলাম যে, তার কিছু সঙ্গী তার সঙ্গে রাতের আড্ডায় মিলিত হয়েছে...

এক সময় আড্ডাবাজ বন্ধুরা বেরিয়ে গেল এবং বাতি নিভিয়ে দেওয়া হলো...

আমি নিশ্চিত হলাম, আমার শিকার বিছানায় গেল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি তখন দেয়ালে ঝুলানো চাবিগুলোর ছড়া নিয়ে রাতের অন্ধকারে চলতে চলতে সালাম ইবনে আবুল হুকাইকের মহলের বাইরের দরজার কাছে পৌঁছে গেলাম। ধীরে ধীরে দরজা খুললাম...

মহলের ভেতরে প্রবেশ করার পর তালা দিয়ে ভেতর থেকে দরজাটা আটকে দিলাম যেন কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে।

এরপর গেলাম দ্বিতীয় দরজার কাছে। ভেতরে ঢুকে এটাও ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দিলাম। আমি সামনে এগিয়ে যেতে থাকলাম। যতগুলো দরজা সামনে পেয়েছি ভেতরে ঢুকেই তালা লাগিয়ে দিয়েছি।

এ কাজটা আমি করেছি এই পরিকল্পনা থেকে যে, কওমের লোকজন যদি আমাকে চিনে ফেলে অথবা কেউ যদি চিৎকার করে বসে, তাহলে তারা কেউ আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না, আমার হাতে নিহত হওয়ার আগে।

আমি যখন ওপরতলার মহলে (চিলেকোঠায়) পৌঁছে গেলাম, দেখলাম সেটা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বুঝতে পারলাম যে, সে স্ত্রী ও

সন্তানদের সঙ্গে শোয়া। কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না যে, আমার শিকার কোন পাশে কোন দিকে শোয়া।

তখন আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম যে, যদি অনুমানের ভিত্তিতে আঘাত করি, তাহলে অন্য কেউ আঘাত পাবে, তাতে রাসূলের নির্দেশ লঙ্ঘন হয়ে যাবে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যেন কোনো নারী ও শিশুকে হত্যা না করি। এতে আমার নিজেকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

তখন আমি তার ডাকনাম ধরে ডাক দিলাম, যে নামে শুধু কেবল তার ঘনিষ্ঠরাই তাকে ডেকে থাকে। আমি বললাম,

'আবু রাফে...'

সে তখন আতঙ্কিত হয়ে বলল,
'কে রে?'

আমি তার আওয়াজ শুনে তার অবস্থান বুঝতে পারলাম এবং তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আওয়াজের স্থান লক্ষ্য করে। যেহেতু আমি অস্থির ছিলাম, ফলে আমার আক্রমণে তার কিছুই হলো না।

তখন সে খুব জোরে চিৎকার করে উঠল... আমি ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। বাতিটা হাতে পেয়ে সেটা দূরে ছুঁড়ে মারলাম, যেন কেউ এসে সেটা জ্বালাতে না পারে।

এরপর আবার তার কাছে ফিরে এসে আওয়াজ পাল্টে জিজ্ঞাসা করলাম,
'আরে আবু রাফে, এত চিৎকার কিসের?'

সে বলল,
'আরে বেজন্মা! বাড়িতে কোনো আততায়ী ঢুকেছে, আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে লুকিয়েছে।'

আমি তার আওয়াজ শুনে একদম কাছে চলে গেলাম এবং আগের বারের চেয়ে মজবুত ও দৃঢ় আঘাত করলাম, যাতে সে মারাত্মক আহত হলো বটে কিন্তু মরল না।

এবার আমি তার পেটের মধ্যে তরবারি ঢুকিয়ে দিয়ে শরীরের পুরো ভর দিয়ে চেপে ধরলাম। সে এমন এক চিৎকার দিলো যাতে তার স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল। তখন আমি তরবারি বের করে ফেললাম তার শরীর থেকে। দেখলাম শরীরে কোনো নড়াচড়া নেই।

***

স্বামীর আর্তনাদে স্ত্রী জেগে উঠল এবং আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করতে থাকল। আমার ইচ্ছা হলো তরবারির এক ঘা মেরে তার চিৎকার বন্ধ করে দিই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও শিশু হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং নিজেকে নিবৃত্ত করলাম।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্ত্রীর চিৎকার শুনে লোকজন সচেতন হয়ে উঠল, দুর্গের মধ্যে নড়াচড়া শুরু হয়ে গেল। তখন আমি আর কী করব। দৌড়াতে থাকলাম আর চিৎকার করতে থাকলাম, বাঁচাও... বাঁচাও... বাঁচাও...

গোটা দুর্গের লোকজন চিলেকোঠার দিকে ছুটতে শুরু করল আর আমি বাহিরের দিকে।

শেষ পর্যন্ত আমি দুর্গের শেষ ধাপে পৌঁছে গেলাম। আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হওয়ায় আমার মনে হয়েছিল যে, আমি শেষ ধাপে, আসলে সেটা শেষ ধাপ ছিল না। মাটিতে লাফ দিলাম আর আমার পায়ের গোছা ভেঙে গেল। মাথার পাগড়ি দিয়ে পা বেঁধে টেনেহিঁচড়ে দুর্গের বাইরে অপেক্ষারত সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে গেলাম।

***

দুর্গের লোকেরা সকল দিক থেকেই আলো জ্বালিয়ে দিলো। সকলেই বিছানা ছেড়ে দুর্গের বাইরের দিকে দৌড়াতে লাগল আততায়ীদের ধরার জন্য... আর আমরা দুর্গের নিচে মোটা এক পানির পাইপের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকলাম।

সকলেই যখন আমাদের খুঁজে খুঁজে নিরাশ হয়ে গেল, তখন সবাই ফিরে যেতে লাগল আততায়ীর আক্রমণে কী ক্ষয়ক্ষতি হলো সেটা দেখতে।

তখন আমার সঙ্গীরা চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকল,

'বেঁচে গেছি... বেঁচে গেছি...'

কারণ, তারা সকলেই আমাদের খোঁজা বন্ধ করে তাদের আক্রান্ত লোককে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমি বললাম,

'তার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে আমি এখান থেকে নড়ব না।'

আমার এক সঙ্গী বলল,

'ঠিক আছে, আমি গিয়ে খবর নিয়ে আসছি।'

এ কথা বলে সে চলে গেল এবং লোকজনের ভিড়ে মিশে গিয়ে আক্রান্ত সালাম ইবনে আবুল হুকাইকের কাছে পৌঁছে গেল। আমার সঙ্গী দেখতে পেল, হাতে বাতি নিয়ে ইবনে আবুল হুকাইকের স্ত্রী স্বামীর দিকে এগিয়ে গেল। বড় বড় ইহুদী নেতারা তাকে অনুসরণ করে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল... কী হয়েছে? জানতে চাইল দুর্গে অনুপ্রবেশকারী অচেনা আততায়ী সম্পর্কে।

জবাবে সে বলল,

'আল্লাহর কসম! আমি জানি না কিছুই। কিন্তু আমি একটি আওয়াজ শুনেছি। সেটা আমার অচেনা নয়... আমি আওয়াজটির দিকে গভীর মনোযোগ দিলে আমার মনে হলো, এটা ইবনে আতীকের গলার স্বর। কিন্তু আমি এই ধারণাকে অস্বীকার করে ভাবলাম, ইবনে আতীক এখানে আসবে কী করে?'

এরপর মাটিত পড়ে থাকা স্বামীর কাছে গিয়ে আলো বাড়িয়ে দিয়ে স্বামীর মুখের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে পেছনে ফিরে এসে ধরা আওয়াজে বললেন,

'মরে গেছে, ইহুদীদের প্রভুর কসম, মরে গেছে...'

এ কথা শোনার পর আমার বন্ধুর প্রাণ জুড়িয়ে গেল এবং ফিরে এসে আমাদের সুসংবাদ শোনাল।

***

তখন আমার সঙ্গীরা সবাই মিলে আমাকে বহন করে নিয়ে চলতে শুরু করলেন এবং সেভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে গেলাম।

আমরা দেখলাম তিনি মিম্বরে বসে বক্তব্য রাখছেন। আমাদের দেখে তিনি বললেন,

'কিছু চেহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়েছে, জান্নাতের সৌভাগ্যে ধন্য হয়েছে।'

আমরা বললাম,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার চেহারা মুবারক হাস্যোজ্জ্বল হোক।'

এরপর আমরা তাকে আল্লাহর দুশমনকে হত্যার সুসংবাদ শোনালাম।

তিনি যখন মিম্বর থেকে নেমে আসলেন, তখন আমার ভাঙা পা দেখে বললেন,

'ইবনে আতীক, তোমার কোনো সমস্যা নেই।'

এরপর বললেন,
'তোমার পা'টা এগিয়ে দাও'

আমি বাড়িয়ে দিলাম পা...

তিনি পবিত্র হাতখানা দিয়ে একবার আমার ভাঙা পা মুছে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

মনে হলো সেখানে কোনো সমস্যাই হয়নি কোনো কালে...

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা অথবা আত্তারজামা, ৬৪৮।
৩. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।
৫. *জামেউল উসূল লিবনি আসীর*, ৯ম খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা।
৬. *আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ*, ৩য় খণ্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা।

আল-মিকদাদ ইবনে আমর

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)

আল্লাহ তাআলা চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি নিজেও তাদের ভালোবাসেন, তারা হলেন, আলী, মিকদাদ, আবু যর এবং সালমান। –হাদীস শরীফ

আমর ইবনে সালাবা নিজ কওমের একজনকে খুন করলেন, এখন হয়তো নিজেকে শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে, নইলে নিজের জন্মভূমি বুহরা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে।

তিনি খুনের শাস্তি মাথা পেতে নেওয়ার পরিবর্তে দেশ ছেড়ে যাওয়াকেই প্রাধান্য দিলেন। জন্মভূমি ছেড়ে পালিয়ে চলে গেলেন ইয়েমেনের হাযরামাউত অঞ্চলে। সেখানেই নিজের বসবাসের উপযোগী বাড়িঘর তৈরি করে নিলেন।

এরপর কিছুদিনের মধ্যে সেখানের এক নারীকে বিয়ে করার পর একটি পুত্র সন্তান হলো। যার নাম রাখা হলো আল-মিকদাদ।

***

মিকদাদ উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করলেন পিতার দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ...

তিনি ছিলেন পিতার মতোই খুবই লম্বা, খুব বেশি শ্যামলা...
এমনকি যদি বলা হয় তিনি কালো, তাহলে সেটাই বেশি সঙ্গত হয়...
বিশালদেহী, তার দিকে তাকালেই ভয় লাগত।
তা ছাড়া তিনি ছিলেন তীব্র আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এবং দৃঢ়চেতা...
ছিলেন পরিপূর্ণ আত্ম-অভিমানী, মানবতাবাদী ও তীব্রতাপ্রেমী।

***

একদিন মিকদাদ ইবনে আমর হাযরামাউতের জনৈক সরদার আবু শামার ইবনে হাজারের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন...

হাযরামী লোকটি একটি কঠিন শক্ত কথা বলে ফেলেন, যা শুনে যুবক মিকদাদের আত্মসম্মানবোধ তীব্রভাবে আহত হয় এবং তিনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠে তরবারি নিয়ে হাযরামী লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন... লোকটির পা কেটে আলাদা হয়ে যায়।

সেই সময় মিকদাদ দেখলেন, তাকে হাযরামাউত থেকে দেশান্তরিত হতে হবে, যেমনিভাবে ইতিপূর্বে তার পিতাকে জন্মভূমি বুহরা থেকে দেশান্তরিত হতে হয়েছিল। অতএব তিনি মক্কায় রওনা করলেন।

***

মিকদাদ ইবনে আমরের পা মক্কার মাটি স্পর্শ করার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই কুরাইশী সমাজে নিরাপদে নিশ্চিন্তে বসবাস করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না তাকে সাহায্য করার মতো কোনো বংশ থাকে অথবা তাকে শত্রু থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো গোত্র থাকে...

আর তার মতো ভিনদেশিকে এই সমাজে থাকতে হলে দুইটির কোনো একটি পথ অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়।

হয়তো কওমের কোনো একজন সরদারের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করে তার আশ্রয়ে বাস করতে হবে এবং তার নিরাপত্তায় নিজেকে নিরাপদ রাখতে হবে...

অথবা নিজেকে সকল প্রকার লাঞ্ছনা ও অপদস্ততার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।

মিকদাদ কুরাইশের বিশিষ্ট সরদার আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস আয-যুহরীর সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করলেন।

***

কিন্তু হাযরামী যুবকের পৌরুষদীপ্ত গুণাবলি, মানবতাবাদী বৈশিষ্ট্য, সাহস-বীরত্ব ও অন্যের সাহায্যের স্বভাব দেখে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তার জন্য হৃদয়ে জেগে ওঠে অফুরন্ত ভালোবাসা। ফলে তিনি নিজের মিত্র মিকদাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে যান কাবা প্রান্তরে বসা কুরাইশদের মজলিসের সামনে।

সেখানে তাদের সামনে তাকে নিজের পুত্র হিসাবে গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়ে বলেন,

'হে কুরাইশের লোকসমাজ, তোমাদের সকলকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, এই মিকদাদ আমার ছেলে, আমি তার ওয়ারিশ হব সেও হবে আমার ওয়ারিশ।'

তখন থেকে মানুষ তাকে মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ বলে ডাকা শুরু করে।

যদিও পরবর্তীকালে ইসলাম পুত্র বানানোর প্রচলিত রীতিকে বিলুপ্ত করে দেয়, তথাপিও বেশির ভাগ মানুষ তাকে ওই নামেই ডাকতে থাকে। নামটি বহুল ব্যবহারের কারণে এবং এ নামেই তাকে বেশি ডাকাডাকির কারণে।

***

মিকদাদ ইবনে আমর অথবা তাদের ডাক অনুসারে মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ ওই বর্বর জাহেলী সমাজে স্বস্তিতে ছিলেন না—যেখানে অন্যায়ভাবে নির্যাতন করে মানুষ খুন করা হতো, জোরজবরদস্তিমূলক মানুষের ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা হতো...

যেখানে শক্তিমানেরা দুর্বল অসহায় মানুষদের লাঞ্ছিত করত, যে সমাজে অন্ধ বংশ ও গোত্রপ্রীতির রাজত্ব চলত।

একজন বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার তাকে দত্তক নেওয়া সত্ত্বেও তিনি সমাজের চোখে ছিলেন একজন বিতাড়িত ভবঘুরে, যার পক্ষে তাদের সমাজের কোনো মেয়েকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। কেননা, সে তাদের সমাজের কোনো মেয়ের, তার মর্যাদা যত নীচুই হোক না কেন, সমকক্ষ হতে পারে না।

মিকদাদ খ্রিষ্টধর্মীয় পণ্ডিতদের আলোচনা এবং ইহুদী ধর্মযাজকদের বর্ণনা থেকে শুনতে পেতেন যে, একজন নবীর আবির্ভাবের সময়কাল ঘনিয়ে এসেছে, যিনি এই পৃথিবীকে সদাচার, কল্যাণ আর ইনসাফ ও ন্যায়বিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন। ফলে তিনি মনে মনে বলতেন, আসুন সেই নবী...

***

এরপর সময় খুব বেশি অতিবাহিত হয়নি, আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য ও হেদায়েতের দীন দিয়ে পাঠালেন...

এই খবর শোনামাত্রই মিকদাদ ইবনে আমর ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। তাঁর হাতে হাত রেখে সাক্ষ্য দিলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

এরপর কাবার কাছে কুরাইশের ভরা মজলিসের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি...

তিনি ছিলেন ভূপৃষ্ঠে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দানকারী সপ্তম ব্যক্তি।

মিকদাদ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন কুরাইশের মজলিসের দিকে প্রকাশ্যে দিনের আলোতে আল্লাহর দীন ইসলামে তার দীক্ষিত হওয়ার ঘোষণা দিতে গেলেন, তখন তিনি কুরাইশের ওপর এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হওয়ার ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন না এবং তার ওপর আসন্ন ভয়ংকর শাস্তি ও নির্যাতনের কথাও তার কাছে গোপন ছিল না...

কিন্তু পাশাপাশি তিনি এ কথাও জানতেন যে, ইসলামের মতো এমন একটি বিশ্বজয়ী দীনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এ পথের জন্য বহু ত্যাগ ও কুরবানী জরুরি, ফলে তিনি সংকল্প করলেন এই দাওয়াতের তিনি হবেন একজন শহীদ, একজন আত্মত্যাগী।

***

মিকদাদ ইবনে আমরের ওপর কুরাইশের লোকজন এমন নিপীড়ন ও নির্যাতন চাপিয়ে দিলো, যা পাহাড়কেও টলিয়ে দেওয়ার মতো, কিন্তু তিনি একটুও টললেন না, একটুও দুর্বল হলেন না।

আরোপিত নির্যাতন তার মধ্যে শুধু ধর্মীয় দৃঢ়তা এবং ঈমান ও ইয়াকীনের মজবুতিই বৃদ্ধি করল।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন, তখন কুরাইশের লোকজন সম্মত হলেন না তাকে তাদের জেলখানা ত্যাগের সুযোগ দিতে...

কেননা, তাদের প্রতি তার চ্যালেঞ্জ যেমন ছিল তীব্র, একইভাবে তার ওপর তাদের বিদ্বেষও ছিল তীব্র।

এ কারণেই হিজরতকারী মুসলিমদের মধ্যে তিনি ছিলেন একদম শেষ পর্যায়ের, তা ছাড়া কুরাইশদের হাত থেকে মুক্তি পেতেও তাকে অবলম্বন করতে হয়েছিল কৌশলের। বিশেষ কৌশলে মুক্তি পেয়েই তিনি যখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় পৌঁছলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তার আগমনে খুব খুশি হলেন, কেননা তিনি তাকে খুবই ভালোবাসতেন এবং বলতেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِيْ بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ ' وَأَخْبَرَنِيْ أَنَّه يُحِبُّهُمْ عَلِيٌّ ' وَالْمِقْدَادُ ' وَأَبُوْ ذَرٍّ وَسَلْمَانُ.

'মহান আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে এবং এই সংবাদও জানিয়েছেন যে, তিনি নিজেও তাদের ভালোবাসেন, তারা হলেন, আলী, মিকদাদ, আবু যর এবং সালমান।'

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরামকে দশজন দশজন করে ভাগ করলেন এবং প্রতি দশজনকে একটি ঘরে থাকতে দিলেন।

মিকদাদ ইবনে আমর সেই দশজনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের সৌভাগ্য হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসবাসের এবং লাভ করেছিলেন তাঁর সর্বোত্তম স্বভাব, সদাচার ও করুণার বিরাট অংশ।

***

মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন,

'আমি ছিলাম সেই দশজনের অন্তর্ভুক্ত, যাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সঙ্গে একই ঘরে থাকার জন্য বাছাই করেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের তিনটি মাদি ছাগল ছিল। যেগুলোর দুধ দোয়ানো হতো এবং আমাদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হতো। আমরা সেখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ তুলে রেখে দিতাম।

একরাতে আমি এবং আরও দুই সঙ্গী এলাম, ক্ষুধা আমাদের এমনভাবে নিঃশেষ করে ফেলেছিল যে, আমাদের চোখ-কান প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছিল।

আমার দুই সঙ্গী তাদের অংশ খেয়ে ঘুমিয়ে গেল, আমার অংশ খেয়ে আমার কিছুই হলো না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ঘুমাতে পারলাম না।

আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তান এসে বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রেখে দেওয়া অংশটুকু তুমি খেয়ে নিলে সমস্যা কী? রাসূলের কাছে আনসার সাহাবীরা যখন তখন আসে, হাদিয়া দেয়। অতএব খেয়ে ফেলো।

এভাবেই অনবরত আমাকে উসকানি দিতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি খেয়েই ফেললাম সেই দুধটুকু...

যেইমাত্র খেয়ে শেষ করলাম দুধটুকু অমনি শয়তান এসে আমাকে লজ্জা দিতে লাগল যে, এটা আমি কী করে ফেললাম!

এখনই এসে পড়বেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এসেই যখন খাবার খুঁজে পাবেন না, তখন তোমার বিরুদ্ধে বদদুআ করবেন আর তাতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

সেই রাতটি ছিল ঠাণ্ডা। আমার গায়ে ছিল একটা ছোটখাটো চাদর, মাথা ঢাকলে পা বের হয় আর পা ঢাকলে মাথা—এমন একটা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলাম।

রাতে ঘুমের সময় রাসূল এলে এমন আওয়াজে সালাম দিতেন যাতে জাগ্রত ব্যক্তিরা শুনতে পায় আর ঘুমন্তদের ঘুম না ভাঙে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে সালাম দিলেন, এরপর কিছুক্ষণ নামায পড়লেন, আমি চাদরের নিচ দিয়ে দেখছিলাম।

এরপর তিনি দুধ খুঁজলেন, না পেয়ে হাত তুলে নিলেন...

আমি মনে করলাম, এখনই তিনি বদদুআ করবেন তাতে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।

কিন্তু তিনি বললেন,

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

'হে আল্লাহ, যে আমাকে খাওয়ায় তাকে তুমি খাওয়াও, তাকে পান করাও যে আমাকে পান করায়।'

এই দুআ শুনে আমি মনে মনে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহকে খাওয়াব এবং তাঁর দুআয় নিজেকে ধন্য করব।

আমি আমার জায়গা থেকে উঠলাম। আমার ছুরিটা নিলাম আর মনে মনে বললাম, একটা ছাগী জবাই করব তারপর যা হয় হবে।

আমি ছাগীগুলোর কাছে গেলাম, হাত দিয়ে নেড়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম কোনটা মোটা, হঠাৎ দেখি ওগুলোর ওলান দুধে ভরপুর, যদিও ওগুলো বিকেলেই দোয়ানো হয়েছে।

আমি একটি পাত্র নিলাম এবং একটি ছাগীর দুধ দোহন করলাম, পাত্রটি ভরে গেল, এরপর সেটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম, তিনি দুধ পান করলেন...

আমাকে দিলেন, আমি পান করলাম...
তাঁকে দিলাম, তিনি পান করলেন...
আবার আমাকে দিলেন, আমি পান করলাম...
এরপর আমি হেসে ফেললাম...

তিনি বললেন,
'মিকদাদ, এত কিছু তো তুমিই করলে, হাসছ কেন?'

তখন তাঁর ভাগের দুধ খেয়ে ফেলার কথা সবিস্তারে জানালাম। শুনে তিনি বললেন, যেটা হয়েছে, আল্লাহর রহমতেই হয়েছে। তোমার দুই সঙ্গীকে যদি জাগিয়ে তুলতে, তাহলে তো তারাও একটু দুধ খেতে পারত যা আমরা খেলাম।

আমি বললাম,

'আল্লাহর শপথ, আপনার পান করার পর সেখান থেকে আমিও পান করেছি। এবার আর কেউ পান করুক বা না করুক আমার কিছুই যায় আসে না।'

***

মিকদাদ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন কিন্তু তখনো তিনি বিয়ে করেননি... একদিন তিনি বসে ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তাকে বললেন,

'হে মিকদাদ, ব্যাপার কী, তুমি বিয়ে করছ না কেন?'

মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বললেন,
'আপনার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিন।'

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বললেন,
'আমার মেয়েকে!... না না, আমার মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব না।' এরপর তিনি তাকে একটি কথা বলে দিলেন, যা শুনে মিকদাদ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়ে বললেন,
'এখনো আমাদের মধ্যে জাহেলী যুগের মনোভাব রয়ে গেছে?

ইসলাম কি সকল মুসলিমকে সমান ঘোষণা করেনি? যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক তাকওয়াবান তাকেই কি সর্বাধিক মর্যাদাবান বানায়নি?'

এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে যা ঘটেছে তার বিবরণ তুলে ধরলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

'মিকদাদ, রাসূলের বংশে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা হলে তুমি কি খুশি হবে?

মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন,

'কেন নয় ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা তো আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

কিন্তু এতবড় সৌভাগ্যের অংশীদার আমাকে কে বানাবে?'

তিনি বললেন,
'সে দায়িত্ব আমার, আমি নিজেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব।'

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র যুবাইরের মেয়ে যুবাআর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন।

ফলে তিনি হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভগ্নিপতি।

এক অনন্য মর্যাদা ও গৌরবের বিচারে এটুকুই তার জন্য যথেষ্ট।

***

এরপর ঘটল বদর যুদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশো তেরোজন সাহাবীকে নিয়ে বের হলেন। কিন্তু সাহাবীরা ব্যাপক যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। ছোটখাটো অভিযানের জন্য তারা বেরিয়ে ছিলেন। কিন্তু পরে পরিস্থিতি পাল্টে যায়, যখন নবীজি জানতে পারেন যে, আবু জাহালের নেতৃত্বে এক হাজার সৈনিক পূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মদীনায় পৌঁছে গেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত ও অস্থির হয়ে উঠলেন। কেননা, তাঁকে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধেই অবতীর্ণ হতে হবে।

এর জন্য সহযোদ্ধা সাহাবীদের পূর্ণ আনুকূল্য ও সমর্থন জরুরি। ফলে তিনি সকলের সামনে বিষয়টি তুলে ধরলেন...

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মতামত প্রকাশ করলেন, ভালোই বললেন।

এরপর উমর ফারুক মন্তব্য করলেন, ভালোই বললেন।

কিন্তু পরিস্থিতি ছিল এমন যে, সাধারণ কোনো কথা নয়, জরুরি হয়ে পড়েছিল এমন চূড়ান্ত সংকল্পময়ী কিছু দৃঢ়চেতা বক্তব্যের যা তাদের সকল দ্বিধা দূর করে সকলকে এক চূড়ান্ত সংকল্পে আবদ্ধ করে দেবে। আর ঠিক সেই রকম একটি আগুনঝরা বক্তব্যের সৌভাগ্য লাভ করলেন মিকদাদ ইবনে আমর...

তিনি নিজের বিশাল দেহ আল্লাহর রাসূলের দিকে ঘুরিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আল্লাহর হুকুমমতো চলুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি...

আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে সেই কথা বলব না, যা বনী ইসরাইল বলেছিল মূসা আলাইহিস সালামকে যে, 'আপনি আপনার প্রভুর সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব।'

আমরা আপনাকে বলব, আপনি আপনার প্রভুর সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ করুন আমরাও আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করব।

আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের সুদূর ইয়েমেনের শেষ প্রান্ত 'বারকুল গিমাদে'ও নিয়ে যেতে চান, তাহলে আমরা এতটা পথ লড়াই করতে করতেই আপনাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যাব।'

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক আনন্দে ঝিলমিলিয়ে উঠল। তার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন।

মিকদাদ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বদর যুদ্ধের দিন ছিলেন একমাত্র মুজাহিদ যিনি ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন, কারণ অন্য মুজাহিদরা হয়তো পায়ে হেঁটে অথবা উটে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

ইসলামের জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ইতিহাস তার নামে লিখে থাকে—আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম ঘোড়ায় চড়ে জিহাদকারী।

মিকদাদ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বদর যুদ্ধে অংশ নিয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর স্বাদ পেয়েছিলেন... এ জন্যই তিনি শপথ গ্রহণ করেন যে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি তরবারি হাতে নিয়ে জিহাদ করতে থাকবেন, আর তিনি এ শপথ পূর্ণও করেছিলেন।

উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনামলে দেখা গেল হিমসের এক বাজারে তিনি এক মুদ্রাব্যবসায়ীর বাক্সের ওপর বসে আছেন। তখন তার বয়স প্রায় সত্তর বছর। তখন তার শরীর হয়ে পড়েছিল কোমল থলথলে। বাক্সের বাইরে শরীর ঝুলে পড়ছিল। এই অবস্থাতেও তরবারি কোমরে নিয়ে তিনি বসে ছিলেন।

একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে রাসূলের সাহাবী, এখানে বসে কী করছেন?'

তিনি বললেন,

'সীমান্ত প্রহরীদের আসার অপেক্ষা করছি, তারা এলে তাদের সঙ্গে সীমান্ত প্রহরায় আমিও বের হয়ে যাব।'

তাকে বলা হলো,

'আপনি কি বাড়ি ফিরে গেলে হয় না? কারণ, এত বয়স হওয়ার পর আল্লাহ তো আপনার ওযর কবুল করে নিয়েছেন।'

তিনি বললেন,

'ব্যাটা কোথায় আছ তুমি, সূরা তাওবা আমাদের এ রকম ভাবার সুযোগ দেয়নি।

তুমি কি শোনোনি আল্লাহর এই বাণী,

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا ...

'তোমরা ভারী ও হালকা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর রাস্তায় বের হও।' –সূরা তওবা : (০৯) ৪১

এই আয়াতে আল্লাহ কি আমাকে বাদ দিয়েছেন?'

মিকদাদ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেঁচে ছিলেন দীর্ঘকাল, এমনকি তেহাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে মুজাহিদ হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন।

যখন মৃত্যু হয়ে গেল...

রাসূলের বেঁচে থাকা সাহাবীরা তাকে কবরে দাফন করতে গিয়ে বলছিলেন...

আল্লাহর এক তরবারি আপন খাপে ফিরে গেল...

বহু কষ্ট আর বহু যুদ্ধের পর...

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৮১৮৩।

২. *আল-ইসতীআব আলা-হামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা।

৩. *উসদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা।

৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১০ম খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা।

৫. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা।

৬. *হায়াতুস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ২৮৬; ২য় খণ্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা (৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য)।

৭. *আল-আলাম ওয়া মারাজিউহু*, ৮ম খণ্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা।

৮. *সীরাতু ইবনি হিশাম*, ১ম খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা; ২য় খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা; ৩য় খণ্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা।

আমর ইবনে উমাইয়া আয-যমরী

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়জন সাহাবীকে দায়িত্ব অর্পণ করলেন বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের কাছে তাঁর চিঠি পৌঁছানোর জন্য। সেই ছয়জনের একজন হলেন আমর ইবনে উমাইয়া।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুশরিকদের মাঝে চলমান যুদ্ধের বিচারে সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় ছিল হিজরী পঞ্চম বর্ষ।

কুরাইশীরা তখন উন্মাদ হয়ে পড়েছিল, যখন তারা বুঝতে পারল যে, মুসলিমদের পাল্লা প্রতিদিনই ভারী হচ্ছে। কুরাইশের মোকাবেলায় তাদের শক্তি প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে...

আর তাদের জন্য যুদ্ধ পরিণত হয়েছিল বাঁচা-মরার লড়াইয়ে...

ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তারা সকল অস্ত্রই ব্যবহার করেছে। এমনকি গুপ্তহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতাও তারা বাদ রাখেনি...

মুসলিমরা কুরাইশের চক্রান্ত থেকে অসাবধান ছিলেন না, তাদের চেয়ে প্রতাপ ও দাপটে কোনো দিক দিয়েই তারা কম ছিলেন না।

উভয় শিবিরেই গোয়েন্দা ও আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডে কেউ কারোর চেয়ে কম ছিল না।

***

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ বিশেষ সাহাবীদের মাঝে ঘোষণা করলেন,

'কে আছে যে গোপনে মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের মাঝে এমন কিছু ঘটাবে, যা আরবদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং তাদের নতুন খবর আমাদের কাছে এনে দেবে?'

আমর ইবনে উমাইয়া আয-যমরী দাঁড়িয়ে বললেন,
'আমি আছি ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখমুখ খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল। তিনি তাকে বললেন,

'হ্যাঁ, তুমিই এর জন্য মানানসই হে আবু উমাইয়া।'

***

আমর ইবনে উমাইয়া আয-যমরী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন আরবের হাতেগোনা বিক্রমশালী বীরপুরুষদের একজন, দুঃসাহসী হৃদয়, মেধাবী অন্তর...

চরম শক্তিশালী, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন।
সমস্যা যা-ই হোক, তার কাছে সমাধান আছেই...
সংকট যত বড়ই হোক উত্তরণের উপায় তার কাছে থাকবেই।

এর একটি উদাহরণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাবশার বাদশাহ নাজাশীর কাছে চিঠি দিয়ে পাঠালেন, তিনি মুসলিমদের সাহায্য করতেন এবং তাদের আশ্রয় দিতেন।

তাকে যখন বাদশাহর দরবারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলো, তিনি তখন দেখলেন, রাজদরবারে প্রবেশদুয়ারের মাথা এত নিচু যে সেদিক

দিয়ে যে-ই প্রবেশ করতে যাবে তাকেই মাথা নিচু করে বাদশাহর সম্মানে রুকু বা কুর্নিশ করে প্রবেশ করতে হবে...

তিনি দরজার সামনে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ ঘুরে গেলেন, সেদিকে পিঠ রেখে পায়ের গোড়ালি প্রবেশ করিয়ে ভেতরে গেলেন...

দরবারের লোকজন এতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ধরে নিয়ে বাদশাহর কাছে অভিযোগ করল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন,

'কেন আপনি অন্যদের মতো প্রবেশ করলেন না?'

তিনি বললেন,

'আমরা মুসলিম জাতি, আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ।'

এ কথা শুনে বাদশাহ তার ওযর মেনে নিলেন।

সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, আমর ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন এই পরিকল্পনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, যদি না তার মধ্যে একটি দোষ থাকত, সেটি এই যে, মক্কার প্রত্যেক ব্যক্তিই তাকে চিনত শুধু তার আকার-আকৃতিতে নয়; বরং তার গলার স্বর ও হাঁটার ভঙ্গিতেও।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আনসারীকে আমর ইবনে উমাইয়া আয-যমরী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাহায্যের জন্য দিলেন। তারা দু'জন শিরকের দুর্গ মক্কার উদ্দেশে রওনা করলেন। কুরাইশের কোনো গুপ্তচর তাদের দেখে ফেলার আশঙ্কায় তারা পুরো দিন লুকিয়ে থেকে রাতের বেলা সফর করতেন।

তাদের দু'জনের আকাঙ্ক্ষা ছিল আবু সুফিয়ান ইবনে হারবকে তারা মদীনায় নিয়ে আসবেন নিহত অথবা বন্দী অবস্থায়।

***

তারা যখন মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন, তারা নিজেদের উট দু'টোকে দূরবর্তী পাহাড়ি পথে বেঁধে রাখলেন এবং তারা দু'জন অন্ধকারের চাদর জড়িয়ে গিরিপথের গভীরে প্রবেশ করলেন...

আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের বাড়ির উদ্দেশে।

আনসারী সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন,

'হে আবু উমাইয়া, চলুন না একটু তাওয়াফ করে দু'রাকাত নামায পড়ে তারপর আমাদের কাজে রওনা হই।

কেননা, হতে পারে আমাদের জীবনে বাইতুল্লাহ তাওয়াফের এটাই শেষ সুযোগ।'

আমর ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বললেন,

'কুরাইশীদের অভ্যাস রাতের খাবার তাদের বারান্দায় বসে খাওয়া, আর তাদের প্রায় সকল ঘর কাবার দিকে মুখ করা।

সকলেই এখন যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে আছে। প্রত্যেক আগন্তুকের ব্যাপারে তারা এখন পূর্ণ সজাগ।'

আনসারী তাকে খুব অনুনয় করে বললেন,

'আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, আপনি মেনে নিন, ইনশাআল্লাহ আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।'

এতে আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মন নরম হয়ে গেল। দু'জন বাইতুল্লাহয় গিয়ে তাওয়াফ করলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলেন।

এরপর তারা আপন কাজে বের হলেন।

***

আমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'আমাদের দুই রাকাত শেষ করামাত্রই তাকিয়ে দেখি যে, অন্ধকারের মধ্যেই একজন গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে আমাদের চেনার চেষ্টা করছে...

যেই আমাকে চিনতে পারল, বলে উঠল,
'আরে আমর ইবনে উমাইয়া?

নিশ্চয় কোনো অসৎ মতলব নিয়ে এসেছে, এ কথা বলেই সে চিৎকার করে লোক জড়ো করার চেষ্টা করতে লাগল...'

আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, 'পালাও... পালাও, লোকজন আমাদের কথা জেনে গেছে, আল্লাহর কসম! তারা যদি আমাদের ধরতে পারে, তাহলে খুবাইবকে যেখানে শূলিতে চড়িয়েছে আমাদেরও সেখানে শূলিতে চড়াবে।'

আমরা দৌড় দিয়ে পাহাড়ে চড়ে বসলাম, দেখলাম সব লোক দৌড়ে দৌড়ে আমাদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। মক্কার পাহাড়ি পথঘাট ছিল আমার সবচেয়ে বেশি চেনা। সুতরাং আমরা এক পথ দিয়ে বের হয়ে আরেক পথে ঢুকে পড়ছিলাম। এ রকম করতে করতে শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের হারিয়ে ফেলল এবং আমাদের খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

***

আমি এবং আমার সঙ্গী পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় এক গুহায় ঢুকে পড়লাম এবং সেখানেই সেই রাত কাটিয়ে দিলাম...

যখন ভোর হলো, গুহার কাছেই দেখলাম একটি লোক ঘোড়া চরাচ্ছে...

আমরা তো আঁতকে উঠলাম তাকে দেখে এবং নড়াচড়া বন্ধ করে চুপচাপ ওখানে পাথরের মতো পড়ে থাকলাম, যেন সে আমাদের অস্তিত্ব আঁচ করতে না পারে...

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে গুহার একেবারে কাছে এসে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইল। আমি মনে মনে বললাম, সে যদি দেখে ফেলে

আমাদের, তাহলে চিৎকার করে কুরাইশীদেরকে আমাদের অবস্থান জানিয়ে দেবে। আমার কাছে একটি খঞ্জর ছিল... সুতরাং এক লাফে তার বুকের মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে দিলাম। সে একটি চিৎকার দিলো কিন্তু সেই একটিমাত্র চিৎকার পাহাড়ি পথগুলোতে প্রতিধ্বনিত হয়ে অনেকগুলো চিৎকারে পরিণত হলো।

মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম লোকজন ছুটে আসছে চিৎকারের উৎস লক্ষ্য করে। আমি গুহার মধ্যে আমার জায়গায় ফিরে গেলাম এবং আমার সঙ্গীর পাশে নীরব পড়ে থাকলাম।

তারা এসে তাদের লোককে পেয়ে গেল, দেখল লোকটি জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে...

তারা তাকে জিজ্ঞসা করল,
'কে আঘাত করেছে তোমাকে?'

সে বলল,
'আমর ইবনে উমাইয়া।'

তারা জিজ্ঞাসা করল,
'সেই ঘাতক আমর আছে কোথায়?'

সে আমার অবস্থানের কথা জানাতে পারল না, তার আগেই মরে গেল।

যদিও আমরা ছিলাম ধনুক বরাবর কাছে অথবা তার চেয়েও কম, তাদের কথা শুনছিলাম, যা করছে দেখছিলাম...

তাদের মধ্যে কারোরই ইচ্ছা জাগল না যে, আমাদের গুহায় ঢুকবে... বরং তারা আমাদের খুঁজতে চলে গেল গুহার পেছন দিকে।

যখন তারা আমাদের কোনো আলামত খুঁজে পেল না, তখন তাদের সেই মৃত সঙ্গীর লাশ কাঁধে তুলে নিয়ে মক্কায় চলে গেল।

***

আমি এবং আমার সঙ্গী পুরো দিন গুহার মধ্যে কাটিয়ে দিলাম, যখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এল আমি তাকে বললাম,

‘পালাও... পালাও, কারণ কুরাইশী গুপ্তচরেরা আমাদের খোঁজে পুরো এলাকা চষে ফেলবে...’

আমরা যখন মদীনার উদ্দেশে রওনা করলাম তখন খুবাইবের কথা মনে পড়ে গেল...

মক্কার কুরাইশরা প্রতারণার মাধ্যমে তাকে বন্দী করে এবং তাকে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করার পর সেভাবেই ফেলে রেখে সেখানে পাহারা বসিয়ে রেখেছে। যেন মানুষ তাকে সকাল-সন্ধ্যায় দেখতে পায়।

আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তাদের হাত থেকে এই লাশ ছিনিয়ে নেব এবং অবশ্যই সেটা দাফন করব।

অতএব আমরা পথ পরিবর্তন করে তানঈমের সেই স্থানটির দিকে রওনা করলাম, যেখানে শূলিমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। আমরা প্রহরীদের কাছাকাছি পৌঁছলে তাদের একজন বলল,

‘আল্লাহর কসম! আমি গতরাতে একদম আমর ইবনে উমাইয়ার হাঁটার মতো একজনকে হাঁটতে দেখেছি। সে যদি মদীনায় না গিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই সেটা সে-ই।’

আমি এমন ভাব করলাম যেন আমি তার কথা শুনতে পাইনি এবং শূলিমঞ্চের দিকে এগুতে লাগলাম। তার বরাবর পৌঁছার পর আমি লাফিয়ে পড়লাম এবং শূলদণ্ডটা গোড়া থেকে উপড়ে ফেললাম এরপর সেটা কাঁধে তুলে নিয়ে জোরে দৌড়াতে থাকলাম।

প্রহরীরা আমার পিছু নিল, আমাকে তাড়া করতে থাকল, এভাবেই আমি একটি পাহাড়ের মসৃণ মধ্যভাগে পৌঁছে গেলাম, যার তলে ছিল বিশাল পানির স্রোত। আমি খুবাইবের লাশ সেই স্রোতের মধ্যে ছুঁড়ে মারলাম। প্রহরীরা এবার আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেই দিকে ঝুঁকে পড়ল। পানি থেকে লাশ ওঠানোর জন্য।

আল্লাহ তাআলা লাশকে তাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য করে দিলেন, তারা খুঁজেই পেল না।

***

এরপর আমি এবং আমার সঙ্গী যেতে যেতে ‘সিহনান’ পাহাড়ের একটি গর্তে আশ্রয় নিলাম। আমরা দু’জন সেখানে থাকা অবস্থায় একজন এক চোখ কানা প্রবীণ লোক এসে হাজির হলো। সালাম দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল,

‘কোন গোত্রের মানুষ আপনি?’

আমি বললাম,
‘বকর গোত্রের। আর আপনি?’

তিনি বললেন,
‘আমিও তো বকর গোত্রের ...।’

আমি বললাম,
‘মারহাবা, স্বাগতম।’

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি শুয়ে পড়ল এবং জোরে গান গাইতে লাগল। তার গানের কথাগুলো ছিল এ রকম,

‘এ জীবন থাকবে যতদিন, মুসলিম আমি হব না কোনোদিন।
ইসলাম থেকে রবো দূরে আমি চিরদিন।’

এই গান শুনে আমি মনে মনে বললাম, দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি মজা।

এরপর তাকে অবকাশ দিলাম। যখন সে ঘুমিয়ে গেল আমার ধনুকটির এক পাশ তার ভালো চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম এবং আমার শরীরের পুরো ওজন তার ওপর চাপিয়ে দেওয়াতে তার ভালো চোখটি একেবারে হাড্ডিতে গিয়ে ঠেকল।

আমার সঙ্গীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললাম, এক্ষুনি পালাতে হবে। কারণ, ঘটনা আরও একটি ঘটিয়ে ফেলেছি।

এরপর আমরা মদীনার দিকে ছুটতে লাগলাম।

আমরা যখন মদীনা থেকে দুই রাতের দূরত্বে 'নাকী' নামক স্থানে নামলাম, হঠাৎ দেখি মুশরিকদের দুই গুপ্তচর, যাদেরকে মুসলিমদের খবর সংগ্রহের জন্য কুরাইশরা পাঠিয়েছে।

আমি ধনুকে তির লাগিয়ে বলে উঠলাম,
'আত্মসমর্পণ করো।'

তারা অস্বীকার করল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের একজনকে তির ছুঁড়ে হত্যা করে ফেললাম। দ্বিতীয়জন এবার ধরা দিলো। আমি তাকে রশি দিয়ে বেঁধে সংগ্রহকৃত সকল খবরসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির করলাম।

নবীজি আমাদের যখন দেখলেন, তাঁর চেহারা মুবারক ঝলমল করে উঠল, তিনি মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেন,

চেহারাগুলো সফল...
এরপর আমাদের সব খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন...

আমি বলতে শুরু করলাম একে একে...
শুনে শুনে তিনি হাসতে থাকলেন।

তথ্যসূত্র :

১. *ইবনে হিশাম*, ৪র্থ খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
২. *খলীফা ইবনে খয়্যাত*, ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৩৮৫৬।
৪. *আল-ইকতিফা ফী মাগাযী রাসূলিল্লাহ...* লিলকালাঈ, ২য় খণ্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা।
৫. *আর-রউযুল আন্‌ফ লিস-সুহাইলী*, ৭ম খণ্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা।
৬. *আনসাবুল আশরাফ*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৭. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা*, ৫৭৬৫।
৮. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা।
৯. *তাজরীদু আসমাইস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা।
১০. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৮ম খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা।
১১. *ইবনে কাসীর*, ৪র্থ খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, ৮ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা।
১২. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ১ম খণ্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা।
১৩. *আল-জারহু ওয়াত-তাদীল*, ১ম খণ্ড, ২২০ পৃষ্ঠা।
১৪. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১৫. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩য় খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

উসমান ইবনে আফ্‌ফান

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

গোটা নবুওয়তের ইতিহাসে উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছাড়া এমন আর কোনো ভাগ্যবানের কথা জানা যায়নি, যিনি একজন নবীর জামাতা হয়েছেন দু'বার।

নিশ্চিয় তিনি যুন্নূরাইন—দুইটি নূরওয়ালা...

ছাহিবুল হিজরতাইন—দুইবার হিজরতের সৌভাগ্যওয়ালা...

যাওজুল ইবনাতাইন—নবীজীর এক মেয়ের পর দ্বিতীয় মেয়ের সৌভাগ্যবান স্বামী...

তিনিই উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

***

উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জাহেলী যুগেই ছিলেন নিজের কওমের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ছিলেন এক বিশাল মর্যাদার অধিকারী।

বিপুল বিত্ত আর সম্পদশালী, প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্যের মালিক...

অসম্ভব রকমের বিনয়ী, প্রচণ্ড লজ্জাশীল।

এত সব গুণ আর বৈশিষ্ট্যের কারণে তার কওমের লোকেরা—নারী-পুরুষ সকলেই তাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। এমনকি কুরাইশের মায়েরা তাদের ছোট্ট ছোট্ট শিশু বাচ্চাদের দোল খাওয়ানোর সময় এই ছন্দ-ছড়া গাইত,

أُحِبُّكَ وَالرَّحْمَانْ – حُبَّ قُرَيْشٍ لِعُثْمَانْ

বুকের মানিক! তোকে ভালোবাসি কত
উসমানকে বাসে ভালো কুরাইশ যত।

মক্কার জমিনে যখন ইসলামের নতুন চাঁদ উদিত হয়, উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন সেই আলোর কেন্দ্র ইসলাম থেকে জীবন আলোকিতকারী অগ্রণী মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

***

উসমান ইবনে আফ্‌ফানের [রাযি.] ইসলাম গ্রহণের রয়েছে একটি চমৎকার প্রেক্ষাপট।

সেটা ছিল ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের কথা। উসমান জানতে পারলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে আব্দুল্লাহ নিজ চাচা আবূ লাহাবের পুত্র উতবার (উতবা ইবনে আবূ লাহাবের) সঙ্গে নিজের মেয়ে রুকাইয়ার বিয়ে দিয়েছেন।

তিনি ভীষণ অনুতপ্ত ও আশাহত হয়ে পড়লেন, কেননা এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারের এবং মহত্তম চরিত্রের অধিকারিনী মেয়েটিকে পাওয়ার সৌভাগ্য-লাভে তিনি পিছে পড়ে গেলেন।

বিষণ্ন ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি এলেন।

দেখলেন তার খালা সুদা বিনতে কুরাইয এসেছেন। বয়সে প্রবীণ এই খালা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ মহিলা। ফলে তাঁকে দেখে তার মন কিছুটা ভালো হয়ে গেল।

খালা তাকে সেই নবীর দীন-এর ব্যাপারে আগ্রহী করে তুললেন। এমনকি তিনি একথাও বললেন যে,

'তুমি যা চাও, সেটাও তাঁর কাছে পেয়ে যাবে।'

উসমান বলেন,

'এরপর আমি খালার কাছ থেকে উঠে পড়লাম। একা একা হাঁটতে হাঁটতে তার কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করছিলাম। পথে দেখা হলো আবূ বকরের সঙ্গে। খালার কথাগুলো তাকে জানালাম। সবকথা শুনে আবূ বকর বললেন,

'তোমার খালা যা বলেছেন, তিনি তোমাকে যে সুসংবাদ দিয়েছেন, আল্লাহর কসম করে বলছি হে উসমান! তিনি একদম খাঁটি ও বাস্তব কথাই বলেছেন।

তুমি তো একজন বিচক্ষণ মানুষ। তোমার কাছে সত্য গোপন থাকার কথা নয়। সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার মতো নির্বোধ মানুষও তুমি নও।'

এরপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন,

'আচ্ছা, তুমি একটু ভেবে দেখোতো! আমাদের কওমের লোকেরা যেসব মূর্তির পূজা করে এগুলো আসলে কী?

এগুলো কি পাথরের মূর্তি নয়—যারা কোনো কিছুই দেখতে ও শুনতে পায় না?'

আমি বললাম,

'অবশ্যই। অবশ্যই এগুলো নিষ্প্রাণ পাথরের তৈরি মূর্তি।'

তিনি আবার বললেন,

'উসমান! তোমার খালা যা বলেছেন সেটা এখন আর 'ঘটিতব্য' নয়, বরং এরই মধ্যে সেটার বাস্তবায়ন ঘটে গেছে।

মহান আল্লাহ তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই নবীকে পাঠিয়েছেন। গোটা মানব জাতির উদ্দেশ্যে সত্য ও হেদায়াতের দীন দিয়ে তাঁকে পাঠিয়েছেন।'

আমি বললাম,

'তাই নাকি? তাহলে কে তিনি?'

আবূ বকর বললেন,

'তিনিই হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব।'

'ইনিই কি সেই 'আলআমীন' ও সত্যবাদী?'

'একদম ঠিক... ইনিই সেই 'আলআমীন।'

'আপনি কি আমাকে একটু তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন?'

'চলো যাই।'

আমরা দু'জনেই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন,

'উসমান! আল্লাহর দিকে এই অহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও। আমি বিশেষভাবে তোমাদের কাছে এবং সাধারণ ভাবে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।'

উসমান বলেন,

'আল্লাহর কসম! তাঁর চোখে চোখ মেলানো এবং তাঁর কথাগুলো শোনামাত্রই আমার হৃদয়ে স্বস্তি ফিরে পেলাম এবং আমার সারা অন্তর জুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসূল। সুতরাং আর কোনো বিলম্ব না করে আমি বললাম,

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

***

তখন পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর কওম বনূ হাশেমের কেউই ঈমান আনেনি।

তবে তাদের মধ্যে একমাত্র তাঁর চাচা আবূ লাহাব ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতার ঘোষণাও আর কেউ করেনি।

আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামীল ছিল রাসূলের বিরুদ্ধে কুরাইশীদের মধ্যে সবচেয়ে নির্দয় ও কঠোর। তাঁকে কষ্ট দানে ও তাঁর প্রতি নির্যাতনে ছিল সর্বাধিক সহিংস।

আল্লাহ তাআলা তার ও তার স্ত্রীর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে নাজিল করেন,

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ ﴿٥﴾

অর্থ ঃ আবূ লাহাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, কোনো কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।' -সূরা লাহাব, (১১১) ১-৫

এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আবূ লাহাবের হিংসা ও ঘৃণার মাত্রা আরো বেড়ে গেল। তার ও তার স্ত্রী উম্মে জামীলের রাগ ও বিদ্বেষ ভীষণ তীব্র হয়ে উঠল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিমদের ওপর। সে কারণেই তারা ছেলে উতবাকে নির্দেশ দিল, যেন সে তার স্ত্রী রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মাদকে তালাক দিয়ে দেয়। সে মা-বাবার নির্দেশ মতো স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল তার পিতা মুহাম্মাদকে বিপদে ফেলার জন্য।

***

রুকাইয়া (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা)-এর এই তালাকের খবর শোনামাত্রই উসমান ইবনে আফ্‌ফানের আনন্দ আর দ্যাখে কে? খুশিতে উড়তে উড়তে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দের সঙ্গেই তার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকে নববধূর সাজে সাজিয়ে পাঠালেন স্বামীর বাসরে।

এই বিয়ের বর উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন কুরাইশের সেরা সুদর্শন সুপুরুষ যুবা। একই সঙ্গে কনে রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ছিলেন রূপ-লাবণ্য ও কমনীয়তায় অতুলনীয়া। তাই স্বামীর বাসরে পাঠানোর পূর্বমুহূর্তে সখীরা এই সুরেলা গীত গেয়ে গেয়ে কনের মনোরঞ্জন করে,

أَحْسَنُ زَوْجَيْنِ رَآهُمَا اِنْسَانٌ – رُقَيَّةُ، وَزَوْجُهَا عُثْمَانُ

উসমান রুকাইয়া জুটি দুইজনে
আহা কি মজার বর! কি মজার কনে!

***

উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যদিও পূর্বে প্রচুর মর্যাদার অধিকারী ও ব্যাপক প্রভাবশালী ছিলেন, তা সত্ত্বেও যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তার কওমের জুলুম-নির্যাতন থেকে তিনিও নিরাপদ থাকতে পারলেন না।

তাঁর চাচা হাকামের কাছে এটা অসহ্য বোধ হতে থাকল যে, আবদে শামস গোত্রের কোনো তরুণ কুরাইশী ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোনো নতুন ধর্ম গ্রহণ করবে। এতবড় অনাচার অন্তত তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না।

ফলে তিনি দলবল নিয়ে উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁকে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন,

'তোমার এত বড় স্পর্ধা! বাপ-দাদার প্রাচীন ধর্ম ছেড়ে দিয়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করবে?

আল্লাহর কসম! যতক্ষণ ঐ নতুন ধর্ম ত্যাগ না করবে ততক্ষণ আমি তোমাকে ছাড়ব না।'

উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার চাচাকে বললেন,

'আল্লাহর কসম! আমার জীবন থাকতে আমি আমার নবী ও আমার দীন কিছুতেই ত্যাগ করব না। আপনার যা খুশি চেষ্টা করে দেখুন।'

চাচা হাকাম তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতেই থাকলেন।

উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাতে একটুও বিচলিত হলেন না। পাহাড়ের দৃঢ়তা নিয়ে নিজের ধর্ম ও নতুন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন। অবশেষে তাঁর চাচা নিরাশ হয়ে হাত গুটিয়ে নিলেন। নির্যাতনের পথ পরিহার করে তাকে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু কুরাইশের অন্য সকলে তাকে ছাড়ল না। অন্তরে পুষে রাখা শত্রুতা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তাঁর ওপর অব্যাহত নির্যাতন চালাতে থাকল। যার কারণে একসময় তিনি বাধ্য হলেন দীন রক্ষার স্বার্থে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়া ছেড়ে দূরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে।

সুতরাং সর্বপ্রথম হাবশায় হিজরত করলেন তিনি এবং তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা। তাদের রওনার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিদায় জানাতে এসে বললেন,

'আল্লাহ! তুমি উসমান ও তার স্ত্রী রুকাইার সঙ্গী হয়ে যাও...

আল্লাহ! তুমি উসমান ও তার স্ত্রী রুকাইয়ার সাহায্যকারী হয়ে যাও ...'

আসলে আল্লাহর নবী লূত আলাইহিস সালামের পরে উসমানই প্রথম ব্যক্তি—যিনি সপরিবারে স্বদেশ ভূমি ছেড়ে হিজরত করেন।

***

উসমান এবং তাঁর স্ত্রী অন্যান্য হিজরতকারীদের মতো হাবশায় বেশি দিন থাকতে পারলেন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তীব্র ভালোবাসার টান আর জন্মভূমি মক্কার প্রতি মায়া তাদের দু'জনকেই অস্থির করে তুলল।

তারা দু'জনেই আবার মক্কায় ফিরে এলেন এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকলেন। পরে যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন হিজরতকারীদের সঙ্গে তারা দু'জনও মদীনায় হিজরত করে চলে গেলেন।

***

উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের প্রতিটি রণাঙ্গনে শরীক হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিটি যুদ্ধেই (গাজওয়াতে) তিনি হাজির থেকেছেন।

শুধুমাত্র বদর যুদ্ধে তিনি পারেননি অংশ নিতে।

কারণ, ঐ যুদ্ধের সময় তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ছিলেন মুমূর্ষু অবস্থায়। যার শুশ্রূষা ছেড়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

বদর যুদ্ধের বিশাল বিজয় নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে এলেন। দেখলেন, তাঁর কলিজার টুকরা মেয়ে রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। মেয়ের এই মৃত্যুতে তিনি ভীষণ ব্যথিত ও শোকাহত হয়ে পড়লেন।

তিনি উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে স্ত্রী হারানোর এই চরম শোকাচ্ছন্ন মুহূর্তে সান্ত্বনা দিলেন। তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলেন খুবই চমৎকার পদ্ধতিতে। তাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করে নিয়ে গণীমতের একটি অংশ প্রদান করলেন। এরপর তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে উম্মে কুলসূম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এ কারণেই সবাই তাঁকে ডাকতে শুরু করল, 'উসমান যিন্নুরাইন' বলে। (যিন্নুরাইন মানে দুইটি নূরওয়ালা। আর নূর বলতে রাসূলের মেয়ে বোঝানো হয়।)

তাঁর সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় মেয়েকে বিয়ে দেওয়া ছিল এমন এক মর্যাদা—যা তিনি ছাড়া এ পৃথিবীর আর কারোর ভাগ্যেই জোটেনি।

কারণ, গোটা নবুওয়াতের ইতিহাসে উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছাড়া এমন আর কারোর কথা জানা যায়নি যিনি একজন নবীর দুইবার জামাতা হয়েছেন।

***

উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ ছিল মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহ তাআলার অন্যতম বিশাল অনুগ্রহ। ছিল এক মহাকল্যাণ—যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা দীন ইসলামের ব্যাপক সাহায্য করেছেন।

মুসলিম জাতির যে কোনো দুঃখ কষ্টে সর্বপ্রথম তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াতেন উসমান ইবনে অফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

দীন-ইসলামের যে কোনো সমস্যার সমাধানে সবার আগে এগিয়ে আসতেন উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিশাল শক্তিধর রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলেন। (৯ হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত) তাবুক যুদ্ধের জন্য যা যা জরুরি তার কিছুই নেই রাসূলের কাছে। তাঁর প্রয়োজন প্রচুর মুজাহিদ, অস্ত্র, বাহন ও অর্থ। কারণ, এই যুদ্ধের প্রতিপক্ষ পৃথিবীর পরাশক্তি রোমান বাহিনী। যাদের রয়েছে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত বিশাল সেনাবাহিনী। প্রতিপক্ষের (রোমান বাহিনীর) সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, তারা এই যুদ্ধ করবে নিজ দেশের পরিচিত এলাকার মধ্যেই।

পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনীকে পাড়ি দিতে হবে বহু দূরের পথ। তাদের কাছে জরুরি পাথেয় প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প। অতি জরুরি বাহনের সংখ্যা তো একেবারেই নগণ্য।

মদীনার মুসলিম জনসাধারণ তখন এমনিতেই ছিল প্রচণ্ড খড়া ও অনাবৃষ্টিজনিত অভাব-অনটনের তীব্র কষ্টে জর্জরিত।

এই রকম মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দেওয়া বিশাল একদল মুজাহিদকে তিনি বাধ্য হয়ে ফিরিয়ে দিলেন।

নিজেদের বাহন না থাকার কারণে এই জিহাদে অংশ নিতে ও শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা অশ্রুভেজা চোখে ফিরে গেলেন।

***

এই রকম চরম সংকটের মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মিম্বারে বসলেন। মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে অবশেষে উপস্থিত সকলকে আল্লাহর জন্য অর্থ ব্যয় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকলেন। দানের বিশাল প্রতিদান ও পরকালীন সওয়াবের কথা বলে সকলকেই উৎসাহিত করলেন।

উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য শুনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একশ উট সেগুলোর জিন ও হাওদাসহ দান করলাম।'

এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের একধাপ নিচে নামলেন। কিন্তু দান সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রেখে নতুন করে আবার সকলকে উদ্বুদ্ধ করা শুরু করলেন।

তখন উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবার দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আরো একশ উট দেব জিন ও হাওদাসহ।'

এতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মিম্বারের আরো এক ধাপ নিচে নেমে পড়লেন। তবে একটু পরেই আবারো সকলকে দানের প্রতি উৎসাহ দেওয়া শুরু করলেন।

উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৃতীয়বার দাঁড়িয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আরো একশ উট অর্থাৎ মোট তিনশ উট এই তাবুক যুদ্ধের জন্য জিন ও হাওদায় সাজিয়ে দেব।'

এইবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি হাতের ইশারায় সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,

'উসমান ইবনে আফ্ফান আজ ইসলামের যে উপকার করল, এরপর আর কেউ তার দীন ও ঈমানের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিছুতেই তার কোনো অপকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না।'

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নামার আগেই উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দ্রুত বাড়ি চলে গেলেন। এবং ওয়াদা করা তিনশ উট জিন-হাওদাসহ সঙ্গে অতিরিক্ত একহাজার স্বর্ণমুদ্রাও রাসূলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

স্বর্ণের এক হাজার মুদ্রা প্রিয় নবী হাত দিয়ে নেড়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে বললেন,

'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন হে উসমান!
তোমার গোপন ও প্রকাশ্য, অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যত
সবকিছুই আল্লাহ ক্ষমা করে দিন।'

***

উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফত কালে একবার দেখা দিল ভয়াবহ খড়া ও অনাবৃষ্টি। যাতে শুকিয়ে গেল ফল ফসল আর গবাদি পশুর ওলান। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর অনাহারে ব্যাপক প্রাণহানির কারণে মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ল। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সেই বছরকে মানুষ ছাই-ভস্মের বছর বলে নাম দিয়ে দিল।

দিন যতই পার হতে থাকল মানুষের বিপদের মাত্রা বাড়তে থাকল। এক সকালে বেশ কিছু মানুষ খলীফার দরবারে এসে নিবেদন করলেন,

'হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা!

আকাশ থেকে বৃষ্টির বর্ষণ বন্ধ হয়ে আছে। জমিন থেকে ফসলের উৎপাদনও রুদ্ধ। মানুষের জীবন ও প্রাণের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে। এই অবস্থায় আমরা কী করতে পারি?'

বেদনাভরা দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে খলীফা বললেন,
'আপনারা ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন।

আমি আশা করছি সন্ধ্যা হওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলা আপনাদের কষ্ট দূর করার ব্যবস্থা করবেন।'

সেই দিনই সূর্যাস্তের পূর্বে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এক বিশাল বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী নিয়ে মদীনার কাছাকাছি এসে গেছে। এবং ভোর নাগাদ সেটা মদীনায় পৌঁছে যাবে।

সকালে ফজরের নামায শেষ হতেই মদীনার লোকজন দলে দলে বাণিজ্য কাফেলার অভ্যর্থনায় এগিয়ে এল।

মদীনার ব্যবসায়ীরাও সংবাদ পেয়ে ছুটে এসে দেখলেন, এক হাজার উটের বিশাল বাণিজ্য বহর বয়ে এনেছে গম, ভোজ্য তেল ও কিশমিশসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী।

***

উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দুয়ারে উটগুলো বসিয়ে সেগুলোর থেকে একে একে মালামাল খালাস করা হলো। এই সময় ব্যবসায়ীরা উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে প্রস্তাব দিয়ে বললেন,

'হে আবূ আমর! আপনার এই পণ্যগুলো আমরা কিনে নিতে চাই।'
'খুবই চমৎকার প্রস্তাব। কিন্তু আপনারা আমাকে কি হারে মুনাফা দেবেন?'

'আপনার ক্রয়মূল্যের দ্বিগুণ দেব।'
'আমার কাছে এরচেয়ে বেশি মুনাফার প্রস্তাব আছে।'

এই কথা শুনে ব্যবসায়ীরা আগের চেয়ে বাড়িয়ে তিনগুণ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন।

উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবার বললেন,

'আপনারা যতটা বাড়িয়েছেন আমার কাছে তার চেয়ে অনেক বেশির প্রস্তাব আছে।'

তখন তারা চারগুণ দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করলেন।

উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'দেখুন, আপনারা যতটা মুনাফা আমাকে দিতে রাজি হয়েছেন, এরচেয়ে অনেক বেশি মুনাফা দেওয়ার প্রস্তাব আমার কাছে আছে। সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এত কম মূল্যে কি করে আপনাদের এই মাল দেই?'

এবার ব্যবসায়ীরা সন্দিহান হয়ে বললেন,

'হে আবূ আমর! মদীনার সকল ব্যবসায়ী এই মুহূর্তে আপনার সামনেই রয়েছে। আমরা ছাড়া আর কেউই এখানে ব্যবসা করে না। আমাদের পূর্বে আপনার সঙ্গে আর কেউ সাক্ষাৎও করেনি। তাহলে আমাদের চেয়েও বেশি মুনাফার প্রস্তাব আপনাকে কে দিয়েছে?'

তিনি বললেন,

'আল্লাহ তাআলা আমাকে এক দিরহামের মুকাবিলায় দিতে চেয়েছেন দশগুণ। আপনারা কি পারবেন দশগুণের বেশি মুনাফা দিতে?'

তারা সমস্বরে বলে উঠলেন,

'না না হে আবূ আমর! আমরা তা কখনোই পারব না।'

উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'আমি মহান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার এই কাফেলা যত সামগ্রী নিয়ে এসেছে এর সম্পূর্ণটাই আমি দান করে দিলাম দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য। এর বিনিময়ে একটি মুদ্রাও আমি কারো কাছে চাই না। আমি চাই শুধু আমার আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁরই দেওয়া বিনিময়-সওয়াব।'

খেলাফতের দায়িত্বভার যখন অর্পিত হলো উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর, তখন তাঁরই হাতে আল্লাহ তাআলা আরমেনিয়া, কাওকায ইত্যাদি অঞ্চলের বিজয় দান করলেন।

তাঁর সময়েই আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করে খুরাসান, কারমান, সিজিস্তান, কুবরুসসহ আফ্রিকার বড় একটি অঞ্চলকেও ইসলামী শাসন ও সাম্রাজ্যের অধীন করে দেন।

তাঁর শাসনামলেই মানুষ লাভ করেছিল এত বেশি ধন-ঐশ্বর্য, যা পৃথিবীর বুকে আর কোনো জাতিই লাভ করতে পারেনি।

***

উসমান যিন্নুরাইন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনকালে মানুষের বিপুল বিত্ত ও প্রাচুর্যের মাঝে সুখী, স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন-যাপন এবং তাদের নিরাপদ ও স্বচ্ছল জীবনের বর্ণনা দিয়ে বিখ্যাত তাবেঈ হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সরকারি কর্মচারীদের দেখেছি যে, তারা পথে পথে ঘোষণা করছেন,

‘লোকসকল! বাইতুল মাল থেকে নাগরিক ভাতা গ্রহণ করুন।’

দেখেছি এই ঘোষণা শুনে মানুষ দলে দলে গিয়ে তাদের প্রাপ্য ভাতা গ্রহণ করেছে। অন্য ঘোষক এমন ঘোষণা করছে,

‘হে লোকেরা! সকলেই যার যার খাদ্য ও রেশন নিয়ে যান।’

এটা শুনে লোকেরা দলে দলে গিয়ে বাইতুল মাল থেকে খাদ্য সামগ্রীর ভাতা নিয়ে নিচ্ছেন।

আল্লাহর কসম! আমার দুই কানে নিজেই শুনেছি যে, সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে, ভাইসব! আপনারা বাইতুল মাল থেকে নিজ নিজ পোশাক গ্রহণ করুন।’

এই সরকারি ঘোষণা শোনার পর আমি দেখেছি মানুষ বাইতুল মাল থেকে তাদের পোশাক নিয়ে আনন্দের সঙ্গে বাড়ি ফিরছেন।

আমি এমন ঘোষণাও শুনেছি যে, ঘি ও মধু নিয়ে যান, সকল নাগরিককে ঘি ও মধু নিয়ে আনন্দে বাড়ি ফিরতে দেখেছি।

বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগে নাগরিকদের বেতন, ভাতা ও রেশন প্রদান সারা মাস ও বছর জুড়ে চলতেই থাকত।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ ছিল তখন প্রচুর।

মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক ছিল খুবই সৌহার্দপূর্ণ। তখন সারা পৃথিবীর বুকে এমন কোনো মুমিন ছিল না, যাকে অন্য মুমিন ভয় পায়। বরং সে সময় এক মুমিন অন্য মুমিনের বন্ধু হত। তারা একে অন্যকে গভীর ভাবে ভালোবাসত, সাহায্য করত। মুমিনদের পরস্পরে থাকত গভীর সম্প্রীতি।

***

কিন্তু সকল যুগেই কিছু মানুষ থাকে যাদের 'সুখে থাকতে ভুতে কিলায়'।

নিশ্চিত নিরাপদ জীবন তাদের সহ্য হলো না, শুরু করে দিল শয়তানী।

সেই রকম কিছু মানুষ উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিরুদ্ধে সামান্য কিছু বিষয় নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করল, অথচ অন্য কেউ যদি সেই কাজগুলো করত তাহলে তারা কখনোই অভিযোগ উঠাত না।

শুধু মৌখিক অভিযোগ করেই যদি তারা থেমে যেত, তবুও বিষয়টি এক রকম সহজেই মিটমাট করে ফেলা যেত। কিন্তু সেখানে তারা থামল না। আসলে সেখানে থামা তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

কারণ, শয়তান তখন তাদের মধ্যে শয়তানী ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তারা তখন পরিচালিত হচ্ছিল শয়তানী কুবুদ্ধিতে।

এই ধরনের শয়তানী বুদ্ধির কিছু বিচ্ছিন্ন মানুষ বিভিন্ন স্থান থেকে মদীনায় এসে সংঘবদ্ধ হলো। তারা উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে চল্লিশ দিন ধরে নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখল। এমনকি তারা বাড়িতে সুপেয় পানি পর্যন্ত আকটে রাখল। পানি আনার জন্য

বাড়ির কাউকে যেতে দিল না, আবার কেউ বাহির থেকে পানি আনলে তাকে ভেতরে যেতে দিল না।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! এই জালেম বিদ্রোহীগোষ্ঠী যার খাবার পানি বন্ধ করে দিল, একদিন তিনিই ব্যক্তিগত অর্থায়নে সুপেয় পানির উৎস 'রূমা কূপটি' খরিদ করে মদীনাবাসীদের এবং মদীনায় আগন্তুকদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। এর আগ পর্যন্ত তাদের সুপেয় পানির সুষ্ঠু কোনো ব্যবস্থাই ছিল না।

জেনেশুনেও এই জালেম গোষ্ঠী কি করে সেই কথা ভুলে থাকতে পারল?

এই দুষ্টচক্র মসজিদে নববীতে তাঁর নামায আদায়ের পথেও বাধা হয়ে দাঁড়াল।

তারা কি করে ভুলে থাকল যে, এই দ্বিতীয় হারাম যখন অপ্রশস্ত ছিল, তখন নিজের ব্যক্তিগত অর্থে এই উসমান যিন্নুরাইনই তার সম্প্রসারণ কাজ করিয়েছিলেন?

এভাবে চলতে চলতে এক সময় ভীষণ দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে সাহাবী ও সাহাবীসন্তান মিলে প্রায় সাতশ ব্যক্তি এগিয়ে এলেন উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহযোগিতায়।

যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাবের পুত্র আব্দুল্লাহ, যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের পুত্র আব্দুল্লাহ, আলী ইবনে আবী তালেবের দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন, আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম প্রমূখ।

***

কিন্তু দুই হিজরতের গৌরব অর্জনকারী, জনকল্যাণে দুইহাতে অর্থ ব্যয়কারী, রাসূলের দুই মেকে বিয়ের বিরল সন্মানের অধিকারী এই মহান সাহাবী উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর কারণে মুসলিম উম্মাহর মাঝে রক্তারক্তির সূচনা হতে দিলেন না। তিনি অত্যন্ত জোরালো ভাবে তাদেরকে বললেন,

'যদি আমার জীবন চলে যায় যাক, আমার মরণ হলে হোক কিন্তু খবরদার! আমার কারণে মুসলিম জাতি নিজেদের মধ্যে পরস্পর তলোয়ার উত্তলন করুক—এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমার কারণে আমি মুসলিমদের দলাদলি করতে দেব না।

সুতরাং আপনারা যারা আমার সাহায্যের জন্য এসেছেন, তাদেরকে আমি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, 'আমাকে আল্লাহর ফয়সালার উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের হাত গুটিয়ে নিন।' এই কথা বলে তিনি তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা সাতশ যোদ্ধাকে ফিরিয়ে দিলেন।

তার ক্রীতদাসদেরকে বললেন,
'তোমাদের মধ্যে যারা তরবারী খাপে ঢুকিয়ে নেবে, তারা স্বাধীন।'

***

আল্লাহর রাসূলের এই তৃতীয় খলীফা শহীদ হওয়ার অল্প সময় পূর্বে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্নে দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর এবং উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম একসঙ্গে এসেছেন এবং নবীজী তাকে বলছেন,

'উসমান! আজ সন্ধ্যায় তুমি আমাদের সঙ্গে ইফতার করবে।'

এতে তাঁর মধ্যে এই প্রত্যয় জন্ম নিল যে, তিনি অতিসত্ত্বর আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাবেন এবং তাঁর নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

***

যখন সকাল হলো, উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন রোযাদার।

তিনি কয়েকটি দীর্ঘ সালোয়ার আনিয়ে পরলেন এই আশঙ্কায় যে, ঐ নরাধমরা যখন তাকে হত্যা করবে সেই মুহূর্তে ছতর খুলে যেতে পারে।

আঠারোই যিলহজ জুমার দিন নিহত হলেন পার্থিব মায়াত্যাগী...
ইবাদতগুজার...

প্রচুর রোজাদার...

তাহাজ্জুদগুজার...

কুরআন সংকলনকারী...

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিলেন তৃষ্ণার্ত, রোজাদার অবস্থায়। তাঁর সামনে খোলা ছিল পবিত্র কুরআন।

***

দুঃখজনক এই ঘটনায় মুসলিম জাতির সান্ত্বনা এই যে, মহান সাহাবী উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হত্যাকারীদের মধ্যে একজনও সাহাবী যুক্ত ছিলেন না...

কোনো সাহাবী পুত্রও না...

শুধুমাত্র একজন সাহাবীপুত্র ছাড়া, যিনি প্রথম দিকে এই অবাধ্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, পরে লজ্জিত হয়ে তাদের ত্যাগ করে ফিরে আসেন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা* ৫৪৪৮।
২. *উসদুল গাবা*, ৩য় খণ্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৭ম খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।
৫. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।
৬. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, ৫৩-৮৪ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-মাআরিফ*, ৮২ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-ইবার*, ১৪ পৃষ্ঠা।
৯. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।
১০. *ইবনে কাসীর*, ৭ম খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

সালামা ইবনুল আকওয়া

সালামা ইবনুল আকওয়া ছিলেন ভয়ঙ্কর এক দুঃসাহসী যোদ্ধা, দৌড়ে যিনি ঘোড়াকেও পিছে ফেলে দিতেন।

- ঐতিহাসিকদের মন্তব্য

কে এই সালামা ইবনুল আকওয়া?
নিশ্চয় তিনি আপন যুগের এক বিস্ময়, ক্ষণজন্মা ও বিরল ব্যক্তিত্ব...
তিনি এমন দৌড়বিদ যাকে কেউ কখনো হারাতে পারত না...
এমন তিরন্দাজ যার তির কখনোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না...
আশ্চর্য ঝুঁকিপ্রবণ, কোনো ঝুঁকিতেই দমে যেতেন না।

প্রিয় পাঠক! তাঁর সাহস ও বীরত্বের কাহিনি পড়ে আপনার মনে হবে, এগুলো নিশ্চয় প্রাচীন কল্পকাহিনির গল্পগুচ্ছ। অথচ সত্য এটাই যে, সেগুলো কোনো গল্পগুজব নয়। হাদীসশাস্ত্রের বিখ্যাত দুই মনীষী ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের বিশুদ্ধ দুই হাদীসগ্রন্থে সেগুলো বর্ণনা করেছেন।

***

মক্কাতে সালামা ইবনুল আকওয়ার ছিল প্রচুর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, ইসলাম গ্রহণের পর এই সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য মদীনায় হিজরত করলেন।

সেখানে হিজরতের পর তিনি পেটচুক্তিতে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আস্তাবলের সহিস হিসাবে চাকরি করতে থাকেন। মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সামর্থ্য ঠিক রাখার মতো এবং কোনো রকম জীবনধারণ উপযোগী কয়েক লোকমা খাবার ছাড়া এ পৃথিবীর আর কিছুই তার প্রার্থিত ছিল না।

সম্ভবত এতক্ষণে প্রিয় পাঠকের মধ্যে কৌতুহল তৈরি হয়ে গেছে, এই বীরের বিস্ময়কর কিছু কাহিনি ও ঘটনা জনার জন্য। অতএব চলুন শুরু করা যাক।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রায় দেড় হাজার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে রওনা হলেন। সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও ছিলেন তাদের মাঝে। কুরাইশের লোকেরা এই খবর পাওয়ামাত্রই তৎপর হয়ে উঠল। তারা উঠে পড়ে লাগল নবীজীর মক্কাপ্রবেশ ঠেকাতে এবং উমরা আদায় থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধ্য হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে হুদাইবিয়াতে থেমে গেলেন এবং উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মক্কায় পাঠালেন কুরাইশের সঙ্গে তাঁর পক্ষ থেকে আলোচনা করে একটি মীমাংসা খুঁজে বের করতে।

কিন্তু এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, কুরাইশের লোকেরা উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যা করে ফেলেছে। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সকল সাহাবীকে তাঁর হাতে যুদ্ধ ও মৃত্যুর শপথ নিতে তিনি আহ্বান জানালেন।

সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা বলেন,

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গাছের নিচে আমাদের বাইআত নেওয়ার আহ্বান জানালেন, তখন আমিই সর্বপ্রথম বাইআত গ্রহণ করলাম।

অন্য মুসলিমরাও এক এক করে বাইআত গ্রহণ করলেন। যখন অর্ধেক মানুষের বাইআত নেওয়া হয়ে গেল, নবীজী আমাকে বললেন,

'হে সালামা! বাইআত গ্রহণ করো।'

আমি বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো সবার আগেই বাইআত গ্রহণ করেছি।'

তিনি বললেন,

'তবু... আবারও করো...'

আমি তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে দ্বিতীয় দফা আবারো বাইআত গ্রহণ করলাম।

এই বাইআত গ্রহণের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খালি হাত (অস্ত্রমুক্ত) দেখে দুশমনের আক্রমণ থেকে অত্মরক্ষার জন্যে একটি ঢাল দিলেন। এরপর আবার মুসলিমদের বাইআত নেওয়া শুরু করলেন। সকলের বাইআত গ্রহণ শেষ হলে তিনি আমাকে বললেন,

'হে সালামা! তুমি কি আমার হাতে বাইআত গ্রহণ করবে না?'

আমি বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বাইআত গ্রহণ করেছি একবার সাবার আগে, আরো একবার করেছি মাঝামাঝিতে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'তবু... আবারো করো...'

আমি তাঁর নির্দেশে তৃতীয়বার বাইআত গ্রহণ করলাম। তখন তিনি আমার খালি হাত দেখে বললেন,

'কী ব্যাপার, সেই ঢাল কী করলে?'

আমি বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চাচা আমেরকে অস্ত্রমুক্ত দেখে তাঁকেই দিয়ে দিয়েছি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে হেসে ফেললেন।'

সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

‘মক্কার মুশরিকেরা সন্ধির প্রস্তাব দিল। ফলে মক্কাবাসীদের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়ে গেল আর আমরা তখন মিলেমিশে অবস্থান করতে থাকলাম। আলাদা আলাদা অবস্থান আর থাকল না।

এ অবস্থায় আমি একটি গাছের ছায়ায় এসে ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করে সেখানে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরেই চারজন মুশরিক এসে গাছের সঙ্গে তাদের তরবারিগুলো ঝুলিয়ে রেখে আমার কাছাকাছি জায়গায় শুয়ে পড়ল। এরপর তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা শুরু করে দিল। আমার ভীষণ রাগ হল এবং উত্তেজিত হয়ে তাদের উপর আক্রমণ সূচনার ভয়ে কিছুটা দূরে সরে গেলাম। নিজেকে বহু কষ্টে সংবরণ করে রাখলেও সেই মুহূর্তে পাহাড়ের ঢালের নিম্নভূমি থেকে কেউ একজন আর্তনাদ করে উঠল,

‘বাঁচাও... মুহাজির ভাইয়েরা বাঁচাও, মুশরিকরা আমাদের ইবনে যুনাইমকে মেরে ফেলেছে...’

এবার আমি ডান হাতে তরবারি তুলে নিয়ে প্রথমে তাদের তরবারিগুলো দখল করে আঁটি বানিয়ে বগলে রাখলাম। তারা জেগে ওঠার আগেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এসব কিছু করে ফেললাম চোখের পলকে। ইতিমধ্যেই ওরা চোখমেলে তাকিয়ে আমার অবস্থা দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল। আমি ধমক দিয়ে বললাম,

‘যেই আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, ‘মাথা উঁচু করলেই খুন করব।’

এরপর তাদের প্রত্যেককে বেঁধে ফেললাম এবং সকলকে একত্র করে টানতে টানতে রাসূলের কাছে হাজির করলাম।’

***

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামা ইবনুল আকওয়াসহ সকল সাহাবীকে নিয়ে রওনা করলেন এবং মদীনায় পৌঁছে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি খাদেম রাবাহকে হুকুম করলেন তাঁর উটের পাল চড়ানোর জন্য গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে। এটা জানার পর সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিদ্ধান্ত নিলেন তিনিও রাবাহের সঙ্গে যাবেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর ঘোড়া চড়ানোর জন্য।

***

সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তীর ধনুক কাঁধে নিয়ে রাবাহের সঙ্গে চলতে শুরু করলেন। এক সময় তারা মদীনার উত্তর প্রান্তে 'আল্-গার' গ্রামে পৌঁছে গেলেন। সেখানেই পশুগুলো রেখে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাতের শেষ প্রহরে হৈচৈ শুনে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। গাতফান গোত্রের চল্লিশজনের একদল দস্যু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটপালের উপর চড়াও হয়েছে। উটের কাছে থাকা আবূ যার গেফারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলেকে হত্যা করে সব উট লুট করে ফেলেছে।

***

সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'আমি তখন রাবাহকে বললাম,

তুমি এই ঘোড়া নিয়ে যাও, এটা তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর কাছে পৌঁছে দিয়ো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে বলো যে, দস্যুদল তাঁর উটপাল লুট করে নিয়ে গেছে। আমি তাদের তাড়া করে পিছে পিছে যাচ্ছি।

তাকে এই নির্দেশনা দিয়ে আমি 'সানিয়াতুল ওয়াদা'র উপরে একটি টিলায় চড়ে বসলাম এবং মদীনার দিকে ঘুরে চিৎকার করে বললাম,

'ডাকাত... ডাকাত... ডাকাত...'

এরপর আমি তাদের পেছনে দৌড়াতে থাকলাম, দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। এবার ধনুক হাতে

নিয়ে একজনকে লক্ষ্য করে তির ছুড়লাম। সেটা বিদ্ধ হলো তার ঘাড়ে। আমি বললাম,

'নে, এটা তোদের জন্য প্রথম উপহার।'

এরপর আমি ছন্দে ছন্দে তির ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকলাম আর জোরে জোরে গাইতে থাকলাম,

أَنَا اِبْنُ الْأَكْوَعْ - اَلْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعْ

ইবনুল আকওয়া বীর এসে গেল
কমিনা তোদের আজ দিন ফুরাল।

প্রতিবার আক্রমণের পর তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি করে উট পেছনে ছেড়ে দিচ্ছিল। কিন্তু আমি সেগুলোর পেছনে না পড়ে তাদের পেছনেই লেগে থাকি।

এর মধ্যে হঠাৎ তাদের একজন অশ্বারোহী যোদ্ধা আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পেছন দিকে আসতে থাকে। এটা দেখে আমি দৌড় বন্ধ করে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে যাই। সেই গাছের বিশাল কাণ্ডকে ঢাল বানিয়ে আমি তার দিকে তির ছুঁড়তে থাকি। অবস্থা বেগতিক দেখে বেচারা কেটে পড়ে।

***

আমি অক্লান্ত ভাবে তাদেরকে তাড়াতে থাকলাম। এবার তারা দুই পাহাড় ঘেরা একটি অপ্রশস্ত রাস্তায় ঢুকে পড়ল। ব্যাস, আমি একটি পাহাড়ে চড়ে উঁচু থেকে পাথর গড়াতে থাকলাম। ছোট বড় নানা আকারের পাথর পড়তে থাকল তাদের আশপাশে, উপরে, সম্মুখে। ভয়ে তারা এখান থেকে বেরিয়ে অন্য পথ ধরল।

আমি নাছোড়বান্দা, লেগেই থাকলাম ওদের পিছে। শেষ পর্যন্ত লুট করা একটা উটও ওদের কাছে থাকল না। এক এক করে সবই ওরা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমাকে ওরা পিছু ছাড়া করতে পারছে না কোনোভাবেই। এবার তারা নিজেদেরকে ভারমুক্ত করার জন্য একটা একটা করে তাদের

বোঝাগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকল। তারা ত্রিশটার বেশি চাদর আর একই পরিমাণ বর্শা ছুঁড়ে দিয়েছে।

তারা যখনই কোনো জিনিস ছুঁড়ে মারত আমি পাথর চাপা দিয়ে তার উপর একটা চিহ্ন এঁকে দিতাম, যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেই চিনতে পারেন; এভাবে রেখেই আবার সামনে এগিয়ে যেতাম ওদের তাড়া করার জন্য।

***

এক সময় ক্লান্তি এসে ভর করল তাদের উপর এবং আমার উপরও। তারা তখন বিশ্রাম নিতে আর দুপুরের খাওয়ার খেতে বসে পড়ল। আর আমি ওদের উপর নজরদারির জন্য একটু দূরে একটা পাহাড়ের উপর চড়ে বসলাম।

ইতিমধ্যে তাদের কওমের একজন লোক এসে দেখল, তাদের কাছে লুটের উট এবং মালামাল কিছুই নেই। এটা দেখে সে জানতে চাইল,

'তোমাদের এই দূর্দশার কারণ কী ?'

তারা আঙ্গুল তুলে আমার দিকে ইশারা করে বলল,

'ঐ ত্যাঁদর, নাছোরবান্দার জন্য আজ আমাদের কপালে কুফা লেগেছে। আল্লাহর কসম, সেই ভোরের অন্ধকার সময় থেকে আমাদের পিছে লেগেছে, একাই সে তির ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাদের বেহাল দশা করে ফেলেছে। একে একে আমাদের সবকিছু ওর দখলে চলে গেছে তবুও সে আমাদের পিছু ছাড়েনি।'

লোকটি বলল,

'তোমাদের উচিৎ চারজনে একসঙ্গে গিয়ে ওর সঙ্গে লড়াই করে ওর হাত থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করা।'

তার কথা মতো তাদের চারজন লোক পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। যখন আমার কাছাকাছি পৌঁছে গেল, আমার কথা ভালোভাবে শোনার মতো কাছে এসে পড়লে আমি তাদের বললাম,

'তোমরা কি আমাকে চেনো?'

তারা বলল,

'না, চিনি না! কে তুমি?'

আমি বললাম,

'আমি হলাম সালামা ইবনুল আকওয়া, আল্লাহর কসম যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করেছেন, তোমাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আমি তাকেই খুন করতে পারব কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষও নেই যে আমাকে ছুঁতে পারবে।'

আমার কথা শুনে তাদের একজন বলল,

'আমার বিশ্বাস কথাটি শতভাগ খাঁটি।'

এরপর ওরা সবাই আমাকে রেখে কেটে পড়ল।

আমি স্থান ত্যাগ করার আগেই দেখতে পেলাম মদীনা থেকে আমার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো অশ্বারোহী বাহিনী। তাদের সবার সম্মুখে দেখলাম, আকরাম আল-আসাদী। তার পেছনে আবূ কাতাদা আল-আনসারী আর তার পেছনে রয়েছেন আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।

ঐ দস্যু লুটেরা দলের লোকেরা এদের দেখামাত্রই দ্রুত পালাতে শুরু করল। ওদের পালাতে দেখে আকরাম আল-আসাদী ওদের পিছু নিতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললাম,

'হে আকরাম! সাবধান ওদের পিছু ধাওয়া করো না। ওরা তোমাকে একা পেয়ে যাবে আর দূর থেকে আমরাও তোমার সাহায্য করতে পারব না। একটু ধৈর্য ধরো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সঙ্গে এসে পড়বেন। ততক্ষণ অপেক্ষা করো।'

তিনি বললেন,

'হে সালামা! যদি আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং যদি অন্তর দিয়ে জেনে থাকো যে, জান্নাত, জাহান্নাম নিশ্চিত; তাহলে আমার শহীদী মৃত্যুর মাঝে বাধা হয়ো না।'

সালামা বলেন,

'এ কথা বলার পর আমি তার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালাম। তিনি ওদের পেছনে ছুটতে ছুটতে তাদের সর্বাগ্রে থাকা দস্যুকে ধরে ফেললেন। তার ঘোড়ার একটি পা কেটে দিলেন। কিন্তু দস্যু ঘুরে দাঁড়িয়ে আকরামের উপর বর্শা ছুঁড়ে মারল; সেই এক আঘাতেই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

***

সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'আল্লাহর কসম! যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করেছেন, আকরামের শহীদ হয়ে যাওয়ার পর আমি তাদের পিছে দৌড়ানো শুরু করলাম। মুসলিম অশ্বারোহীদের আর কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না।

সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে দেখলাম দস্যুদল 'যূ-কারাদ' নামি এক পাহাড়ি গুহায় পানি পান করতে ঢুকল। যেইমাত্র তারা আমাকে তাদের পেছনে দেখতে পেল, এক কাতরা পানিও পান না-করে তারা বের হয়ে গেল।

এবার তারা খুব দ্রুত পালাতে লাগল। পালাতে গিয়ে তাদের দু'টি ঘোড়া আমার জন্য রেখে গেল। যেন ঘোড়া দু'টি নিয়ে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে যাই আর এই ফাঁকে ওরা অনেক দূর পালিয়ে যেতে পারে। আমি আর ওদের পিছু নিলাম না বরং ঘোড়া দু'টো নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এলাম।

দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে সেই পানির কাছে উপস্থিত হয়েছেন, যেখান থেকে দস্যুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আরো দেখলাম দস্যুদের থেকে ছিনিয়ে আনা উটগুলোও তিনি বুঝে নিয়েছেন। বুঝে নিয়েছেন সেই সব বর্শা ও চাদর যা ওরা ফেলে গেছে। এরপর দেখলাম বেলাল একটি উটনী জবাই করেছেন এবং উটের কলিজা ও কুঁজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ভুনা করছেন।'

সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

'সেখানে রাত কাটানোর পর সকালে যখন ফেরত-যাত্রার ঘোষণা দেওয়া হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর উটনীর পেছনে উঠিয়ে নিলেন। তাঁর পেছনে একই উটনীতে চড়ে একসঙ্গে মদীনায় পৌঁছলাম।'

***

অভিনন্দন সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি, একই বাহনে তিনি রাসূলের সহযাত্রী হয়েছিলেন। প্রিয় নবীর মুবারক দেহের সঙ্গে তার দেহের স্পর্শ লেগেছিল।

অভিনন্দর দীন-ইসলামের প্রতি, তার দুঃসাহসী-তরুণ বীরের জন্য...

আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি দান করুন অশ্বারোহীদের বিস্ময় সালামা ইবনুল আকওয়ার প্রতি, যিনি দৌড়ে দ্রুতগামী ঘোড়াকে হারিয়ে দিতেন।

তথ্যসূত্র :

১. *তাবাকাতে ইবনে সাআদাত* ঃ ৪র্থ খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা।
২. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা, *আত্তারজামা*, ৩৩৮৯।
৪. *আল-ইসতীআব আলা হামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা।
৫. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৪র্থ খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।
৬. *তারীখু ইবনি আসাকির*, ৭ম খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।
৭. *তারীখুল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

যায়েদ ইবনে সুউনা

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

ইবনে সুউনা অনেক চিন্তা-ভাবনা এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

যায়েদ ইবনে সুউনা একদল বড় ইহুদী পণ্ডিতের সঙ্গে বসে 'ইবনুল হাইয়াবান' নামের শীর্ষস্থানীয় এক ইহুদী পণ্ডিতের আলোচনা শুনছিলেন।

এই ইবনুল হাইয়াবান ইয়াসরিবে তাদের সঙ্গে বসবাসের উদ্দেশ্যে শাম দেশের আরামদায়ক বসবাস ছেড়ে চলে এসেছেন।

পণ্ডিতের চমৎকার আলোচনা, সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, তার ঈমানী আবেগ-উত্তাপ এবং তাওরাতের বিষয়ে তার জ্ঞানের বিশাল ব্যাপ্তিতে যায়েদ ইবনে সুউনা খুব মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

মুগ্ধশ্রোতা হয়ে পণ্ডিতের আলোচনা শুনতে শুনতেই যায়েদের মনে প্রশ্ন জাগতে লাগল, আচ্ছা এমনকি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যা এই মহান পণ্ডিতকে বাধ্য করল ভূস্বর্গতুল্য শামদেশ ছাড়তে? যেখানে রয়েছে বিস্তৃত বাগানের সমাহার, রয়েছে মিষ্টি পানি ও শীতল স্নিগ্ধ ছায়াঘেরা মনমাতানো পরিবেশ...!!

কে তাকে ঠেলে দিল ঐ রকম মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ছেড়ে এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে ইয়াসরিবের মতো রসকসহীন এক মরু অঞ্চলে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে...

কেন তিনি স্বদেশ, স্বজন ছেড়ে, পরিবার পরিজন, বন্ধু সব ত্যাগ করে চলে এলেন?

***

ইবনুল হাইয়াবান আলোচনা শেষ করতে না করতেই যায়েদ ইবনে সুউনা মনের কৌতুহল মেটানোর জন্য জিজ্ঞাসা করে বসলেন,

'হে মহান পণ্ডিত! আপনি আমাদের এই অঞ্চলে শুভাগমন করেছেন এটা আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্য। আপনাকে স্বাগতম—আহলান সাহলান...

কিন্তু আমি জানতে চাই, কেন আপনাকে শামদেশ ত্যাগ করতে হলো—যার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, মিষ্টি পানির প্রবাহ, দৃষ্টিনন্দন বাগবাগিচা এবং ব্যাপাক ফল-ফসল উৎপাদনের বর্ণনা দিয়ে মহিমান্বিত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ—কিতাবুল মুকাদ্দাস।

কেউ কি সেখানে আপনাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে, ইবাদত-উপাসনায় বাধা প্রদান করছে?'

পণ্ডিত ইবনুল হাইয়াবান বললেন,

'সত্যিই শামদেশটি তেমনই আকর্ষণীয় যেমনটি আপনি বর্ণনা করলেন বরং বলা যায় আপনার সুন্দর বর্ণনার চেয়েও বেশি চমৎকার।

সত্যিই সেখানে রয়েছে মিষ্টি পানির প্রবাহ, স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া আর প্রচুর ফল ও ফসলের সমাহার।

আমরা ঐ চমৎকার দেশে সুখে-শান্তিতে, নিশ্চিন্ত-নিরাপদে জীবন-যাপন করতাম।

আমার দেশের সকল সুখ ও নিরাপত্তা ফেলে আমি আপনাদের এই মরুভূমিতে পাড়ি জমালাম এর একমাত্র কারণ, আখেরী নবীর প্রতীক্ষা—যার আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে এবং যার হিজরতের স্থান ও দাওয়াতের প্রাণকেন্দ্র হবে আপনাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই ইয়াসরিব।'

এ কথা শুনে যায়েদ ইবনে সুউনা জিজ্ঞাসা করলেন,

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, সেই আরবী নবীর কথা—যার আলোচনা পেয়েছি আমাদের ধর্মগ্রন্থে এবং যার আগমনের সুসংবাদ আমরা শুনিয়ে থাকি আমাদের সন্তানদের?'

তিনি বললেন,
'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক তাঁর কথাই আমি বলছি।'

***

এরপর ঐ ইহুদী পণ্ডিত উপস্থিত সকলের কাছে প্রতীক্ষিত সেই নবীর আখলাক ও চারিত্রিক গুণবৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে থাকলেন। তিনি তাঁর নবুওয়াতের জাহেরী কিছু চিহ্ন ও নিদর্শনের কথাও তুলে ধরলেন।

তিনি ইহুদী সম্প্রদায়কে সেই নবীর অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করলেন। তাদের কল্যাণের প্রার্থনা করলেন, যদি তারা সেই নবীর প্রতি ঈমান আনে আবার তাদের সাবধানবাণীও শোনালেন যদি তারা তাঁকে উপেক্ষা করে এবং তাঁর সাহায্য ত্যাগ করে।

কিন্তু এই শীর্ষস্থানীয় ইহুদী পণ্ডিত এরপর খুব বেশি দিন আর বাঁচেননি। অনিবার্য মৃত্যুর ক্ষণ এসে পড়েছে। প্রতীক্ষিত নবীর দর্শন লাভ, তাঁর দাওয়াতে সাড়া প্রদান করে তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান গ্রহণ এবং তাঁকে সাহায্য করে জীবনের সফলতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

***

ইবনুল হাইয়াবানের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর ইয়াসরিবে উপুর্যপরি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর নবী হিসাবে আত্মপ্রকাশের সংবাদ আসতে থাকে। একের পর এক শোনা যেতে থাকে যে, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাঁর আনীত সত্যদীনের জন্য এবং তাঁর বিরোধীদের সীমাহীন নির্যাতনেও অনুসারীদের পাহাড়ের মতো অবিচল থাকার সংবাদ প্রায় নিয়মিত শোনা যেতে থাকে।

যায়েদ ইবনে সুউনা ঐ সংবাদ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর তার ইহুদী সম্প্রদায়কে শীর্ষ পণ্ডিত ইবনুল হাইয়াবানের কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেন। তাদেরকে আহ্বান জানান ঐ নবীর খবর সম্পর্কে যাচাই বাছাই করে দেখতে, যার আত্মপ্রকাশের সংবাদ প্রচার করে এতো দিন তারা খুশি প্রকাশ করত এবং আরবরা তাদের সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করলে অথবা কষ্ট দিলে তারা ওদেরকে এই নবীর আত্মপ্রকাশের কথা বলেই হুমকি দিয়ে বলত যে, সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আগমন খুব শিগগির হবে, তখন আমরা সেই নবীর অনুসারী হয়ে তোমাদের শায়েস্তা করব।

যায়েদ ইবনে সুউনা তাদেরকে তাড়াতাড়ি ঐ নবীর প্রতি ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করেন, যেন অন্য কেউ মহাকল্যাণ লাভে তাদেরকে পিছে ফেলে দিতে না পারে।

কিন্তু যায়েদ তার ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছে উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না।

শুধু কি তাই? যায়েদ অনুভব করতে শুরু করলেন, যেই নবীর দাওয়াত আকাশের উচ্চতায় নক্ষত্রের মতো চমকাচ্ছে, সেই নবীর প্রতি হিংসা আর বিদ্বেষের আগুন ইহুদীদের অন্তরগুলোকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে।

***

এরপর দ্রুত গতিতে অনেক সময় পার হয়ে গেল। ঘটনা পরম্পরায় একে একে অনেক কিছুই ঘটে গেল।

একদিন হঠাৎ দেখা গেল, মক্কা থেকে মুমিন মুহাজিরদের অনেকগুলো কাফেলা এসে থামল ইয়াসরিবে। ইয়াসরিবের মানুষ তাদেরকে বিপুল সমাদর ও অভ্যর্থনায় গ্রহণ করে নিল। ইয়াসরিবের পরিবারগুলোকে তারা পেল নিজেদেরই পরিবারের মতো আপন আর মানুষজনকে দেখল আপন ভাইয়ের মতোই তাদের সাহায্যে তৎপর।

এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই মদীনার সর্বত্র এই সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্বাচিত বন্ধু আবূ বকর সিদ্দীককে সঙ্গে নিয়ে মদীনার পথে রওনা হয়েছেন।

আনন্দে যেন গোটা মদীনা দোল খেতে লাগল। খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল মদীনার সর্বত্র।

রহমতের নবী ও হেদায়াতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মানুষ বেরিয়ে এল পথে; একা এবং দলবদ্ধ হয়ে।

এতে ইহুদীরা চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল। হিংসায় হিংসায় তাদের অন্তর জ্বলে পুড়ে ভস্ম হতে থাকল। কিন্তু তাদেরই এক সদস্য যায়েদ ইবসে সুউনা, তাঁর অবস্থা অন্য ইহুদীদের চেয়ে একেবারেই আলাদা...

এবার তাহলে আমাদের কথা বন্ধ করে দেই আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর চমৎকার কাহিনির বর্ণনা শুনি তার ভাষাতে।

***

যায়েদ ইবনে সুউনা বলেন,

'এই আগন্তুক মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে আমি অনেক গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করলাম, খুব সুক্ষ্মভাবে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার সম্পর্কিত সকল তথ্য ও তত্ত্ব যাচাই বাছাই করে দেখলাম।

তাঁর নবুওয়াতের সকল আলামত ও নিদর্শনই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল দুইটি বিষয় ছাড়া। তাঁর পবিত্র চেহারায় গভীর ও দীর্ঘ দৃষ্টি ফেলে মাত্র দুইটি বিষয় ছাড়া সবই আমার দেখা হয়ে গেল। নবুওয়াতের সকল আলামত চেনা ও জানার পর আমার অজানা ও অজ্ঞাত বিষয় দু'টির প্রতি কৌতুহল বেড়ে গেল।

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত তাঁর বিশেষ দু'টি গুণ এখনো আমার সামনে অপ্রকাশিত; তা হলো,

এক. ক্রোধ নয়, তাঁর সহনশীলতাই সর্বদা বিজয়ী হবে।

দুই. তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহারের মাত্রা যত বাড়বে, কোমলতা ও ক্ষমাশীলতা ততই বৃদ্ধি পাবে।

আমি অদেখা এই গুণবৈশিষ্ট্যের খোঁজে লেগে গেলাম এবং অবশেষে এই দু'টোও পেয়ে গেলাম।

বিষয়টির বিবরণ এই যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের একটি ঘর থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গী ছিলেন আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ইতিমধ্যে একজন বেদুইন সেখানে এসে উপস্থিত হলো। নিজের বাহনে চড়া অবস্থাতেই রাসূলের পাশে থেমে বলল,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! গ্রামে অমুক গোত্রে আমার একটি দল আছে, যারা ইসলাম কবূল করেছে। ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে আমি ওদেরকে বলেছিলাম, তারা ইসলাম কবূল করলে আল্লাহ তাদের জীবনে সুখ ও স্বচ্ছলতার সকল ব্যবস্থা করে দেবেন। বৃষ্টি দেবেন, ফসল দেবেন এবং স্বাচ্ছন্দপূর্ণ রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণের পর সেখানে ভয়াবহ অনাবৃষ্টি, ফসলহীনতা আর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, লোকগুলো হয়ত অন্য কোনো লোভে ইসলাম ছেড়ে দেবে; যেমন ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সময়েও লোভে পড়েই হয়েছিল।

তাদের সাহায্যে কিছু পাঠাতে চাইলে পাঠিয়ে দিন দয়া করে।'

তিনি আলী ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে তাকালেন, যার অর্থ তিনি আলীর কাছে যা আছে তা চাচ্ছেন। আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেটা বুঝতে পেরে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাদের কাছে যা এসেছিল এখন তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।'

***

যায়েদ ইবনে সুউনা বলেন,

'আমার কাছে এটাকে মনে হলো এক সুবর্ণ সুযোগ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম,

‘হে মুহাম্মাদ! আপনি চাইলে আমার সঙ্গে একটি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে পারেন, নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আমার প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ খেজুর দিলেই হবে। আপনি কি রাজি?’

তিনি বললেন,
‘হ্যাঁ’।

আমি আশিটি স্বর্ণমুদ্রা তার হাতে তুলে দিলাম। তিনি আমার নিকট থেকে নিয়ে ঐ বেদুইনকে দিয়ে বললেন,

‘এই অর্থ দিয়ে তোমার দলের লোকদের সাহায্য করো। ন্যায় ও ইনসাফের নীতিতে এগুলো বণ্টন করে দিয়ো।’

***

যায়েদ ইবনে সুউনা বলেন,

‘আমার প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর পরিশোধ করার জন্য যে মেয়াদ নির্ধারিত ছিল, সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই বা তিনদিন পূর্বেই আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর, উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাসহ একদল সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে কোনো এক মুসলিমের জানাযার উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন।

জানাযার নামায হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসার জন্য একটি দেওয়ালের কাছে গেলেন। এমন সময় আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর গায়ের চাদর চেপে ধরে রাগী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললাম,

‘এই মুহাম্মাদ! আমার পাওনা শোধ করবে না?

আল্লাহর কসম! তোমরা আব্দুল মুত্তালিব বংশের লোকেরা পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে খুব গড়িমসি করে থাকো। তোমাদের এই বদস্বভাবের ব্যাপারে আমার খুব ভালো অভিজ্ঞতা আছে।’

একথা বলার পর আমি তাঁর আশপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উমর ইবনুল খাত্তাবের দুই চোখে যেন আগুন জ্বলছে। রাগী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,

'তুমি আল্লাহর রাসূলকে এমন কটু কথা বলতে পারলে? তাঁর চাদর চেপে ধরার মতো এমন দুঃসাহস দেখাতে পারলে?

আল্লাহর কসম! তুমি ঈমান আনার সুযোগ হারাবে, এই আশঙ্কা না থাকলে এতক্ষণ আমার এই তরবারি দিয়ে তোমার কল্লা ফেলে দিতাম।'

আর রাসূলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি অত্যন্ত ধীর ও শান্ত ভাবে আমাকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর উমরের দিকে তাকিয়ে বললেন,

لَقَدْ كُنْتُ اَنَا وَهُوَ اَحْوَجَ اِلى غَيْرِ هذا مِنْكَ - فَلَقَدْ كَانَ عَلَيْكَ اَنْ تَأْمُرَنِىْ بِحُسْنِ الْاَدَاءِ وَاَنْ تَأْمُرَه بِحُسْنِ الطَّلَبِ -

'উমর! আমি দেনাদার আর উনি পাওনাদার, তোমার কাছ থেকে আমাদের দুজনেরই দরকার ছিল একটু ভিন্ন আচরণ। তোমার উচিত ছিল আমাকে সঠিক ভাবে পরিশোধ করতে বলা আর তাকে সুন্দর ভাবে চাইতে বলা।'

এরপর তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নির্দেশ দিলেন,

উমর! তাকে নিয়ে যাও এবং তার পাওনা পরিশোধ করে দাও। তাকে তোমার হুমকি-ধমকির বদলা হিসাবে বিশ সা (৯০ কেজি) খেজুর বেশি দিয়ে দাও।

উমরের হৃদয় শান্ত হয়ে গেল। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন, আমার পাওনা শোধ করলেন এবং বিশ সা' (৯০ কেজি) খেজুর আমার পাওনার চেয়ে বেশি দিলেন।

আমি বললাম,
'উমর! এই বর্ধিত অংশ নেওয়ার কোনো অধিকার নেই আমার।'

তিনি বললেন,
'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ভয় দেখানোর বদলা হিসাবে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং তুমি এটা গ্রহণ করো।'

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

'উমর! তুমি কি চেনো আমাকে?'

উমর বললেন,
'নাতো, কে তুমি?'

'আমি যায়েদ ইবনে সুউনা।'
'ইহুদী পণ্ডিত?'
'হ্যাঁ, সেই।'

'কিসের জন্য তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ঐ রকম বাজে ব্যবহার করলে? কেনই বা ঐ রকম বাজে কথা বললে?'

'নবুওয়াতের সকল আলামত ও নিদর্শন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। মাত্র দু'টি নিদর্শন বাকি ছিল—যা আমি চেহারার মধ্যে দেখতে পাইনি। মূলত এ দু'টো বৈশিষ্ট্য চেহারা দেখে বোঝার বিষয়ই নয়। বিষয় দু'টি হলো,

এক. তাঁর সহনশীলতা সর্বদা বিজয়ী হবে ক্রোধের উপর।

দুই. তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহারের মাত্রা যত বাড়বে, তার কোমলতা ও সহনশীলতা তত বাড়বে।

এখন এই দুই বৈশিষ্ট্যও আমি পেয়ে গেছি। সব চিহ্ন ও নিদর্শন মিলে গেছে।

সুতরাং হে উমর তুমি সাক্ষী থাকো, আমি রব হিসাবে আল্লাহকে পেয়ে এবং দীন হিসাবে ইসলামকে পেয়ে এবং মুহাম্মাদকে নবী হিসাবে পেয়ে মুহাখুশি।

আমার অর্থের একাংশ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য দান করে দিলাম।'

উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,
'ঠিক করে বলো... উম্মতে মুহাম্মাদীর কিছু মানুষের জন্য... কারণ সকল উম্মতের জন্য হলে ওটাতে কিছুই হবে না।

আমি বললাম,

'ঠিক আছে। তোমার কথাই ঠিক। কিছু মানুষের জন্য...।'

***

এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব এবং যায়েদ ইবনে সুউনা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ফিরে এলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন,

'তোমরা দু'জন ফিরে এলে কেন?'

আমি বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফিরে এসেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের জন্য।

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُه وَرَسُوْلُه

'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, এক-অদ্বিতীয় ও লা-শারীক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। আপনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৫৬৬ পৃষ্ঠা। *আত্তারজামা*, ২৯০৪।
৩. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা।

ছয়জন সাহাবীর অবিস্মরণীয় শাহাদাত

মহান প্রভু করুণা বর্ষণ করুন তাদের প্রতি যারা একের পর এক এসেছিলেন শাহাদাতের মঞ্চে, রাযীয়ের প্রান্তরে, তাদের সম্মানিত করা হয়েছে, প্রতিদান দেওয়া হয়েছে।

–হাস্‌সান ইবনে সাবেত

হিজরতের তৃতীয় বর্ষের শেষ দিকে, খুযাইমা গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় এল ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে, ঈমান কবুলের কথা জানান দিতে...

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চমৎকারভাবে তাদের এস্তেকবাল করলেন, তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন।

সাহাবায়ে কেরাম তাদের আগমনে প্রচুর খুশি হলেন, আপনজনদের মতো তাদের আদর ও আপ্যায়ন করলেন, আন্তরিকভাবে সকলের মেহমানদারি করলেন।

প্রতিনিধিদলের লোকেরা নিজ নিজ পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার পূর্বে মিনতি প্রকাশ করে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের কওমের অনেক মানুষ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে জানার সৌভাগ্য তাদের হয়নি এবং ঈমানের নূরে আলোকিত হওয়ার সুযোগ তারা পায়নি।

সুতরাং কতই-না ভালো হতো যদি আপনার কয়েকজন সাহাবীকে আমাদের সঙ্গে পাঠাতেন যারা আমাদের কুরআন শেখাবে, ইসলামী শরীয়তের আদেশ-নিষেধ এবং মহান আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামের বিধিবিধানের শিক্ষা প্রদান করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং তাদের জন্য ছয়জন আনসার সাহাবীকে মনোনীত করলেন। তারা হলেন, মারসাদ আল-গানাউই, খালিদ আল-লাইসী, আব্দুল্লাহ ইবনে তারিক, যায়েদ ইবনে দাসিন্না, খুবাইব ইবনে আদীই এবং আসেম ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম।

তাদের নির্দেশ দিলেন প্রতিনিধিদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে এবং সেখানে ততদিন অবস্থান করতে যতদিন তারা নতুন নির্দেশ না পাবেন।

***

অর্পিত দায়িত্বের কারণে রাসূলের ছয় নেককার সদাচারী সাহাবী খুব আনন্দিত হলেন। তাদের ভাগ্যে বিশাল প্রতিদান লিপিবদ্ধ হওয়ায় অন্য ভাইয়েরা তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন।

কীভাবে তারা আনন্দিত এবং ঈর্ষণীয় হবেন না?

এতদিন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করার অনন্য মর্যাদা ভোগ করেছেন (কারণ, তারা আনসারী)।

তার সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হলো আল্লাহর দীন প্রচারের কাজে হিজরতের সওয়াব (অর্থাৎ এই ছয়জন এখন থেকে একই সঙ্গে আনসার এবং মুহাজিরীন হিসাবে গণ্য)।

***

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয় সাহাবীকে বিদায় জানালেন, তাদের গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বদা আল্লাহর ভয় ও তাকওয়ার গুণে ভূষিত হওয়ার প্রতি উপদেশ দিলেন।

তারাও নিজেদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে বিদায় জানালেন এবং তাদের নিজেদের প্রতি এবং সঙ্গী-সাথিদের প্রতি কল্যাণের অসিয়ত করলেন।

***

খুযাইমা গোত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে হেদায়েতকারী আল্লাহর পথের আহ্বানকারীগণ রওনা হলেন। পেছনে ফেলে রেখে গেলেন পরিবার-পরিজন, বাড়িঘর, স্বদেশ ও স্বজন।

কিন্তু এগুলো কোনোটাই তাদের জন্য কষ্টকর বোধ হলো না।

কষ্টকর বোধ হলো শুধু রাসূলের বিচ্ছেদ, তাঁর সংশ্রব থেকে দূরে চলে যাওয়া।

তাদের মনে হলো না যে, তাঁর থেকে দূরে তারা ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন...

তাঁরা আশা করেন না যে, জীবনে কখনোই রাসূলকে ছেড়ে থাকতে পারবেন...

***

কাফেলা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকল খুযাইমা গোত্রের আবাসস্থলের দিকে—যা আসাফানের নিকটে অবস্থিত।

দাঈ ও হাদী এই ছয়জন একের পর এক অতিক্রম করছেন মরুপ্রান্তর, আল্লাহর দীনের প্রতি তীব্র আগ্রহী জনতার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। তারা যখন পৌঁছে গেলেন রাজী অঞ্চলে...

আকস্মিকভাবে তারা মুখোমুখি হলেন এক কুৎসিত রকমের বিশ্বাসঘাতকতার, যার বীভৎসতায় অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, যার আতঙ্কে কলিজা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

***

খুযাইমা গোত্রের ওই দলটি—যারা রাসূলের কাছে প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিল—তাদের পুরো কর্মকাণ্ডটিই ছিল এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের অংশ। হুযাইল গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে একটি বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে এদের চুক্তি হয়েছিল যে, এরা রাসূলের একদল সাহাবীকে এনে এদের (হুযাইলীদের) হাতে তুলে দেবে।

এর কারণ কুরাইশীদের হাতে হুযাইলীদের দুই বন্দী রয়েছে...

এ জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুরাইশদের হাতে আটক তাদের দুই বন্দীকে মুক্ত করবে দুইজন সাহাবীকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে।

এরপর অবশিষ্ট সাহাবীদের বিক্রি করে দেবে আগ্রহী কুরাইশীদের কাছে। যারা বদর যুদ্ধে নিজেদের নিহত স্বজনদের বদলায় এদের হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে।

কাফেলা যখন রাজী অঞ্চলে পৌঁছল, ছয়জন সাহাবী আকস্মিকভাবে দেখলেন যে, তাদের সঙ্গী খুযাইমার লোকেরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল...

একই সঙ্গে তারা অবাক হয়ে দেখলেন যে, একদল হুযাইলী তরবারি ও বর্শা নিয়ে তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল।

ছয়জন সাহাবীর পক্ষে কিছুই করার ছিল না। তারা বাহন থেকে নেমে তরবারি খাপমুক্ত করে আক্রমণ করতে চাইলেন।

সেটা দেখে হুযাইলীরা বলল,
‘এটা আমাদের নিজেদের অঞ্চল, আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি আর তোমরা মাত্র ছয়জন...

তা ছাড়া কাবার রবের কসম, আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চাই না, তোমাদের হত্যার ইচ্ছাও আমাদের নেই। আমরা শুধু মক্কাবাসীর কাছ থেকে কিছু অর্থ উপার্জন করতে চাই তোমাদের মাধ্যমে...

এ ব্যাপারে আমরা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে ওয়াদা করছি।’

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছয় সাহাবী চিন্তিতি ও হয়রান হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন না যে, তাদের কী করা উচিত!

এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন।

আসেম ইবনে সাবিত আল-আনসারী, মারসাদ আল-গানাউই এবং খালিদ আল-লাইসী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আল্লাহর দুশমনদের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মরে যাওয়াকেই ভালো মনে করলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন যে, আমরা মুশরিকদের অঙ্গীকার মানব না, তাদের কোনো প্রতিশ্রুতিতেও আমাদের ভরসা নেই।

এরপর হুযাইলীদের বিরুদ্ধে তারা মরণপণ লড়াই করলেন, একের পর এক কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা তিনজনই শহীদ হয়ে গেলেন।

রাসূলের অন্য তিন সাহাবী অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে তারেক, যায়েদ ইবনে দাসিন্না এবং খুবাইব ইবনে আদীই রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম... তারা হুযাইলী গাদ্দার দলের কথায় আস্থা রেখে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

***

হুযাইলী ঘাতকেরা যখন জানতে পারল যে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলো আসেম ইবনে সাবিত আল-আনসারী, তখন তারা তার নিহত হওয়াতে খুশি হলো।

কেননা, আসেম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওহুদ যুদ্ধে কুরাইশী দুই অশ্বারোহীকে হত্যা করেছিলেন। ফলে তাদের মা সুলাফা বিনতে সাআদ মান্নত করেছিলেন যে, আসেমকে পেলে তিনি তার মাথার খুলিতে মদ ঢেলে খাবেন। এবং যে তাকে জীবিত বা মৃত ধরে এনে দেবে তাকে তার চাহিদামতো অর্থ পুরস্কার দেবে।

এ উদ্দেশ্যে হুযাইলীরা আসেম ইবনে সাবেতের মাথা কাটার জন্য বিরাট পুরস্কারের আশায় এগিয়ে গেল...

কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখল মৌমাছির ঝাঁক আর ভিমরুলের দল তার লাশকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে...

অগত্যা লাশের কাছে যেতে চাইলেই মৌমাছির ঝাঁক তাদের প্রতিরোধ করেছে।

তখন তারা বলাবলি করছে,

'এখন থাক, রাত হলে মৌমাছি আর ভিমরুল চলে যাবে। তখনই আমরা তার মাথা কেটে মক্কায় নিয়ে যাব।'

***

রাজী অঞ্চল ও তার আশপাশে রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই মেঘের গর্জন ও মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বড় বড় ফোঁটা তুমুল বৃষ্টিতে মাঠঘাট ভেসে এমন অভূতপূর্ব স্রোত বয়ে গেল যে, আসেম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লাশ যে কোথায় গেল, সবখানে খুঁজেও তারা কোনো কূলকিনারা করতে পারল না। খুঁজে খুঁজে হয়রান ও ব্যর্থ হয়ে তারা আফসোস করতে করতে ফিরল।

আসেম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যেন জীবনে কখনো কোনো মুশরিককে স্পর্শ করতে না হয়।

এবং আরও প্রার্থনা করেছিলেন, যেন কোনো মুশরিক তাকে স্পর্শ করতে না পারে।

আল্লাহ তাআলা আসেম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রার্থনাকে বাস্তবায়ন করেছেন এবং যে দুআ করেছেন তা কবুল করেছেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন,

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকে হেফাজত করে থাকেন, আসেম মান্নত করেছিলেন যেন জীবনে কোনো মুশরিক তাকে স্পর্শ করতে না পারে এবং মুশরিকদেরকেও যেন তার স্পর্শ করতে না হয়। আল্লাহ মৃত্যুর পর মুশরিকদেরকে প্রতিরোধ করেছেন যেমনিভাবে জীবদ্দশায় তাদের হাত থেকে নিরাপদ রেখেছেন

হুযাইলীরা তাদের তিন বন্দীকে নিয়ে মক্কায় রওনা হলো। অবশ্য এর আগেই তাদের কাছ থেকে তরবারি, বর্শা সবই ছিনিয়ে নিয়ে তাদের নিরস্ত্র করেছে। এরপর ধনুকের রশি খুলে সেই রশি দিয়ে তাদের হাত বেঁধেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে তারেক হুযাইলীর বাঁধা রশির দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা।

তিনি নিজেকে ওই রশি থেকে মুক্ত করার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকলেন... যখন তিনি দেখলেন যে, ওরা তার ব্যাপারে উদাসীন, তখন তিনি দুই হাতের বাঁধন থেকে মুক্ত হলেন এবং ইচ্ছা করলেন দুই সঙ্গীর রশি খুলে দিতে। কিন্তু হুযাইলীরা টের পেয়ে গেল, তারা ভয়ে তার কাছে গেল না এবং তাকে মুক্ত হওয়ারও সুযোগ দিলো না। তারা পাথর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। এবং তার লাশ সেখানেই ফেলে রেখে যায়েদ ইবনে দাসিন্না ও খুবাইব ইবনে আদীইকে নিয়ে মক্কায় পৌঁছে গেল এবং তাদেরকে কুরাইশীদের কাছে তুলে দিলো।

***

কুরাইশী হিংসুটে কাফেরেরা—যাদের স্বজনরা নিহত হয়েছিল—তারা সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা ওই দুই কয়েদিকে হাসিল করতে চায় মূল্য যত হয় হোক। এদের দ্বারা তারা মুহাম্মাদকে পরাভূত করতে চায়, এদের দু'জনকে হত্যার মাধ্যমে তারা বদরে নিহতদের প্রতিশোধ নিতে চায়।

ওই দু'জনের জন্য তারা উচ্চমূল্য পরিশোধের প্রতিযোগিতা করতে থাকে। তখন একজন কুরাইশী নেতা বলে,

হে কুরাইশ জাতি, এই দুই বন্দীকে নিয়ে প্রতিযোগিতা করে তোমরা তাদের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ো না। তোমরা এদের সেই ব্যক্তির জন্য ছেড়ে দাও, যার সরাসরি প্রতিশোধ রয়েছে এদের সঙ্গে। কারণ, অন্য সকলের চেয়ে সে-ই এদের পাওয়ার বেশি যোগ্য ও বেশি হকদার।

যায়েদ ইবনে দাসিন্না রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বহু উচ্চমূল্যে ক্রয় করে নিল সফওয়ান ইবনে উমাইয়া, তার বাবা উমাইয়া ইবনে খালাফের প্রতিশোধ হিসাবে তাকে হত্যার জন্য।

আর হারেসের সন্তানরা কিনে নিল খুবাইব ইবনে আদীই রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, বদরে নিহত তাদের বাবার বদলা হিসাবে তাকে হত্যার জন্য। আর এর জন্য তারা হুযাইলীদের অস্বাভাবিক মূল্য পরিশোধ করেছে।

***

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া বেশি সময় ধৈর্য ধরতে পারল না। বন্দীকে হাতে পেয়েই অস্থির হয়ে উঠল। কারণ, তার বুকের মধ্যে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। ফলে সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব থেকে কুরাইশীদের প্রতিশোধ তৃষ্ণা নিবৃত্ত করতে এবং তাকে হত্যার দ্বারা কওমের চক্ষুগুলো শীতল করতে তাড়াহুড়া করতে লাগল।

সে সংকল্প করল বন্দীকে হত্যা করবে তানঈমে। তার লাশ সেখানে ফেলে রাখবে যেন কুকুর ও শকুনরা খেতে পারে। এই হত্যাকাণ্ডের একটি সময় নির্ধারণ করে সেটা মক্কায় প্রচার করে দিলো।

***

নির্ধারিত দিনের সকাল হওয়ামাত্রই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে হিংসুটে কুরাইশী প্রতিশোধপ্রবণ কাফেররা, নারী, পুরুষ, শিশুসহ দলে দলে সকলে তানঈম এলাকায় হারামের বাইরে সমবেত হতে শুরু করে। তাদের শেকলে বাঁধা বন্দীকে তারা নিজেদের সামনে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসে সেখানে, সকল মানুষের সামনে তাকে হত্যার জন্য... আর ওই সকলের নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান ইবনে হারব।

***

যায়েদ ইবনে দাসিন্না রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যার জন্য প্রস্তুত করা হলো। তার হত্যাদৃশ্য যেন ছোটবড় সকলেই সহজে দেখতে পায় সে উদ্দেশ্যে মাটি থেকে উঁচু করে রাখা হলো।

তিনি স্থিরচিত্তে, হাসিমুখে মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। এই সময় আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে যায়েদ, তোমাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি চাও তোমাকে আমরা ছেড়ে দিই, তুমি নিরাপদে নিশ্চিন্তে পরিবারের কাছে ফিরে যাও, আর তোমার এই জায়গায় তোমার বদলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি?'

মুচকি হেসে যায়েদ বললেন,

'আল্লাহর কসম! আমি চাই না যে মুহাম্মাদের শরীরে একটু কাঁটার আঁচড় লেগে তিনি কষ্ট পান, আর বিনিময়ে আমার মুক্তি হোক, আমি নিরাপদে পরিবারের সঙ্গে থাকি...'

তার জবাবে সকলের রাগ তীব্র হয়ে উঠল, চিৎকার করে উঠল,

'ওকে মেরে ফেলো... হত্যা করো...

কিন্তু আবু সুফিয়ান চিন্তিত হয়ে বললেন,

'কোনো মানুষ অন্য মানুষকে এত ভালোবাসতে পারে তা আমি জানতাম না। মুহাম্মাদকে তার সাহাবীরা যেমন ভালোবাসে।'

এরপর সকলে তার দিকে এগিয়ে গেল, পাথরের আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলল। আর তিনি বলতে থাকলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল, তাঁর নির্বাচিত বান্দা।

এটা ছিল যায়েদ ইবনে দাসিন্না রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অবস্থা। তার সঙ্গী খুবাইব ইবনে আদীই রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অবস্থা এবার বর্ণনা করা হবে...

***

হারেসের সন্তানেরা খুবাইব ইবনে আদীই রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিজেদের বাড়ির জেলখানার গভীরে ফেলে রাখল। তাকে তারা দীর্ঘ সময় জেলে আটকে রাখল... ফলে তিনি সেখানে রোযা, নামায ও তিলাওয়াতের মধ্যে কাটাতে থাকেন।

হারেসের মেয়েরা ও দাসীরা রাত ও দিনে যখনই তার দিকে তাকাত তখনই দেখত তিনি হয়তো রুকুতে, না হয় সিজদাতে...

অথবা কুরআন তিলাওয়াতে রত, আর তার দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত।

ফলে তার জন্য হৃদয়গুলো কোমল হয়ে ওঠে। তারা প্রায় ভুলে যায় যে, এই লোকটি বদর যুদ্ধে তাদের পিতাকে হত্যা করেছিল।

***

ইসলাম গ্রহণ করার পর হারেসের এক মেয়ে বর্ণনা করেন,

'খুবাইব ইবনে আদীই রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আমাদের বাড়িতে আটকে রাখা হয়। কওমের লোকেরা যখন তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত ও দিনক্ষণ পাকা করে ফেলল, তখন তিনি আমার কাছে একটি ক্ষুর চাইলেন, মুসলিমরা যেসব অবাঞ্ছিত লোম কেটে পরিষ্কার করে থাকে, নিহত হওয়ার আগে সেই পরিচ্ছন্নতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই তার এই ক্ষুর চাওয়া।

আমি তার চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুর তার হাতে দিলাম।

আমার অসাবধান মুহূর্তে আমার এক ছোট্ট বাচ্চা টুকটুক করে তার কাছে চলে যায় এবং গিয়ে তার কোলে উঠে বসে।

আমার ছোট্ট বাচ্চা তার কোলে বসা আর তার হাতে ধারালো ক্ষুর— এই দৃশ্য দেখামাত্রই আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম, মনে মনে বললাম,

'হায় হায়! এটা আমি কী করলাম? খুবাইব নিহত হওয়ার আগে আমার বাচ্চাকে হত্যা করে তার বদলা নিয়ে নেবে।'

আমি ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, যা তিনি আমার চেহারায় দেখতে পেলেন।

তখন তিনি কোমল ও স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাকে বললেন,

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে, এই বাচ্চাকে খুন করে আমি তোমাকে ব্যথিত করব?

আল্লাহর কসম! আমি এমন নিকৃষ্ট কাজ কখনোই করব না।'

এরপর তিনি বললেন,

'আমরা মুসলিম জাতি কখনোই নিষ্পাপ শিশু, বৃদ্ধ, নারী ও ইবাদতের জন্য উৎসর্গিত যাজক বা পাদরিকে কষ্ট দিই না।

আমাদের যুদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের ওপর জুলুম করে এবং আমাদেরকে আমাদের দীন থেকে উৎখাত করতে চায়।'

হারেসের মেয়ে বলেন,

'আল্লাহর কসম! পৃথিবীর বুকে খুবাইবের চেয়ে ভালো কোনো কয়েদি আছে বলে আমার মনে হয় না। আল্লাহর কসম, আমি তাকে বড় বড় আঙুরের থোকা থেকে আঙুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন আঙুরের মৌসুম নয়। তা ছাড়া তিনি তখন লোহার শিকলে বন্দী।

আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, ওই আঙুর ছিল তার জন্য পাঠানো আল্লাহর বিশেষ রিযিক।'

***

হারেসের সন্তানেরা যখন খুবাইব ইবনে আদীই রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যার সংকল্প গ্রহণ করল এবং মানুষের মাঝে এটা প্রচার করে দিলো। তখন মক্কার ছোট বড় সকলেই তানঈমে জমায়েত হলো দ্বিতীয় কয়েদির হত্যাদৃশ্য দেখার জন্য।

কুরাইশের লোকেরা যখন তাকে হত্যার স্থানের কাছে নিয়ে গেল... তিনি তখন কুরাইশ নেতাদের বললেন,

'পারলে আমাকে দু'রাকাত নামাযের সুযোগ দিন।'

তাদের এক নেতা তার প্রতি কোমল হয়ে বলল,

‘ঠিক আছে, তোমার দু’রাকাত পড়ে নাও...

তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে দু’রাকাত নামায পড়লেন। এরপর কওমের লোকদের কাছে এসে বললেন,

‘আল্লাহর কসম! যদি এই কথা বলার আশঙ্কা না থাকত যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে নামায দীর্ঘ করেছি, তাহলে নামায আরও দীর্ঘ করতাম।’

***

লোকেরা খুবাইব ইবনে আদীই রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে উঁচু করে ধরল শূলদণ্ডের সঙ্গে। এবং মজবুত করে তাকে সেটার সঙ্গে বেঁধে ফেলল...

যখন তারা হত্যা করতে উদ্যত হলো, সে সময় খুবাইব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

‘হে আল্লাহ, আমরা আপনার নবীর রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি, সুতরাং কাল তাঁকে এই সংবাদ পৌঁছে দিন যে, আমাদের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছে।’

এরপর তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে বদদুআ করলেন,

اَللّٰهُمَّ اَحْصِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

‘হে আল্লাহ, কুরাইশী কাফেরদের ভালো করে গুনে রাখুন, তাদের নির্মমভাবে হত্যা করুন, তাদের একটাকেও ছাড়বেন না।’

আবু সুফিয়ান যখন তার বদদুআর কথাগুলো শুনলেন, কোলে থাকা পুত্র মুআবিয়াকে তাড়াতাড়ি কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন, তার গায়ে বদদুআ লেগে যাওয়ার ভয়ে। জাহেলী যুগে আরবরা যেমন করত।

এরপর তারা তাকে হত্যা করল...

খুবাইব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার পূর্বসূরি পাঁচ সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এবং সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে চলে গেলেন আপন রবের সান্নিধ্যে...

তথ্যসূত্র :

১. *আস-সীরাতু লিবনি হিশাম*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
২. *দীওয়ানু হাস্সান ইবনে সাবেত ওয়া শুরূহুহূ, ফীহি মাররাতুন কীলাত আসেম ওয়া আস-হাবুহু।*
৩. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
৪. *সিফাতুস সফওয়া*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৫. *তারীখুত তাবারী*, ১০ম খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
৬. *আল-মুহাব্বার ফিত-তারীখ*, ১১৮ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড ২৪৪ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৪৩৪৭, আসেম।
৮. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, আসেম।
৯. *উসদুল গাবাহ*, 'আত্তারজামা' ২৬৬৩ আসেম।
১০. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৭৩৭৮, মারসাদ।
১১. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, মারসাদ।
১২. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ২১৪৮, খালিদ।
১৩. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা, খালিদ।
১৪. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৪৭৬৯, আব্দুল্লাহ।
১৫. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা, আব্দুল্লাহ।
১৬. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৫৬৫ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ২৮৯৮, যায়েদ।
১৭. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৫৫৪ পৃষ্ঠা, যায়েদ।
১৮. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ২২২২, খুবাইব।
১৯. *আল-ইসতীআব বিহামিশিল ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, খুবাইব।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

(দুই খণ্ডে সমাপ্ত)

লেখক ড. পাশা ও তাঁর রচনা সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর মন্তব্য :

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা সাহাবী ও তাবেঈদের জীবনকথা রচনার ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেছেন এক অনন্য ধারা। জন্ম, মৃত্যু আর অবদান আলোচনার সেই সেকেলে পদ্ধতি বর্জন করেছেন। মুসলিম উম্মাহর মহান পূর্বসূরী সাহাবী ও তাবেঈদের আলোকিত জীবনধারাকে প্রথমে তিনি আত্মস্থ করেছেন নিজের মধ্যে। এরপর সেই সব জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রকে আবেগ, ভালোবাসা, ভক্তি আর সাহিত্যের রস দিয়ে এমন জীবন্ত ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন যাতে মনে হয় তিনি চলমান কোনো ঘটনার ধারাভাষ্য বর্ণনা করছেন।

তাঁর রচিত সাহাবী ও তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন পড়লে মহৎ মানুষ হওয়ার নেশা চেপে ধরে।

–ড. আয়েয আর-রদাদী

আমি যতবারই তাঁর কিতাব দু'টি পড়ি, ততবারই নতুন স্বাদ আস্বাদন করি, নতুন মজা পাই। তাঁর কালোত্তীর্ণ, আলোকিত, ঈমান জাগানিয়া সাহিত্যের সৌন্দর্য একদিকে আমাকে মোহাবিষ্ট করে তোলে, অন্যদিকে আমি যেন যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়ি সাহাবায়ে কেরাম আর তাবেঈনে এযামের প্রতি তাঁর নিখাদ ভক্তি ও ভালোবাসা দেখে। যা স্পষ্ট চোখে পড়ে তাঁর এই রচনার প্রতিটি হরফে, শব্দে আর বাক্যে..

–নূর আলম খলীল আল-আমীনী

বহুগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ড. পাশা খ্যাতির শিখরে উন্নীত হতে পেরেছিলেন একজন সুসাহিত্যিক, লেখক, গল্পকার, গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনমান্য শিক্ষক হিসাবে। তিনি নিজের বহুমুখী প্রতিভার প্রভাব ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন অগণিত ছাত্র ও ভক্তের মাঝে...। বিদ্যালয়ের হলঘরগুলো তাঁকে চিনত এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ গড়ার কারিগর রূপে। যখন তিনি কথা বলতেন, সকলের গলা উঁচু হয়ে যেত তাঁকে দেখার জন্য, সকলেই তাকিয়ে থাকত তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে। সাহিত্য-অলঙ্কারে, শব্দের যাদুময় প্রভাব সৃষ্টিতে, বাগ্মীতা ও বাকপটুতায় তিনি ছিলেন এক মুকুটহীন সম্রাট। রচনা ও বক্তব্য-উপস্থাপনায় বিশেষত জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ের সহজ ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনায় তাঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার।

তাঁর জীবনব্যাপী ঐকান্তিক উদ্যোগ ছিল তরুণ ও যুব-সমাজকে ইসলামী ভাবধারায় ও ইসলামী আদব-কায়দায় গড়ে তোলার। সেই উদ্যোগের গলায় মালা পরিয়েছেন *সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন* ও *তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন* নামের সুবিখ্যাত দু'টি গ্রন্থের মাধ্যমে। –ড. আবদুল্লাহ হামেদ